শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

৪৫শ বর্ষ | ভাদ্র, ১৪০০ | ৭ম সংখ্যা



শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উপাস্য
শ্রীশ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারীজীউ
সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ
উপ-সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ
—: কার্য্যালয় :—
শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ,
২৮, হালদার বাগান লেন; কলিকাতা-৭০০০০৪
ফোন ঃ ৩৩-৮৯৭৩

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

(মাসিক)

পঞ্চচত্বারিংশ-বর্ষ (১ম-১২শ সংখ্যা)

(শ্রীগৌরাব্দ ৫০৬ বিষ্ণু হইতে ৫০৭ মাধব,

বঙ্গাব্দ ১৩৯৯ ফাল্গুন হইতে ১৪০০ মাঘ,

খৃষ্টাব্দ ১৯৯৩ মার্চ্চ হইতে ১৯৯৪ ফেব্রুয়ারী।)

প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক—

পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-আচার্য্য—

ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

উপ-সম্পাদক—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

প্রকাশক—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) পঃ বঃ।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রতিষ্ঠাতা—নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসস্বামী ১০৮-শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-অধ্যক্ষ—পরিব্রাজকাচার্য্য
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ

—(*)—

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুদর্শন দাসাধিকারী, বি. এ., বি.টি., কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
পণ্ডিত শ্রীযুত রসিকরঞ্জন দাসাধিকারী, বি. এ.
পণ্ডিত শ্রীযুত কৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক, ব্যাকরণতীর্থ
পণ্ডিত শ্রীযুত জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ
পণ্ডিত শ্রীযুত চৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী, কবিভূষণ

—(*)—

প্রচার-সম্পাদক—
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ

কার্য্যাধ্যক্ষ—
শ্রীসত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, বিদ্যারত্ন

(ত্রিদণ্ডিস্বামী) শ্রীভক্তিবেদান্ত আচার্য্য (মহারাজ)-কর্ত্তৃক শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে প্রকাশিত ও নবদ্বীপস্থ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেস হইতে তৎকর্ত্তৃক মুদ্রিত।

পঞ্চচত্বারিংশ-বর্ষ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

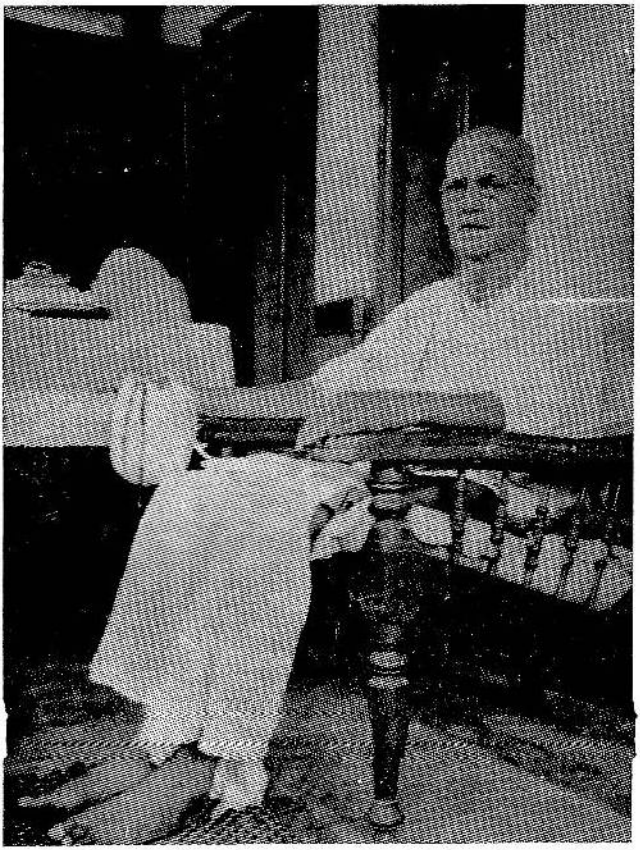
প্রবন্ধাদির সূচীপত্র

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
অজিত ভগবান্ ভক্তজিৎ	৩।৯৬
আর্ত্তি-প্রসূনাঞ্জলি [কবিতা]	১১।৪৩২
উজ্জীবিত ভাবনা : অমৃতত্বের পথ	১।২৫, ২।৫৯
কৃপণ	২।৭১
কৃষ্ণ বংশীগীত-মাহাত্ম্য—শ্রী [কবিতা]	৪।১৫৫
কৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী - শ্রী [কবিতা]	৭।২৫৫
(কৃষ্ণ)-প্রণাম-প্রণয়াখ্য-স্তবঃ—শ্রী	৯।৩২১
কৃষ্ণ—পরমতত্ত্ব—শ্রী	১০।৩৭১
কে চোর ?	১০।৩৮৯
ক্রোধ	৭।২৬২
গরুড়-কৃতম্ শ্রীশ্রীবদরীনারায়ণ-স্তোত্রম্—শ্রী	৫।১৬১
গুরু-বৈষ্ণব-মহিমা কীর্ত্তন— শ্রী [শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব]	১।১০
গুরু-মহারাজের বক্তৃতা—শ্রীল	
১। শ্রীজন্মাষ্টমী-তিথিতে শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠে প্রদত্ত	১।৩২, ২।৬৬, ৩।১১১, ৪।১৪৯
২। শ্রীরাধাষ্টমী-তিথিতে শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠে প্রদত্ত	৫।১৯৪, ৬।২৩৫, ৭।২৭১
৩। শিলং-এ প্রদত্ত	১০।৩৯১, ১১। ৪৩৪, ১২। ৪৬১
গৌর এলো [কবিতা]	১।৩০
গৌরজন্ম-যাত্রা [কবিতা]	২।৫৪
'গৌড়ীয়-পত্রিকা'র পঁয়তাল্লিশ-বর্ষ পদার্পণে—শ্রী [কবিতা]	২।৬৫
গৌরাঙ্গস্তোত্ররত্নম্—শ্রী	৮।২৮১
চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত	৫।১৭০, ৬।২০৯
চৈতন্যাষ্টকম্—শ্রীশ্রী	১০।৩৬১
জগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসবে আহ্বান—শ্রীশ্রী [নিমন্ত্রণ-পত্র]	৩।১১৯
জন্ম-মৃত্যু-রহস্য	৩।১০৪
জন্মাষ্টমী—শ্রী [কবিতা]	৬।২২২
জন্মাষ্টমী-মহোৎসব—শ্রীশ্রী [বিবরণ]	৮।৩১৯

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
জীবন-পথের পাথেয় কি দুঃখ ?	১।১৫
ঝুলনযাত্রা ও শ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে সাদর আহ্বান—শ্রী [নিমন্ত্রণ-পত্র]	৪।১৫৯
তত্ত্বমুক্তাবলী ও যুক্তিমল্লিকা [বিজ্ঞাপন]	৬।২২৮, ৭।২৭৪
ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস [শ্রীখগপতি দাসাধিকারী, শ্রীরামগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীবলভদ্র দাস ব্রহ্মচারীর]	২। ৭
দামবন্ধন-লীলা-কীর্ত্তন—শ্রী [কবিতা]	৮।৩০১
দীক্ষাগুরু, শিক্ষাগুরু ও চৈত্ত্যগুরু	১।১৭
দুনিয়ার দৌড়	৫।১৮২
দৈব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম	১।১৩, ২।৪৮, ৩।৮৯, ৪।১২৯
নববর্ষ	১।৩৬
নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব—শ্রীশ্রী [বিবরণ]	২।৭৫
নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ও পরিক্রমা-গ্রন্থাবলী—শ্রীশ্রী [বিজ্ঞাপন]	৯।৩৩০
নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব-শ্রীশ্রী [নিমন্ত্রণ-পত্র]	১২।৪৭৫
পুরুষোত্তম কে ?	৫।১৮৬
পুরুষোত্তম মাস—শ্রী [কবিতা]	৬।২২৯
পুষ্পাঞ্জলি [কবিতা] শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব-তিথিপূজায়	১০।৩৮১
পুরুষোত্তমধামে শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রত-উদ্‌যাপন—শ্রী [বিবরণ]	১০।৩৯৬
প্রশ্নোত্তর [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	১।৩, ২।৪৪, ৩।৮৪, ৪।১২৪, ৫।১৬৪, ৬।২০৩, ৭।২৪৪, ৮।২৮৩, ৯।৩২৪, ১০।৩৬৪, ১১।৪০৩, ১২। ৪৪৪
প্রভুপাদের অভিভাষণ—শ্রীল	১।৬
প্রভুপাদের হরিকথামৃত—শ্রীল	২।৪৭, ৩।৮৬, ৪।১২৭, ৫।১৬৭, ৬।২০৬, ৭।২৪৮, ৮।২৮৮, ৯।৩২৯, ১০।৩৬৯, ১১।৪০৮, ১২। ৪৪৯
প্রকৃত বৈরাগ্য	৬।২১৭
প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ	৮।২৯৭
প্রণতি-প্রসূনাঞ্জলি [কবিতা] শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামীর তিরোভাব-তিথিপূজায়	৯।৩৪৬

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ সম্বন্ধে দুই-চারিটী কথা	১২। ৪৭০
বর্ত্তমান ভারতের শাস্ত্রানাদর	৫।১৭৩
বিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর-স্থাপন—শ্রী	৪।১৫৬
বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি [কবিতা] শ্রীল প্রভুপাদের শুভাবির্ভাব-তিথিতে	১।১১
বৃন্দাদেব্যষ্টকম্—শ্রীশ্রী	১১।৪০১
বৈষ্ণব-চরণে প্রার্থনা—শ্রীশ্রী [কবিতা]	৪।১৫৮
বৈরাগ্যবিলাস	৭।২৬৭
ব্যঞ্জন-বর্ণমালায় শ্রীগুরু-মহিমা [কবিতা]	৩।১১৫
ব্যাসপূজা-মহোৎসব—শ্রীশ্রী [নিমন্ত্রণ-পত্র]	১০।৪০০
ব্রহ্মচর্য্য বনাম বৈষ্ণবতা	৮।৩১৬, ৯।৩৪১
ভগবল্লোক ও ভক্ত—কাল-মায়াতীত	৪।১৩১
ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব —শ্রীমদ্ [নিমন্ত্রণ-পত্র]	৭।২৭৯
ভগবানের ভুল কি ?	৮।৩১২
ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি [কবিতা] শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বিরহ-বাসরে	৯।৩৫১
ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শুভাবির্ভাব-তিথিতে —শ্রীল [কবিতা]	১১।৪২২
ভাগবত-মাহাত্ম্য—শ্রীমদ্	৭।২৫১, ৮।২৯১
ভাগবতের প্রতিপাদ্য—শ্রীমদ্	৯।৩৫৪
মহাপ্রভু ও রায়-রামানন্দ মিলন—শ্রীমন্	১।২৮, ২।৬৩
মহাপ্রভুর শিক্ষাসার—শ্রীমন্	৫।১৯৯
মহাজনোপদেশ	৭।২৫৬
মজার ভুল	৭।২৭৫
মদ	১০।৩৭৮
মহাবদান্যতার পরাকাষ্ঠা	১১।৪১১, ১২। ৪৫১
মার্কণ্ডেয়-কৃতম্ শ্রীশ্রীবদরীনারায়ণ-স্তোত্রম্	৩।৮১, ৪।১২১
মাৎসর্য্য	১১।৪২৮
মুক্তি বনাম ভক্তি	৯।৩৪৭
মোহ	৯।৩৩৬

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
'যদি তোমার দেখা না পাই প্রভু !'	৪।১৪০
যুক্তবৈরাগ্য ও ফল্গুবৈরাগ্য	৩।৯৯
রাধাষ্টকম্—শ্রীশ্রী	৭।২৪১
লোভ	৮।৩০৩
শচীনন্দন-বিজয়াষ্টকম্—শ্রীশ্রী	২।৪১
শরণাগত ও শরণাগত-রক্ষক ভগবান্ শ্রীহরি	৬।২৩১
শান্তি !! [কবিতা]	৮।৩১৫
শিক্ষার স্বরূপ	১।২২, ২।৫৫
শিব-কৃতম্ শ্রীশ্রীবদরীনারায়ণ-স্তোত্রম্—শ্রী	৬।২০১
শ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠে শ্রীঝুলনযাত্রা-মহোৎসব— শ্রী [বিবরণ]	৭।২৭৮
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-জয়ন্তী	৫।১৯০, ৬।২২৩, ৭।২৫৯, ৮।৩০৭, ৯।৩৩১, ১০।৩৮৪, ১১।৪২৩
সম্বন্ধ-জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা	৪।১৩৬
সৃষ্টিকর্ত্তা কে ?	৩।৮৮
সৌভাগ্য	৯।৩৪৯
স্বধামে শ্রীপাদ সত্যসঙ্কল্প প্রভু	৩।১১৭
স্বরবর্ণমালায় শ্রীগুরু-মহিমা	৪।১৩৫
স্বধামে শ্রীযুক্তা কল্যাণী দেবী	৯।৩৫৮
হরিকুসুম-স্তবকম্—শ্রী	১।১
হইতে পারিতাম যদি [কবিতা]	২।৭৩
হরিনাম করো সার [কবিতা]	৩।৯৪
হরিজন	৪।১৪৩
His Master's Voice	৬।২১২
Life Story of Impersonalism or Victory of Vaishnavism [বিজ্ঞাপন]	১১।৪৪০
Statement about Shri Goudiya-Patrika	১।৪০



নবদ্বীপ মঠের স্বীয় ভজন-কুটীরে ভজনরত
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৪৫শ বর্ষ | ৬ বিষ্ণু, বাসুদেব, ৫০৭ শ্রীগৌরাব্দ
৩০ ফাল্গুন, রবিবার, ১৩৯৯, ইং ১৪/৩/৯৩ | ১ম সংখ্যা

শ্রীহরিকুসুম-স্তবকম্

[শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

শ্রীহরয়ে নমঃ

গতি-গঞ্জিত-মত্ততর-দ্বিরদং-রদ-নিন্দিত-সুন্দর-কুন্দ-মদম্।
মদনার্ব্বুদ-রূপ-মদঘ্ন-রুচিং রুচির-স্মিত-মঞ্জরি-মঞ্জু-মুখম্ ॥ ১ ॥

মত্ত-মাতঙ্গের গতি অপেক্ষাও যাঁহার গতি অতিসুন্দর, কুন্দ কুসুমাবলী অপেক্ষাও যাঁহার দশন-পঙ্‌ক্তি অতি মনোজ্ঞ, অর্ব্বুদ-পরিমিত কন্দর্পের শোভা অপেক্ষাও যাঁহার শ্রীঅঙ্গের শোভা এবং যাঁহার মুখমণ্ডল মন্দ মন্দ হাস্যযুক্ত ॥ ১ ॥

মুখরীকৃত-বেণু-হৃত-প্রমদং মদ-বল্গিত-লোচন-তাম-রসম্।
রসপূর-বিকাশক-কেলি-পরং পরমার্থ-পরায়ণ-লোক-গতিম্ ॥ ২ ॥

যিনি বংশীধ্বনিদ্বারা প্রমদাগণকে আকর্ষণ করিয়া থাকেন, যৌবনমদহেতু যাঁহার নয়ন-পদ্ম অরুণবর্ণ হইয়াছে, যাঁহার লীলা—রসপ্রবাহ-প্রকাশক এবং যিনি পরমার্থ-পরায়ণ ভক্তগণের একমাত্র গতি ॥ ২ ॥

গতি-মণ্ডিত-যামুন-তীর-ভুবং ভুবনেশ্বর-বন্দিত-চারু-পদম্ ।
পদকোজ্জ্বল-কোমল-কণ্ঠ-রুচং রুচকাক্ত-বিশেষক-বল্গু তরম্ ॥ ৩ ॥

যাঁহার ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশাদি চরণ-চিহ্নদ্বারা যমুনার তীরস্থ ভূমি ভূষিত হইয়াছে, বিধি-রুদ্রাদি দেবগণ-কর্ত্তৃক যাঁহার মনোহর পাদপদ্ম বন্দিত হইতেছে, উজ্জ্বল পাদক-ভূষণদ্বারা যাঁহার কোমল কণ্ঠ সুশোভিত এবং গোরচনা-নির্ম্মিত তিলক ধারণ করায় যাঁহার ললাট অতিশয় মনোহর ॥ ৩ ॥

তরল-প্রচলাক-পরীত-শিখং শিখরীন্দ্র-ধৃতি-প্রতিপন্ন-ভুজম্ ।
ভুজগেন্দ্র-ফণাঙ্গণ-রঙ্গ-ধরং ধর-কন্দর-খেলন-লুব্ধ-হৃদম্ ॥ ৪ ॥

ময়ূরপুচ্ছদ্বারা যাঁহার চূড়া সুশোভিত, যিনি বামহস্তদ্বারা গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছেন, ভুজগেন্দ্র কালিয়ের মস্তকে যিনি নৃত্য করেন, গিরিকন্দরে খেলা করিতে যাঁহার চিত্ত সমুৎসুক ॥ ৪ ॥

হৃদয়ালু সুহৃদ্গণ-দত্ত-মহং মহনায়-কথা-কুল-ধূত-কলিম্ ।
কলিতাখিল-দুর্জ্জর বাহু-বলং বল-বল্লব-শাবক-সন্নিহিতম্ ॥ ৫ ॥

সহৃদয় সুহৃদ্গণকে যিনি সর্ব্বদা উৎসবযুক্ত করেন, যাঁহার কথা-প্রসঙ্গে কলিযুগের গর্ব্ব খর্ব্ব হয়, যাঁহার বাহুবল সকলের দুর্জ্জেয় এবং যিনি বলরাম ও ব্রজ-বালকগণের নিকট সর্ব্বদা বিরাজমান ॥ ৫ ॥

হিত-সাধু-সমীহিত-কল্পতরুং তরুণীগণ-নূতন-পুষ্প-শরম্ ।
শরণাগত-রক্ষণ-দক্ষতমং তমসাধু-কুলোৎপল-চণ্ডকরম্ ॥ ৬ ॥

যিনি অনুবর্ত্তী ভক্তগণের বাঞ্ছা-পূরণে কল্পতরু, যিনি যুবতীগণের নবীন কন্দর্পস্বরূপ, যিনি শরণাগত-রক্ষণে তৎপর এবং যিনি দৈতবৃন্দ-রূপ কুমুদ পুষ্প-সকলের ম্লান বিষয়ে সূর্য্যস্বরূপ ॥ ৬ ॥

কর-পদ্ম-মিলৎ কুসুম-স্তবকং বক-দানব-মত্ত-করীন্দ্র-হরিম্ ।
হরিণীগণ-হারক-বেণু কলং কঠরবোজ্জ্বল-কণ্ঠ-রণম্ ॥ ৭ ॥

কুসুম-স্তবকে যাঁহার কর-পদ্ম সুশোভিত, যিনি বকাসুর-রূপ মত্ত-মাতঙ্গের প্রতি সিংহ-স্বরূপ, যিনি সুমধুর বংশীরবে হরিণীগণকে আকর্ষণ করেন, কোকিলের কলরব অপেক্ষাও যাঁহার কণ্ঠধ্বনি সুমধুর ॥ ৭ ॥

রণ-খণ্ডিত-দুর্জ্জন-পুণ্যজনং জন-মঙ্গল-কীর্ত্তি-লতা-প্রভবম্।
ভব-সাগর কুম্ভজ-নাম-গুণং গুণ-সঙ্গ-বিবর্জ্জিত-ভক্তগণম্ ॥ ৮ ॥

যিনি যুদ্ধে দুষ্ট রাক্ষসগণকে পরাভব করিয়াছেন, যাঁহার কীর্ত্তি-কলাপ জগতের কল্যাণপ্রদ, যাঁহার নাম, গুণ ও লীলা ভবসাগর শোষণে অগস্ত্যমুনি-স্বরূপ, যাঁহার ভক্তগণ প্রকৃতি-সঙ্গ-বিবর্জ্জিত ॥ ৮ ॥

গণনাতিগ-দিব্য-গুণোল্লসিতং সিতরশ্মি-সহোদর-বক্ত্রবরম্।
বর-দৃপ্ত-বৃষাসুর-দব-ঘনং বিভ্রম-বেশ-বিহারময়ম্ ॥ ৯ ॥

দয়া-দাক্ষিণ্যাদি অসংখ্য সুদিব্য গুণগণে যিনি ভূষিত, যাঁহার মুখমণ্ডল শশাঙ্ক-সদৃশ, যিনি অতি গর্ব্বিত বৃষাসুররূপ দাবানল নির্ব্বাপণে মেঘস্বরূপ, যিনি অতিশয় বিলাসী এবং তদুচিত বেশভূষাদি করিয়া নিকুঞ্জ-বিহারে তৎপর ॥ ৯ ॥

ময়-পুত্র-তমঃক্ষয়-পূর্ণবিধুং বিধুরীকৃত-দানব-রাজকুলম্।
ফুল-নন্দনমত্র নমামি হরিম্ ॥ ১০ ॥

যিনি ময়পুত্র ব্যোমাসুর-রূপ অন্ধকারের ক্ষয়ে পূর্ণচন্দ্রস্বরূপ, যাঁহা হইতে দানব-রাজবংশ ক্লেশান্বিত হইয়াছে, সেই স্ব-বংশের আনন্দকর শ্রীহরিকে আমি নমস্কার করি ॥ ১০ ॥

উরসি পরিস্ফুরদিন্দিরমিন্দিন্দির-মন্দির-স্রজোল্লসিতম্।
হরি-মঙ্গলাতি-মঙ্গল-সচ্চন্দনং বন্দে ॥ ১১ ॥

যাঁহার বক্ষঃস্থলে শ্রীরাধা বিরাজমানা, অলিকুলাকীর্ণ বৈজয়ন্তী-মালায় যিনি সুশোভিত, যিনি যুবতীগণের অতিশয় মঙ্গলকর এবং মলয়াদি অনুলেপনে যাঁহার শ্রীঅঙ্গ অনুলিপ্ত, সেই শ্রীহরিকে আমি অভিবাদন করি ॥ ১১ ॥

প্রশ্নোত্তর

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব

১। কৃষ্ণস্বরূপ বিমল প্রেমের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপযোগী কেন?

"পরমতত্ত্বের যত প্রকার ভাব জগতে লক্ষিত হইয়াছে, সে-সমস্ত ভাবের অপেক্ষা কৃষ্ণস্বরূপ ভাবটীই বিমল প্রেমের একমাত্র অধিকতম উপযোগী ভাব। মুসলমান শাস্ত্রে যে 'আল্লা'র ভাব স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে বিমলপ্রেম নিযুক্ত হইতে পারে না; অতিপ্রিয়বন্ধু পয়গম্বরও তাঁহার স্বরূপ সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই। কেন না, উপাস্য-তত্ত্ব সখ্যগত হইয়াও ঐশ্বর্য্য-বশতঃ উপাসক হইতে দূরে থাকেন। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম যে 'গডে'র ভাবনা করেন, তিনিও অত্যন্ত দূরগত-তত্ত্ব। ব্রহ্মের ত' কথাই

নাই। নারায়ণও জীবের সহজ-প্রেমের প্রাপ্য বস্তু হন না ; পরন্তু কৃষ্ণই একমাত্র বিমল-প্রেমের সাক্ষাৎ বিষয়স্বরূপে চিন্ময় ব্রজধামে নিত্য-বিরাজমান আছেন।"

—চৈঃ শিঃ ১।১

২। কৃষ্ণ ব্যতীত কি বিশুদ্ধ-প্রেমের বিষয়ান্তর নাই ?

"যদিও ভাষাভেদে কৃষ্ণ, বৃন্দাবন, গোপ, গোপী, গোধন, যমুনা, কদম্ব প্রভৃতি শব্দসকল কোন স্থলে লক্ষিত নাও হয়, তথাপি বিশুদ্ধ প্রেমসাধকদিগের তত্তল্লক্ষণ লক্ষিত নাম, ধাম, উপকরণ, রূপ ও লীলা-সমুদয় প্রকারান্তরে ও বাক্যান্তরে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। অতএব কৃষ্ণ ব্যতীত বিশুদ্ধ-প্রেমের বিষয়ান্তর নাই।"

—চৈঃ শিঃ ১।১

৩। বিষ্ণুতত্ত্বের চরম প্রকাশ কি ?

"শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুতত্ত্বের চরম প্রকাশ। সত্ত্বগুণের উপাসনায় জীব নির্গুণ হইলে কৃষ্ণতত্ত্বের সেবাপ্রাপ্ত হন।" —'তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন', সঃ তোঃ ১১।৬

৪। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ কি পৃথক্ তত্ত্ব ?

"ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ বস্তুতঃ একই তত্ত্ব, যিনি যেরূপ ও যতদূর দেখিতে পান, তিনি তাহাই দেখিয়া তাঁহাকেই সর্ব্বোত্তম বলিয়া স্থির করেন।—চৈঃ শিঃ ১।৩

৫। ব্রহ্ম ও পরমাত্মা হইতে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য কি ?

"শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ; পরমাত্মা ও ব্রহ্মের আশ্রয়।" —শ্রীমঃ শিঃ ৩য় পঃ

৬। ব্রহ্ম ও ভগবানের স্বরূপ ও তাঁহাদের উপাসনাগত ফলের তারতম্য কি ?

"ব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম ভগবান্ পৃথক্ পৃথক্ তত্ত্ব ন'ন। ব্রহ্ম সেই ভগবানের মহা-বিভূতি ; ব্রহ্ম—ব্যতিরেক-গুণ অর্থাৎ অপ্রকটিত-শক্তি-সম্পন্নতা-ভাব-মাত্র। প্রকটিত-অবিচিন্ত্য-অদ্ভুত-বিচিত্র-শক্তিবিশিষ্ট সেই বস্তুই ভগবান্ ; এইজন্যই স্বগুণ-নির্গুণাদি বিরুদ্ধ গুণসমূহ তাঁহাতে সামঞ্জস্যরূপে প্রবিষ্ট আছে। সুতরাং ব্রহ্মে কেবল শুষ্কজ্ঞান সংযোগদ্বারা জীবের মোক্ষমাত্র তুচ্ছ-সুখলাভ। ভগবানে নির্ম্মল ভক্তিরসাস্বাদনরূপ ভূমা-সুখের সম্ভব।" —বৃঃ ভাঃ তাৎপর্য্যানুবাদ

৭। ব্রহ্ম ও ভগবৎস্বরূপের বৈশিষ্ট্য কি ?

"শর্করা-পিণ্ডের ন্যায় কৃষ্ণ-পাদপদ্মই সুখরূপ ও সুখাধার। ব্রহ্ম কেবল সেই সুখ-মাত্র, কিন্তু সুখাধার ন'ন। ভগবান্ ও ব্রহ্মে এই প্রকার ভেদ কেবল ভগবানের অবিচিন্ত্য-ভেদাভেদ-শক্তি হইতে পর্য্যবসিত হয়।"

—বৃঃ ভাঃ তাৎপর্য্যানুবাদ

৮। শ্রীকৃষ্ণে কি দেহ-দেহি-ভেদ আছে ?

"শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহে জড়ীয়-শরীরধারী জীবের-ন্যায় দেহ-দেহি-ভেদ ও ধর্ম্ম-ধর্ম্মি-ভেদ নাই। অদ্বয়জ্ঞান-স্বরূপে যে দেহ, সেই দেহী ; যে ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মী। কৃষ্ণ-স্বরূপ একস্থান-স্থিত মধ্যমাকার হইলেও সর্ব্বত্র পূর্ণরূপে অবস্থিত।"

—শ্রীমঃ শিঃ ৩য় পঃ

৯। পরব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ বলা অযৌক্তিক কেন ?

"যাহা কিছু আছে, তাহার একটী বিশেষ ধর্ম্ম আছে, যদ্দ্বারা সে বস্তু অন্য বস্তু হইতে স্বতঃ ভিন্ন হইতে পারে। বিশেষ নাই, তবে বস্তুর অস্তিত্ব নাই বলিলেও হয়। পরব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ হইলে সৃষ্ট-বস্তু হইতে বা প্রপঞ্চ হইতে কিরূপে পৃথক্ হইতে পারিতেন ? যদি সৃষ্ট-বস্তু হইতে তাঁহাকে পৃথক্ বলিতে না পারি, তবে সৃষ্টিকর্ত্তা ও জগৎ এক হইয়া যায়। আশা, ভরসা, ভয়, তর্ক ও সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান নাস্তিত্বে পর্য্যবসিত হইয়া পড়ে।"　　—প্রেঃ প্রঃ ৯ম প্রঃ

১০। পরমেশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী তত্ত্ব সম্ভব নহে কেন ?

"পরমেশ্বর অদ্বিতীয় পুরুষ, তাঁহার সমান বা অধিক কেহ নাই, সমস্তই তাঁহার অধীন। তাঁহার হিংসা উৎপন্ন করিতে পারে, এমত কিছুই নাই। তাঁহার প্রতি ভক্তি অর্জ্জন করিতে যে-কিছু কার্য্য করা যায়, তিনি হৃদয়নিষ্ঠা লক্ষ্য করিয়া তাহার ফল দান করেন।"　　—প্রেঃ প্রঃ ৫ম প্রঃ

১১। ব্রহ্মকে কেন ভগবত্তত্ত্বের অঙ্গকান্তি বলা হয় ?

"ভগবৎস্বরূপই পূর্ণ-স্বরূপ ; যেহেতু তাহাই বিশেষ্য-তত্ত্ব ; ব্রহ্ম ও পরমাত্মা সেই বিশেষ্যের বিশেষণ-দ্বয়। যখন সৃষ্টি হয় নাই, তখন একমাত্র ভগবান্ বই আর কিছু ছিল না, তখন ব্রহ্ম ছিল না। জগৎ সৃষ্টি হইলে 'সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ'—এই ভাবে ভগবানের একটী বিশ্ব-সম্বন্ধী আবির্ভাব পরিজ্ঞাত হয়। ব্রহ্ম-সম্বন্ধে দুইটী ভাব আছে। একটী—'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' ; দ্বিতীয়টী—সমস্ত সৃষ্ট বা সগুণ বস্তুর ব্যতিরেক-চিন্তাবিশেষ। উভয় ভাবই বিশ্ব-সম্বন্ধী ভাব্। অতএব ব্রহ্মই ভগবানের জ্যোতিঃস্বরূপ বিশ্ব-সম্বন্ধে পরিব্যাপ্ত। এস্থলে ব্রহ্মকে ভগবানের অঙ্গকান্তি বলিলে যাথার্থের চরিতার্থই হইয়া থাকে।"　　—'বস্তুনির্দ্দেশ', সঃ তোঃ ২।৬

১২। ব্রহ্ম কি বস্তু ? তিনি পূর্ণ-সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের কিরূপ প্রকাশ ?

"শ্রীকৃষ্ণের যশোরাশি জ্যোতিরূপে সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইয়া 'ব্রহ্ম' নামে অভিহিত হয়।"　　—শ্রীমঃ শিঃ ৩য় পঃ

১৩। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব যে ব্রহ্মের আশ্রয়, তৎসম্বন্ধে গীতা-প্রমাণ কি ?

"নির্গুণ-সবিশেষ-তত্ত্বস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণই জ্ঞানীদিগের চরমগতি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। অমৃতত্ব, অব্যয়ত্ব, নিত্যত্ব, নিত্যধর্ম্মরূপ প্রেম এবং ঐকান্তিক সুখরূপ ব্রজরস,—এই সমুদায়ই নির্গুণ-সবিশেষ-তত্ত্বরূপ কৃষ্ণ-স্বরূপকে আশ্রয় করিয়া থাকে।"　　—রঃ ভাঃ ১৪।২৭

১৪। ব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে পার্থক্য কি ?

"পরশক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মই পরব্রহ্ম। নিঃশক্তিক-নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম পরব্রহ্মেরই একদেশ-মাত্র।" —তঃ বিঃ ১ম অনুঃ, ৩২

১৫। পরমাত্মার দ্বিবিধ প্রকাশ কি কি?

"পরমাত্মার দ্বিবিধ প্রকাশ—অর্থাৎ ব্যষ্টি-প্রকাশ ও সমষ্টি-প্রকাশ। সমষ্টি-প্রকাশদ্বারা তিনি বিরাট্—ব্রহ্মাণ্ড-বিগ্রহ। ব্যষ্টি-প্রকাশদ্বারা তিনি জীবের সহচর, তৎহৃদয়বাসী অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ পুরুষ-বিশেষ।" —চৈঃ শিঃ ৫।৩

(ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ

সম্বন্ধ-জ্ঞানদাতা শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয়-প্রার্থনা

"বৈরাগ্যযুগ্ ভক্তিরসং প্রযত্নৈরপায়য়ন্মামনভীপ্সুমন্ধম্।
কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী, সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি॥"

নিত্যবস্তু কৃষ্ণ—সনাতন বস্তু। তিনি সকলের প্রভু, তাঁ'র দাসসকলও প্রভু। যাঁ'রা তাঁ'র সেবা করেন, তাঁ'রাই প্রভু।

আচার্য্য—নিরহঙ্কারী ও আত্মবিৎ উপদেশক

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ।" সেই কৃষ্ণবস্তু উপদেশকসূত্রে নিজেই নিজের সেবা করেন। কৃষ্ণসেবা-বিমুখ প্রতীতিকে সেবোন্মুখ কর্‌বার যিনি যত্ন করেন, তিনিই গুরুর কার্য্য করেন। আমরা লঘু, অপণ্ডিত, বিপরীত বুদ্ধিবিশিষ্ট, প্রকৃতির দাস। 'আমি কর্ত্তা' বুদ্ধি হ'তেই কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠাশা—এই তিনটে এসেছে। কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যে গান শুনিয়েছেন, সেই গানের মধ্যে এইটী নিষেধ ক'রেছেন,—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥

"আপনি নিরহঙ্কারী, অন্যে দিবে মান"—বিচারটা যিনি পরিত্যাগ ক'রেছেন, তিনি ভক্তিপথ হ'তে বিচ্যুত। আত্মবিৎ আত্মা কি, তা জানেন।—

"জীবের স্বরূপ হয়—কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা-শক্তি, ভেদাভেদ-প্রকাশ॥"

চিৎকণ জীবের স্বরূপ-বিচার ; কৃষ্ণবিস্মৃতিই তাহার বিপর্য্যয় ও দুর্গতি

আমরা একটী শ্লোক দেখি,—

"কেশাগ্র-শতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
জীবঃ সূক্ষ্ম-স্বরূপোঽয়ং সংখ্যাতীতো হি চিৎকণঃ॥"

আমরা চিৎকণ জীব অনেক, সনাতন বস্তু এক। একটা চুলের প্রস্থ অংশকে শতভাগ ক'রে তা'রও যে শতভাগ, সেইটে 'আমি'। সেই 'আমি'কে ভোগা দেবার জন্য অনেক জিনিষ এসেছে। যাঁর যেরূপ ক্ষমতা, সেই অনুসারে সকলেই প্রভু হ'বার জন্য—নিগ্রহানুগ্রহ করবার জন্য ব্যস্ত। এই কার্য্য ক'রতে হ'লে কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা—এই তিনটীর দরকার। কনক, কামিনী—ছোট কথা, প্রতিষ্ঠাশাটাই বড়। মনুষ্য-জীবনে এ ছাড়া জঘন্য কার্য্য আর নাই। প্রতিষ্ঠাশা বড় দৌরাত্ম্যজনক। শ্রীসনাতন-গোস্বামীকে সনাতন-কৃষ্ণ শ্রীগৌর-লীলায় যে উপদেশ দিয়েছেন, তা'তে আমরা দেখছি যে, কৃষ্ণ-বিস্মৃতিফলেই আমাদের দুর্গতি হ'য়েছে।

শ্রীরূপানুগ-সম্প্রদায়ের গুরুতত্ত্ব ও গুরু পূজা-পদ্ধতি-বিশ্লেষণ

শ্রীরূপ-গোস্বামী সাংসারিক পরিচয়ে সনাতনের অনুজ, কিন্তু তিনি শ্রীসনাতনকে 'গুরু'রূপে জানেন। সেই রূপ-গোস্বামী হ'তে রূপানুগসম্প্রদায়। শ্রীল দাস-গোস্বামীও সনাতনের শিষ্য। তিনি যেরূপভাবে গুরুপূজা ক'রেছেন, সেটী 'বিলাপকুসুমাঞ্জলি'তে আছে— 'বৈরাগ্যযুগ্' প্রভৃতি। বিরাগের ভাব— বৈরাগ্য, ভক্তিরস—প্রভুতা-রস নহে। বৈরাগ্যবন্ত বৈষ্ণবগণ প্রতিষ্ঠার আশা করেন না। যদি প্রত্যহ সকালে উঠে নিজেকে শত ঝাঁটা মারা যায়, তা' হ'লে গুরুদ্রোহী হ'তে হয় না—প্রতিষ্ঠা আসে না। গুরু—সাধারণের নিকট একরূপে পরিচিত, অন্তরঙ্গ-জনের নিকট অন্যরূপে। অন্তরঙ্গ-জনগণের নিকট শ্রীগুরুপাদপদ্ম যেরূপ পরিচিত, সেটী বিলাপ-কুসুমাঞ্জলিতে গীত হ'য়েছে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রেষ্ঠ ও তদভিন্ন। তাঁর (শ্রীগুরুদেবের) দাস্য ব্যতীত কৃষ্ণদাস্যের সম্ভাবনা নাই। যাঁ'রা তাঁ'র দাস্য করেন, তাঁ'রা প্রভু, আর বাদবাকী অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা—সোজা কথায় ভোগী হ'বার বাসনাযুক্ত। মানুষ—ভোগী বা ত্যাগী হ'তে পারে না। সহস্রারে এই কথাটা লিখে রাখবেন।

কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশাহীন শুদ্ধ বৈষ্ণবই বাস্তবরূপে শ্রীসনাতন-শিক্ষাশ্রয়ী

প্রতিষ্ঠা—শৌকরী-বিষ্ঠা, এটা ছাড়লে মঙ্গল হ'বে। আমি ত্যাগ ক'রে

বাহাদুরী নেব, এটাও প্রতিষ্ঠাশা। এজন্যে বলি, এখানে (এজগতে) যতগুলি কথা আছে, সব শেষ ক'রে নাও। শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্ম আশ্রয় ক'রলে সব সুবিধা হ'বে। তাঁ'র পুত্রত্ব, ভৃত্যত্ব ও কলত্রত্বেই সব আছে। তাঁ'র কথা তিনি সনাতন-শিক্ষায় অতিসহজ ভাষায় ব'লেছেন ; আমি সেবাবিমুখ জীব—কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা ত্যাগ ক'রলেই মানুষ হ'তে পারব। প্রতিষ্ঠা এখানে পাওয়া যায় না, প্রতিষ্ঠাশার ঢেউ খাওয়া মাত্র সার হয়। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ প্রকৃত প্রতিষ্ঠাশার কথা শিক্ষা দিয়েছেন। কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশায় বৈরাগ্য হওয়ার দরকার। তা' হ'লেই প্রকৃত বৈষ্ণব হ'তে পারব।

অমানী-মানদ হইলে গুরুবর্গের আনুগত্যে শ্রীগৌর-কৃষ্ণের সেবাধিকার লাভ

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের উচ্চস্তরে পারমহংস্য-ধর্ম্ম, তা'কেই বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বলে। সেখানে পরিপূর্ণ সেবা-প্রবৃত্তি, যেটী কেবল বার্ষভানবীতে আছে ; আর আংশিক তিনি যাঁ'কে যতটুকু দি'য়েছেন, তাঁ'তে ততটুকু বর্ত্তমান। আমরা যদি অমানী-মানদ হই, তা'হলেই সব সুবিধা হ'বে, নচেৎ সবই অসুবিধাজনক হ'বে, আমরাও ভাগ্যহীন জান্‌তে হ'বে।

প্রযত্নৈঃ—শ্রীগুরুপাদপদ্ম ভক্তিরস পান করা'বার জন্য প্রকৃষ্টরূপে যত্ন করেন। তিনি অনভীপ্সু, আমাকে বাসনার আশা—প্রতিষ্ঠার আশা করান না। আমরা বহু আরাধনার ফলে ডেকে ডেকে শ্রীচৈতন্যমঠে তাঁ'কে পেয়েছি। 'বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি' বহুদিন প'ড়তে প'ড়তে শ্রীগুরুপাদপদ্ম পেয়েছিলাম। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক-গীতি, কৃষ্ণকর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ ও বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি—অধিকারানুসারে যিনি এই ছয়খানা গ্রন্থ না পড়েন, তাঁ'র কিছু মঙ্গল হ'বে না। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গীতমালা-মধ্যে 'কার্পণ্য-পঞ্জিকা' আছে, সে'গুলি সর্ব্বদা মনে রাখ্‌বেন। তাঁ'র দাস্য যদি ইচ্ছা হয়, তবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচার মনে রাখ্‌বেন। তা' হ'লেই প্রকৃত-প্রস্তাবে পরমহংস-অবস্থায় অবস্থিত হ'তে পা'রবেন।

মহাভাগবতের অপ্রাকৃত দৃষ্টিতে তদাশ্রিত জনগণও শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা-বৈভব

বর্ত্তমান সময়ে আমি যে উঁচু আসনে ব'সেছি, সেই আসনটা আমার নয়—সেটী শ্রীগুরুপাদপদ্মের। আমার মাথাটা—শ্রীগুরুপাদপদ্মের। পাপযুক্ত চক্ষুতে গুরুপাদপদ্ম দর্শন হয় না ; তা'তে ভোগ্যবস্তু দর্শনের আকাঙ্ক্ষা হয়। বহু সৌভাগ্যফলে শ্রীল জগন্নাথ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের দর্শন

পেয়েছিলাম। আমি একদিন মায়াপুরে বিচার করেছিলাম, এসব অর্চ্চনের কার্য্য ক'রব না। কিন্তু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ইচ্ছাক্রমে 'গীতার সংসার'-এর ন্যায় বহু সহস্র গুরুদেব আমার হ'য়েছেন। কেউ চ'লে গেছেন, কেউ আছেন। সকলেই আমার গুরুপাদপদ্মের আশ্রিত। তিনি মিত্রতাসূত্রে শ্রীল ভক্তিবিনোদ, শ্রীল জগন্নাথ, শ্রীল বলদেব, শ্রীল বিশ্বনাথ, শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু, শ্রীল রূপ-সনাতন-রঘুনাথ, শ্রীল স্বরূপ-দামোদর এবং শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরের স হত সর্ব্বতোভাবে সংশ্লিষ্ট—আলাদা ন'ন—স্বতন্ত্র ন'ন।

জড়বিদ্যা-ধন-জন-মদমত্ত কৃষ্ণসে া-বিমুখ জীব—
অভক্ত, ভোগী ও ত্যাগী

ঐ বিচার ছেড়ে দিয়ে ধন, সৌন্দর্য্য, বিদ্যা প্রভৃতির অভিমানে প্রমত্ত হ'লে আমি ভোজন পরায়ণ হ'য়ে যাই। কিন্তু—"শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়।" ভোগ ক'রতে ক'রতে কৃষ্ণসেবা-বিমুখতা এসে যায়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'গীতার পরিবারের' মধ্যে আমাকে কিছু সেবাভার দিয়েছিলেন, কিন্তু ক'রতে প রি নাই, কিছু যত্ন ক'রেছি মাত্র। এখন আপনাদের কাছ থেকে অবসর পা'বার সময় হ'য়েছে। হয়ত' আর দেখা নাও হ'তে পারে। আপনারা আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের কথা স্মরণ ক'রবেন। তাঁ'র বৈরাগ্য-কথা আলোচনা ক'রবেন। আপনাদের ধাম-প্রচারিণী-সভার সভাপতির আসনে অনেক সময় ব'সে প'ড়ে ধৃষ্টতা করি মাত্র।

ভোগী ও ত্যাগী—কর্ম্ম-জ্ঞানাবৃত অভক্ত। এদের অনুসরণ ক'রবেন না। ভক্ত-গুরুর দর্শন হ'তে যেন কোনদিন বঞ্চিত না হ'ন। যদি হ'ন, তবে জা'নব—আপনাদের সঙ্গ ক'রে আমি বঞ্চিতই হ'য়েছি মাত্র। আপনারা শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় গুরু-পরম্পরাটী কীর্ত্তন করুন।*

---

* [শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার (৪৪৮ শ্রীগৌরাব্দ) সভাপতি জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রদত্ত ভাষণ। —প্রকাশক, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা]

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-মহিমা কীর্ত্তন

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের গুণগানই আত্মশোধনের বিশেষ উপায়

কীর্ত্তনই একমাত্র সর্ব্বদা সেব্য ব'লে শ্রীগুরু-বৈষ্ণব * * আমাকে কীর্ত্তনমুখে আত্মশোধনের বিচার বরণ ক'রবার সুযোগ দিয়েছেন। আমি ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী হ'য়ে গৃহস্থের গুণ-কীর্ত্তন ক'রতে গেলে সাধারণের নিকট কেমন যেন একটা বিসদৃশ ব'লে মনে হতে পারে। গৃহস্থ ও ব্রহ্মচারী—পারমার্থিক ও ব্যবহারিক হিসাবে দুই প্রকার।

শ্রীবিষ্ণু ও বৈষ্ণব নির্গুণ—গুণাতীত অপ্রাকৃত তত্ত্ব

যাঁরা শ্রীশঙ্করের আনুগত্যে "বেদান্ত-বাক্যেষু সদা রমন্ত", তাঁ'রা মনে ক'রবেন, —"গুণের আলোচনা কেন? 'গুণ' 'গুণ' শুন্‌তে শুন্‌তে ত' কাণ ঝালাপালা; গুণ ত' ব্যবহারিক, এ ত' পারমার্থিক নয়!" তাঁ'দের কাছে নিবেদন,—গুণের বিচারে একটী কথা মনে হয়। 'ব্রহ্ম' শব্দটী যে জিনিষকে লক্ষ্য করে, ব্রহ্মের যে অর্থ, তাহাই শ্রীমধ্বপাদ বলেন—'বিষ্ণু'। **বস্তু—'বিষ্ণু', সেই বিষ্ণুর প্রকাশক 'বৈষ্ণব', এজন্য 'ব্রহ্ম' ব'লতেই 'বৈষ্ণব' বুঝায়।** Substance আর Attribute; ব্রহ্মকে যদি Substance ব'লেই স্বীকার করা যায়, তা' হ'লেও Attributeকে বাদ দিয়ে Substance-এর ধারণা অসম্ভব।

বৈষ্ণব-তত্ত্বের মূল—গুরু-তত্ত্ব, উহা পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত

'ব্রহ্ম' ব'লতে গুরু। 'নির্গুণ' ব'লতে সমস্ত গুণ-সমষ্টি—অসীম গুণ-সম্পন্ন। অথবা ব্রহ্ম-তত্ত্বটী বস্তুর প্রকাশক। আমরা কোন বস্তু তত্ত্বের কথা আলোচনা ক'রতে পারি না গুণকে বাদ দিয়ে। 'নির্গুণ' ব'ললে তাও একটী গুণ। নির্গুণ তত্ত্ব—বৈষ্ণব; তাঁদের কথা ব'লতে গেলে কোন প্রাকৃত গুণ তাঁ'দিগকে স্পর্শ করে না। **বৈষ্ণব অপ্রাকৃত গুণজাতীয় গুণজাতীয়ের সেই মূলপুরুষ গুরুদেবই—ব্রহ্ম; অতএব বৈষ্ণবের মূলতত্ত্ব গুরুদেব।** সেই গুরুদেবের আনুগত্যে যাঁরা, তাঁরাই ব্রহ্মচারী অর্থাৎ গুরু-সেবকই প্রকৃত 'ব্রহ্মচারী'—'পারমার্থিক ব্রহ্মচারী'। আমার মত ব্যবহারিক ব্রহ্মচারী সেই পারমার্থিক ব্রহ্মচারিগণের কথা ব'লতে অসমর্থ, সুতরাং ** তাঁদের কৃপা-প্রার্থনাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য।

ভগবদ্‌বহির্ম্মুখতাই—ভব-রোগ বা ভব-ব্যাধি; হরি-ভজনেই আত্মার স্বাস্থ্যলাভ

পারমার্থিকগণের * আচরণে আমরা জেনেছি,—প্রাকৃত বিজ্ঞানের কোন মূল্যই

দেওয়া যায় না, যদি না তা' শ্রীভগবান্ ও ভক্তের সেবায় লাগে।** Medical Science-এর অভিজ্ঞতা হ'তে জানা যায়,—ভগবদ্‌বহির্ম্মুখতা বা ভব-রোগই সকল দেহ ও মনোরোগের মূলীভূত কারণ। যাঁরা শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবাগত-প্রাণ ব্রহ্মচারী, তাঁরাই প্রকৃত রোগমুক্ত-স্বাস্থ্যবান্। হরিভজনই আত্মার স্বাস্থ্য, তা'তেই সর্ব্বেন্দ্রিয়ের সুস্থতা।

সেবাগত-প্রাণই পারমার্থিক ; সেবা-বৃত্তিই বর্ণাশ্রমীর শ্রেষ্ঠ সদ্‌গুণ

'পারমার্থিক ব্রহ্মচারী' ব'লতে গেলে ** গুরু-গৌরাঙ্গের সেবাগত-প্রাণকেই বুঝায়। আমরা 'ব্রহ্মচারী' খেতাব মাত্র গ্রহণ ক'রেছি, পারমার্থিক ব্রহ্মচারীর সদ্‌গুণের কণামাত্রও গ্রহণ ক'রতে পারি নাই। (আদর্শ গৃহস্থ বৈষ্ণবের) সেবা-প্রবৃত্তি দেখে, গৃহস্থ হ'লেও তাঁদের ভগবদ্ গৃহবাসী পারমার্থিক ব্রহ্মচারীর মধ্যেই পরিগণিত ক'রবার ইচ্ছা হয়। তাঁরা * * মঠ-মন্দির ও পত্র পত্রিকার সেবায় আনুকূল্য ক'রে এবং নানাভাবে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের সেবা ক'রে সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করেন।*

—জগদ্‌গুরু শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শুভাবির্ভাব-তিথিতে তদীয় শ্রীচরণকমলে

বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি

ছিলাম কোথায়,　　এলাম হেথায়,
কোথায় যাব ভাবি না।
সাধু শাস্ত্র বাণী,　　কতই যে শুনি,
তবু বোঝা ত' গেল না ॥ ১ ॥

---

* [সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়'-পত্রে প্রকাশিত শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার ৪০তম বার্ষিক অধিবেশনের ৩য় দিবসে সভাপতি জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের নির্দ্দেশে "উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, কৃতিরত্ন প্রভুর" প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত ভাষণ।

—প্রকাশক, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা]

আনা গোনা সার, সকলই অসার,
বুঝাইলে ত' বুঝি না।
কি যেন অভাব, ভেবে কত ভাব,
স্বভাব ছাড়া গেল না ॥ ২ ॥
যেতে হবে ঠিক, সব যে বেঠিক,
সঠিক জানা গেল না।
কি করিব হায়, ভাবি যে সদায়,
শেষ হ'ল না বাসনা ॥ ৩ ॥
ভাবি সদা মনে, জনমে জনমে,
ভুগেছি কত যাতনা।
যাতনার কথা, জেনে লাগে ব্যথা,
সে ব্যথা দূর হ'ল না ॥ ৪ ॥
"শুনি" শ্রীহরি সাধনা, করিলে যাতনা,
সব হয় অবসান।
শ্রীহরি দর্শন, হবে কি কখন,
ভাবিয়া আকুল মন ॥ ৫ ॥
কত উপদেশ, স্বদেশ বিদেশ,
দিয়েছি শুনেছি আমি।
এবে ভাবি হায়, লব যে বিদায়,
সঙ্গে কি যাবে না জানি ॥ ৬ ॥
পেয়েছিনু হরি ! ভবের কাণ্ডারী,
সদ্‌গুরু এই ভবে।
কিন্তু ভব পার, হইমু অপার,
বলিয়াছি উচ্চ রবে ॥ ৭ ॥
অন্তিম আগত, তব পদে নত,
হয়ে দাস সন্তে কয়।
রাঙা পদে ঠাঁই, দিও গো গোঁসাই,
হরি পদে স্থান চায় ॥ ৮ ॥

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ

দৈব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম

চাতুর্ব্বর্ণ্য বা বর্ণধর্ম্ম

উপনয়নকে বর্ণধর্ম্ম বলে, উপনীত বর্ণের ভিক্ষা-দণ্ডাদি-ধারণকে আশ্রম-ধর্ম্ম কহে এবং তাহাদিগের মুঞ্জময়ী মেখলাদি ধারণকে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম বলা হয়। "ধর্ম্মন্তু সাক্ষাদ্ভগবৎ-প্রণীতম্" (ভাঃ ৬।৩।১৯), "ধর্ম্মস্তু বক্তাহং কর্ত্তা তদনুমোদিতা" (ভাঃ ১০।৬৯।৪০) ইত্যাদি বচন হইতে জানা যায় যে, সত্য ধর্ম্মটী সাক্ষাৎ ভগবৎ-প্রণীত ; স্বয়ং ভগবানই ধর্ম্মের বক্তা, কর্ত্তা ও অনুমন্তা। ধর্ম্মের মূলকারণ —শ্রীবিষ্ণু। সত্য, দয়া, তপস্যাদি ত্রিংশৎ লক্ষণসম্পন্ন পরমধর্ম্মই 'সনাতন ধর্ম্ম' বলিয়া কথিত।

মানবগণের নৈমিত্তিক কাম্য-কর্ম্মাদি সাধারণ ধর্ম্ম জাগতিক বিচারে আবদ্ধ। পরম মঙ্গল লাভ করিতে হইলে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের চরম লক্ষ্য যে ভক্তি-তাৎপর্য্য তাহাই অনুষ্ঠেয়। আদিযুগে কেবল ভগবদুপাসনা-ধর্ম্মই মুখ্য ছিল। আচার-লক্ষণ-ধর্ম্ম বা গুণগত-বিচার পরে প্রচলিত হয়। কল্পের আদিতে সত্যযুগে সকলেই শ্রীহরির উপাসনা-তৎপর ছিলেন ; জন্মমাত্রই তাঁহারা কৃতকৃত্য হইতেন, এজন্য সত্যযুগের অপর নাম ছিল 'কৃতযুগ'। তখন প্রণবই একমাত্র বেদ, নারায়ণই একমাত্র সেব্য-দেবতা এবং 'হংস'ই একমাত্র বর্ণ ছিল। তখন তপঃ, শৌচ, দয়া ও সত্য—এই চতুষ্পাদ-ধর্ম্ম পূর্ণরূপে বিরাজিত ছিল। সত্যযুগে সকলেই নির্ম্মল-হৃদয় ও তপঃ-পরায়ণ ছিলেন এবং একাগ্রচিত্তে তপস্যাদ্বারাই তাঁহারা উপাস্য-তত্ত্বকে লাভ করিতেন।

ত্রেতাযুগ প্রবৃত্ত হইলে একপাদ ধর্ম্ম লুপ্ত হয় এবং ত্রিপাদ ধর্ম্মে ঋক্, সাম, যজুঃ—এই ত্রয়ী বেদ প্রকাশিত হয় ; হোতা উদ্গাতা ও অধ্বর্য়ু—ত্রিবিধরূপে যজ্ঞরূপী ভগবান্ আবির্ভূত হন। তখন বিরাট্ পুরুষের মুখ হইতে বর্ণধর্ম্ম-লক্ষণ-যুক্ত ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পাদদেশ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হয়।

মুখ-বাহূরু-পাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥ (ভাঃ ১১।৫।২)

আদিপুরুষ ভগবান্ বিষ্ণুর শ্রীমুখ হইতে সত্ত্বগুণে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে সত্ত্ব-রজগুণে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে রজ-তমোগুণে বৈশ্য এবং পদ হইতে তমোগুণে শূদ্র সৃষ্ট হয়। ব্রহ্মচর্য্যাদি চারি আশ্রমও তাঁহা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ বর্ণ-বিভাগ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ-কর্ম্ম-বিভাগশঃ।"

গুণ-কর্ম্ম-বিভাগপূর্ব্বক বর্ণ-চতুষ্টয় ভগবানই সৃজন করিয়াছেন। জগতে তিনি ছাড়া আর কেহ কর্ত্তা নাই, অতএব বর্ণ ও বর্ণ-ধর্ম্মের কর্ত্তা তিনি ব্যতীত আর কেহই নয়। ঋক্-সংহিতা ৮।৪।১৯, শুক্ল যজুর্ব্বেদ ৩৪।১১, অথর্ব্ববেদ ১৯।৬।৬ শ্লোকের "ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ", ভাঃ ২।৫।৩৭ শ্লোকের "পুরুষস্য মুখং ব্রহ্ম," ভাঃ ৩।৬।৩০-৩৩ শ্লোকের "মুখতোঽবর্ত্তত ব্রহ্ম পুরুষস্য কুরুদ্বহ", "তস্যাং জাতঃ পুরা শূদ্রো যদ্বৃত্ত্যা তুষ্যতে হরিঃ" এবং ভাঃ ৭।১১ অধ্যায়ে চারি বর্ণের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যায়।

শম, দম, তপঃ, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, সরলতা, ভগবানে ভক্তি, দয়া, সত্য—এইসকল ব্রাহ্মণের স্বভাব। তেজ, বল, ধৈর্য্য, প্রভাব, সহিষ্ণুতা, উদারতা, উদ্যম, স্থৈর্য্য, ব্রাহ্মণ-ভক্তি ও ঐশ্বর্য্য—এইসকল ক্ষত্রিয়-প্রকৃতি। আস্তিক্য, দাননিষ্ঠা, দম্ভশূন্যতা, ব্রাহ্মণ-সেবা ও ধনবৃদ্ধিতে সন্তোষ—এইসকল বৈশ্য-প্রকৃতি। অকপটে দেব-দ্বিজ ও গো-সেবা এবং উক্ত সেবার দ্বারা ধনাদিদ্বারাই সন্তোষলাভ—এইসকল শূদ্রগণের প্রকৃতি।

প্রতি-শুশ্রূষা, তাঁহার অনুকূলতা, পতি-বন্ধুগণের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সর্ব্বদা ব্রতাদি-ধারণ—এই চারিটী পতিব্রতা স্ত্রীগণের লক্ষণ। ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণা সাধ্বী স্ত্রী নিত্য অলঙ্কৃত, শুদ্ধ পরিচ্ছদে ভূষিতা হইয়া সম্মার্জ্জন, উপলেপনদ্বারা গৃহোপকরণের শুদ্ধি সম্পাদন, গৃহ মণ্ডন, সুগন্ধীকরণ, হরি-পরায়ণ পতির অনুকূলা নানাবিধ ইচ্ছা, বিনয়, দম, সত্য, হিতজনক বাক্য ও প্রীতিদ্বারা সেবা করিবে। ভক্তিমতী স্ত্রী যথালাভে সন্তুষ্টা, অলুব্ধা, নিপুণা, ধর্ম্মজ্ঞা, সত্য-প্রিয়বাদিনী, সাবধানা, শুচি ও স্নেহযুক্তা হইয়া পাতকশূন্য পতির সেবা করিবে।

অন্তেবসায়ী চণ্ডাল এবং অচৌর ও নিষ্পাপ অন্ত্যজ প্রভৃতির স্ব-স্ব কুলপরম্পরা-প্রাপ্ত বৃত্তি হইয়া থাকে। অশৌচ, অসত্য, চৌর্য্য, নাস্তিক্য, বৃথা কলহ, কাম, ক্রোধ ও তৃষ্ণা—এইগুলি বর্ণাশ্রমবিহীন নীচ-লোকের প্রকৃতি।

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, অকাম, অক্রোধ, অলোভ, সর্ব্বভূতের প্রিয় এবং হিতচেষ্টা—ইহা সর্ব্বসাধারণের ধর্ম্ম।

সত্য, দয়া, তপস্যা (একাদশী প্রভৃতিতে উপবাস), শৌচ (স্নান), তিতিক্ষা, ঈক্ষা (যুক্তাযুক্ত বিবেক), শম (মনের সংযম), দম (বাহ্যেন্দ্রিয় দমন), অহিংসা, ব্রহ্মচর্য্য, ত্যাগ, দান, স্বাধ্যায় (যথোচিত জপ), আর্জ্জব (সরলতা), সন্তোষ, সমদর্শী মহতের সেবা, ধীরে ধীরে অনিত্য কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি, মানবগণের নিষ্ফল

কার্য্যদর্শন, মৌন (বৃথা-আলাপ-পরিত্যাগ), আত্মবিবেক, প্রাণিদিগকে যথাযোগ্য অন্নাদি বিভাগ, সকলভূতে আত্মজ্ঞান, মনুষ্যগণে ভগবদধিষ্ঠান-দর্শন, মহদ্‌গণের আশ্রয়, ভগবানের গুণ-কর্ম্ম-শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, সেবা, ইজ্যা (পূজা), নতি (নমস্কার), দাস্য, সখ্য, আত্মসমর্পণ—এই ত্রিশটী মনুষ্যমাত্রেরই পরমধর্ম্মরূপে ঋষিগণ-কর্ত্তৃক নিরূপিত হইয়াছে।

যাঁহার গর্ভধানাদি সংস্কারসকল অবিচ্ছিন্ন, ব্রহ্মা যাঁহাকে অনুমোদন করেন, তিনিই দ্বিজ। কুল ও আচারে পরিশুদ্ধ বর্ণীর ব্রহ্মচর্য্যাদি ক্রিয়া বিহিত আছে। ব্রাহ্মণের অধ্যয়নাদি ষট্‌কর্ম্ম, ক্ষত্রিয়-জাতির প্রতিগ্রহ ব্যতীত অন্য পঞ্চকর্ম্ম এবং প্রজাপালক রাজার ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যের নিকট হইতে করগ্রহণ প্রভৃতিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যবস্থা আছে। বৈশ্যজাতি সর্ব্বদাই ব্রাহ্মণকুলের অনুগত থাকিয়া কৃষি-বাণিজ্যাদিদ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিবে এবং শূদ্রজাতির দ্বিজ-সেবা ও তাহাই তাহার জীবিকা। কৃষি, গো-রক্ষা, বাণিজ্য, প্রত্যহ ধান্য যাচ্ঞা, ধান্য-ক্ষেত্রাদিতে ক্ষেত্রস্বামি-পরিত্যক্ত শস্যগ্রহণ এবং আপণাদিতে পতিত শস্যকণা সংগ্রহ—এই চারিপ্রকার আপৎকালে বিপ্রবৃত্তি। বিপদ্ উপস্থিত না হইলে নীচ মনুষ্য কখনও শ্রেষ্ঠ বৃত্তি অবলম্বন করিবে না, আপৎকালে ক্ষত্রিয় ভিন্ন সকলের সকল বৃত্তি বিহিত আছে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় নিন্দিত নীচ-সেবারূপ শ্ব-বৃত্তি সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবেন। (ক্রমশঃ)

— ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

জীবন-পথের পাথেয় কি দুঃখ ?

আমরা জাগতিক মানুষ তেত্রিশ কোটী দেব-দেবীর পূজার্চ্চনা করে চলেছি প্রাত্যহিক জীবনের প্রায় প্রতি মুহূর্ত্তেই। মনের মধ্যে বহন করে চলেছি অতৃপ্ত কামনা-বাসনার দুর্ভর এক বোঝা। আন্তরিক ধ্যান-ধারণার দ্বারা সেই কৃত্রিম চরম বোঝাকে পাওয়ার জন্য আমাদের চেষ্টা হয়ে ওঠে প্রাণান্তকর। তাঁদের কাছে আমাদের একমাত্র পাওয়ার জিনিস হল অর্থ, প্রতিষ্ঠা, যশ আর আজন্মকাল সুখ। জীবনের প্রকৃত সার্থকতা ছেড়ে অপ্রকৃত সার্থকতার মাঝে চলে যাওয়া। কিন্তু আমরা সবাই বিস্মিত হব—যদি কখনও শুনি—কেউ তাঁর অভীষ্ট দেবতার কাছে একমাত্র দুঃখ চাইছেন। সকলের কাছে আমার অনুরোধ—দুঃখ চাইবার কথা শুনে যেন কেউ না হাসেন। পঞ্চপাণ্ডবদের জননী পাণ্ডু-পত্নী শ্রীকুন্তীদেবী তাঁর অভীষ্ট দেবতার কাছে চেয়েছিলেন আজন্মকাল দুঃখ। আর সেই দুঃখই হয়েছিল তাঁর সারা জীবনের সাথী।

হ্যাঁ, দুঃখ আমাদের চাই। দুঃখই আমাদের জীবন পথের পথিক, বন্ধু, জীবনের পাথেয় হোক। দুঃখ আমার স্বর্গ, দুঃখ হোক আমার আনন্দ, দুঃখ হোক

আমার সাথী, দুঃখ হোক আমার জীবনের সাতমহলার পরম প্রাপ্তি। আমাদের জীবনতরী বয়ে চলেছে এপার থেকে ওপারে। তার জন্য প্রয়োজনীয় পাথেয় হল দুঃখ। এ দুঃখ হল সেই দুঃখ যার মাধ্যমে জীবনতরীটা হেলতে দুলতে ওপারে পৌছুতে পারে। কিন্তু এটা রূঢ় বাস্তবসত্য যে আমরা অধিকাংশই চাই—জীবনতরীটা না হেলে-দুলে যাক চলে সোজা পথে। এই চাওয়াটা এমনিই অসম্ভব এবং অস্বাভাবিক ব্যাপার যে—দুঃখ অনাহূত অবস্থাতেই পৌছে যায় আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের প্রায় প্রতিক্ষণ-মুহূর্ত্তে। অন্যদিকে, দুঃখ পাওয়াটা এমনই স্বাভাবিক ব্যাপার যে আমাদের চারদিকের বাতাসে বুঝি তাই ভেসে ওঠে—

'দুঃখ যদি না পাবে ত' দুঃখ তোমার ঘুচবে কবে ?'

এবারে আলোচনার বিষয়—দুঃখ কি আমরা সবসময় পেয়ে যাব ? না, শুধু দুঃখ পেলে চলবে না, দুঃখকে জয় করবার মন্ত্র আমাদের জানতে হবে। সে কেমন ? পরমপুরুষের সামনে আমার দুঃখের প্রদীপ নিয়ে আরতির সাজ সাজাতে হবে। এখন তাই আমার সমস্ত ক্লান্তি কাটিয়ে 'আমার সকল দুখের প্রদীপ জেলে দিবস গেলে করব নিবেদন' কারণ, 'আমার ব্যথার পূজার হয়নি সমাপন।' যার জন্যে আমার পূজা সমাপন হয়নি তাকে পরিপূরণ করতে আমাকে দুঃখের জ্বালাকে বরণ করতে হবে, আর সেই অভীষ্ট পরমপুরুষকে পাওয়ার জন্য অচিন্ত্যনীয় সব প্রতিরোধে দুঃখকে আমার বিজয়মালা করে নিতে হবে, কিন্তু 'কবে যে দুঃখজ্বালা হবে রে বিজয়মালা'—সেই আশে 'গলায়ে গলায়ে বাসনার সোণা। প্রতিদিন আমি করেছি রচনা। তোমার ক্ষণিক খেলার লাগিয়া মূরতি নিত্য নব।' জড়াসক্ত কঠিন বাসনাকে তিল তিল করে গলিয়ে সারা শরীরে মেখে নিতে হবে আর সেই শুদ্ধ পবিত্র দেহই হবে পরমপুরুষের পূজার প্রদীপশিখা। প্রশ্ন জাগতে পারে—এ কেমন করে হবে ? শরীরই যদি প্রদীপ শিখা হয়ে জ্বলতে থাকে, তবে তাঁর সেবা হবে কি দিয়ে ! এখানেই ত' তাঁকে পাওয়ার কৌশল।

ভগবান্ যে ভক্তের অন্তর্যামী, হৃদয়স্বামী, তাই 'যত দুঃখ লাজ দারিদ্র্য সঙ্কট আর জানাইব কারে'—বলে ভক্ত ক্রমাগতই দীর্ঘশ্বাস ফেলতে থাকেন। না, আর জানানোর কেউ নেই। সবাই পর। অসহায় ভক্তের কথা কেউ বোঝে না। সত্যই বোঝে না। ভক্তের চলন-বলন; আচার-ব্যবহার কিছুই সাধারণের গোচরে আসে না। তাঁর নিদারুণ দুঃখব্যঞ্জক কথাগুলো অন্যের সুখ বিঘ্নিত করবে। সারাজীবনের সংগ্রামে ভক্ত হয়ে পড়ে নিঃস্ব-রিক্ত-ক্লান্ত। ভক্ত তখন কিছুতেই নিজের ভাবনা আর ভাবতে পারেন না। তাই চোখের জল ফেলতে ফেলতে তিনি বলতে বাধ্য হন যে—'আর আপন ভাবনা পারি না ভাবিতে, তুমি

লহ মোর ভার।' হে সখা আমার, হে বন্ধু আমার, তুমি আমাকে সবরকম দুঃখের জালে জড়িয়ে রাখ। দৈহিক, মানসিক, ভৌতিক, আধিভৌতিক, আধিবৈদিক সব দুঃখের কঠিন জ্বালায় আমাকে জর্জ্জরিত কর প্রভু। এতটুকু সুখ আমি চাই না। এই হয় ভক্তের একমাত্র প্রার্থনা।

আমাদের মত জড়াসক্ত মানুষের ভগবানের কাছে একমাত্র প্রাত্যহিক প্রার্থনা হওয়া উচিত আমৃত্যু দুঃখ। দুঃখের মাধ্যমেই আমরা অন্তর্নিহিত সুখ খুঁজে পাব। হ্যাঁ পাবই। দুঃখ থাকলেই আমরা আমাদের প্রকৃত বিবেক-বুদ্ধি-বিবেচনা-আদর্শ-ব্যক্তিত্ব কিছুই হারাব না। আর তবেই আমরা প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠব। সমস্ত সংসারনিয়ন্তা যে পুরুষ, সেই পুরুষের প্রতি এতটুকু কৃতজ্ঞতা জানাতে চাইলে আমাদের অবশ্যই দুঃখকে আমাদের জীবনপথের পাথেয় করে নিতে হবে। কঠিন শুষ্ক দারিদ্র্য এসে গ্রাস করুক আমাকে, অর্থনৈতিক জ্বালায় আমার হৃদয় তথা সমগ্র দেহসম্ভার হোক মর্ম্মাহত। তবুও আমি দৃঢ়কণ্ঠে যেন বলতে পারি—হে প্রভু, দুঃখই আমার জীবন-পথের পাথেয় হোক।

—শ্রীমতী কুহু বেরা, অমর্ষি (মেদিনীপুর)

দীক্ষাগুরু, শিক্ষাগুরু ও চৈত্ত্যগুরু

জীব যখন প্রথমে "গুরুপাদাশ্রয়স্তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদিশিক্ষণম্। বিশ্রম্ভেন গুরোঃ সেবা সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তনম্॥"—এই ভক্ত্যঙ্গচতুষ্টয় সাধনে প্রবৃত্ত হয়, তখনই তাঁহার সাত্বতসংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের যথার্থ অধিকার আসে। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ-কালে তিনি "ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ" শ্লোকের তাৎপর্য্য, "তাবদ্ভয়ং দ্রবিণদেহ-সুহৃন্নিমিত্তং" শ্লোকের উদ্দেশ্য এবং 'ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসাং শোক-মোহ-ভয়াপহা' শ্লোকের অর্থ উপলব্ধি করিয়া অধোক্ষজ-সেবায় অভিষিক্ত হন অর্থাৎ তিনি কৃষ্ণদাস্যব্যতীত অন্য কোন কর্ম্মফলগ্রাহিতা স্বীকার করেন না। ইহাই ভাগবত-ধর্ম্ম। কেবলমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রিত ব্যক্তিই ভাগবতধর্ম্ম অনুশীলনের অধিকার লাভ করেন। কৃষ্ণবিষয়ে অধিক জানিবার ইচ্ছায় তিনি এক বা একাধিক গুরু আশ্রয় করিয়া তাঁহাদিগের নিকট শ্রবণাদি করেন।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু "বন্দে গুরূন্" শ্লোকে (চৈঃ চঃ আদি ১।৩৪) দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু-আদি গুরুগণের বন্দনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—

মন্ত্রগুরু, আর যত শিক্ষাগুরুগণ।
তাঁহার চরণ আগে করিয়ে বন্দন॥ (চৈঃ চঃ আদি ১।৩৫)

বস্তুতঃপক্ষে গুরু তিন প্রকার—দীক্ষাগুরু, শিক্ষাগুরু ও চৈত্ত্যগুরু। দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু উভয়েই আশ্রয়জাতীয় ভগবান্, আর চৈত্ত্যগুরু বিষয়জাতীয় ভগবান্।

মন্ত্রগুরু বা দীক্ষাগুরু একজনই, যেহেতু শাস্ত্রে অনেক দীক্ষাগুরুকরণের নিষেধ রহিয়াছে, কিন্তু শিক্ষাগুরুর বহুত্ব। শ্রবণগুরু এবং ভজনশিক্ষাগুরু প্রায় একজনই হইয়া থাকেন। শ্রবণগুরুর সংসর্গেই শাস্ত্রীয়জ্ঞান জন্মে। শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ তত্ত্বসন্দর্ভের মঙ্গলাচরণে বলিয়াছেন,—

অথ নত্বা মন্ত্রগুরূন্ গুরূন্ ভাগবতার্থদান্।
শ্রীভাগবতসন্দর্ভং সন্দর্ভং বহ্নি লেখিতুম্॥

—"ইহার পর মন্ত্রদাতা গুরুবর্গ এবং শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থশিক্ষাদাতা গুরুগণকে প্রণাম করিয়া 'শ্রীভাগবত-সন্দর্ভ' নামক গ্রন্থ লিখিতে বাঞ্ছা করিতেছি।" অনেকে প্রশ্ন করিতে পারেন,—"মন্ত্রগুরূন্-শব্দদ্বারা শ্রীল জীব গোস্বামিপাদও অনেক মন্ত্র-গুরুর কথা স্বীকার করিয়াছেন, তবে 'মন্ত্রগুরু একজন' এই কথা বলিবার সার্থকতা কোথায়?" এই প্রশ্নের সমস্যার সমাধানে শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণকর্ত্তৃক 'অথ নত্বা' শ্লোকের টীকায় উদ্ধৃত কারিকার অনুবাদে পাওয়া যায়,—"মন্ত্রগুরু অর্থে দীক্ষাগুরু —যাঁহার নিকট হইতে ইষ্টমন্ত্র লাভ করা যায়। সেই মন্ত্রদাতা গুরু একজন। উপনিষদ্ (মুণ্ডক ১।২।১২) 'গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ' বলিয়াছেন, 'গুরূন্' বলেন নাই। শ্বেতাশ্বতরেও (৬।২৩) 'যথা দেবে তথা গুরৌ' বলিয়াছেন, 'গুরুষু' নহে। শ্রীমদ্ভাগবতেও (১১।৩।২১) বলিয়াছেন,—'তস্মাৎ গুরুং প্রপদ্যেত।' সর্ব্বত্রই দেখা যায়, গুরু একজন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মুখবন্ধ শ্লোকে যে 'বন্দে গুরূন্' দেখা যায়, তাহারও অর্থ মন্ত্রদাতা দীক্ষাগুরু একজন, শিক্ষাগুরু একাধিক হইতে পারেন। অতএব গুরুর বহুত্ব সিদ্ধ হইল, কিন্তু মন্ত্রগুরুর বহুত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইবে? উত্তরে জানিতে হইবে যে, 'মন্ত্র' আম্নায়পারম্পর্য্যে পূর্ব্বতম গুরু হইতে পর পর শিষ্যধারায় আগত হন। মন্ত্রদাতা শ্রীগুরুদেবের গুরুকে 'পরমগুরু', তাঁহার গুরু 'পরাৎপরগুরু', তাঁহার উপরে 'পরমেষ্ঠীগুরু' ইত্যাদি ক্রমপর্য্যায়। শ্রীমন্ত্র ইহাদের মাধ্যমেই আগত হইয়াছেন, সুতরাং ইহারা সকলেই মন্ত্রগুরু। এইভাবে মন্ত্রগুরুরও বহুত্ব সিদ্ধ হইল।"

সম্বন্ধ-জ্ঞানপ্রদাতা দীক্ষাগুরুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

দীক্ষাগুরু দিব্যজ্ঞান—পূর্ণবস্তুর জ্ঞান প্রদান করেন। 'কৃষ্ণই আমার নিত্য প্রভু, আমি তাঁহার নিত্যদাস'—এই দিব্যজ্ঞান বা সম্বন্ধজ্ঞান দীক্ষাগুরু দিয়া থাকেন। অত্যন্ত সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥" মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া আচার্য্যের নিকট আগমশাস্ত্রের উপদেশ লাভ করেন। দীক্ষাগুরুর অনুগ্রহক্রমেই জীবের ভোগময় দর্শন অপসারিত হয়, তখনই চিন্ময় বিগ্রহের পূজ্যত্ব হৃদয়দেশ অধিকার করে।

বিশ্রম্ভের সহিত মন্ত্রগুরুর সেবা করিতে করিতেই ভগবৎপূজার শিক্ষা লাভ হয়। এই প্রসঙ্গে শাস্ত্রে উল্লেখ রহিয়াছে,—

লব্ধানুগ্রহ আচার্য্যাৎ তেন সন্দর্শিতাগমঃ।
মহাপুরুষমভ্যর্চ্চেন্মূর্ত্যাভিমতয়াত্মনঃ॥ (ভা: ১১।৩।৪৮)

—"আচার্য্যের নিকট হইতে তৎকৃপাস্বরূপ উপনয়ন মন্ত্রাদি লাভ করিয়া তৎকর্ত্তৃক সন্দর্শিত আগমানুসারে স্বীয় অভীষ্ট মূর্ত্তিতে ভগবান্ শ্রীহরির আরাধনা করিবেন।" 'অনুগ্রহ' অর্থাৎ মন্ত্রদীক্ষারূপ অনুগ্রহ, 'আগম' অর্থাৎ মন্ত্রবিধায়ক শাস্ত্র। 'আচার্য্যাৎ' এই পদটী একবচনাত্মক হওয়ায় দীক্ষাগুরু একজনই জানিতে হইবে।

মন্ত্রদীক্ষাপ্রভাবে জীব দ্বিতীয়াভিনিবেশ অর্থাৎ সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন, তখন মন্ত্রসিদ্ধি-প্রভাবে ভগবন্নামের ও নামি-ভগবানের বিজ্ঞানোদয়ে কৃষ্ণ-পাদপদ্ম-সেবায় তাহার অধিকার লাভ ঘটে। দীক্ষাগুরু জীবকে নবজন্ম দান করেন বলিয়া তাঁহার গুরুত্ব সর্ব্বাধিক। পূজ্যবিচারে দীক্ষাগুরুরই পূজা সর্ব্বাগ্রে অবশ্যই কর্ত্তব্য। এই প্রসঙ্গে মদীয় পরমগুরুদেব জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ তাঁহার বক্তৃতাবলীর মধ্যে বলিয়াছেন,—"অর্চ্চনমার্গের বিচারে দীক্ষাগুরুর অর্চ্চনই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। যদিও শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু একই—'শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ', তথাপি দীক্ষাগুরুর পূজা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে দেখা যায়,– মন্ত্রদাতা গুরুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মননধর্ম্ম হইতে যিনি ত্রাণ করেন বা যে বস্তুদ্বারা ত্রাণ করেন, তাহাই মন্ত্র। শব্দব্রহ্ম মননধর্ম্ম হইতে আমাকে ত্রাণ করেন বলিয়া মন্ত্রগুরুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণকে লাভ করিবার মন্ত্র প্রদান করেন বলিয়া মন্ত্রগুরুর পূজা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।" দীক্ষাগুরুর শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ শ্রীমন্দিরে বিশেষ যত্নসহকারে দীক্ষাগুরুর শ্রীমূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকেন। জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ, শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ, শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর এবং অন্যান্য মহাজনগণ 'আমার গুরু' শব্দ প্রয়োগের দ্বারা দীক্ষাগুরুর বিশেষ গুরুত্বের কথা আমাদিগকে জানাইয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু—সাক্ষাৎ কৃষ্ণস্বরূপ ; সুতরাং অন্তর্যামী—চৈত্যগুরুরূপে ঈশ্বর-পুরীপাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও তিনি নিঃশ্রেয়সার্থ বা পরমার্থী ব্যক্তিমাত্রেরই যে সর্ব্বপ্রথম দীক্ষাগুরুর পাদপদ্মাশ্রয় একান্ত আবশ্যক – এই বিধিশিক্ষা দিবার জন্য স্বয়ং শিষ্যাভিমানে পুরীপাদকে গুরুজ্ঞানে তাঁহার নিকট হইতে দশাক্ষর-মন্ত্রগ্রহণ লীলার অভিনয় করিয়াছিলেন। ভগবান্ গৌরসুন্দর স্বয়ং উপাস্যবস্তু হইয়াও তাঁহার নিজজন প্রিয়ভক্তকে মর্য্যাদা-গৌরব প্রদান করিবার জন্য গুরুরূপে স্থাপন করিয়া

নিজের অমায়া কৃপাই প্রকাশ করিয়াছিলেন। **বহু ব্যক্তিকে দীক্ষাগুরুর সমান মনে করা বা সমান সম্মান দেওয়া ভয়ানক অপরাধ।** এই প্রসঙ্গে জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ তাঁহার উপদেশাবলীর মধ্যে বলিয়াছেন, "বহু ব্যক্তিকে গুরুর সমান মনে করা উচিত নয়। গুরুর অবজ্ঞা করতে নাই—শ্রৌতবাণীর নিন্দা করতে নাই—**বহু ব্যক্তিকে গুরুর ন্যায় পূজ্যজ্ঞানে গুরুপাদপদ্মের অবজ্ঞা করতে নাই।**"

অপ্রাকৃত দীক্ষাগুরুতে সুদৃঢ় শ্রদ্ধাই ভক্তির মূল। 'বহু ধর্ম্ম আছে'—এরূপ অন্ধবিশ্বাস ও যুক্তি-তর্কপথ ছাড়িয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের মঙ্গলময় উপদেশের প্রতি শ্রদ্ধা সর্ব্বপ্রথমেই প্রয়োজন। ব্যবহারিক গুর্ব্বাদি জীবের কোন মঙ্গল করিতে পারে না। শ্রীমন্ত্রগুরুর আবশ্যকতা বর্ত্তমান থাকায় চরমকল্যাণাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের ব্যবহারিক গুর্ব্বাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক পরমার্থগুরুর আশ্রয় গ্রহণ কর্ত্তব্য।

আশ্রয়বিগ্রহ শিক্ষাগুরু—অভিধেয়-বিগ্রহ

মহামন্ত্র-সাধনে বহুব্যক্তি একযোগে সাধন করিতে পারেন, সাধনোপযোগী অনুকূল পরামর্শসমূহ অনেকেই দিতে পারেন; এইজন্য শিক্ষাগুরুর বহুত্ব স্বীকৃত। শিক্ষাগুরু অনর্থ-নিবৃত্তির উপায় বলিয়া দেন এবং তৎপরে শুদ্ধভজন-শিক্ষা দেন। **দীক্ষাগুরুই অধিকাংশস্থলে শিক্ষাগুরুর কার্য্য করেন।** শাস্ত্রের যেইস্থলে "দীক্ষাগুরু শিক্ষাগুরু এক করি মানি" উল্লেখ রহিয়াছে, সেইস্থলে দীক্ষাগুরুই শিক্ষাগুরুর কার্য্য করেন বলিয়া বুঝিতে হইবে। **বদ্ধজীব দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুর কার্য্য করিতে পারেন না।** দীক্ষাগুরু মন্ত্র ও ভজনোপদেশ দান করেন, শিক্ষাগুরু অনর্থনিবৃত্তির পর ভজন শিক্ষাদাতা। **আশ্রয়জাতীয় শিক্ষাগুরুগণ দিব্যজ্ঞানদাতা দীক্ষাগুরুরই প্রকাশবিশেষ।** এই প্রসঙ্গে জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ তাঁহার উপদেশাবলীর মধ্যে বলিয়াছেন,—"আশ্রয়জাতীয় শিক্ষাগুরুবর্গ বিভিন্ন মূর্ত্তিতে আমাকে দয়া করবার জন্য উপস্থিত। ইহারা দিব্যজ্ঞানদাতা শ্রীগুরুপাদপদ্মেরই প্রকাশবিশেষ। বিভিন্ন আদর্শে জগদ্‌গুরুর বিশ্ব প্রতিবিম্বিত হয়েছে।"

শিক্ষাগুরু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপ-বিগ্রহ। তাই শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ—এই দুই রূপ॥ (চৈঃ চঃ আদি ১৪।৪৭)

ভজনানন্দী মহান্তগুরু ব্যতীত ভজনহীন দুরাচার ব্যক্তি কখনও শিক্ষাগুরুর কার্য্য করিতে পারেন না। ভজনহীন ব্যক্তি শিক্ষাগুরুর কার্য্য করিলে তাহার দ্বারা

জগতের অমঙ্গলই সাধিত হয়। জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ শিক্ষাগুরুর মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে গিয়া চৈঃ চঃ আদি ১৪।৪৭ শ্লোকের অনুভাষ্যে বলিয়াছেন,—"যিনি হরিভজন শিক্ষা দেন, তিনি শিক্ষাগুরু। ভজনহীন দুরাচার গুরু বা আচার্য্য নহেন। ভজনানন্দী মহান্তগুরু ও ভজনানুকূল বিবেকদাতা চৈত্যগুরু-ভেদে শিক্ষক দ্বিবিধ। সাধ্য-সাধন-ভেদে ভজনশিক্ষা ভেদ। কৃষ্ণপ্রদাতা শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে সম্বন্ধজ্ঞানে সমৃদ্ধ করিয়া তাঁহাতে স্বীয় সেবানুভূতি উন্মেষিত করেন। সেই দীক্ষাগুরুর নিকট হইতে অনুগ্রহ লাভ করিয়া সুষ্ঠুভাবে বিষ্ণুসেবন-শিক্ষা 'অভিধেয়' নামে কথিত। আশ্রয়বিগ্রহ শিক্ষাগুরু—অভিধেয়-বিগ্রহ; সুতরাং ঐ আশ্রয়-বিগ্রহ সম্বন্ধদাতা দীক্ষাগুরু হইতে পৃথক্ নহেন। উভয়েই শ্রীগুরুদেব। * * * * দীক্ষাগুরু শ্রীসনাতন শ্রীশ্রীমদনমোহন-পাদপদ্মদাতা। ব্রজে বিচরণে অসমর্থ ভগবদ্বিস্মৃত জীবকে তিনি ভগবৎপাদ সর্ব্বস্বানুভূতি প্রদান করেন। শিক্ষাগুরু শ্রীরূপ শ্রীগোবিন্দের ও তৎপ্রেষ্ঠের পাদ সেবাধিকারদাতা।" 'তৎপ্রেষ্ঠ' বলিতে মন্ত্রগুরুকেই বুঝায়।

হৃদয়বিহারী অন্তর্যামী শ্রীহরিই চৈত্যগুরু

দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু যে কথা বলেন, চৈত্যগুরু তাহা ধারণা করিবার যোগ্যতা দেন। চৈত্যগুরু ও শিক্ষাগুরু গ্রহণ করিবার যোগ্যতা প্রদান করেন। চৈত্যগুরুর কৃপা ব্যতীত কেহই দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুর কথা বুঝিতে বা ধরিতে পারে না। চৈত্যগুরুর কৃপা বা সাহায্য ব্যতীত মহান্তগুরুর কৃপা লাভ হয় না, চিত্তের মালিন্য দূর হয় না, শিক্ষা দৃঢ় হয় না, শ্রবণীয় বিষয় কার্য্যকরী হয় না। কৃষ্ণের সহিত বদ্ধজীবের সাক্ষাৎকার হয় না, তজ্জন্য কৃষ্ণ সৌভাগ্যবান্ জীবের চিত্তে কৃষ্ণভক্তির বিবেক উদয় করাইয়া চৈত্যশিক্ষাগুরু এবং মহান্তস্বরূপ হইয়া শিক্ষাগুরু হন। এই প্রসঙ্গে শাস্ত্রে পাওয়া যায়,—

জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্যরূপে।
শিক্ষাগুরু হয় কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১।৫৮)

লীলাশুক শ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের 'ময়ূরপিচ্ছধারী আমার শিক্ষাগুরু' বলিয়া যাঁহাকে সম্বোধন করিয়াছেন, তিনি আশ্রয়বিগ্রহ শিক্ষাগুরু নহেন, তিনি স্বয়ং রাধাকান্ত শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের শ্লোকটি নিম্নরূপ—

চিন্তামণির্জয়তি সোমগিরির্গুরুর্মে
শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্ শিখিপিঞ্ছমৌলিঃ।
যৎপাদকল্পতরুপল্লবশেখরেষু
লীলাস্বয়ম্বররসং লভতে জয়শ্রীঃ॥

—"চিন্তামণিস্বরূপ সোমগিরি-নামা যিনি আমার গুরু, তিনি জয়যুক্ত হউন। ময়ূরপিচ্ছধারী আমার শিক্ষাগুরু ভগবান্‌ও জয়যুক্ত হউন। তাঁহার পদকল্পতরু-পল্লবরূপ নখাগ্রের শোভাতে আকৃষ্ট হইয়া জয়শ্রী অর্থাৎ শ্রীমতী রাধিকা স্বয়ম্বরজনিত সুখ লাভ করিয়াছিলেন।"

বিবাদময় কলিকালে চতুর্ব্বর্গফলাকাঙ্ক্ষার ক্ষুদ্র আশা ত্যাগ করিয়া সদ্‌গুরুর নিকট শ্রীনাম ও গায়ত্রী মন্ত্র গ্রহণ ব্যতীত জীবের অন্য কোন ধর্ম্ম নাই। গুরুত্রয়ের (দীক্ষাগুরু, শিক্ষাগুরু ও চৈত্যগুরু) সেবা ও কৃপাতেই জীব পরমোপাদেয় পরম-পুরুষার্থরূপ প্রেমাধিকার লাভ করিতে পারেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

—শ্রীবলভদ্রদাস ব্রহ্মচারী

শিক্ষার স্বরূপ

কোন জিনিসকে নূতনভাবে নূতন রঙে, নূতন রসে, নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে নূতন দৃষ্টিকোণ হইতে যিনি দেখিতে পারেন, তিনিই কবি। আর এই দর্শনকে প্রকাশ করার নামই কবিত্ব। ইহাতে মৌলিক লক্ষ্যবস্তু কিন্তু একই থাকে। এই দর্শন কখনও খণ্ডিত, কখনও আংশিক, কখনও অসম্যক্, কখনও পূর্ণ, পূর্ণতর বা পূর্ণতমরূপে প্রতিভাত হয়। দর্শনের বিষয় সম্বন্ধেও তাই বিভিন্ন বাদানুবাদ উপস্থিত হয়। পূর্ণতম দর্শনকারীই সমদর্শনের অধিকারী, কারণ কাহার কি অবস্থা ও অধিকার তাহা তিনিই স্পষ্টরূপে দর্শন ও নির্ণয় করিতে পারেন। আমাদের পূজনীয় গোস্বামী এবং তাঁহাদের অনুগামিগণই একমাত্র ইহার প্রকৃষ্টতম উদাহরণ। তাই তাঁহাদের বিভিন্ন রচনার মধ্যে কবিত্বের প্রকাশে সেই একই নিত্য-তত্ত্ববস্তুর নির্দ্দেশে বিভিন্ন রসের নব নবরূপে আস্বাদনের অফুরন্ত অবকাশ আছে।

শ্রীভগবান্ অসমোর্দ্ধ্ব-তত্ত্ব, পরমশক্তিমান্, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। তাঁহাকে বাদ দিয়া যাহা কিছু চেষ্টা তৎসমস্তই 'ভুয়ো-দর্শন' বা 'জড়ীয়-দর্শন।' এই জড় দর্শন-কারীরাই 'অসুর' নামে কথিত। পুরাকালেও যখনই ইহাদের দৌরাত্ম্য বা প্রাবল্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, তখনই পৃথিবীতে শান্তির পরিবর্ত্তে অশান্তি, অস্থিরতা, চঞ্চলতা দেখা দিয়াছে। ইহারাই নিজদের নিকৃষ্টতা ঢাকিবার জন্য সমন্বয়ের জিগীর

তুলিয়া সাধু, শাস্ত্র ও ভগবদ্‌বাক্যে অসূয়া প্রদর্শন করে এবং ফলস্বরূপ সমস্তরকম উৎপাতের কারণ হয়। শ্রীগীতায় ইহাদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,—

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ॥
অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্ ॥
এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ ॥

(গীঃ ১৬।৭-৯)

বর্ত্তমানকালেও তথাকথিত শিক্ষিতাভিমানী একদল ব্যক্তিকে এই 'সমন্বয়বাদ' এক সংক্রামক ব্যাধিস্বরূপ পাইয়া বসিয়াছে। 'সমন্বয়'-শব্দটি যত্রতত্র যথেচ্ছভাবে জানিয়াই হোক আর না জানিয়াই হোক, নিজেদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইতেছে। কিন্তু সমন্বয়-শব্দের প্রকৃত অর্থ কি? 'সম' উপসর্গের সহিত 'অন্বয়' শব্দযোগে "সমন্বয়"-পদ সিদ্ধ হয় অর্থাৎ পরস্পরের সম্যক্ সম্বন্ধ, সঙ্গতি, পরস্পর মিলন বা অবিরোধকেই 'সমন্বয়' বলে। গোঁজামিল ও সমন্বয় এক জিনিস নহে। শ্রীভগবানেই একমাত্র বাস্তব সমন্বয় সম্ভব।

এ প্রসঙ্গে আর একটী শব্দও ছোঁয়াচে ব্যাধির মত বর্ত্তমানে সমগ্র পৃথিবীকে গ্রাস করিতেছে। শব্দটি হইল "সম্প্রদায়"। অপরকে 'সাম্প্রদায়িক' হিসাবে প্রতিপন্ন করাইয়া নিজকে 'অসাম্প্রদায়িক' বলিয়া লোক-দেখানো বাহাদুরিটুকু কুড়ানোর জন্য কতই না কাঙালপনা, তা সত্যই হাস্যকর। ইহারা প্রকৃতপক্ষে 'সম্প্রদায়' শব্দটির উৎস ও অর্থ জানে না। যাহা পরমসত্যকে সম্যগ্‌ভাবে প্রদান করে তাহাই **'সম্প্রদায়'**। গুরু-পরম্পরাপ্রাপ্ত সদুপদেশ বা শ্রোত-আম্নায়-ধারাকেই 'সম্প্রদায়' বলে। ভারতীয় আস্তিক্য-সমাজে এই সম্প্রদায়-প্রণালী চিরদিনই চলিয়া আসিতেছে। **বিশুদ্ধ সাম্প্রদায়িকতাই সনাতন আর্য-ধর্ম্মের গৌরব।** লোকপিতামহ ব্রহ্মা এই সম্প্রদায়ের আদি প্রবর্ত্তক।

বিদেশীয় নাস্তিক্য সাম্যবাদ বা sectarian thought-এ বিশেষভাবে আক্রান্ত হইবার কুফলস্বরূপ, সনাতন আর্য্য-ঋষিগণের বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এই সম্প্রদায়-প্রণালীর উপর বিশেষভাবে আঘাত হানিবার অপচেষ্টা চলিতেছে। ইহার আশু প্রতিকার একান্ত কর্ত্তব্য।

শুদ্ধ উপাস্যতত্ত্ব নির্দ্দেশ করিতে হইলে, সেই তত্ত্বের মলসকলও বর্ণনপূর্ব্বক দেখাইতে হয়। শাস্ত্রমধ্যে সেই মল বা মায়ামলসকলও কথিত রহিয়াছে।

বস্তুতঃ যৎপরোনাস্তি ভাল-মন্দ, অণু-বৃহৎ জিজ্ঞাসা হইয়াছে, হইতেছে, হইবে বা হইতে পারে, তৎসমুদয়েরই উত্তর শাস্ত্রমধ্যে প্রকৃষ্টরূপে দেওয়া আছে। বুদ্ধিমান্, সৌভাগ্যবান্, সৎবিবেচকগণ অন্বয়-ব্যতিরেক-পদ্ধতিতে শ্রৌত-আম্নায়-বাক্যানুসারে নিত্য-মঙ্গলপ্রদ ভগবৎ-সম্বন্ধীয় বাক্যগুলি গ্রহণ করিবেন ও অপরগুলি নিষেধরূপে মলবৎ পরিত্যাগ করিবেন। অপরপক্ষে অসুরসকল বিপরীতভাবে মলাংশকে—যাহা গৌণভাবে কথিত তাহা গ্রহণ করিয়া অপর সমস্ত অস্বীকার করিয়া জগৎ উৎপাতের কারণ ঘটাইবে। তাহারাই কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগবীরগণের শাস্ত্র-ব্যাখ্যাকে অসাম্প্রদায়িক বলিয়া প্রচার করিয়া গৌরবান্বিত হইবে। কারণ শ্রীভগবানকে নির্ব্বিশেষ বলিলে "কাড়িয়া খাইব না কেন?"—এই প্রকার আসুরিক মতবাদ ও ভোগবাদের পথে বিশেষ সুরাহা হইবে।

পুরাকালে রাজন্যবৃন্দ দেশ শাসন করিতেন প্রজা-কল্যাণোদ্দেশ্যে। তাঁহারা নিজেদের প্রজারঞ্জক বা পালক বলিয়া জানিতেন। তাই তাঁহারা প্রজাকল্যাণের জন্য সর্ব্বতোভাবে সত্যদ্রষ্টা মুনি-ঋষিগণের পরামর্শ, উপদেশ বা শরণ গ্রহণ করিতেন। তাঁহারা মুনি-ঋষিদের শিক্ষায় শিক্ষিত হইতেন। তাই তাহারা আজও প্রজাবৎসল, সুপালক, সুবিবেচক প্রভৃতি উপাধিতে শ্রদ্ধার সহিত অমর হইয়াছেন। অপরপক্ষে যাহারা মুনি-ঋষিদের অবজ্ঞা করিতেন, তাহারা "প্রজাপীড়ক" নামে উপাধি লাভ করিয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া শোচনীয় গতি লাভ করিয়াছেন।

বর্ত্তমানযুগের রাজন্যবৃন্দ কেহ কেহ রাজ্যপরিচালনে সাধুদিগের পরামর্শ ত' দূরের কথা, ইহারা প্রকাশ্যে নির্লজ্জভাবে জগৎ-কল্যাণকারক নিরাসক্ত, নিষ্কিঞ্চন সাধুদিগের উপর অত্যাচার করিতে, আক্রমণ করিতে বা তাহাতে ইন্ধন যোগাইতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। ইহারাই কংসের বা বর্ত্তমানে কলির চর। ইহাদেরও অচির-গতি সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই।

শ্রীগীতায় কর্ম্মের তিনটী স্বরূপ দেওয়া আছে,—কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম। বেদবিহিত কর্ত্তব্যাচরণই কর্ম্ম; যাহা নিষ্কাম কর্ম্মযোগ বলিয়া অভিহিত। এই কর্ম্মযোগ ভক্তি-বিমিশ্রিত হইয়া জ্ঞান উৎপন্ন করে এবং অবশেষে সেই জ্ঞানই সুপরিপক্ক অবস্থায় শুদ্ধা ও পরিশেষে ভক্তিরূপে আবির্ভূতা হন। কর্ম্মের অকরণই অকর্ম্ম। আবার বেদনিষিদ্ধ আচরণই বিকর্ম্ম বা বিরুদ্ধকর্ম্ম। কাম্য-কর্ম্মসকল তদন্তর্গত।

তদনুরূপ শিক্ষারও তিনটী অবস্থা আছে,—শিক্ষা, অশিক্ষা ও কুশিক্ষা। যাহা নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের চিৎ-অচিৎ বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানদান করে, তাহাই

শিক্ষা। এই শিক্ষাই শ্রেয়ঃ, Positive Degree, আবার ইহা যখন বিশেষভাবে বিচারপূর্ব্বক শ্রীভগবানকে জানায়, তখন সেই শিক্ষা শ্রেয়ঃতর, Comperative Degree ; ইহাই বিশেষ জ্ঞান বা বিজ্ঞান। আবার সেই শিক্ষা যখন সেই প্রেমময় ভগবানের বিশেষ বিশেষ রূপ, গুণ, লীলা সম্বন্ধে জানায়, তখন তাহা হয় শ্রেয়ঃতম, যা Superlative Degree। ইহা পরিপুষ্ট ও বিভিন্ন রসরূপে আস্বাদনযোগ্য।

যাহাদের কোন শিক্ষা নাই বা বোধ নাই, তাহারা তটস্থ। ইহারা অশিক্ষিত, নির্ব্বোধ বা বালিশ বলিয়া পরিচিত, ইহারা কৃপাযোগ্য।

আর যে শিক্ষা শ্রীভগবানের ভগবত্তা একেবারে অস্বীকার করিয়া Inferiorityটুকু অর্থাৎ শুধুমাত্র মল দর্শন করায়, তাহা কুশিক্ষা। ইহারও Negative দিকে Graphically অনেক তর-তম অবস্থা আছে। এই শিক্ষায় শিক্ষিতগণ—ভগবদ্‌বিদ্বেষী, ভক্ত এবং জগৎ উৎপাতের কারক। ইহারা শ্রীভগবানকে মানে না, তাই কোন কিছুরই সঠিক মীমাংসা করিতে না পারিয়া অবশেষে গোঁজামিল ও মিথ্যার আশ্রয় লইয়া নির্লজ্জভাবে জগৎকে বঞ্চনা করে এবং নিজেরাও বঞ্চিত হয়। কিছু তথাকথিত নির্ব্বোধ যাহারা তটস্থ বলিয়া পরিচিত, তাহাদের একটী অংশ ইহাদের সমর্থন করিয়া ধ্বংস হয়। ইহারা নিজেদের বড় বুদ্ধিমান্ ভাবিয়া অপর বৃহৎ সুন্দর দিকটী ভুলিয়া যায়। ইহারা নিজেরা 'ভগবান্' সাজিয়া অহংগ্রহোপাসনায় ব্যাপৃত থাকে। (ক্রমশঃ)

—শ্রীবীরভদ্র দাস ব্রহ্মচারী

উজ্জীবিত ভাবনা ঃ অমৃতত্বের পথ

পৃথিবীতে মানুষই একমাত্র বিচক্ষণ প্রাণী। তার বুদ্ধি আছে, বিবেক আছে, ক্ষমতা আছে, বোধ আছে, বিদ্যা আছে, অনুভূতি আছে, কল্পনা আছে, সর্ব্বোপরি আছে তার বিচার-ক্ষমতা। কিন্তু মনুষ্যেতর অন্য প্রাণীদের বুদ্ধি থাকতে পারে, তাদের আত্মরক্ষার কৌশলও জানা থাকতে পারে, শক্তি থাকা অবিচিত্র নয়, বিদ্যার প্রশ্নই ওঠে না, বোধ বা অনুভূতি কিছু ক্ষেত্রে থাকা অসম্ভব নয়, কিন্তু বিচার-ক্ষমতা আদৌ নেই। কোন্‌টী ভাল, কোন্‌টী মন্দ, কোন্‌টী কল্যাণপ্রদ, কোন্‌টী গ্রহণীয়, কোন্‌টী বর্জ্জনীয়, তা' মনুষ্যেতর প্রাণীর পক্ষে জানা সর্ব্বক্ষেত্রে সর্ব্বদা সম্ভব নয়। কদাচিৎ কখনও কোন বিরলক্ষেত্রে বুদ্ধিমত্তার প্রাখর্য্য-সম্পৃক্ত

বিচার-ক্ষমতার নিদর্শন পাওয়া গেলে তা' সাধারণীকরণ করা সম্ভব নয়, বিরলদৃষ্ট অস্বাভাবিক ঘটনার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। কিন্তু এই একটী ক্ষেত্রে মানুষ অনন্য এবং একক। তাই সেই বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান্ মানুষের বিচারে মানুষই হল সবার সেরা প্রাণী। স্বভাব, প্রকৃতি, জীবনাচরণ, প্রবৃত্তি, প্রবণতা প্রভৃতি বিষয়ে অন্য প্রাণীর সঙ্গে মানুষের বহুলাংশে মিল থাকতে পারে, তবুও মানুষ মানুষই, পশু পশুই। আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন—এ চারিটী মানুষ এবং পশু সবার মধ্যে আছে। বৈদিক শাস্ত্র সে-কথা বলেছেন :—

আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ সামন্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
ধর্ম্মো হি তেষাম্ অধিকো বিশেষো ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানা॥

আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুন—এই চারিটী প্রবৃত্তি মানুষ ও পশু উভয়ই চরিতার্থ করতে প্রয়াস পায়। তাই মানুষ এবং পশুর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, মানুষ বিচারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে ঈশ্বর এবং ঈশ্বরতত্ত্ব (ভগবত্তত্ত্ব) সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে পারে, জীবনের শ্রেয়ঃ এবং প্রেয় বস্তু সম্পর্কে অবহিত হবার সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করতে পারে, কিন্তু একটা পশু তা' পারে না। মানুষ এবং পশুর মধ্যে এটীই হচ্ছে পার্থক্য। তাই ভগবৎ চিন্তা-বিরহিত মানুষ সর্ব্বাংশে মনুষ্য-পদবাচ্য নয়। একথা ধৃষ্ট উক্তি বলে পরিহর্ত্তব্যও নয়। জগতের আদর্শ মানুষ, শ্রেষ্ঠ মানুষ, মহামানব, অবতার-কল্প পুরুষ যিনি সাধারণ কোটি হতে ভিন্ন কোটিতে অবস্থান করছেন, তিনি ঈশ্বর-চিন্তা-বিবিক্ত কোনমতেই নন। কোন-না-কোনভাবে তাঁর জীবন ঈশ্বর-নির্দ্দেশিত অনুশাসন-নিয়ন্ত্রিত হবেই। ধর্ম্মজগতের মানুষ হলে ত' কথাই নেই। ধর্ম্মেতর জগতের মহৎ ব্যক্তিত্বের জীবনও ভগবন্নীতি ও আদর্শ-নিষ্ণাত। আর ঠিক এই কারণেই চরাচরের সবার সেরা প্রাণী হচ্ছেন—মানুষ। মানুষ যথার্থ মানুষ হলে তাঁর ভাবনা ঈশ্বর-ভাবনায় উজ্জীবিত হবে, আর ঈশ্বর-ভাবনায় উজ্জীবিত মানুষই কেবল অমৃতত্বের সন্ধানাভিলাষী হয়ে থাকেন, অমৃতত্বের পথ কেবল তাঁরই জন্য। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য-পত্নী মৈত্রেয়ীর প্রশ্ন :—

'যেনাহং নামৃতা স্যাম্ তেনাহং কিম্ কুর্য্যাম্'—যা আমাকে অমৃতত্ব দান করবে না বা অমৃতত্বের সন্ধান দেবে না, তাতে আমার কি প্রয়োজন? এ প্রশ্ন শুধুমাত্র সুপ্রাচীন কালের শ্রুতকীর্ত্তি কোন ঋষিপত্নীর নয়। এ প্রশ্ন মানবাত্মার প্রশ্ন, এ প্রশ্ন বিশ্বাত্মার প্রশ্ন। সমগ্র বিশ্বের প্রকৃত অর্থের মানব-অভিধেয় মাত্রেরই প্রশ্ন। তাই অমৃতত্বের পথই হল—ঈশ্বর-ভাবনার পথ, ঈশ্বর-ভাবনায় উজ্জীবনের পথ।

জীবদেহ ধারণ করলে আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন সংশ্লিষ্ট মুখ্য চিন্তাগুলি তাকে বিব্রত করবেই। আহার-নিদ্রাদি দ্বারা সে উদ্‌বেজিত, হয়ত' বা উৎপীড়িত

হবেই। তবুও এ চারিটী ব্যতীত আরও ভাবনা তার আছে বা থাকবে। গৃহী মানুষের ক্ষেত্রে সে-সব চিন্তার অবকাশ থেকে যায়। আহার, নিদ্রা ইত্যাদি জৈব প্রয়োজন। জীবদেহের পুষ্টি, বিশ্রাম, সংরক্ষণ ও তার ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য এগুলি নিঃসন্দেহে অপরিহার্য্য। এগুলি শুধু ব্যক্তির প্রয়োজনে নয়, ব্যক্তি যে পরিজন-বেষ্টিত হয়ে সংসার-জীবন যাপন করে, তাদের প্রয়োজনেও বটে। তাই ব্যক্তি যখন সমষ্টির চিন্তায় ভারাক্রান্ত, তখন প্রথম চিন্তা তার সংসার, দ্বিতীয় চিন্তা সমাজ, তৃতীয় চিন্তা বৃহত্তর মানবকল্যাণমুখী প্রয়াসের বিস্তার ক্ষেত্র। সংসার-সচেতন মানুষই প্রায়শঃ বলে থাকেন—জীবন মানেই যন্ত্রণা, এক দঙ্গল দুরূহ সমস্যার এক সমন্বিতি। পুত্র-কলত্র-পরিজন পরিবেষ্টিত মানুষ সকলের জন্য বিচিত্র ভাবনার বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়েন। কিন্তু দুর্ভাগ্য মানুষের যাদের জন্য এত ভাবনা, আহার-নিদ্রা-বিশ্রামের অপ্রতুলতা, প্রচেষ্টা অসার্থক / অসফল হলে প্রীতিসিক্ত অভিনন্দন কেউই জানাবে না। অক্ষমতার প্রতিমূর্ত্তি, অপদার্থতার মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ মনে করে ধিক্কার-লাঞ্ছনাই উপহার দেবে। কটুবাক্যে, পরিবাদে জীবন বিষময় করে তুলবে। আর সফল হলে উত্তরাধিকারসূত্রে লব্ধবস্তুর উপভোগের সময় ভুলেও কৃতজ্ঞতার বাণী উচ্চারিত হবে না, প্রশংসার বাক্য ত' দূরের কথা। স্ত্রীর উচ্ছ্বসিত প্রেম, সন্তানের উৎসারিত ভক্তি, প্রিয়-পরিজনদের উদার দাক্ষিণ্য, প্রতিবেশীর সহৃদয় সৌজন্য দুঃসাহস বিবেচিত না হলে বলব,—এসবই বিনিময়-লভ্য। সংসার এমনই বিচিত্র স্থান —এখানে কিছুর বিনিময়ে কিছু প্রত্যাশা করা যেতে পারে। সর্ব্বক্ষেত্রে প্রত্যাশা সম্পূরিত হবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। বিংশ শতাব্দীর পরার্দ্ধে ব্যবহারিক জগতে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে কাজ আদায়ের উপকরণ হল—উপঢৌকন; আরও পরিশীলিত ভাষায় বলা যায়—উৎকোচ। বিনা উৎকোচে কাজ সমাধা উত্তরোত্তর বিরল হয়ে আসছে। বলাবাহুল্য, সে উৎকোচ পরিবার-পরিজনদের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রয়োজন। এজন্যই আমাদের গ্রন্থসম্রাট্ শ্রীমদ্ভাগবত বলেছেন,—'স্বজনাখ্যঃ দস্যুঃ'। সংসারের এই চিত্র, এই বৈশিষ্ট্য, এই ব্যবহার জেনেই শাস্ত্র তারস্বরে ঘোষণা করেছেন :—"অনিত্য দুঃখময় এই সংসার।" এই সংসারে ভূতযজ্ঞে জীবনপাতের কি প্রতিদান? এই কঠিন প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে সাধুই কম্বুকণ্ঠে উদ্‌ঘোষণা করেছেন :—সকল চিন্তার সেরা চিন্তা হল ঈশ্বর-চিন্তা। অন্য চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে প্রতারিত হবার আশঙ্কা আছে, বঞ্চিত হবার শঙ্কা আছে। (ক্রমশঃ)

—শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ দাস, আটুরিয়া (২৪ পরগণা উঃ)

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও রায়-রামানন্দ মিলন

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অখিলরসামৃতসিন্ধু। 'রসো বৈ সঃ'—সমস্ত রসের সদন, রসের মূল কারণ তিনি। ব্রজলীলায় ব্রজবাসিগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যথেষ্ট বিহার করিয়া রসনির্য্যাস আস্বাদন করেন।

আপ্তকাম—আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পূর্ণানন্দময়, পূর্ণ চিন্ময়তত্ত্ব। প্রকটলীলার অবসানের পর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চিন্তা করিলেন—"না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল। যে বলে আমারে করে সর্ব্বদা বিহ্বল॥ * * * নিজ-প্রেমাস্বাদে মোর হয় যে আহ্লাদ। তাহা হইতে কোটিগুণ রাধা-প্রেমাস্বাদ॥" (চৈঃ চঃ আঃ ৪র্থ পঃ) শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বিষয়তত্ত্ব, বিষয়জাতীয় সুখই আস্বাদন করেন, কিন্তু আশ্রয়জাতীয় সুখ মূল আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীমতী রাধারাণী। "আমা হৈতে কোটিগুণ আশ্রয়ের আহ্লাদ॥" সেই আশ্রয়জাতীয় সুখ—প্রেমাস্বাদনের জন্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের "হৃদয়ে বাড়য়ে প্রেম-লোভ ধক্‌ধকি॥" শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত, অনন্ত, অসীম মাধুর্য্য, স্বীয় মাধুর্য্যে স্বয়ং চমৎকৃত হন। শ্রীমতী রাধারাণী 'একলি' আপন প্রেমদ্বারে সেই মাধুর্য্যামৃতসকল পান করেন। শ্রীমতী রাধারাণীর সৎপ্রেমরূপী দর্পণে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিজ নিত্য নবনবায়মান মাধুর্য্যরাশি দর্শন করিয়া তাহা আস্বাদনের জন্য হৃদয়ে সতৃষ্ণার উদিত হয়। কিরূপে ইহার আস্বাদন সম্ভব? "বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ-উপায়। রাধিকাস্বরূপ হইতে তবে মন ধায়॥"

সমস্ত বস্তুর সুখ ও আনন্দের হেতু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। সেই কৃষ্ণচন্দ্রের "রাধিকার রূপ-গুণ আমার জীবাতু।" * * * "কৃষ্ণের বল্লভা রাধা কৃষ্ণ-প্রাণধন॥" * * * "সেই রাধাভাব লঞা চৈতন্যাবতার।" * * * "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি ব্রজেন্দ্রকুমার। রসময়-মূর্ত্তি সাক্ষাৎ শৃঙ্গার॥"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীমতী রাধারাণীর ভাব-কান্তি অঙ্গীকারপূর্ব্বক অর্থাৎ অত্যন্ত ধূর্ত্ততার সহিত তাহা চুরি করিলেন। ব্রজে চৌর্য্যকার্য্যে অতি দক্ষ এবং প্রসিদ্ধ ছিলেন। কোন ভক্ত সেই চৌরাগ্রগণ্য পুরুষের স্তব-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—"কেনাপ্যহো ভীষণ চৌর ইদৃগ্‌দৃষ্টঃ শ্রুতো ন জগত্রয়াপি।"

শ্রীমতীজীর ভাব-কান্তি চুরি করিয়া গ্রহণপূর্ব্বক আসিলেন বটে, কিন্তু তাহা আস্বাদন সম্ভব হইতেছে না—শিক্ষার প্রয়োজন—যাহাতে পরিপাটীরূপে প্রেম আস্বাদন সম্ভব হয়। দক্ষিণ ভারত ভ্রমণচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব রায়-রামানন্দরূপী শ্রীমতী রাধারাণীর শ্রেষ্ঠ নর্ম্মসখীর নিকট উপস্থিত হইলেন। "বিশাখাং শিখালী বিতরণ গুরুত্বে", তাঁহাকে শিক্ষাগুরুরূপে বরণ করিলেন। রায়-রামানন্দরূপী বিশাখার নিকট শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব দীক্ষিত ও শিক্ষিত হইয়া শ্রীমতীর অধিরূঢ় মহাভাব মোদন-মাদন দিব্যোন্মাদ, উদ্‌ঘূর্ণা, চিত্রজল্পাদি ভাবসকল আস্বাদনে সক্ষম

হইলেন। "রাধিকার ভাব-মূর্ত্তি প্রভুর অন্তর। সেইভাবে সুখ-দুঃখ উঠে নিরন্তর॥ *** ভ্রমময় চেষ্টা, সদা প্রলাপময় বাদ॥ রাধিকার ভাব যৈছে উদ্ধব-দর্শনে। সেইভাবে মত্ত প্রভু রহে রাত্রিদিনে॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু রায়-রামানন্দের নিকট সাধ্য-সাধনতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। উদ্দেশ্য চরম সাধ্য-সাধনতত্ত্ব রায়-রামানন্দ-কর্ত্তৃক জগতে প্রকাশিত করা। সাধন-দ্বারা যে বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই সাধ্য, এবং সাধ্যবস্তুকে পাইবার জন্য যে উপায় অবলম্বন করা হয়, তাহাই সাধন।

প্রভু কহে,—"পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।" শ্রীমন্মহাপ্রভু রায়-রামনন্দপ্রভুকে শাস্ত্রসম্মত প্রমাণসহ সাধ্যতত্ত্ব নির্ণয়ের কথা বলিলেন। "তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।" (গীতা) রায়-রামানন্দ প্রথমেই চরম সাধ্য-সাধনতত্ত্বের কথা না বলিয়া প্রথমাবস্থা হইতে আরম্ভ করিলেন। পরমার্থ-জগতে প্রবেশ করিতে হইলে নিয়মশৃঙ্খলাপূর্ণ ধর্ম্ম-জীবনের প্রয়োজন আছে। উচ্ছৃঙ্খলতা বা যথেচ্ছচারিতা পরমার্থ-জগতে বাধা-স্বরূপ। রায় কহে,—"স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়॥" শাস্ত্র-প্রমাণ-স্বরূপে বিষ্ণুপুরাণের শ্লোক উদ্ধৃত করিলেন,—"বর্ণাশ্রমাচার-বতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্। বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষকারণম্॥" স্বধর্ম বা বর্ণাশ্রম আচরণ, সাধন এবং সাধ্য বিষ্ণুর সন্তোষ এবং এই সন্তোষের দ্বারা বর্ণাশ্রমী ঐহিক, পারত্রিক কিছু সুখভোগ লাভ মাত্র করেন। সাধকের অস্মিতার উপলব্ধি এবং প্রাপ্তবস্তু ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত। জীব বা সাধক নিত্য কৃষ্ণদাস। শ্রীকৃষ্ণের সেবাই তাঁহার নিত্যবৃত্তি। ইহার উপলব্ধি, অনুভব স্বধর্ম্ম পালনের মধ্যে কিছুমাত্র নাই। সুতরাং শ্রীমন্মহাপ্রভু 'এহো বাহ্য' বলিয়া অগ্রে যাইতে নির্দ্দেশ দিলেন।

রায়-রামানন্দপ্রভু শ্রীকৃষ্ণে কর্ম্মার্পণরূপী আরোপসিদ্ধা ভক্তি এবং পরে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার চরম শ্লোক "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"—সাধন নির্ণয় করিলে পর শ্রীমন্মহাপ্রভু 'এহো বাহ্য' বলিলেন এবং অগ্রে কহিতে নির্দ্দেশ করিলেন। ভোগলিপ্সু কর্ম্মীকে শ্রীকৃষ্ণে কর্ম্ম-সমর্পণের জন্য শাস্ত্রের আদেশ, কারণ কর্ম্মী নিজ ভোগসুখের জন্য কর্ম্ম করিবেই, কিন্তু শ্রীভগবানে অর্পণের দ্বারা কর্ম্মের শোধন এবং অর্পণের প্রবৃত্তি উদয় হইবে। 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য'র মধ্যে যে শরণাগতের কথা বলা আছে তাহা শুদ্ধ শরণাগত নয়। কারণ সাধকের পাপের ভয় চিন্তা আছে। শ্রীভগবান্ তাই আশ্বাস ও অভয় দিতেছেন, পাপের দায়-দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করিবেন। (ক্রমশঃ)

—শ্রীযুক্তা উমা দেবী

গৌর এলো

গৌর এলো, গৌর এলো, গৌর এলো—
শুদ্ধভক্তি ল'য়ে তীর্থে মেলো—
গৌর যেথা নিত্য আছে
নিম্ব বৃক্ষ কাছে ;
মাতৃ-কোলে
দোলে ;

ঘরে
নাহি ধরে
মহা শুদ্ধ অতি
রূপ, রং তাঁ'র জ্যোতি,
দূর হ'তে আরো দূরে যায়—
যেন ডেকে বলে, "ওরে ছুটে আয়।"

বসে আছে পিতা এক খট্ট 'পরে
স্ফীত বুক ; মুখে হর্ষ ঝরে ;
দেহ তাঁর বস্ত্রে ঢাকা ;
প্রেমে মাখা মাখা ;
চক্ষু দৃষ্টি
মিষ্টি ;

ধীরে
গৃহ ঘিরে
মৃদু বায়ু বয় ;
সূর্য্য ডোবে ; সন্ধ্যা হয়—
শঙ্খ, ঘণ্টা, খোল বাজে ঘন,
গৌর এলো ঘরে, জয় ধ্বনি শোন।

চাঁদ ওঠে নভে, করে জ্বল্-জ্বল্,
ঝক্ ঝক্ করে বারি তল ;

মধু দিয়ে মাখা আলো
মুছে দেয় কালো,
প্রেম বেষে
এসে ;

তবু
ওগো বিভু,
বদ্ধ জীব, হায় !
ক্ষণে ক্ষণে ভুলে যায়—
তুমি ছাড়া ত্রাতা কেহ নাই,
সব ত্রুটী তুমি ক্ষমা করো তাই ।

বিশ্বে আজ ধর্ম্ম নাই, শান্তি নাই,
হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা, নি'ছে ঠাঁই ;
মিথ্যা, দুষ্ট চক্র, গর্ব্ব
হোক্ সব খর্ব্ব ;
থাক নিত্য-
সত্য ;

তাই
চলো যাই
গৌর পথ ধরি,—
মুখে বলি 'হরি হরি' ;
গাহি যেন গৌর গুণগান,—
নামে যেন মেতে ওঠে মন-প্রাণ ।

—শ্রীবলাই চাঁদ ঘোষ (সেবানুহৃদ্)
সাংবাদিক পি টি. আই.

———

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-তিথিতে

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ, শিলিগুড়ি (দার্জ্জিলিং), তাং ২১।৮।৯২]

সর্ব্বাগ্রে অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম জগদ্‌গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তি-প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামি-চরণে অনন্তকোটী সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ-প্রণতি জ্ঞাপন করি। তদনন্তর পূজনীয় বৈষ্ণববৃন্দ, সুধী সজ্জনবৃন্দ, মাতৃমণ্ডলী-চরণেও আমার অসংখ্য দণ্ডবৎ। আজ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী বা জন্মজয়ন্তী। এই তিথিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছিলেন। প্রতি বৎসরেই এই শুভতিথি সমাগতা হন আমাদের কিছু সেবার সুযোগ দান করবার জন্য। ভগবান্ যেমন যুগে যুগে বারে বারে অবতীর্ণ হন, তাঁর ভক্তগণও জগতের কল্যাণের জন্য ধরাধামে আবির্ভূত হন। আমরা গীতাশাস্ত্রে দেখতে পাই ভগবানের এ জগতে আসবার কারণ। তিনি নিজমুখে তাঁর প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে বলেছেন,—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

যখন এ জগতে ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, তখন আমি আবির্ভূত হই। আরও কি কারণ ?—আমার একান্ত ভক্তগণকে, সাধুগণকে রক্ষার জন্য আমি আবির্ভূত হই। 'বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্'—দুষ্কৃত যারা আছে, তাদের বিনাশের জন্য আমি আবির্ভূত হই। এইভাবে ভগবানের আবির্ভাবের কথা তিনি নিজেই ঘোষণা করেছেন। ভগবানের এই আসবার কারণ মাঝে মাঝে ঘটছে, কিন্তু বিশেষ বক্তব্য বিষয়—ভগবান্ কতকগুলো কাজ তাঁর অবতারাদির দ্বারা সম্পন্ন করেন। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় তিনি স্বয়ং আবির্ভূত হচ্ছেন। আমাদের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে এ বিষয়টীও বিশেষভাবে আলোচনা করতে হবে।

যে কাজ তাঁর অন্যান্য অবতারের দ্বারা সম্ভব হয়, সেই কাজ থেকে আরও বিশেষ কিছু কার্য্যসাধন করতে গেলে ভগবান্‌কে স্বয়ং আবির্ভূত হতে হচ্ছে। যেটা অবতারের দ্বারা সম্ভব হবে না। ঠিক এই তত্ত্বদর্শনটা এর ভিতরে রয়েছে। সেটা কি করে বুঝব ? শাস্ত্র আলোচনা করতে হবে সুন্দরভাবে মনোযোগ-সহকারে এবং সে শাস্ত্র আলোচনাও হবে উপযুক্ত বৈষ্ণব-গুরুর আনুগত্যে।

ভগবান্ কৃষ্ণের 'জন্মাষ্টমী'-শব্দ ব্যবহার হয়েছে। এ সব বিষয়ে অন্যত্রও কিছু কিছু আলোচনা করেছি। তথাপি পুনরায় একটু দিগ্‌দর্শন করে যেতে হবে। 'জন্ম'-শব্দ ব্যবহার হল কেন? জন্ম-মৃত্যু শব্দ সাধারণ মানুষের বিশেষণরূপে ব্যবহার হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী একথা কেন ব্যবহার হচ্ছে? শাস্ত্র আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি কৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছেন বসুদেব-দেবকীর পুত্ররূপে এবং শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনামের মধ্যে 'যখন কৃষ্ণ জন্ম নিল দেবকী উদরে।'—লাইনটা রয়েছে। কার্য্যক্ষেত্রে আবার দেখা যাচ্ছে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নন্দনন্দন, যশোদানন্দন বলা হচ্ছে। এটা কিভাবে হচ্ছে? ভগবান্ যদি বসুদেবনন্দন, দেবকীনন্দন, তাহলে আবার নন্দনন্দন, যশোদানন্দন একথা আসছে কেন? বহু ব্যক্তির ধারণা নন্দ-যশোদা কৃষ্ণকে পালন-পোষণ করেছেন। সেখানে বক্তব্য বিষয় হচ্ছে এই—ভগবান্ তাঁর সমস্ত শক্তি সব জায়গায় প্রকাশ করেন না। সাধারণ মানুষের যে ক্ষমতা তার থেকে শত-সহস্রগুণে অধিক ক্ষমতা রাখেন ভগবান্। যেহেতু তিনি পরমেশ্বর। "কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুম্ ইতি ঈশ্বরঃ।" ঈশ্বরের সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন শাস্ত্রে। ঈশ্বর-শব্দে যদি আধিকারিক দেবদেবীগণকে লক্ষ্য করে, তাহলে পরমেশ্বর, পরমেশ্বরী-শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে Supreme Command, Highest Authority, Supreme Lord, Almighty Lord এর ক্ষেত্রে। ঠিক সেইরূপ বিচার এখানে রয়েছে।

বসুদেবনন্দন বাসুদেব বা দেবকীনন্দন কৃষ্ণ ঐশ্বর্য্যপর ভাবেতে সেবিত হচ্ছেন বসুদেব-দেবকীর কাছে। সেই কৃষ্ণ যখন গোকুলে নন্দালয়ে গেছেন তখন তাঁর ঐশ্বর্য্যভাবটা সেখানে শেষ হয়েছে। বিশুদ্ধ বাৎসল্য স্নেহেতে লালিত-পালিত হয়েছেন মা যশোদার কাছে, নন্দ মহারাজের কাছে। আপনারা পূর্ব্বে শুনেছেন, একই সময়ে রাত্রি দ্বিপ্রহরে বসুদেব-দেবকীর সামনে ভগবান্ কৃষ্ণ যখন আবির্ভূত হয়েছেন, ঠিক সেই একই সময়ে মা যশোমতী কৃষ্ণকে প্রসব করেছেন এবং নবমী-তিথি যখন পড়েছে তখন তিনি যোগমায়াকে প্রসব করেছেন। ঠিক সেই বিচারটা এখানে আসছে। দেবকীনন্দন কৃষ্ণ ঐশ্বর্য্যপর বিগ্রহ, আর নন্দনন্দন-যশোদানন্দন কৃষ্ণ বিশুদ্ধ বাৎসল্য স্নেহে লালিত-পালিত মাধুর্য্যপর বিগ্রহ। ঐশ্বর্য্যপর বিগ্রহের বেলায় আবির্ভাব-শব্দটা এসেছে, আর নন্দ-যশোমতীর পুত্ররূপে যখন তিনি প্রকাশিত তখন জন্ম-শব্দটা এসেছে। এই জন্ম-শব্দটা হল স্বাভাবিক। বিশুদ্ধ বাৎসল্যের ক্ষেত্রে ঐশ্বর্য্যভাব নাই। সুতরাং কৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী শব্দটী বললে পরে এর ভিতরে গূঢ় রহস্য আছে, সেটুকু আমাদের বুঝতে হবে।

আর একটী বিষয় হচ্ছে এই,—'শ্রীকৃষ্ণ-জন্মজয়ন্তী'-শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

জয়ন্তী-শব্দের অর্থ কি? তারও একটা বিশেষ অর্থ আছে। কিন্তু আজ এই 'জয়ন্তী'-শব্দের অপব্যবহার হচ্ছে। সংবাদপত্রের সম্পাদকমণ্ডলী, কবি, সাহিত্যিক জয়ন্তী-শব্দটা ব্যবহার করছেন আজকাল জন্ম অর্থে। যেটা সম্পূর্ণ ভুল কথা এবং তাঁরা এই জয়ন্তী-শব্দটা রামা-শ্যামা, যদু-মধু সকলের ঘাড়েই চাপিয়ে দিচ্ছেন। গান্ধী-জয়ন্তী, রবীন্দ্র-জয়ন্তী, নেতাজী সুভাষ-জয়ন্তী ইত্যাদি। কিন্তু জয়ন্তী-শব্দের অর্থ ত' জন্ম নয়। ওরা কিন্তু ব্যবহার করছেন জন্ম-জয়ন্তী। আমরা স্মৃতিশাস্ত্র আলোচনা করে দেখছি এই শব্দটা ব্যবহার হয়েছে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের বেলায়। এই শব্দটা ব্যবহৃত হতে পারে ভগবান্ বিষ্ণুর আবির্ভাবের ক্ষেত্রে। অন্য কারও ক্ষেত্রে এ শব্দ ব্যবহৃত হবে না। বিশেষ ক্ষেত্র কি? ভাদ্র মাসের কৃষ্ণ-অষ্টমী, তার মধ্যে রোহিণী নক্ষত্র যদি যুক্ত হয়, অভিজিৎ মুহূর্ত্ত যদি থাকে, তাহলে তাকে বলে জয়ন্তী। এই জয়ন্তী হল একটা যোগ, শুভ মুহূর্ত্ত। কৃষ্ণ যে-সময় আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন ছিল এই শুভ যোগ। অথচ সাধারণ মানুষ জয়ন্তী-শব্দের অর্থ বোঝেন না। সবই বোঝেন, অথচ কিছু বোঝেন না! যে কোন জায়গায় জয়ন্তী-শব্দ লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

স্মৃতিশাস্ত্রে সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমী-তিথি পালন করতে নিষেধ করেছেন। শুদ্ধ অষ্টমী-তিথি পালন করতে হবে। শুদ্ধাষ্টমী-তিথির মধ্যে আবার বাছাবাছি আছে। যদি রোহিণী নক্ষত্রের যোগ হয় তাহলে ভাল। আবার বলছেন—নবমী-সংযুক্ত অষ্টমী যদি হয় তাহলে আরও উত্তম। নবমী-সংযুক্ত অষ্টমী মানে—অষ্টমী-তিথিতে ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র আবির্ভূত হয়েছেন, আর নবমী-তিথি যখন পড়েছে তখন যোগমায়া দেবী আবির্ভূত হয়েছেন। এইজন্য নবমী-সংযুক্ত অষ্টমী-তিথিকে বৈষ্ণব-স্মৃতিশাস্ত্রে বলা হয়েছে 'উমা মাহেশ্বরী তিথি'। এই যোগের বিশেষ আদর আছে। আবার যদি সোমবার বা বুধবার হয়, তাহলে আরও সুন্দর যোগ হয়। শাস্ত্রে এইভাবে কথাগুলো নির্দ্দেশ করেছেন আমরা এইভাবে শুভযোগ যদি নাও পাই, তাহলে অন্ততঃ শুদ্ধ অষ্টমী-তিথি আমাদের পালন করতে হবে।

শ্রীকৃষ্ণ যে-সময়ে সংসারে আবির্ভূত হয়েছিলেন, সে-সময়ে মৃদুমন্দ বারিবর্ষণ হচ্ছিল, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল এবং কিছু কিছু দৈব-দুর্বিপাকও দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু ওটা দৈব-দুর্ব্বিপাক নয়, শাস্ত্রে বর্ণনা করেছেন। প্রকৃতিদেবীও ভগবানের সেবা করবার জন্য ঐরকম অবস্থাটা সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং ভগবানকে যদি আমরা ভালবাসতে চাই, ভগবত্তত্ত্ব যদি আমরা অনুশীলন করতে চাই, তাহলে শাস্ত্রীয় যে তত্ত্বদর্শন, বিচার-পদ্ধতি সেগুলো আমাদের মেনে নিতে হবে। এটা হল সবথেকে বড় কথা।

জন্মাষ্টমী-তিথি পালন করলে ভগবান্ খুশি হবেন। যে কোন তিথি—মাধবতিথি মাত্রেই, যদি আমরা তাতে উপবাস করি, তার ভিতরে ভগবানের লীলাকথা শ্রবণ করি, কীর্ত্তন করি, তাহলে আমাদের সর্ব্বৈব কল্যাণ, ভক্তি লাভ হবে। সংসারে আমরা দুঃখ-কষ্ট পাচ্ছি, এ দুঃখ-কষ্টটা দূর হয়ে যাবে, এটা বড় কথা নয়। শাস্ত্র আলোচনা করে আমরা দেখছি—'আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তির্হি মুক্তিঃ'। মুক্তি কাকে বলব ?—আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তিকে মুক্তি বলে। আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি কিরকম ? আমার জ্বর হয়েছে, অসুখ করেছে, জ্বরটা ছেড়ে গেল, ওতে কি হবে ? স্বাস্থ্য লাভ করা আমার প্রয়োজন আছে। আত্মার যে স্বাস্থ্যলাভ সেই লাভ করা হল বড় কথা। সেটা শাস্ত্রে বুঝিয়েছেন। শুধু দুঃখ-নিবৃত্তি হলে হবে না। তার সঙ্গে আছে মুক্তির কথা, ভক্তিলাভের কথা। আবার ভক্তিলাভের কথা যখন এসেছে তখন সাধনভক্তির কথা, ভাবভক্তির কথা, প্রেমভক্তির কথা এসেছে। সব জিনিসটাকে সুন্দরভাবে আমাদের বুঝতে হবে। আমরা কতটুকু পেতে চাই, আর কতটুকু পেলে আমার আত্মা শান্তি লাভ করবে, এটা বলতে হবে। সুতরাং জন্মাষ্টমী-তিথি পালন করা মানে হল ভগবানের সাক্ষাৎকার। হরিনাম করা আর ভগবানের সাক্ষাৎকার দুই-ই একই বস্তু বলেছেন শাস্ত্রে। আশ্চর্য্য ব্যাপার। দুটো একই জিনিষ, Identical। ভগবান্ এবং ভগবানের নাম দুই-ই এক। ভগবান্ স্বয়ংরূপ এবং তাঁর শ্রীনাম ও শ্রীবিগ্রহ—তিন একই। যতদিন পর্য্যন্ত এ বুদ্ধি আমাদের না হবে, যতদিন পর্য্যন্ত এ দর্শন আমাদের না হবে, ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের তত্ত্বজ্ঞান লাভ অসম্ভব।

শাস্ত্র আলোচনা করব কেন আমরা ?—তত্ত্বদর্শন লাভ করার জন্য। বাচ্চা ছেলেদের Eshops Fables এর গল্পগুলো পড়ানো হয়। গল্পের শেষের দিকে একটা Moral—নীতি-শিক্ষা দেওয়া আছে দু-এক লাইন করে। সেটা হল মূল শিক্ষণীয় বিষয়। সেটা বুঝতে পারবে না বলে একটা করে গল্প দেওয়া হয়েছে ঐ জিনিষটা বুঝাবার জন্য। সমস্ত শাস্ত্রটা যদি আমরা তুলোপাঁজা করি এবং তার মূল বিষয়বস্তুটা আমরা গ্রহণ করার চেষ্টা না করি, তাহলে সব পণ্ডশ্রম হয়ে যাবে। ভগবানকে ভালবাসতে হবে, এটা সবচেয়ে বড় কথা।

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি পঞ্চরাত্র-বিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কেবলম্॥

শ্রুতি স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রবিধিকে যদি বাদ দিয়ে আমরা নিজেদের কোন বক্তব্য রাখতে চাই, তাহলে বৃথা হয়ে যাবে, কেউ মানবে না। তত্ত্ববিৎ,

শাস্ত্রদর্শী ব্যক্তিগণ নিশ্চয় স্বীকার করবেন না। তাঁরা শাস্ত্রীয় যুক্তি-সিদ্ধান্ত ছাড়া কোনটা মানতে পারেন না। "যেন কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ।"—এটা শাস্ত্রের সর্ব্বত্র লেখা আছে। আমরা যেন সেই প্রেমময় ভগবানকে না ভুলি। ভগবানকে ভালবাসা যাচ্ছে ৬৪ রকমে। একে বলে ভক্ত্যঙ্গ। সেইগুলো শুনলে পরে আমাদের ভয় হয়। এতগুলো পারা যাবে না কি? তাই শ্রীমদ্ভাগবতে ওটা সংক্ষিপ্ত করেছেন।

প্রহ্লাদ মহারাজকে তাঁর পিতা হিরণ্যকশিপু জিজ্ঞাসা করেছেন, তুমি পড়াশুনা করছ, তোমার যেটা ভাল পড়া তুমি সেটা আমাকে বল। বাপের কোলে বসে প্রহ্লাদ বলতে লাগলেন,—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥

এই পাঠ আমি ভাল পড়েছি। শ্রীভগবানের নাম শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই নবধা ভক্তি যিনি যাজন করবেন, তিনি ভগবানকে ঠিক ঠিকভাবে ভালবাসতে পারবেন।

(ক্রমশঃ)

নববর্ষ

ভক্তিপ্রচারের নামে অন্যাভিলাষময়ী অন্যান্য পত্রিকা

"পরম-করুণাবারিধি শ্রীশচীদুলালের প্রেরণায় * * * শ্রীপত্রিকা অদ্য নববর্ষে পদার্পণ করিলেন। যদিও অন্যান্য অভিলাষময়ী ভক্তি-প্রচারণী পত্রিকাসমূহের অবতারণা হইয়াছে সত্য, তথাপি সকলগুলিই কেবলা ভক্তিকে আশ্রয় করিয়া প্রতিষ্ঠিত নহে। অবান্তর লক্ষ্যসমূহ অন্তরে পোষণ করিলে কখনই শুদ্ধ-ভক্তির স্বরূপ উপলব্ধি ঘটে না। ভক্তির নামে অভক্তিমিশ্র ব্যাপার-সমূহ পাঠকের ভক্তিবৃত্তির ন্যূনতা সাধন করে। আমরা বিষয়মিশ্র চেষ্টাকে কখনই শুদ্ধভক্তি-প্রচারিণী চেষ্টা বলিতে পারিব না। অন্যাভিলাষিতা অন্তরে প্রবাহিত হইলে কখনই অবিমিশ্রা ভক্তির সম্ভাবনা নাই। যাহারা এ-সকল কথা বুঝিতে

পারে না, অথবা জড় ভোগময় স্বার্থে আবৃত হইয়া অপ্রাকৃত শুদ্ধভক্তির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে না, তাহারা ভক্তির নামে অন্য গৌণ চেষ্টার অবতারণা করিয়া ফেলে।

শ্রীপত্রিকার ধর্ম্ম ও উদ্দেশ্য

আমাদের পাঠকবর্গ অনেকেই অন্যাভিলাষিতা-শূন্য কৃষ্ণানুশীলনময় শুদ্ধ ভক্ত; সুতরাং তাঁহাদের সর্ব্বতোভাবে উপকার করিয়া শ্রীপত্রিকা সন্তোষ-বিধানে একমাত্র সমর্থা। যেখানে বিষয়-ব্যাপার, সেখানেই হিংসা-দ্বেষ প্রভৃতি ধর্ম্ম। শ্রীপত্রিকা নির্ম্মৎসর ভাগবতগণের একমাত্র তোষণী; সুতরাং শ্রীপত্রিকার প্রতিকূল-দলের সহিত হরিজনের কোন সম্বন্ধই থাকিতে পারে না। শ্রীপত্রিকা কখনই মিছা-ভক্তের অনিত্য ধর্ম্মপ্রচার, কর্ম্মজ্ঞানাবৃত ধর্ম্মের প্রচার বা অন্যাভিলাষ-পোষণ করিবার সহায়তা করেন না।

বিষয়-সেবা এবং কৃষ্ণসেবা এক নহে; বিষয়-সেবা বন্ধনের কারণ

শ্রীপত্রিকা বিষয়ীর কোন কথায় থাকেন না বলিয়াই যে বিষয়িগণ ইহা পাঠে সন্তুষ্ট হইবেন ও বিষয় ছাড়িবেন, আমরা এরূপ মনে করিতে পারি না। কৃষ্ণেতর বিষয়ের স্বভাব এই যে, যাহারা কৃষ্ণেতর অসদ্‌বস্তু-সেবাকে কৃষ্ণসেবাসহ সাম্য জ্ঞান করিয়া অসাম্প্রদায়িক বা নিরপেক্ষ মনে করেন, তাহারা অচিরেই যতই কেন না আপনাদিগকে ভক্তিতে অবস্থিত জানুন, স্বকর্ম্ম বিপাকে কেবল বিষয়েই অবস্থিত হন।

তথাপি বিষয়ের স্বভাব হয় মহা অন্ধ।
সেই কর্ম্ম করায় যাতে হয় ভববন্ধ॥　(চৈঃ চঃ অঃ ৬।১৯৯)

কৃষ্ণসেবার ফল ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ নহে

উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যই মূল বস্তু। যাহারা কৃষ্ণ-সেবার উদ্দেশ্য ছাড়িয়া নিজে উন্নতি-বাদী হইয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষ-ফলোদ্দেশে কৃষ্ণেতর বিষয়কে স্বীয় চেষ্টার উদ্দিষ্ট বস্তু জ্ঞান করে, তাহাদের মন্দ চেষ্টা আমরা আদর করিতে পারিলাম না। প্রকৃত অর্থলাভ, ইন্দ্রিয়-সুখেচ্ছা, প্রতিষ্ঠাশা প্রভৃতি শুদ্ধ কৃষ্ণসেবার ফল নহে; এই কথা সাধুদিগের মুখে, লেখনীতে ও উপদেশসমূহে অসংখ্য-স্থলে কথিত হইয়াছে। আমরা তাহা ছাড়িয়া যদি ভববন্ধকারক প্রাকৃত দ্রবিণ, জাতরূপ প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া হরিভজন সম্পাদিত হইল মনে করি, তাহা হইলে আমরা 'অন্ধ'-শব্দবাচ্য বিষয়ী হইব। এতাদৃশ বিষয়ী হইলে আমরা শ্রীপত্রিকাদ্বারা তুষ্ট হইতে পারিব না। আমাদের সর্ব্বার্থ শ্রীকৃষ্ণে নিযুক্ত হইলে তদ্বিনিময়ে অনিত্য ফল-ভোগ কাম্য হইলে আমরা কখনই ভক্তির স্বরূপ বুঝিতে পারিব না।

জাতিগত ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব না হইলে বিষয়ী

অনেকে মনে করেন, নির্ম্মৎসর বৈষ্ণবেতর বস্তুতে ব্রহ্মণ্য অবস্থিত বা বৈষ্ণবেতর ব্রাহ্মণের সহায়তা করিলেই নিরপেক্ষ হইয়া শুদ্ধ বৈষ্ণব হওয়া যায়, পরন্তু তাহাও বিষয়। শুদ্ধভক্তির উদয়ে বৈষ্ণবে ব্রহ্মণ্য ও ব্রহ্মণ্যের সহায়তা-ধর্ম্ম আপনা হইতেই প্রকাশিত হয়। বৈষ্ণবে ব্রহ্মণ্যের অভাব থাকিতে পারে মনে করিলে, বৈষ্ণব হওয়া সুকঠিন। তাহাকে 'বৈষ্ণবের প্রায়' বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

বৈষ্ণব ব্যতীত অন্যে ব্রহ্মণ্য-ধর্ম্ম নাই

বিষয়কে যাঁহারা সুখ বলিয়া মনে করেন, তাঁহারাই শুদ্ধবৈষ্ণবে ব্রহ্মণ্যের অবস্থিতি দেখিতে না পাইয়া, তদিতর বস্তুতে তাহা থাকিতে পারে, এরূপ মিথ্যা ধারণা করেন এবং ব্রহ্মণ্য ও ব্রাহ্মণের সাহায্য প্রভৃতি ধর্ম্ম বৈষ্ণবেতর বস্তুতেই আশ্রিত—এরূপ মনে করিয়া মহাপীড়ারূপ বিষয়ে অবগাহন করেন। এইসকল লোক জগতে সমৎসর সমাজে 'বৈষ্ণব' বলিয়া পরিচিত হইলেও তাহারা 'বৈষ্ণবের প্রায়।'

বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের গুরু ; তাঁহাকে ছোট মনে করা অপরাধ

বিষয় কখনও ভক্তের লোভনীয় পদবী হয় না ; যেহেতু কৃষ্ণসেবা-লৌল্যই তাঁহার স্বরূপ-ধর্ম্ম। যাহাদের বিষয়-গ্রহণ-প্রবৃত্তি প্রবল, তাহারা ভক্ত সাজেও বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধি বর্ণ-বুদ্ধি প্রভৃতি করিয়া নিজের জড় স্বার্থ-সাধনে সর্ব্ববর্ণ-গুরু নির্ম্মৎসর বৈষ্ণবকেও লঘু জ্ঞান করে। বর্ণগুরু সমৎসর ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বৈষ্ণবকে আভিজাত্যে লঘু জ্ঞান করিলে বা তাঁহার যোগ্য সমাদর না করিলে জীব বিষয়ী হইয়া পড়েন।

গুরু-পদাসীন মিছা-ভক্তগণ বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করায় অপরাধী এবং তাহারা শিষ্য-বঞ্চক

যে-সকল ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিচারহীন ভক্ত-পরিচয়াকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি গুরু-পদাসীন হইয়া কৃষ্ণ-সেবা-কুতূহল ভক্তকেও অপ্রাকৃত ব্রহ্মণ্য-ধর্ম্ম-রহিত মনে করেন এবং তাঁহাদের প্রাকৃত শৌক্র-বর্ণাদির বিচার করেন, তাঁহাদের শুদ্ধা ভক্তির উদয় হয় নাই জানিতে হইবে। যাঁহারা কৃষ্ণোন্মুখ ভক্তগণকে শৌক্র-বর্ণ-বিচারে অভদ্র, শূদ্র, চণ্ডালাদি অভিধান করিতে ব্যগ্র, তাদৃশ গুরু-পদাসীন মিছা-ভক্তগণ অনেকস্থলে অর্থলোভে কৃষ্ণ-ভজনোন্মুখ জনকে বিষয়াশী বলিয়া গ্রহণ করিয়াও তাঁহাদের নিকট হইতে রজত, সুবর্ণাদি বা বস্ত্রাদি লইয়া নিজ গ্রাসাচ্ছাদন সম্পন্ন করেন ; পরন্তু তাঁহাদের স্পৃষ্ট জল গ্রহণ করিলে তাঁহাদের জাতিনাশ আশঙ্কা করিয়া তাঁহাদিগকে

বঞ্চনা করেন মাত্র। কেবলমাত্র বাক্যদ্বারা কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিলাম বলিয়া কপটতার প্রশ্রয় দেন। শ্রীগৌরসুন্দর কিন্তু এতাদৃশ কপটতা বারংবার নিষেধ করিয়াছেন।

জাতি-ব্রাহ্মণগণ শিষ্যকে পতিত রাখায় পতিতপাবন গুরু নহেন

পরমার্থ-বিষয়ে এরূপ কপটতা প্রশ্রয় পাইয়া আজ শুদ্ধভক্তিকে কপটভক্ত-সমাজ আচ্ছাদন করিয়াছে। সমৎসর শৌক্র ব্রাহ্মণগণ গুরুপদাসীন হইয়া সমাজের ভয়ে অবরকুলোৎপন্ন শূদ্রগণের দীক্ষাপ্রদান করিয়া ও তাহাদিগকে শূদ্রাদি বলিয়া তাহাদের সহ সম্বন্ধ স্থাপনপূর্ব্বক তাহাদের অন্নজলাদি গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে অধঃপাতিত করিতেছেন। পতিতপাবন গুরুদেবের আসন গ্রহণ করিয়া পতিতকে উত্তোলন করা দূরে যাক্, আপনাদিগের নিজ পাতিত্য-ভয়ে ভীত হইয়া পরমার্থ পর্য্যন্ত ছাড়িতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

যে-কোনও কুলোদ্ভূত ব্যক্তি বৈষ্ণবী দীক্ষা-প্রভাবে ব্রাহ্মণ হন

পতিতকে অব্রাহ্মণ জানিয়া নিজের আত্মম্ভরিতা বৃদ্ধি করিবার জন্যই কি শ্রীমন্মহাপ্রভু উপদেশ করিয়াছেন? পণ্ডিতকে হরিসেবা করিবার যোগ্যতা দিবেন না বলিয়াই কি শ্রীগৌরহরির আজ্ঞা? আমরা ত' শুনিয়াছি!—

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
সেই কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা—সেই গুরু হয়॥
যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম্।
শূদ্রো ব্রাহ্মণতাং যাতি বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়তাং ব্রজেৎ॥
যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রস-বিধানতঃ।
তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥
ভক্তিরষ্টবিধা হ্যেষা যস্মিন্ ম্লেচ্ছেপি বর্ত্ততে।
স বিপ্রেন্দ্রো মুনিশ্রেষ্ঠঃ স জ্ঞানী স চ পণ্ডিতঃ॥
চণ্ডালোপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তি-পরায়ণঃ॥

দীক্ষা দিবার পরেও গৃহীত-বিষ্ণুদীক্ষাক বৈষ্ণবকে যিনি অব্রাহ্মণ মনে করেন বা নিন্দা করেন, তাঁহার হরিভক্তির পরিমাণ কিরূপ, তাহা পাঠকগণ বুঝিয়া লইবেন।"

———

FORM—IV

STATEMENT ABOUT OWNERSHIP AND PARTICULARS ABOUT NEWSPAPER

SHRI GOUDIYA-PATRIKA

[Under Rule 6 of the Registration of Newspapers (Central) Rules 1956]

1. Place of Publication—Shri Devananda Goudiya Math, Tegharipara, P. O.—Nabadwip (Nadia , W. B.
2. Periodicity of its Publication—Last day of every Bengali month i. e. once in month.
3. Printer's Name—Tridandi Swami Bhakti Vedanta Acharyya Maharaj.
   Nationality—Indian—Goudiya-Vaishnaba.
   Address—Shri Devananda Goudiya Math, Tegharipara, P. O.—Nabadwip (Nadia , W. B.
4. Publisher's Name— Do
   Nationality— Do
   Address— Do
5. Editor's Name—Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti Vedanta Trivikram Maharaj.
   Nationality—Indian—Goudiya-Vishnaba.
   Address—Shri Devananda Goudiya Math, Tegharipara. P. O.—Nabadwip (Nadia), W. B.
6. Name and address of individuals who won the newspapers and partners or share holders holding more than one percent of the total capital,— Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti Vedanta Baman Maharaj, President-Acharyya, on behalf of Shri Goudiya Vedanta Samiti.

I, *Swami Bhakti Vedanta Acharyya* hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd./Swami B. V. Acharyya
Signature of Publisher.

Dated—28. 2. 93

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪৫শ বর্ষ | ৭ মধুসূদন, প্রদ্যুম্ন, ৫০৭ শ্রীগৌরাব্দ
৩০ চৈত্র, মঙ্গলবার, ১৩৯৯, ইং ১৩/৪/৯৩ | ২য় সংখ্যা

শ্রীশ্রীশচীনন্দন-বিজয়াষ্টকম্

[শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিতম্]

শ্রীশ্রীশচীনন্দনায় নমঃ

গদাধর! যদাপরঃ স কিল কশ্চনালোকিতো
ময়াশ্রিত-গয়াধ্বনা মধুর-মূর্ত্তিরেকস্তদা।
নবাম্বুদ ইব ব্রুবন্ ধৃত-নবাম্বুদো নেত্রয়ো-
র্লুণ্ঠন্ ভুবি নিরুদ্ধবাগ্ বিজয়তে শচীনন্দনঃ॥ ১॥

একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রিয় গদাধরসহ কথোপকথন করিতে করিতে বলিলেন,—হে গদাধর! গয়াপথে কোন এক পরমোৎকৃষ্ট অপূর্ব্ব মধুর মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলাম; জলদ-গম্ভীর-স্বরে এই কথা বলিবামাত্র যাঁহার নয়ন-যুগল হইতে দরদর ধারে অশ্রু

প্রবাহিত হইয়াছিল এবং যিনি তৎক্ষণাৎ ভূপতিত হইয়া বাক্‌শক্তি-রহিত হইয়াছিলেন, সেই শ্রীশচীনন্দন গৌরচন্দ্র জয়যুক্ত হউন ॥ ১ ॥

অলক্ষিতচরীং হরীত্যুদিতমাত্রতঃ কিং দশা-
মসাবেতি বুধাগ্রণীরতুল-কম্প-সম্পাদিকাম্ ।
ব্রজন্নহহ ! মোদতে ন পুনরত্র শাস্ত্রেধিতি
শিষ্যগণ-বেষ্টিতো বিজয়তে শচীনন্দনঃ ॥ ২ ॥

আহামরি ! যিনি অধ্যয়ন-ব্যপদেশে শিষ্যাদির মুখে অথবা অন্য কোনও ছলে "হরি" এই বর্ণদ্বয় শ্রবণ করিবামাত্র, অনুপম কম্পাদিযুক্ত কি এক অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়া যেরূপ আনন্দ উপভোগ করিতেন, পরন্তু শাস্ত্রালোচনায় তদ্রূপ করিতেন না, শিষ্যগণ-পরিবেষ্টিত পণ্ডিতাগ্রগণ্য সেই শ্রীশচীনন্দন গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি জয়যুক্ত হউন ॥ ২ ॥

হহা ! কিমিত্যুচ্যতে পঠ পঠাত্র কৃষ্ণং মুহু-
র্বিনা তমিহ সাধুতাং দধতি কিং বুধা ! ধাতবঃ ।
প্রসিদ্ধ ইহ বর্ণ-সংঘটিত-সম্যগাম্নায়কঃ
স্বনাম্নি যদিতি ব্রুবন্ বিজয়তে শচীনন্দনঃ ॥ ৩ ॥

ছাত্রগণ ধাতুপাঠ আরম্ভ করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—হায় ! হায় ! বৎসগণ ! তোমরা কি বলিতেছ ? বারম্বার 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বল । হে বুধগণ ! ধাতুসকল 'কৃষ্ণ' বিনা কিরূপে শুদ্ধলাভ করিবে ? এমন কি, যিনি ক, খ ইত্যাদি বর্ণমালাদ্বারাও কৃষ্ণনাম উপদেশ করিতেন, সেই শ্রীশচীনন্দন জয়যুক্ত হউন ॥ ৩ ॥

নবাম্বুজ দলে যদীক্ষণ-সবর্ণতা-দীর্ঘতে
সদা স্বহৃদি ভাব্যতাং সপদি সাধ্যতাং তৎপদম্ ।
স পাঠয়তি বিস্মিতান্ স্মিতমুখঃ স্বশিষ্যানিতি
প্রতি প্রকরণং প্রভুর্বিজয়তে শচীনন্দনঃ ॥ ৪ ॥

যাঁহার নয়ন-যুগলের বর্ণ ও আয়তন নব-বিকশিত কমল-দল-সদৃশ, সেই পদ্ম-পলাশ-লোচন শ্রীহরির 'পদ' সদা হৃদয়ে চিন্তা কর ও শীঘ্র সেই 'পদ' সাধনা কর, ব্যাকরণের 'পদ' সাধনা করিয়া কি ফল হইবে ?—এইরূপে যিনি হাস্যমুখে বিস্ময়াপন্ন শিষ্যদিগকে অধ্যয়ন করাইতেন, সেই শ্রীশচীনন্দন গৌরাঙ্গসুন্দর জয়যুক্ত হউন ॥ ৪ ॥

ক্ব যামি করবাণি কিং ক্ব নু ময়া হরির্লভ্যতাং
তমুদ্দিশতু কঃ সখে ! কথয় কঃ প্রপদ্যেত মাম্ ।

ইতি দ্রবতি ঘূর্ণতে কলিত-ভক্তকণ্ঠঃ শুচা
সম্মূর্চ্ছয়তি মাতরং বিজয়তে শচীনন্দনঃ ॥ ৫ ॥

"হে সখে! কোথায় যাইব? কি করি? কোথায় গেলে সেই হরিকে পাইব? কে আমাকে তাঁহার সন্ধান বলিয়া দিবে? কে বা আশ্রয় দিবে?"—এইরূপ বলিতে বলিতে যাঁহার চিত্ত দ্রবীভূত হইলে, যিনি ভূমি-লুণ্ঠিত হইতেন এবং যিনি কখনও বা শোক-ভরে ভক্তগণের কণ্ঠ ধারণ করিয়া মাতৃদেবীর সম্যক্ মোহ উৎপাদন করিতেন, সেই শ্রীশচীনন্দন জয়যুক্ত হউন ॥ ৫ ॥

স্মরার্ব্বুদ-দুরাপয়া তনু-রুচিচ্ছটাচ্ছায়য়া
তমঃ কলিতমঃ-কৃতং নিখিলমেব নির্ম্মূলয়ন্।
নৃণাং নয়ন-সৌভগং দিবিসদাং মুখৈস্তারয়ন্
লসন্নধিধরঃ প্রভুর্বিজয়তে শচীনন্দনঃ ॥ ৬ ॥

কোটি কোটি কন্দর্পেরও সুদুর্ল্লভ অঙ্গচ্ছটায় যিনি মানবগণের কলিযুগ-জনিত মলিনতাও অজ্ঞানান্ধকার সম্পূর্ণরূপে দূরীকৃত করিয়াছেন এবং অধর-মাধুর্য্যে যিনি দেবতাগণের নয়নানন্দ প্রদান করিয়াছেন, সেই সমুজ্জ্বল বিশ্বম্ভর শ্রীশচীনন্দন জয়যুক্ত হউন ॥ ৬ ॥

অয়ং কনক-ভূধরঃ প্রণয়-রত্নমুচ্চৈঃ কিরন্
কৃপাতুরতয়া ব্রজন্নভবদত্র বিশ্বম্ভরঃ।
যদক্ষি-পথ-সঞ্চরৎ সুরধুনী-প্রবাহৈর্নিজং
পরঞ্চ জগদার্দ্রয়ন্ বিজয়তে শচীনন্দনঃ ॥ ৭ ॥

এই যে সোণার পর্ব্বত শ্রীগৌরাঙ্গ অসীম করুণা প্রকাশপূর্ব্বক কোনও বিচার না করিয়া অকাতরে সর্ব্বসাধারণকে প্রেম-রত্ন বিতরণ করত নিখিল জগৎ পোষণ করিয়াছিলেন, এ নিমিত্ত যাঁহার নাম 'বিশ্বম্ভর' এবং যিনি নয়নপথ-নিঃসৃত গঙ্গা-প্রবাহদ্বারা আপনাকে ও অপরকে—এমন কি, সমস্ত জগৎকে নিমজ্জিত করিয়াছিলেন, সেই শ্রীশচীনন্দন শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু জয়যুক্ত হউন ॥ ৭ ॥

গতোঽস্মি মথুরাং সম প্রিয়তমা বিশাখা-সখী
গতা নু বত! কিং দশাং বদ কথং নু বেদানি তাম্।
ইতীব স নিজেচ্ছয়া ব্রজপতেঃ সুতঃ প্রাপিত-
স্তদীয়-রস-চর্ব্বণাং বিজয়তে শচীনন্দনঃ ॥ ৮ ॥

"আমি মথুরাপুরে আসিয়াছি, বল বল, আমার প্রিয়তমা বিশাখা এখন কি দশা প্রাপ্ত হইয়াছে? আহা! তাহা আমি কি-প্রকারে জানিতে পারিব?"—এইরূপে

যে ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বেচ্ছাক্রমে বিশাখা-বিষয়ক রসাস্বাদন প্রাপ্ত হইতেন, সেই শ্রীশচীনন্দন গৌরসুন্দর জয়যুক্ত হউন ॥ ৮ ॥

ইদং পঠতি যোঽষ্টকং গুণনিধে ! শচীনন্দন !
প্রভো ! তব পদাম্বুজে স্ফুরদমন্দ-বিশ্রম্ভবান্ ।
তমুজ্জ্বল-মতিং নিজ-প্রণয়রূপ-বর্গানুগং
বিধায় নিজ-ধামনি দ্রুতমুরীকরুষ্ব স্বয়ম্ ॥ ৯ ॥

হে গুণনিধে ! হে প্রভো ! হে শ্রীশচীনন্দন ! যিনি তোমার পাদপদ্মে প্রগাঢ় শ্রদ্ধাসহকারে এই অষ্টক পাঠ করেন, তুমি স্বয়ং সেই উজ্জ্বলচেতা ভাগ্যবান্ ব্যক্তিকে নিজ-প্রেম-পরিকরের অনুচর করিয়া তোমার স্বধামে স্থান প্রদান করিও ॥ ৯ ॥

প্রশ্নোত্তর

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৫শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৬ পৃষ্ঠার পর]

১৬। ব্রহ্ম-দর্শন, পরমাত্ম-দর্শন ও ভগবদ্-দর্শনে পার্থক্য কি ?

"ব্রহ্ম-দর্শন ও পরমাত্ম-দর্শন—সোপাধিক অর্থাৎ মায়িক উপাধির বিপরীতভাবে ব্রহ্ম-দর্শন এবং মায়িক উপাধির অন্বয়ভাবে পরমাত্ম-দর্শন হয়। কিন্তু নিরুপাধিক চিচ্চক্ষুদ্বারা বস্তু দর্শন করিলে একমাত্র চিন্ময় ভগবৎস্বরূপমাত্র লক্ষিত হয়।"

—শ্রীমঃ শিঃ ৪র্থ পঃ

১৭। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানের স্বরূপ কি ?

"নিঃশক্তি নির্ব্বিশেষ ভগবদ্ভাবই ব্রহ্ম এবং শক্তিমান্ সবিশেষ-ব্রহ্মই ভগবান্। অতএব ভগবান্ই স্বরূপতত্ত্ব, ব্রহ্ম কেবল তাঁহার স্বরূপের নির্ব্বিশেষ-আবির্ভাবরূপ জ্যোতিঃ এবং পরমাত্মাও তাঁহারই জগৎপ্রবিষ্ট অংশ ॥"

—শ্রীমঃ শিঃ ৪র্থ পঃ

১৮। অদ্বয়-তত্ত্ব কৃষ্ণে কোন্ সময় নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম-বিচার উপস্থিত হয় ?

"অনন্ত বৈভবযুক্ত কৃষ্ণ এক অদ্বয়তত্ত্ব। জ্ঞান-চর্চ্চায় ইচ্ছা ও শক্তিকে কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ করিলে সেই অদ্বয়তত্ত্বকে নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম বলিয়া লক্ষ্য হয়।"

—'নাম-মাহাত্ম্য-সূচনা', হঃ চিঃ

১৯। কৃষ্ণলীলার স্বরূপ কি ?

"কৃষ্ণ সে পুরুষ এক, নিত্য বৃন্দাবনে।
জীবগণ নারীবৃন্দ, রমে কৃষ্ণসনে ॥
সেই ত' আনন্দ-লীলা যা'র নাই অন্ত।
অতএব কৃষ্ণলীলা অখণ্ড-অনন্ত ॥"

—'সম্বন্ধ-বিজ্ঞান-লক্ষণ-উপলব্ধি' ১, কঃ কঃ

২০। কৃষ্ণের-স্বকীয় ও পারকীয় রসের বিচার কিরূপ ?

"কৃষ্ণের আত্মারামতা-ধর্ম্ম নিত্য হইলেও লীলারামতা-ধর্ম্মও তদ্রূপ নিত্য। বিরুদ্ধ-ধর্ম্ম-সামঞ্জস্যময় পরম পুরুষের পক্ষে ইহা স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কৃষ্ণতত্ত্বের এক কেন্দ্রে আত্মারামতা, তদ্বিপরীত কেন্দ্রে লীলারামতার পরাকাষ্ঠারূপ পারকীয়তা ॥"

—চৈঃ শিঃ ২য় খণ্ড ৭।৭

২১। আশ্রয় ও বিষয়-তত্ত্বের ইয়ত্তা কোন্ কোন্ তত্ত্ব ?

"শ্রীরাধিকার অনুরাগরূপে আশ্রয়-তত্ত্বের ইয়ত্তা, শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গাররূপে বিষয়-তত্ত্বের ইয়ত্তা।"　　—চৈঃ শিঃ ২য় খণ্ড ৭।৭

২২। কৃষ্ণের প্রকটাপ্রকট-লীলার স্বরূপ কি ?

"কৃষ্ণলীলা প্রকট ও অপ্রকট-ভেদে দ্বিবিধ। সাধারণ মানবের নয়ন-গোচর যে বৃন্দাবন-লীলা, তাহাই প্রকট-কৃষ্ণলীলা এবং যাহা চর্ম্মচক্ষে লক্ষিত হয় না, সেই কৃষ্ণলীলাই অপ্রকট-লীলা। গোলোকে অপ্রকট-লীলা সর্ব্বদা প্রকট এবং গোকুলে অপ্রকট-লীলা কৃষ্ণের ইচ্ছা হইলে প্রাপঞ্চিক চক্ষে প্রকট হন।"　　—ব্রঃ সং ৫।৩

২৩। 'মথুরা', 'বসুদেব', 'দেবকী', 'কংস', 'কংস কারাগার'—এ সকল তত্ত্বতঃ কি ?

"মহাপুণ্যভূমি ভারতবর্ষে, ব্রহ্মজ্ঞান-বিভাগরূপ মথুরায় বিশুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ বসুদেব জন্মগ্রহণ করিলেন। সাত্বতদিগের বংশসম্ভূত বসুদেব নাস্তিক্যরূপ কংসের মনোময়ী ভগিনী দেবকীকে বিবাহ করিলেন। ভোজাধম কংস ঐ দম্পতী হইতে ভগবদ্ভাবের উৎপত্তি আশঙ্কা করিয়া স্মৃতিরূপ কারাগারে তাহাদিগকে আবদ্ধ করিলেন ?"　　—কৃঃ সং ৪।১

২৪। দেবকীর ষট্‌পুত্র ও সপ্তম পুত্র বলদেব কি তত্ত্ব ? দেবকীনন্দনকে কংসভয়ে ব্রজে আনয়নের রহস্য কি ?

"সেই দম্পতীর যশঃ, কীর্ত্তি প্রভৃতি ছয়টী পুত্র ক্রমশঃ উৎপন্ন হয় ; কিন্তু ঈশ-বিরোধী কংস তাহাদিগকে বাল্যকালেই হনন করে। ভগবদাস্যভূষিত বিশুদ্ধ জীবতত্ত্ব বলদেব তাঁহাদের সপ্তম পুত্র। জ্ঞানাশ্রয়ময় চিত্তরূপ দেবকীতে শুদ্ধ জীব-

তত্ত্বের প্রথমোদয়, কিন্তু মাতুল কংসের দৌরাত্ম্য-কার্য্য আশঙ্কা করিয়া সেই তত্ত্ব ব্রজ-মন্দিরে গমন করিলেন। তিনি বিশ্বাসময় ধাম ব্রজপুরী প্রাপ্ত হইয়া শ্রদ্ধাময় চিত্ত রোহিণীর গর্ভে প্রবেশ করিলেন।" —কৃঃ সং ৪।৫-৮

২৫। কৃষ্ণলীলা কি নরচরিত্র হইতে গৃহীত কোন কল্পনা ?

"নির্ম্মল কৃষ্ণ-চরিত্র শ্রীব্যাসাদি সারগ্রাহী জনগণের সমাধিতে পরিদৃষ্ট হইয়াছে। জড়াশ্রিত মানব-চরিত্রের ন্যায় উহা ঐতিহাসিক নয় অর্থাৎ কোন দেশে বা কালে পরিচ্ছেন্নরূপে লক্ষিত হয় নাই ; অথবা নর-চরিত্র হইতে কোন কোন ঘটনা সংযোগ-পূর্ব্বক উহা কল্পিত হয় নাই।" —কৃঃ সং ৩।১৬

২৬। কৃষ্ণের সমস্ত লীলাই নিত্য কেন ?

"অধিকার-ভেদে কোন ভক্ত-হৃদয়ে এই মুহূর্ত্তে কৃষ্ণ-জন্ম হইতেছে, কোন ভক্ত-হৃদয়ে বস্ত্রহরণ, কোন হৃদয়ে মহারাস, কোন হৃদয়ে পূতনা-বধ, কোন হৃদয়ে কংস-বধ, কোন হৃদয়ে কুব্জা-প্রণয় এবং কোন হৃদয়ে ভক্তের জীবনত্যাগ-সময়ে অন্তর্দ্ধান হইতেছে। যেমত জীবসকল অনন্ত, তদ্রূপ জগৎসংখ্যাও অনন্ত ; একজগতে এক লীলা ও অন্য জগতে অন্য লীলা, এরূপ শশ্বদ্রূপে বর্ত্তমান আছেন। অতএব ভগবানের সমস্ত লীলাই নিত্য, কখনই লীলার বিরাম নাই, যেহেতু ভগবচ্ছক্তি সর্ব্বদাই ক্রিয়াবতী।" —কৃঃ সং ৭।১

২৭। বস্ত্রহরণ-লীলাটী কি ?

"যে-সকল ব্যক্তির কৃষ্ণদাস্যেচ্ছা অত্যন্ত বলবতী, তাঁহাদের স্বগত বা পরগত কিছুই গোপনীয় নাই। ভক্তদিগকে এই তত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্যই কৃষ্ণ গোপীদিগের বস্ত্র হরণ করিলেন।" —কৃঃ সং ৫।৩-৪

২৮। রাসাদি-লীলা কি অশ্লীল নহে ?

"চিদ্গত মহারাস-লীলায় কৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ এবং সমস্ত জীবই নারী। ইহার মূলতত্ত্ব এই যে, চিজ্জগতের সূর্য্যস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র একমাত্র ভোক্তা ও সমস্ত অণুচৈতন্যই ভোগ্য। প্রীতি-সূত্রে সমস্ত চিৎস্বরূপের বন্ধন সিদ্ধ হওয়ায় ভোগ্যতত্ত্বের স্ত্রীত্ব ও ভোক্তৃতত্ত্বের পুরুষত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। জড়দেহগত স্ত্রী-পুরুষত্ব, চিদ্গত ভোক্তা-ভোক্তৃত্বের অসৎ প্রতিফলন। সমস্ত অভিধান অন্বেষণ করিয়া এমত একটী বাক্য পাওয়া যাইবে না, যদ্দ্বারা চিৎস্বরূপদিগের পরমচৈতন্যের সহিত অপ্রাকৃত সংযোগ-লীলা সম্যক্ বর্ণিত হইতে পারে। এতন্নিবন্ধন মায়িক স্ত্রী-পুরুষের সংযোগ-সম্বন্ধিয় বাক্যসকল তদ্বিষয়ে সর্ব্বপ্রকারে সম্যক্ ব্যঞ্জক বলিয়া ব্যবহৃত হইল। ইহাতে অশ্লীল চিন্তার কোন প্রয়োজন বা আশঙ্কা নাই।"

—কৃঃ সং ৫।১৯

২৯। উগ্রসেন, কংস, কংস ভার্য্যা ও জরাসন্ধ কি তত্ত্ব ?

"নাস্তিক্যরূপ কংস বিগত হইলে তজ্জনক স্বাতন্ত্র্যরূপ উগ্রসেনকে শ্রীকৃষ্ণ রাজ-সিংহাসন অর্পণ করিলেন। অস্তি-প্রাপ্তি-নামা কংসের দুই ভার্য্যা কর্ম্মকাণ্ডস্বরূপ জরাসন্ধকে আপন-আপন বৈধব্যদশা নিবেদন করিলেন।" —কৃঃ সং ৫।২৫-২৬

(ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন—এই-গুলি আমাদের পরম প্রয়োজনীয় বিষয়। এই পাঁচের অল্প সঙ্গ হইতেই ভজনীয় বস্তুর অনুশীলন করিতে পারি। পাঁচের অল্প সঙ্গপ্রভাবে ভগবদ্বস্তুর সান্নিধ্য লাভ ঘটে। পাঁচের অল্পসঙ্গেই কৃষ্ণপ্রেম জন্মায়। ভাগবতকথা সুষ্ঠুভাবে আলোচনা আবশ্যক। শ্রীচৈতন্যের অকৃত্রিম দাসগণের ভাগবতের কথা ব্যতীত অন্য কথা নাই। ভাগবতের কথাই শ্রীচৈতন্যদেবের কথা। ভাগবত থেকে শ্রীচৈতন্যের কথায় কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা যাঁরা ভগবানের সেবায় নিযুক্ত, অন্যাভিলাষ-কর্ম্মজ্ঞানাদি চেষ্টা-হ'তে সম্পূর্ণ নির্ম্মুক্ত, ভাগবত তাঁ'দেরই আরাধ্য ; তাঁ'রাই ভাগবতের আরাধনা জানেন।

ভাগবতের নিকট ভাগবত আলোচনা ক'রতে হবে, ভাগবত বিরোধীর নিকট নয়। চব্বিশ ঘণ্টা যাঁ'রা ভাগবতসেবা করেন, প্রত্যেক কার্য্যই যাঁ'দের ভগবৎসেবা, যাঁরা চেতনদর্শনে মেপে নেওয়া ধর্ম্মকে নিরুদ্ধ ক'রেছেন, অচিৎপিণ্ড দর্শনে আবদ্ধ ন'ন, এমন চেতনবিগ্রহ বৈষ্ণবগণ—পূর্ণপ্রজ্ঞের অধীনগণ ভাগবত। অচেতনের মলিনতা হ'তে যাঁ'রা জ্ঞান সংগ্রহ করেন না, তাঁরাই ভাগবত সুষ্ঠুভাবে উপদেশ ক'রতে পারেন।

হরিভজনের কথা শুনিয়াও ইচ্ছাপূর্ব্বক ভোগ চালাইব ইহা পাষণ্ড ভোগীদিগের বিচার ; কিন্তু কোমলশ্রদ্ধ প্রবর্ত্ত বা সাধকের পক্ষে প্রথম প্রথম কিছু অনর্থ দৃষ্ট হইলেও তাঁহারা যে আপাত ইন্দ্রিয়তৃপ্তকর কার্য্যকেই নিত্যকর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করেন, বাস্তবিক তাহা নহে। ভগবান্ বলিতেছেন,—"আমার কথায় যাহাদের শ্রদ্ধা হইয়াছে, তাহাদের ঐ ইতর চেষ্টারূপ দ্যূতপানাদির সঙ্গটা

নিশ্চয়ই ক্রমে ক্রমে দূর হইয়া যাইবে।" যাঁহার হৃদয়ে কৃষ্ণ বাস করেন, তাঁহার অন্যসকল কামনা নষ্ট হইয়া যায়।

শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের পাদপদ্ম আশ্রয় করাই কর্ত্তব্য। তাঁহাদের নাম, ধাম ও কামের সেবা করাই কর্ত্তব্য। যাহারা গুরুবৈষ্ণবানুগত্য পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের দ্বারা প্রত্যক্ষবাদী হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা অধোক্ষজের সেবা করে না।

ভগবানের চরণে অকপট দৃঢ় শ্রদ্ধা-বিশ্বাসই প্রয়োজন। ভগবানের চরণে যাঁহাদের অকপট দৃঢ় শ্রদ্ধা-বিশ্বাস হইয়াছে, তাঁহাদের সেবা করা দরকার। আমরা কোন্ দিন মরিয়া যাইব, তাহার স্থিরতা নাই, অতএব আমাদের ক্ষুদ্র অনিত্য নশ্বর বস্তুর সেবা করিবার সময় নাই। মহতের পদরজে অভিষিক্ত হইতে না পারিলে অর্থাৎ তাঁহাদের ঐকান্তিক ভৃত্য হইতে না পারিলে কখনও জীবের নিস্তার নাই।

শ্রীকৃষ্ণের মন্দির—শ্রীসঙ্কর্ষণ-বলদেবের অভিন্নপ্রকাশ। জীবের হৃদয়ই ভগবানের মন্দির। ভগবানের ধাম ও মন্দিরাদি স্বয়ং প্রকাশতত্ত্বের সেবাকার্য্য। এই স্বয়ংপ্রকাশ হইলেন—নারায়ণের অংশী। যাঁহারা শ্রীমন্দিরকে বিষ্ণু মনে করেন, তাঁহারাই আস্তিক। মন্দির বিষ্ণু হইতে অভিন্ন হইলে তাহা ভাঙ্গা সম্ভব নহে। মন্দিরকে কেহ ভাঙ্গতে পারে না, ভাঙ্গে ভোগের বস্তু। শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহকে যাহারা প্রাকৃত মনে করে, তাহারা অজ্ঞ। দিব্যজ্ঞান লাভ না হইলে শ্রীবিগ্রহঅর্চ্চন ও শ্রীমন্দির-দর্শনাদি—কিছুই হয় না।

দৈব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৫শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৫ পৃষ্ঠার পর]

বিরাট্ পুরুষের মুখ হইতে বেদ এবং ব্রাহ্মণ সৃষ্ট হইলেন। ভগবদুন্মুখ ও বেদোন্মুখ বলিয়া ব্রাহ্মণ বর্ণসমূহের মধ্যে মুখ্য। তাঁহার বাহুযুগল হইতে পালন-রূপা বৃত্তি ও তদাশ্রিত ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হইয়া চৌরাদি উপদ্রব হইতে বর্ণসকলকে রক্ষা করিয়া থাকে। সেই বিভুর উরুদ্বয় হইতে জীব-জগতের জীবিকানির্ব্বাহার্থ ব্যবসায় এবং তদাশ্রিত বৈশ্যবর্ণ প্রাদুর্ভূত হইয়া জীব-জন্তুগণের জীবিকা সম্পাদন করে এবং পাদদ্বয় হইতে ধর্ম্মসিদ্ধির নিমিত্ত পরিচর্য্যা-বৃত্তি ও শূদ্রবর্ণ সৃষ্ট হয়।

পরিচর্য্যা, শুশ্রূষা বা সেবাবৃত্তি শূদ্রবর্ণীর জন্য নির্দ্দিষ্ট হইলেও ইহা সার্ব্ববর্ণিক।

কারণ ব্রাহ্মণাদি সর্ব্ববর্ণই যদি শ্রীহরির সেবা করেন, তবে সেবাবৃত্তিদ্বারা শ্রীহরিও পরিতুষ্ট হন। এইজন্য শাস্ত্রে সর্ব্বত্রই সেবাবৃত্তির মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। চারি বর্ণী স্ব-স্ব জীবিকার সহিত যে ভগবান্ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, আত্ম-বিশুদ্ধির জন্য শ্রদ্ধার সহিত স্বধর্ম্ম-পালনদ্বারা তাঁহারা পরমপিতা শ্রীহরির পূজা করিবেন—ইহাই শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্ম। যাহারা জগতের পিতা ঈশ্বরকে ভজন করে না, পরন্তু তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে, তাহারা স্থানভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়।

নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম বা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ভগবদ্ভজন করিতে করিতে অসিদ্ধাবস্থায় যদি ভজন হইতে ভ্রষ্ট বা মৃত্যু হয়, তথাপি কোনও অমঙ্গলের আশঙ্কা নাই। জ্ঞানহীন ব্যক্তিগণের ভক্তিশূন্য স্বধর্ম্ম পালনের দ্বারা কোনও প্রয়োজনসিদ্ধ হয় না। সেবাবৃত্তিই একমাত্র ভগবৎ প্রাপ্তির কারণ। ভগবদ্ভক্তি-শূন্য কর্ম্মজড়গণের নিমিত্তই (গীঃ ৩।২৬) "ন বুদ্ধিভেদং জনয়েৎ" শ্লোক উল্লিখিত হইয়াছে। অজ্ঞান কর্ম্মিগণকে জ্ঞানের উপদেশদ্বারা বুদ্ধিভেদ উৎপাদন করিতে নিষেধ করা হইয়াছে, কিন্তু ভগবৎ-ভাগবত-ধর্ম্ম বা সেবাধর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করিবার উপদেশ নিষিদ্ধ হয় নাই। শুশ্রূষা ব্যতীত কোন কর্ম্মেরই সিদ্ধি হয় না। শুশ্রূষা বা সেবা শূদ্রের বৃত্তি হইলেও বস্তুতঃ উহা সর্ব্ববর্ণেরই সাধারণ ধর্ম্ম। এই সেবাবৃত্তি জীবমাত্রেরই স্বাভাবিক ধর্ম্ম। ইহাদ্বারাই চারি বর্ণী হরিতোষণে সমর্থ হন।

ভগবদ্ভক্তি বা ভগবৎসেবা একই তাৎপর্য্যপর। শাস্ত্র বলেন,—"ভজ ইত্যেষ বৈ ধাতুঃ সেবায়াং পরিকীর্ত্তিতঃ।" সুতরাং সেবন-ধর্ম্মের অপর নাম 'ভজন'।

ভগবদ্দাস্যের গুরুত্ব ও মহিমা সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবত (মঃ ১৭।১০৫) বলেন,—

অল্প করি না মানিহ 'দাস' হেন নাম।
অল্প ভাগ্যে 'দাস' নাহি করে ভগবান্॥
এইমতে কৃষ্ণ মহারাজ-রাজেশ্বর।
কর্ত্তা-হর্ত্তা ব্রহ্ম-শিব যাঁহার কিঙ্কর॥" (চৈঃ ভাঃ মঃ ১৭।৯৪)

"স্বামিত্বং তু হরেরেব মুখ্যমন্যত্র ভৃত্যতা" (ভাঃ ৫।১০।১১ মধ্যভাষ্য), "তদ্বশা ইতরে সর্ব্বে শ্রীব্রহ্মেশ পুরঃসরাঃ" (ভাঃ ১১।২।৪৭ মধ্বভাষ্য), "সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ" (ভাঃ ২।৬।৩২) ইত্যাদি বাক্যে দেখা যায়, ব্রহ্ম-রুদ্রাদি দেবগণ সকলেই বিষ্ণুর আজ্ঞাবাহী ভৃত্য এবং এই দাসত্ব, সেবকত্ব ও ভৃত্যত্ব লাভের নিমিত্ত তাঁহাদের বহুতর স্তব-স্তুতি শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। সেবাপরায়ণ সুকৃতিশালী জীবই প্রকৃত ভজনপরায়ণ এবং তিনি ভগবদ্দাস্যে প্রতিষ্ঠিত। ভোগী

আধ্যক্ষিক জীব জড়-প্রভুত্ব কামনায় ভগবানের সেবায়ও বিমুখতা প্রদর্শন করে এবং উহা দাসবৃত্তির পরিচায়ক মনে করিয়া জড়ভোগে প্রমত্ত হয়। জড়ীয় চিন্তা-স্রোত হইতে মুক্ত না হইলে জীব ভগবদ্দাস্য লাভে সমর্থ হয় না। যিনি জাগতিক সর্ব্বপ্রকার লোভনীয় বিষয় হইতে পরিমুক্ত আত্মার নিত্যা বৃত্তিরূপ ভগবৎসেবা তাঁহার পক্ষেই সম্ভব। তাই "মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।" আত্মারাম মুনিগণও লীলাময় পুরুষোত্তমের আরাধনায় তৎপর হন। সুতরাং মুক্তির পরও সেবাধর্ম্মের নিত্যত্ব স্বীকৃত হইয়াছে।

সচ্চিদানন্দ বস্তুর সেবাই শুদ্ধ জীবাত্মার নিত্যবৃত্তি—অণুচৈতন্য জীব বিভু-চৈতন্যের দ্বারা নিত্যই আকৃষ্ট। শ্যামসুন্দর বিগ্রহই ভক্তের আরাধ্য ও প্রিয় বস্তু। সেই প্রিয়তম বস্তুর প্রিয় হইবার চেষ্টাকেই 'দাস্য' বলা হয়। যাঁহারা ভগবানের প্রিয়, তাঁহাদের অলভ্য কি? পার্থিব বস্তুর আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদের নিকট অকিঞ্চিৎকর। যাহারা ভগবানের অশেষ মহিমা জানিতে অসমর্থ, তাহারাই মায়ার দাসত্বে অবস্থিত হইয়া নিজদিগকে কৃতার্থ মনে করে। ভগবদ্ভক্ত ভগবানের সেবকত্ব বা দাসত্ব লাভ করিয়া সর্ব্বদা ইতর বস্তুর অসারতা উপলব্ধি করেন।

কৃষ্ণদাস্যভাবে যে চমৎকারিতা, তাহার সহিত কোটী-ব্রহ্মানন্দ-সুখেরও তুলনা হয় না। অপরাপর উন্নত মুখ্যরসেও দাস্যভাব মিশ্রিত আছে। তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃষ্ণদাস্যরসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনকল্পে (চৈঃ চঃ আঃ ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ) লিখিয়াছেন,—

কৃষ্ণদাস-অভিমানে যে আনন্দসিন্ধু। কোটী-ব্রহ্মসুখ নহে তার এক বিন্দু॥
পরমপ্রেয়সী লক্ষ্মী হৃদয়ে বসতি। তেঁহো দাস্যসুখ মাগে করিয়া মিনতি॥
দাস্যভাবে আনন্দিত পারিষদগণ। বিধি-ভব-নারদাদি-শুক-সনাতন॥
কৃষ্ণপ্রেমের এই এক অপূর্ব্ব প্রভাব। গুরু-সম-লঘুকে করায় দাস্যভাব॥
অন্যের কা কথা, ব্রজে নন্দ-মহাশয়। তাঁর সম 'গুরু' কৃষ্ণের আর কেহ নয়॥
শুদ্ধ বাৎসল্যে ঈশ্বর-জ্ঞান নাহি তাঁর। তাঁহাকেই প্রেমে করায় দাস্য-অনুকার॥
তেঁহো রতি মাগে কৃষ্ণের চরণে। তাঁহার শ্রীমুখবাণী তাহাতে প্রমাণে॥
শ্রীদামাদি ব্রজে যত সখার নিচয়। ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানহীন, কেবল-সখ্যময়॥
কৃষ্ণসঙ্গে যুদ্ধ করে, স্কন্ধে আরোহণ। তাঁরা দাস্যভাবে করে চরণ সেবন।
কৃষ্ণের প্রেয়সী ব্রজে যত গোপীগণ। যাঁর পদধূলি করে উদ্ধব প্রার্থন॥
যাঁ-সবারউপরে কৃষ্ণের প্রিয় নাহি আন। তাঁহারাও করে দাসী অভিমান।
তা-সবার কথা রহু, শ্রীমতী রাধিকা। সবা হৈতে সকলাংশে পরম-অধিকা॥
তেঁহো যাঁর দাসী হঞা সেবেন চরণ। যাঁর প্রেমগুণে কৃষ্ণ বদ্ধ অনুক্ষণ॥

দ্বারকাতে রুক্মিণ্যাদি যতেক মহিষী। তাঁহারাও আপনাকে মানে কৃষ্ণদাসী॥
আনের কি কথা, বলদেব মহাশয়। যাঁর ভাব—শুদ্ধসখ্য-বাৎসল্যাদিময়॥
তেঁহো আপনাকে করেন দাস-ভাবনা। কৃষ্ণদাস-ভাব বিনু আছে কোন্ জনা॥
সহস্র-বদনে যেঁহো শেষ-সঙ্কর্ষণ। দশ দেহ ধরি করে কৃষ্ণের সেবন॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে রুদ্র—সদাশিবের অংশ। গুণাবতার তেঁহো, সর্ব্বদেব-অবতংস॥
তেঁহো করেন কৃষ্ণের দাস্য প্রত্যাশ। নিরন্তর কহে শিব,—'মুঞি কৃষ্ণদাস'॥
কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত, বিহ্বল দিগম্বর। কৃষ্ণগুণ-লীলা গায়, নাচে নিরন্তর॥
পিতা-মাতা গুরু-সখা-ভাব কেনে নয়। কৃষ্ণপ্রেমের স্বভাবে দাস্যভাব সে করয়॥
এক কৃষ্ণ সর্ব্বসেব্য—জগৎ-ঈশ্বর। আর যত সব,—তাঁর সেবকানুচর॥

সুতরাং দেখা যাইতেছে, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য শূদ্র নিজ নিজ বর্ণধর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে পালন করিয়াও যদি কৃষ্ণভজন বা ভগবৎসেবা না করেন, তাহা হইলে তাহারা প্রাকৃত অভিমানবশে উচ্চতা লাভ করিয়াও অবশেষে পুণ্যক্ষয়ে অধঃপতিত হন। ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন ব্যতীত বিষয়ী বর্ণাভিমানীর কোনই মঙ্গল নাই। অতএব সেব্য-সেবক-সেবনধর্ম্ম নিত্য হওয়ায় সেবাধর্ম্ম চারি বর্ণীরই অবশ্য কৃত্য। গুরু-সেবা ও কৃষ্ণ-ভজনবলে বদ্ধজীব মায়াজাল হইতে মুক্ত হইয়া কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ করেন। ইহাই তাঁহার পক্ষে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মপালনের একমাত্র চরম লক্ষ্য—ইহাকেই ভাষান্তরে 'স্বরূপে অবস্থিতি' বলা হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ -ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র - এই চারি বর্ণী বর্ণধর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে পালন করিয়াও যদি ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনে বিমুখ হন, তবে সেবন-ধর্ম্ম হইতে চ্যুত হইয়া প্রাকৃতাভিমান-বশে আত্যন্তিক মঙ্গল-লাভের পরিবর্ত্তে বিবিধ দুর্দ্দশা বরণ করেন। সুতরাং ইঁহাদের ভগবদুপাসনাই একমাত্র ও শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য—ইহা প্রমাণিত হইতেছে।

কেবল ব্যবহারিক ও লৌকিক কাম্য-কর্ম্মাদিদ্বারা ইন্দ্রিয়তোষণ হয় মাত্র, পরন্তু ভগবদ্ভক্তিময় জীবন-যাপনই নিত্যধর্ম্মযাজীর মূল লক্ষ্য। বৃত্তি বা গুণগত-বিচারেই বর্ণ-চতুষ্টয় বিভাগ - ইহা সচ্ছাস্ত্র-অনুমোদিত।

"যদবৃত্ত্যা তুষ্যতে হরিঃ", "ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলম্", ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ", "ভক্ত্যা মামভিজানাতি" ইত্যাদি বাক্য হইতে জানা যায়—ভক্তিবৃত্তিদ্বারাই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক শ্রীহরি সন্তুষ্ট হন। সুতরাং ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-বিধান করিতে পারিলেই আমরা সকলে বাস্তব ব্রাহ্মণত্বে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি। সরলতা ও ভগবৎসেবাই চারিবর্ণীর মুখ্যধর্ম্ম, অপরাপর গুণগুলি গৌণ। তথাপি অহিংসা, অকাম, অলোভ, প্রাণীগণের প্রতি দয়া, সমদর্শী মহতের আশ্রয়গ্রহণ

এবং ভগবন্নাম-রূপ-গুণ-লীলা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিই উক্ত ভগবৎসেবা বা ভক্তিলাভের বিশেষ সহায়ক ও অপরিহার্য্য গুণমধ্যে পরিগণিত। তাই ভজন বা সেবাবিহীন অবস্থা চিন্তা করাই চরম নাস্তিকতা এবং ইহাই চারিবর্ণীর অধঃপাতজনক।—

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি' মজে॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২২। ৬)

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্‌ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥ (ভাঃ ১১।৫।৩)

অর্থাৎ এই চারি বর্ণাশ্রমীর মধ্যে যাঁহারা স্বীয় প্রভু ভগবান্ বিষ্ণুর ভজন না করিয়া, নিজ নিজ বর্ণাশ্রমাহঙ্কারে তাঁহার ভজনে অবজ্ঞা করেন, তাঁহারা স্বস্থান-ভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ভগবদুন্মুখতাই সরলতা বা ব্রাহ্মণতার মাপকাঠি। ইহার দ্বারা অপর বর্ণীও উত্তরোত্তর ঊর্দ্ধগতি লাভ করেন। আর ইহার ব্যত্যয় হইলে সকল বর্ণীই ভগবদ্বিমুখ হইয়া প্রাকৃত ভোগের আবাহন করেন এবং এইরূপে ভগবৎকৃপার অভাববশতঃ তাহারা স্ব-স্ব বৃত্তি পরিত্যাগ করেন।

ভগবদ্বিমুখ বর্ণীর অধঃপতন-বিষয়ে সর্ব্ববেদান্ত-সার শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—"ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যাদির দ্বিজত্ব-নিবন্ধন শ্রীহরির পাদপদ্মলাভের যোগ্যতা থাকিলেও বেদ-বর্ণিত অর্থবাদ-বচনে মোহিত হইয়া ভগবদুপাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গাদি কর্ম্মফলে আসক্ত হইয়া থাকেন। যথার্থ কর্ত্তব্য-বিষয়ে অনভিজ্ঞ, অবিনীত, মূর্খ অথচ পাণ্ডিত্যাভিমানগ্রস্ত মূঢ়গণ শ্রুতিমধুর পরোক্ষবাদরূপ বৈদিক স্বর্গাদি-সুখ-প্রতিপাদক বচনে উৎসুক হইয়া যজ্ঞাদিতে তাদৃশ কর্ম্মফলপ্রদ দেবতাগণের চাটুবাক্য অর্থাৎ প্রশংসাবাদ উচ্চারণ করিয়া থাকে। তাহারা রজোগুণের আধিক্য-নিবন্ধন হিংসা-বিষয়ে সঙ্কল্পযুক্ত, কামুক, সর্পতুল্য খলস্বভাব, দাম্ভিক, দুরভিমানগ্রস্ত এবং পাপাচার-রত হইয়া ভগবদ্ভক্তগণকে উপহাস করিয়া থাকে এবং কামিনীসেবায় রত হইয়া মিথুন-সুখযুক্ত গৃহে অবস্থানপূর্ব্বক পরস্পর গৃহবার্ত্তার আলোচনা, অন্নাদি-দানরহিত দক্ষিণাশূন্য অবিধিপূর্ব্বক যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও হিংসা-দ্বেষ-বিষয়ে অনভিজ্ঞ হইয়া কেবলমাত্র নিজের জীবিকা-নির্ব্বাহ-কামনায় পশুগণের বিনাশসাধন করিয়া থাকে। তাদৃশ ক্রূরচিত্ত পুরুষগণ ধন-সম্পত্তি, ঐশ্বর্য্য, বিদ্যা, সৎকুল, দান, রূপ, দেহবল এবং যজ্ঞাদি ক্রিয়াজনিত গর্ব্বহেতু বিবেক-বুদ্ধি-রহিত হইয়া জগদীশ্বর শ্রীহরি ও তদীয় ভক্ত সাধুগণের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া থাকে। তাহারা নিখিল প্রাণিগণের মধ্যে নিরন্তর বর্ত্তমান এবং শ্রুতিগণ-কীর্ত্তিত পরম প্রেমাস্পদ

জগদীশ্বরের কথা শ্রবণ করিয়াও জানিতে চেষ্টা করে না। ঐ অবুধগণ নিজ নিজ মনোরথজাত গ্রাম্য বিষয়াদির কথা-প্রসঙ্গেই কাল অতিবাহিত করিয়া থাকে। যে-ধর্ম্ম হইতে বিজ্ঞান ও মোক্ষসাধক জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাদৃশ ধর্ম্মকৃত্য-সম্পাদনোপযোগী ধনকে তাহারা কেবলমাত্র আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তি-সাধনের জন্যই ব্যবহার করে, কিন্তু দুরন্তবীর্য্য মৃত্যুর কথা চিন্তা করে না। স্ত্রীসঙ্গ, আমিষভক্ষণ এবং মদ্যপান-স্পৃহা সংযত করিবার জন্যই এবং উহা হইতে ক্রমশঃ নিবৃত্তির উদ্দেশ্যেই স্ত্রীসঙ্গ, যজ্ঞদ্বারা আমিষভক্ষণ ও মদ্যপানের আপাতত ব্যবস্থা শাস্ত্রে কোথাও কোথাও প্রদত্ত হইয়াছে মনে হইলেও শাস্ত্রে মদ্যের ঘ্রাণরূপ ভক্ষণই বিহিত হইয়াছে, পান বিহিত হয় নাই। যথেচ্ছ পশুহিংসার পরিবর্ত্তে যজ্ঞে পশুব্যবহার (যাহাকে জীবন দেওয়া যায়) এবং ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির পরিবর্ত্তে কেবলমাত্র সুসন্তানলাভের জন্যই মৈথুন বিহিত হইয়াছে—কিন্তু মনোরথ-বাদিগণ এবম্বিধ বিশুদ্ধ স্বধর্ম্ম অবগত হয় না। ঈদৃশ ধর্ম্মতত্ত্বানভিজ্ঞ সেইসকল অবিনীত, সাধুত্বাভিমানী দুর্জ্জন নিঃশঙ্কচিত্তে পশুহিংসা করে এবং পরলোকে নিহত পশুগণ তাহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। পুত্র-কলত্রাদিযুক্ত শবতুল্য নিজদেহে অত্যাসক্ত সেই সকল মানবগণ পরদেহস্থিত জীবাত্মার প্রতি হিংসাবশতঃ পরমাত্মরূপী জগদীশ্বর শ্রীহরির প্রতিই বিদ্বেষ করিয়া থাকে। ইহারা কখনই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে না। জাড্য-ভাবগ্রস্ত, ত্রিবর্গাসক্ত, ক্ষণকাল বিশ্রামরহিত এইসকল পুরুষগণ নিজ আত্মাকেই বিনাশ করে। এই সমস্ত আত্ম-বঞ্চক, অশান্তচিত্ত ব্যক্তিগণ নিজেন্দ্রিয়তর্পণপর অসৎ কর্ম্ম-জ্ঞানকেই ভক্তি-সাধনের উপযোগী মনে করিয়া তত্তৎ ক্রিয়া আচরণপূর্ব্বক পরিণামে বিফল-মনোরথ হইয়া পড়ে। এইরূপে ভগবদ্বিমুখ মানবগণ নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও অন্তিমকালে ভগবন্মায়া-রচিত গৃহ, পুত্র, বান্ধব, স্ত্রী প্রভৃতিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক নরকে প্রবেশ করিয়া অশেষ দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে।" ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

যাঁহারা চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালন না করিয়া, কেবলমাত্র 'উর্জ্জাদর' করিয়া থাকেন, তাঁহারা চাতুর্ম্মাস্যের ভক্তিফল সম্পূর্ণরূপে লাভ করিতে পারেন না। ইহার দ্বারা চাতুর্ম্মাস্যের প্রতি অনাদরই প্রকাশ পায়।"

—শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

গৌরজন্ম-যাত্রা

হেরিলাম জন্মোৎসব দেবানন্দ মঠে।
অগণিত সমাগত ভকতের হাটে॥
ধনী-মানী, জ্ঞানী-গুণী, মূরখ-নির্ধন।
বঙ্গবাসী, ঔড্রদেশী, যবন, খ্রীশ্চান॥
আসাম, বিহার, পূর্ব্ব পশ্চিমের বঙ্গ।
উড়িষ্যা, উত্তর দেশ, দাক্ষিণাত্য অন্ধ্র॥
মারোয়ার গুজরাট কেরল কর্ণাট।
মহারাষ্ট্র, মধ্যদেশ নাহি কেহ বাদ॥
স্ত্রী-বৃদ্ধ-বালক-যতি গৃহী ব্রহ্মচারী।
চণ্ডাল ব্রাহ্মণ আর কত দেশান্তরী॥
সুবেশ কুবেশ আর বেদন্ত সুকান্ত।
সকলেই একভাবে মহান্ একান্ত॥
ভেদাভেদজ্ঞানহীন এক মন-প্রাণ।
পরস্পর প্রেমময় অদান-প্রদান॥
গৌর বলি বাহু তুলি উন্মত্ত প্রায়।
গৌর-নামে নেত্র হ'তে অশ্রু বহি' যায়॥
অদ্ভুত অনিন্দ্য মহা জাতপাতহীন।
প্রেমময় একাকার নহে চিন্তাধীন॥
মায়িক নির্ভেদ আর প্রেমে একাকার।
কভু নহে এক বস্তু, বিভেদ অপার॥
গৌর-প্রেমে সাম্য আর জাতপাতহীন।
বিজ্ঞে নাহি এক বলে, বলে অর্ব্বাচীন॥
ধন্য ধন্য সাধুসঙ্গ ধন্য সাধুবৃন্দ।
অধমে উত্তম করি দেয় প্রেমানন্দ॥
এমত কল্যাণপ্রদ আর কেহ নাই।
ভকতচরণ সদা ভজহ হিয়ায়॥

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

শিক্ষার স্বরূপ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৫শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২৫ পৃষ্ঠার পর]

পুরাকালে হিরণ্যকশিপু-নামক রাজা বিভিন্ন শাস্ত্রে তথাকথিত সুপণ্ডিত বা শিক্ষিত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত শিক্ষা ভগবদ্বহির্ম্মুখী বা Negative দিকে প্রবাহিত ছিল। তজ্জন্য তাঁহার পুত্র ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদ যখন সৎশিক্ষায় শিক্ষিত হইতেছিলেন, তখন তিনি তাঁহার চরম বিরোধিতা করেন এবং অবশেষে তদুপযুক্ত গতিলাভ করেন। শাস্ত্রে এইমত রাবণাদি অজস্র কুশিক্ষায় সু-শিক্ষিত কুপণ্ডিতের পরিচয় পাওয়া যায়।

সুশিক্ষা নিত্যকাল নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত। অনুরূপভাবে কুশিক্ষাও ইহার মল বা ছায়ারূপে যুগপৎ বিদ্যমান। যুগভেদে ইহা কখনও অনুকূল, কখনও প্রতিকূল বাত্যাবরণে পড়িয়াছে। সেই যুগে এই সুশিক্ষার অনুকূল আবহাওয়া ছিল, সেজন্য কুশিক্ষা বহুদিন যাবৎ বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই, অঙ্কুরোদ্গমকালেই বারে বারে ধ্বংস হইয়াছে।

অধুনা 'অনুকূল-বাতাসে' কুশিক্ষার পালে হাওয়া লাগিয়াছে। তাই এযুগে মানুষকে ভগবান্ এবং ভগবানকে মানুষ বানাইবার অপচেষ্টা বা অপকৌশল ব্যাপকভাবে প্রসারলাভ করিয়াছে। ইহারা কলিযুগ-পাবনাবতারী ঔদার্য্য-বিগ্রহ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে মানুষ বলিয়া অপপ্রচারের অপপ্রয়াস করিতেছে এবং তাহাতেই মাননীয় সরকারবাহাদুরের নিকট হইতে অনায়াসে বড় বড় খেতাব পাইতেছে।

ইহারা বলেন, —"শ্রীমন্মহাপ্রভুকে কিছু লোক অথবা কিছু পাণ্ডা পিটাইয়া মারিয়া ফেলিয়াছে, অবশেষে তাঁহাকে মাটিতে পুঁতিয়া ফেলিয়াছে অথবা সমুদ্রে ভাসাইয়া দিয়াছে। সেদিন প্রসঙ্গক্রমে এক তথাকথিত শিক্ষিতাভিমানী ভদ্রলোককে (?) আমি প্রশ্ন করিলাম,—মহাশয়! আপনি এই অমূল্য-তথ্য (!) কোথায় পাইলেন? তিনি সগর্ব্বে উত্তর দিলেন,—"কেন? অমুক Ph. D. Research করেছেন, তিনি একথা বলেছেন। আমি বলিলাম,—মহাশয়! তিনি কিসের উপর ভিত্তি করিয়া এই গবেষণা চালাইয়াছেন? তিনি বলিলেন,—কেন, তিনি চৈতন্য-জীবনীগ্রন্থ হইতে গবেষণা করিয়া এই তথ্য পাইয়াছেন। আমি বলিলাম,—কোন্ গ্রন্থ হইতে জানেন কি? তিনি বলিলেন,—তাহা জানি না; তবে তিনি গবেষণা

করিয়া যাহা বাহির করিয়াছেন এবং খেতাব পাইয়াছেন, তাহা অনেকেই মানেন এবং আমিও মানি।

আমি বিনীতভাবে বলিলাম,—মহাশয়! আমাদের কোন কিছু লইয়া গবেষণা করিতে হইলে, সেই বিষয়ে পূর্ব্বসূরীদিগের অনেক প্রামাণ্য গ্রন্থ লইয়া আলোচনা করিতে হয়। যে সর্ব্বজনস্বীকৃত অবিসংবাদিত গ্রন্থ হইতে অজস্র প্রমাণ নিদর্শন-স্বরূপ বাহির করিয়া আমাদের ধারণা বা অনুমানকে যুক্তিগ্রাহ্য করিয়া তুলি, তাহাকে 'প্রামাণ্য গ্রন্থ' বলে। গবেষণার ক্ষেত্রে এই প্রামাণ্য গ্রন্থের উপর একমাত্র নির্ভর করা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই। যদি কেহ তাহাকে অস্বীকার বা লঙ্ঘন করিবার স্পর্দ্ধা দেখান, তবে তিনি পাগল, বাচাল, প্রগলভ বলিয়া কথিত হন। আমাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর Hegiography সম্বন্ধে "শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত" এবং "শ্রীচৈতন্যভাগবত" যথাক্রমে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এবং শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের দুইখানি গ্রন্থই সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বজনস্বীকৃত, সর্ব্বাধিক প্রামাণ্য গ্রন্থ, ইহাতে কোন সংশয় নাই এবং ইহার কুত্রাপিও অনুরূপ স্বকপোলকল্পিত ভ্রান্ত ধারণার আভাসমাত্রও দৃষ্ট হয় না। তবে আপনার Doctorate মহাশয় কি মহাপ্রভুকে ঠেঙ্গাইয়া মারিয়া ভাসাইয়া বা পুঁতিয়া দিবার সময় সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন? নাকি নিজেই পাণ্ডা সাজিয়াছিলেন? কারণ আপনি একটু আগেই আমাকে বলিয়াছিলেন,—"রামায়ণের রামচন্দ্রের বস্তুতঃ কোন অস্তিত্বই নাই। কারণ যাহাকে দেখি নাই তাহাকে আমরা অন্ততঃ কিছুতেই বিশ্বাস করিব না। ইহা একটী নিছক গল্পবিশেষ।" অনুরূপভাবে আমাদের নিজ পিতৃপুরুষগণও একটী নিছক গল্পবিশেষ নিশ্চয়। এইবার ভদ্রলোক একেবারে দমিয়া গেলেন।

এইভাবে কুশিক্ষার প্রভাবে শ্রীভগবানের বিরোধিতা করিয়া Sophistismএর প্রভাবে ইহারা কুতর্ক উত্থাপন করিয়া অবশেষে সামঞ্জস্য করিতে না পারিয়া নিজেদের মূর্খতা, অজ্ঞতাকে ঢাকিবার অছিলায় নির্লজ্জের মত গোঁজামিল, গোঁয়ার্ত্তুমি ও মিথ্যার আশ্রয় করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। যেন শ্রীভগবানের বিরোধিতা করিতেই হইবে, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়া আছেন। ফলতঃ এই Positive দিক্‌টি জানিবার আদৌ তাহাদের আগ্রহ বা অবকাশ নাই। এই-ভাবে ইহারা নিজেরা নিজকে এবং সাধারণ মানুষকেও বিভ্রান্ত করিতেছেন।

এই কুশিক্ষা নিজেদের কুমতের পক্ষে টানিয়া রামায়ণ, মহাভারত, গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রসমূহকে আবার নির্লজ্জের মত দাঁড় করাইতে কুণ্ঠা বোধ করেন না। আবার কখনও সেইসমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থ সম্বন্ধেই Research এর প্রহসন চালান। সেই গ্রন্থের

গবেষণাই যে সেই গ্রন্থ বা শাস্ত্রকে স্বীকার করিয়া লওয়া, এই সামান্যতম বুদ্ধিটুকুও এইসমস্ত মহা-পণ্ডিত-মূর্খদের নিরেট মস্তিষ্কে প্রবেশ করে না। ইহারা যেন শুধুমাত্র শাস্ত্রাদির বিরোধিতা করিতেই সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছেন। ইহারা নিজেদের পিতা, পিতামহদেরও অস্বীকার করিয়া নিজেই নিজের পিতা বলিয়া তর্কের খাতিরে প্রলাপ বকিতে বা পরিচয় দিতে লজ্জিত হন না। নাস্তিকতা যেন বর্ত্তমান শিক্ষা-জগতের একটা Fashion হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বড় বেদনার সহিত আজ এই সত্যটি বলিতে হইতেছে যে, এই সমস্ত তথাকথিত শিক্ষিতরা প্রকৃত শিক্ষিত সমাজের কলঙ্ক-স্বরূপ।

যে শিক্ষায় প্রকৃত শিক্ষিতের পরিচয়, যে শিক্ষায় একমাত্র মঙ্গল ও পরাশান্তি, যে শিক্ষা নিত্য সনাতন, চিরন্তন, তাহাকে মানিয়া লইলেই সমস্ত গণ্ডগোল মিটিয়া যায়। অন্যথায় যত গোলোযোগ হাঙ্গামা ও লোকহানিকর বিধর্ম্ম এবং অপসম্প্রদায়ের উৎপাত ও উপদ্রব আসিয়া উপস্থিত হইবে ও হইতেছে। সুশিক্ষার শ্রেষ্ঠতম ও সহজতম পথ দর্শাইবার জন্যই স্বয়ং ভগবান্ তাঁহার নিজস্বরূপে দ্বাপর ও কলির মিলিত এক ক্রান্তিক্ষণে শ্রীকৃষ্ণরূপে এবং পঞ্চশতাব্দী বর্ষ পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুরূপে কৃপাপূর্ব্বক জগতে প্রকটিত হইয়া "আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়" যে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, সেই শিক্ষাই প্রকৃত এবং একমাত্র মঙ্গলদায়ক। সেই শিক্ষাই সনাতন শিক্ষা, যাহা বর্ত্তমানে শ্রীগৌড়ীয়-ধারায় প্রকাশিত এবং প্রচারিত হইতেছে।

শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুই দেখাইয়া গিয়াছেন, নাস্তিক বর্ণবৈষম্য দূর করিয়া ধর্ম্ম-নিরপেক্ষতা কাহাকে বলে? ধর্ম্মনিরপেক্ষতার ধুয়া তুলিয়া গায়ের জোরে সদাচারীকে টানিয়া কদাচারীর সহিত অখাদ্য-কুখাদ্য খাওয়াইলেই কিংবা কদাচারীকে জোর করিয়া সদাচারীর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলেই মহা উদার ধর্ম্মনিরপেক্ষ নেতা সাজা হইল, বস্তুতঃ তাহা নহে। একই নীতি-আদর্শ যাহা সনাতন, যাহা নিত্য মঙ্গলপ্রদ, তাহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইলেই আর অমঙ্গলের আশঙ্কা নাই, ধর্ম্মের বা Secularismএর ধ্বজা ধরিয়া উৎপাত ও তথাকথিত সাম্প্রদায়িকতারও অবকাশ নাই। সেখানে অস্পৃশ্য নীচজাতি, উচ্চজাতির বালাই নাই, শুধু একটাই পরিচয় ;—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিল-পরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাস-দাসানুদাসঃ॥

শ্রীগীতায় বর্ণ এবং আশ্রম বিভাগের কথা বলা আছে—"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ-কর্ম্ম-বিভাগশঃ।" তাহাদের বর্ণ এবং তদনুসারে কর্ম্মেরও যথাযথ ব্যবস্থা দেওয়া আছে। যেরকম একটী officeএ বিভিন্ন যোগ্যতানুসারে কর্ম্মের শ্রেণীবিভাগ করা হয়। কিন্তু যখন সমানাধিকারের প্রলাপ বকিয়া একজন Bankএর Manager কে কোন বেয়ারার কাজে এবং কোন বেয়ারাকে Manager এর পদে বসাইয়া দেওয়া "চিরদিন সমান থাকে না"—এই বিপ্লবের বাণী শুনাইয়া; তাহাতে আর যাহাই হউক, কিছু মূর্খের সস্তা হাততালি মিলিবে, কিন্তু দেশের যে কি করুণ অবস্থা হইবে, তাহা সূক্ষ্ম মস্তিষ্কের সকল মানুষই অনুধাবন করিতে পারিবেন।

বর্ত্তমানে অসাম্প্রদায়িক উদার মানবতাবাদের নেতা সাজিবার লোভে কোন কোন জননেতা ধর্ম্মস্থান এবং ধর্ম্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনার মূল-দায়িত্বে নাকি 'হরিজন'-নামক এক তথাকথিত সম্প্রদায়কে বসাইবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহার জন্য তাঁহারা শুধুমাত্র দলিত 'হরিজন' ইহাই তাহাদের যোগ্যতা বলিয়া দাবী করেন। কিন্তু এই সমস্ত পদের জন্য যে কতটা সাধনা, দায়িত্ব সচেতনতা, কর্ত্তব্যতৎপরতা এবং পাণ্ডিত্যের সাথে ভালবাসা মিশ্রিত হইলে তবেই এই পদের অধিকারী হওয়া সম্ভব এবং এইসমস্ত পদের জন্য উমেদারী করিতে হয় না। মানুষের হৃদয়ের কত উচ্চাসনে এই সমস্ত আসন অধিষ্ঠিত, তাহা এই সমস্ত নাস্তিক পাষণ্ডদের নিরেট মস্তিষ্কে প্রবেশ করে না। ইহারা নিজেদের বিচারে নিজেদেরই মত করিয়া সমস্ত বিষয়কেই লঘু করিয়া দেখে। অবশেষে সকলের চরম সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনে। কিন্তু যাহার যা অধিকার ও যোগ্যতা সেই বিচারে কর্ম্ম করিলে কোন হাঙ্গামা বাধে না। আজ দেশের যে-সমস্ত অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিয়া চলিতেছে, একটু ধীরস্থির ভাবে চাহিলেই দেখা যাইবে যে, সেই কারণের মূল কিন্তু এই সমস্ত কুশিক্ষা। যাহা আজ সমস্ত অফিস, আদালত, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান-গুলিতে সর্ব্বত্র দাপট দেখাইয়া সমস্ত শুভ সচেতনতাকে গ্রাস করিতেছে। ইহা যে কি পরিতাপের বিষয়, তাহা বুঝিয়া সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সৎ ও বিবেকবান্ মানুষ-মাত্রই মর্ম্মাহত হইতেছেন এবং একান্ত অসহায় বোধ করিয়া নিপীড়িত ও নিগৃহীত হইতেছেন।

পৃথিবীতে প্রধানতঃ দুই ধরণের লোক আছেন। এক দল পণ্ডিত, অপর দল অপণ্ডিত; একদল শিক্ষক, অপরদল শিক্ষানবীশ। যাঁহারা শিক্ষক বা পণ্ডিত তাহাদের জন্য বিধি-নিষেধ নহে, কিন্তু যাহারা অপণ্ডিত—শিক্ষানবীশ, তাহাদের জন্যই যত বিধি-নিষেধ। কারণ তাহারা কোনটি ভাল ও কোনটি মন্দ, এই

বিচার করিয়া চলিতে পারেন না। সেইজন্য শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ মানিয়া উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করাই তাহাদের পক্ষে এবং জগতের পক্ষেও মঙ্গলজনক।

অপণ্ডিতের ভাগই সাধারণভাবেই জগতে বেশী। ফলতঃ শিক্ষকের সংখ্যা খুবই সীমিত ; অথচ কার্য্যকালে দেখা যায়, সকলেই প্রায় শিক্ষক সাজিতে চায়। অধিকার এবং যোগ্যতা-অনুসারে মোটামুটিভাবে কর্ম্মবীর, জ্ঞানবীর এবং যোগ-বীরগণকে যথাক্রমে কর্ম্মী, জ্ঞানী এবং যোগীদিগের শিক্ষক হিসাবে নিরূপিত করা হয়। ইহারা আবার মুখ্য এবং গৌণহিসাবে দ্বিবিধ। সকাম কর্ম্মী অর্থাৎ জাগতিক যাবতীয় অনিত্য ব্যাপারে যাহারা লিপ্ত, তাহারা সকাম কর্ম্মী, ইহারা গৌণ অনিত্য শিক্ষায় ব্যাপৃত এবং এই শিক্ষাও বহুধা বিভক্ত। নির্ব্বিশেষ জ্ঞানিগণ শুষ্ক-বৈরাগ্যে এবং ব্রহ্মনির্ব্বাণের জন্য যাহারা ব্যাকুল তাহারা গৌণ জ্ঞানচর্চ্চায় ব্যস্ত ; এবং অষ্টাঙ্গ-যোগচর্চ্চায় ফল্গুবৈরাগ্যে অণিমা-লঘিমাদি বিভূতিলাভে যাহারা উৎসুক, তাহারা গৌণ যোগী। ইহারা কেহই ভক্ত নহেন, ফলতঃ সঠিক শিক্ষা কি তাহা কদাচ নিরূপণ করিতে সমর্থ হন না।

যাঁহারা 'যজ্ঞার্থাৎ' অর্থাৎ বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে সমস্ত রকম ফলাশা নির্ম্মূল করত নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করেন, তাঁহারা মুখ্য কর্ম্মী। ইহাদেরই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় বা অধিকার হয়। অতঃপর উন্নততর শিক্ষকের সংস্পর্শে আত্মশোধনপূর্ব্বক ইহারা ভক্ত হন।

—শ্রীবীরভদ্র দাস ব্রহ্মচারী

উজ্জীবিত ভাবনা ঃ অমৃতত্বের পথ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৫শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২৭ পৃষ্ঠার পর]

সহায়-সম্বলহীন হয়ে নিঃসঙ্গ হবার সব-সম্ভাবনা বর্ত্তমান—বিপদে বন্ধুত্ব শিথিল হয়ে যায়, আত্মীয়তা গা বাঁচিয়ে আপনজন সময় করে উঠতে পারে না। কিন্তু ঈশ্বর? তিনি ঠিক পাশে থাকেন, তাঁর অকৃপণ করুণা হতে বঞ্চিত হবার কোন আশঙ্কা নেই। শুধু তাঁকে চাইতে হবে আপনার বলে। চাওয়ার মত চাইতে জানলে শূন্য হাতে তিনি কাউকেই ফিরান না। তাই মুনি-ঋষি, সাধু-সন্ন্যাসী, ভক্ত-ভাগবত নির্ব্বিকল্প কণ্ঠে ঈশ্বর-ভাবনাকে শ্রেষ্ঠ-

ভাবনা বলে চিহ্নিত করে গেছেন। জগতে ঈশ্বরই একমাত্র আপন, আর সব পর। সেই আপনজনকে চিনবার কথা, তাঁর সঙ্গে নিত্যকালের সম্বন্ধের কথা শাস্ত্রই বলে গেছেন। আর বলেছেন আমাদের আর্য্য-ঋষিবর্গ। আর বলেছেন পরম্পরাসূত্রে আমাদের গুরু-আচার্য্যবর্গ। কাজেই ঈশ্বর ভাবনা সমস্ত রকম ভাবনার ঊর্দ্ধে, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাবনা। ঈশ্বর ভাবনাই জগতে "পুনঃ পুনঃ গতাগতি" স্তব্ধ করে দিতে পারে। ঈশ্বর নিত্যবস্তু, সেই নিত্যবস্তুর সঙ্গে নিত্যকালীন সম্বন্ধ-ভাবনাই নিত্যস্বরূপ জীবের নিত্যকালীন কর্ত্তব্য।

শাস্ত্র বলেছেন ঃ—ঈশ্বর প্রেমময়, ঈশ্বর করুণাময়। তাঁর প্রেম, তাঁর করুণা, তাঁর ভালবাসা, তাঁর দয়া জীবের জন্য স্বতোৎসারিত। তাই জীবের মধ্যে সেই প্রবণতাগুলোর প্রকাশ লক্ষণীয় হয়ে পড়ে। জগতের সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে প্রেম আছে। আধার ভেদে কোথাও কোথাও তার তারতম্য দেখা যায় মাত্র। কিন্তু প্রেম প্রেমই। তাই যা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বর্ত্তমান, প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে বর্ত্তমান তার নাম যদি প্রেম হয়, তা' আস্বাদনের বৈচিত্র্যে পিতার প্রতি সন্তানের প্রেমের বা সন্তানের প্রতি পিতার প্রেমের পর্য্যায়ে পড়ে না। গুণগত বৈশিষ্ট্যে তা বাৎসল্য-প্রেম নামে অভিহিত হয়ে থাকে। ভ্রাতার প্রতি ভ্রাতার প্রেম, ভ্রাতার প্রতি ভগ্নীর বা ভগ্নীর প্রতি ভ্রাতার প্রেম স্নেহ নাম ধারণ করে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। জগতের সব প্রাণীর মধ্যে স্বজাতীয় বা বিজাতীয় ভাবে হলেও ভালবাসা বর্ত্তমান। প্রেম বা ভালবাসা কেবল আধার ভেদে রূপান্তরিত হচ্ছে মাত্র। সকলের অন্তরে ভালবাসার অস্তিত্ব থাকার দরুণ আমরা পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে থাকি। ব্যতিক্রম বা বিরল দৃষ্টান্তের কথা ছেড়ে দিলে আমরা অসংশয়িতচিত্তে বলতে পারি—ভালবাসার এই মিলন-মেলায় আজ বিপর্য্যয় এসেছে। কারণ সেখানে এসেছে সংশয়, সন্দেহ এবং অবিশ্বাস। ভালবাসা বা প্রেম পদে পদে তাই বিপর্য্যস্ত হচ্ছে, নৈরাশ্য আমাদিগকে আচ্ছাদিত করে রাখছে। এর কারণ কি? কারণ সমস্ত প্রেমের যিনি আকর বা আধার, তাঁকে আমরা ভালবাসতে ভুলে গেছি। ভগবানকে ভুলে থাকাটাই আজ আমাদের জীবনে অভিশাপ হয়ে দেখা দিয়েছে। সকলকে ভালবাসতে জগতের সব ধর্ম্মই নির্দ্দেশ দিয়েছেন। এমন কি, ব্যবহারিক জগতের কবিও সেই কথারই প্রতিধ্বনি করে কম্বুকণ্ঠে বলে গেছেন ঃ—

তারা বলে গেল ঃ ভালবাসো
অন্তর হতে বিদ্বেষ-বিষ নাশো। —রবীন্দ্রনাথ

জীবকোটি ঈশ্বরকোটির অংশভূত, তাই তার মধ্যে ঈশ্বরের প্রেমের সামান্যতম

অভিব্যক্তি হলেও তা' লক্ষণীয়। যে প্রেম শ্রীরাধারাণীতে পরিলক্ষিত, যে প্রেম শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃষ্ণার্ত্তিতে প্রকট, তা' কোন অবস্থাতেই সাধারণ নরনারীর ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। তবুও মহৎ বস্তুর অনুকরণ বা অনুসরণ জীবনকে মহত্ত্বে ভূষিত করবার পক্ষে শ্রেষ্ঠ উপায়ন। এবং পর্য্যায় অতিক্রম-অভিলাষী মানুষ তা' না করে পারেন না। তাই ভঙ্গুর, অনিত্য জাগতিক সম্বন্ধকে বুদ্ধিমান্ এবং সুকৃতিসম্পন্ন মানুষ কখনই বহুমানন করতে পারেন না। তিনি নিত্যবস্তু ঈশ্বরতত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত হবার বা সম্বন্ধ রচনায় যত্নশীল এবং প্রয়াসী হন। কারণ তাই হল জীবশ্রেষ্ঠের উজ্জীবিত ভাবনা, বারবার জন্ম-মৃত্যুর চক্রাবর্ত্তন হতে মুক্তির একমাত্র পথ— অমৃতত্বের পথ যার নামান্তর।

চিন্তার স্বাধীনতা এবং স্বাতন্ত্র্য থাকার দরুণ মানুষ জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর কথা বলেছেন। একজন ধনী ধন উপার্জ্জন এবং সঞ্চয় জীবনের উদ্দেশ্য বলে ভাবতে পারেন। বড়জোর সেই সঙ্গে জনকল্যাণমূলক কিছু কাজের কথা ভেবে নিয়ে অর্জ্জিত অর্থের একটী অংশ ব্যয় করতে পারেন। একজন স্বদেশসেবী সব কিছু স্বদেশের মঙ্গলের জন্য উৎসর্গ করতে পারেন, কারণ তাঁর মতে স্বদেশ-সেবা অর্থাৎ নরঋণ পরিশোধ জীবনের উদ্দেশ্য। একজন চিকিৎসক আর্ত্তের সেবাকেই জীবনের উদ্দেশ্য বলে বেছে নিতে পারেন। সাহিত্যিক শিল্পী স্ব-স্ব ক্ষেত্রে প্রতিভার নব-নব অবদান রেখে যাওয়াকেই জীবনের উদ্দেশ্য ভেবে নিতে পারেন। উদ্দেশ্যের বিভিন্নতা থাকলেও সব উদ্দেশ্যের একটী অভিন্ন অন্তঃপ্রবাহী সূত্র বর্ত্তমান এবং তা' হল মানব চিত্তে স্থান দখল। কবির উক্তি :—

মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
জীবন্ত হৃদয়-মাঝে যদি স্থান পাই॥

কিন্তু মহাকালের স্থূল হস্তক্ষেপে মানবচিত্তের এ বাসনাও ত' অবলুপ্ত হয়। তা' হলে জীবনের উদ্দেশ্য কি? এ প্রশ্নের মীমাংসা হল কই? মীমাংসা আছে। আধ্যাত্মিক জগৎ, পারমার্থিক ভাবনা আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সুনিশ্চিত করেছে। আমাদের শাস্ত্র বলেছেন :—

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।"...

—মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে অমৃতের অনুসন্ধান করা, মৃত্যুহীন নিত্যজীবনের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা, ব্রহ্ম-বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা।

জীবনের এই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবহিত হবার প্রচেষ্টাই বৈষ্ণবের একমাত্র কৃত্য। বৈষ্ণবের সাধন চৈতন্যেরই সাধন। তাই চৈতন্যের উদ্বোধন ঘটাতে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের বাণী তাঁর পক্ষে অপরিহার্য্য।

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবের সাধনা,—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

গৌড়ীয় বৈষ্ণবের এই হল উজ্জীবিত ভাবনা, তাঁর অমৃতের অনুসন্ধান, মৃত্যুহীন নিত্যজীবন লাভের পথ। দুঃসাহস বিবেচিত না হলে বলব, এ পথ কেবলমাত্র গৌড়ীয়ের নয়, দেশ-কাল-পাত্র-নির্ব্বিশেষে বিশ্বের সকল মানুষের।

একথা আজ বোধ করি অস্বীকার করা যাবে না যে, ধর্ম্ম নিয়ে সর্ব্বত্র এক স্পর্শকাতর মানসিকতার সৃষ্টি হচ্ছে। বিশেষ করে শিক্ষিত মানুষ ধর্ম্মের নামে কতিপয় স্বার্থগৃধ্নু মানুষের অপপ্রয়াস-জনিত পরিণতির কথা সামনে রেখে নির্ব্বিচারে 'ধর্ম্ম'কে গালি পেড়ে যাচ্ছে। তাদের মতে ধর্ম্মকে কেন্দ্র করে কলহ-বিবাদ নিরন্তর সৃষ্টি হচ্ছে, রক্তক্ষয়ী সংগ্রামও যে হচ্ছে না এমন নয়; ধর্ম্মের বাতাবরণে সংকীর্ণতা এবং ভেদাভেদ সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু এ ত' একদেশদর্শী অভিমত। যথার্থ ধর্ম্মপথাবলম্বী সর্ব্বসুন্দরের মূর্ত্তপ্রতীক। ধর্ম্মের কাজ ধারণ করা। সত্য, শিব ও সুন্দরকে জীবনে ধারণ করার কথাই ত' ধর্ম্ম বলে। ধর্ম্মের পরিমণ্ডলে নীচতা নেই, বিদ্বেষ নেই, সংকীর্ণতা নেই। আছে পবিত্রতা, সহিষ্ণুতা, সহমর্ম্মিতা এবং সৌভ্রাতৃত্ব। যথার্থ ধার্ম্মিক মন্দিরে পূজারত হিন্দু ভক্ত, মসজিদে আজানে সামিল ইমানদার মুসলিম, গীর্জ্জায় প্রার্থনারত খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রাণ মানুষ, প্যাগোডায় বৌদ্ধ সাধকে কোন পার্থক্য দেখেন না। দেশ-কাল-জাতি-বর্ণের উর্দ্ধে উঠতে পারলে তবে ত' তিনি ধার্ম্মিক পদবাচ্য হবেন। ধর্ম্মের এই ইতিবাচক দিকটী উপেক্ষা করে ধর্ম্মকে পঙ্কিলতার আবিলতায় আচ্ছন্ন করে ফেলছি। ধর্ম্ম মানুষকে উদার করে—আর এই উদার-চরিত মানুষের কাছে সমগ্র বসুধা আত্মীয়। বসুন্ধরার মানুষ তাই তখন তার কাছে আপন হতে আপন হয়ে উঠে। কোন ইতর বিশেষ না করে মানুষ মাত্রকেই সেবা করা ধার্ম্মিকের পক্ষে অপরিহার্য্য এবং তা কেবল সম্ভব আত্মধর্ম্মের উদ্বোধনেই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্ম এই আত্মধর্ম্ম। কেবলমাত্র গৌড়ীয়দের ধর্ম্ম-চিন্তাই একথা তারস্বরে বলতে পারে,—

"জীবে সম্মান দিবে জানি' কৃষ্ণ অধিষ্ঠান।"

মনুষ্যের কথা ত' দূর—মনুষ্যেতর প্রাণীকেও ঈশ্বরীয় ভাবনায় ভাবতে বলা হয়েছে এবং আচরণও তদনুরূপ করতে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাই এই আত্ম-

ধর্ম্মই জৈবধর্ম্ম—জীবমাত্রেরই ধর্ম্ম—এবং তাই বিশ্বজনীন ধর্ম্ম। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্ম যে বিশ্বজনীন ধর্ম্ম—তা' আজকের বিশ্বের মানুষের আচরণে সুপ্রমাণিত। তাই ত' বিশ্বমানব আজ এই ভাবনায় উজ্জীবিত হচ্ছে, কারণ মৃত্যুর তুহিন শীতল স্পর্শে কাতর না হবার এই পথ সর্ব্বোত্তম, অমৃতত্ব লাভের অন্য কোন পথ নেই—"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

—**শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ দাস**, আটুরিয়া (২৪ পরগণা উঃ)

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও রায়-রামানন্দ মিলন

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৫শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২৯ পৃষ্ঠার পর]

রায়-রামানন্দ প্রভু ইহার পর জ্ঞানমিশ্রা ও পরে জ্ঞানশূন্যা শুদ্ধভক্তির কথা জানাইলেন। "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্। স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভির্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥" (ভাঃ ১০।১৪।৩) নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞান-চিন্তাকে সম্পূর্ণ দূর করিয়া সাধুমুখে হরিকথা শ্রবণ এবং কায়-মন-বাক্যদ্বারা সাধুপথে স্থিত হইয়া জীবনযাত্রার দ্বারা অজিত ভগবান্ জিত হইয়া থাকেন। প্রভু কহে,—"এহো বাহ্য, আগে কহ আর।" রায়-রামানন্দ সাধারণ প্রেমভক্তির কথা বলিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহা স্বীকার করিয়া অগ্রে যাইতে নির্দ্দেশ দিলে পর রায়-রামানন্দ রাগমার্গে ব্রজবাসীর দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যপ্রেম শাস্ত্রপ্রমাণসহিত বলিলেন। প্রভু কহে,—"এহো উত্তম, আগে কহ আর।" রায়-রামানন্দ কান্তভাব প্রেমসাধ্যসার বলিলেন। "পরিপূর্ণ-কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই 'প্রেমা' হৈতে। এই প্রেমার বশ—কৃষ্ণ, কহে ভাগবতে॥ কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্ব্বকালে আছে। যে যৈছে ভজে, কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে॥ এই 'প্রেমে'র অনুরূপ না পারে ভজিতে। অতএব 'ঋণী' হয়, কহে ভাগবতে॥" (চৈঃ চঃ মঃ ৮ম পঃ) শ্রীমন্মহাপ্রভু ইদৃশ সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া শ্রীগোপীজনবল্লভ-প্রেম সাধ্যতত্ত্বের অবধি বটে ; তথাপি আরও যদি কিছু থাকে তাহা বর্ণনের জন্য কহিলেন। রায়-রামানন্দ সমস্ত শাস্ত্রে শ্রীরাধার প্রেমসাধ্য শিরোমণি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, ইহা জানাইলেন। কিন্তু সাধারণ সাধক ঐ ভাবের অনুগত হইলে ভজনের যোগ্যতা লাভ করে।

রায়-রামানন্দ সমস্ত গোপীগণ হইতে শ্রীমতী রাধিকার প্রেম-মহিমার শ্রেষ্ঠত্ব জানাইলেন। "ত্রিজগতে রাধা-প্রেমের নাহিক উপমা॥" কোন সময়ে

রাসমহোৎসবের সময় শ্রীমতীজী অন্যান্য গোপীদের সহিত আপন সমতা-দর্শন করিয়া মান করিয়া রাসস্থলী ত্যাগ করিলেন। "তাঁরে না দেখিয়া ব্যাকুল হৈল হরি॥ সম্যক্ বাসনা কৃষ্ণের ইচ্ছা রাসলীলা। রাসলীলা-বাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খলা॥ তাঁহা বিনা রাসলীলা নাহি তাঁর চিত্তে। মণ্ডলী ছাড়িয়া গেল রাধা অন্বেষিতে॥ * * শতকোটি গোপীতে নহে কাম-নির্ব্বার্পণ॥ তাহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ॥" (চৈঃ চঃ মঃ ৮ম পঃ) শ্রীমন্মহাপ্রভু এইসব রসতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া উল্লসিত হইয়া বলিলেন,—যাহার জন্য আসিয়াছি তাহার জ্ঞান হইল। সাধ্য-সাধনতত্ত্ব-নির্ণয় হইল। শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ, শ্রীরাধাস্বরূপ, প্রেম, রসতত্ত্ব চতুষ্টয় বর্ণনার জন্য মহাপ্রভু অনুরোধ করিলে পর রায় আপনাকে যন্ত্র এবং প্রভুতে যন্ত্রী জ্ঞান করিয়া বলিলেন,—"তোমার শিক্ষায় পড়ি যেন শুক-পাঠ। সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি, কে বুঝে তোমার নাট॥ হৃদয়ে প্রেরণ কর, জিহ্বায় কহাও বাণী। কি কহিয়ে ভাল-মন্দ, কিছুই না জানি॥" (চৈঃ চঃ মঃ ৮ম পঃ)

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব—"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥" (ব্রঃ সঃ) "বৃন্দাবনে 'অপ্রাকৃত নবীন মদন'। কামগায়ত্রী কামবীজে যাঁর উপাসন॥ * * সর্ব্ব-চিত্তাকর্ষক, সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন॥ * * শৃঙ্গার রসরাজময়-মূর্ত্তিধর॥"

শ্রীরাধাতত্ত্ব বর্ণন-প্রসঙ্গে বলিলেন যে,—শ্রীকৃষ্ণস্বরূপশক্তির তিন রূপ। তাহার মধ্যে আনন্দাংশে হ্লাদিনী শক্তি শ্রীকৃষ্ণে আনন্দ প্রদান করেন। "সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।" হ্লাদিনীর সার প্রেম, আর প্রেমের সার মহাভাব, সেই মহাভাবস্বরূপ রাধা-ঠাকুরাণী। "প্রেমের 'স্বরূপ'-দেহ'—প্রেমের ভাবিত। 'কৃষ্ণের প্রেয়সী-শ্রেষ্ঠ' জগতে বিদিত॥ * * * কিলকিঞ্চিতাদি'-ভাব-বিংশতি-ভূষিত। গুণশ্রেণী-পুষ্পমালা সর্ব্বাঙ্গে পূরিত॥ * * * কৃষ্ণকে করায় শ্যামরস-মধু পান। নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব্বকাম॥" (চৈঃ চঃ মঃ ৮ম পঃ)

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া যুগল বিলাসের মহত্ত্ব ও সম্বন্ধ কিছু শ্রবণের আগ্রহ প্রকাশ করিলে পর "রায় কহে,—কৃষ্ণ হয় 'ধীর-ললিত'। নিরন্তর কামক্রীড়া যাঁহার চরিত॥ রাত্রিদিন কুঞ্জে ক্রীড়া করে রাধা-সঙ্গে। কৈশোর বয়স সফল কৈল ক্রীড়া-রঙ্গে॥" বিলাসমহত্ত্ব শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু আর কিছু শ্রবণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে রায় প্রেমবিলাস বিবর্ত্তভাব অর্থাৎ বিচ্ছেদকালে অধিরূঢ় ভাববশতঃ সম্ভোগাভাবে সম্ভোগ স্ফূর্ত্তি হয়, এই ভাব অনুরূপ আপনকৃত এক গীত শ্রবণ করাইলে পর মহাপ্রভু স্বহস্তে রায়-রামানন্দের বদন আচ্ছাদন করিলেন, কারণ বাহ্য জগদ্দর্শনশীল জড় দার্শনিকের অনুভূতির দ্বারা এই গীতের অনুভব সম্ভব নয়।

রায়-রামানন্দপ্রভুর তত্ত্বসিদ্ধান্ত বিচারসমূহ শ্রবণ করিয়া শ্রীমহাপ্রভু বলিলেন যে, সাধ্যবস্তুর সমগ্র কথিত হইল, এখন সেই চরম সাধ্যবস্তু প্রাপ্তির উপায় বা সাধন জানাইতে নির্দ্দেশ দিলেন। রায় ব্রজে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যাদি প্রেমদ্বারা এই গূঢ়তত্ত্ব প্রাপ্তি সম্ভব নয়, একমাত্র ব্রজের সখীর ভাব গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাদের আনুগত্যে সাধনদ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের কুঞ্জ-সেবারূপ সাধ্যবস্তু লাভ হইয়া থাকে, ইহা ছাড়া প্রাপ্তির আর অন্য কোন উপায় নাই জানাইলেন।

অবশেষে রায়-রামানন্দের অনুরোধে স্বীয় শ্যাম-গৌররূপ অর্থাৎ রসরাজ-মহাভাবস্বরূপ দর্শন করাইলেন অর্থাৎ একতত্ত্বে দুই, আবার দুই তত্ত্বেই এক—এরূপ একটী অপূর্ব্ব স্বরূপ প্রদর্শন করাইলেন।

—শ্রীযুক্তা উমা দেবী

'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা'র

পঁয়তাল্লিশ-বর্ষ পদার্পণে

মাঘী কৃষ্ণ-পঞ্চমী, প্রকৃতি সুশীতল।
নবীনের আবির্ভাবে করে ঝলমল্॥
হরিকীর্ত্তন-মুখরিত ঠাকুরালয়।
পারমার্থিক আলোকে আলোকিত হয়॥
বত্রিশ লক্ষণযুক্ত বিমলাপ্রসাদ।
পরিচিত নাম তাঁর 'শ্রীল প্রভুপাদ'॥
নীলাচল মায়াপুর শ্রীগৌরকৃপায়।
জগৎ কল্যাণরূপে নিত্য শোভা পায়॥
'জ্যোতির্ব্বিদ', 'জ্যোতিঃ' শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত-সার।
সরস্বতী-অনুকম্পিত দয়ার আধার॥
'শাস্ত্রাদির' ভাষ্যকার মহাপ্রেমদাতা।
মঠাদি স্থাপনে বদ্ধ-জড়-জীব-ত্রাতা॥
অনন্ত 'শ্রী'-তে মণ্ডিত 'জগতের গুরু'।
পাদপদ্ম শিরে ধরি যাত্রা হোক শুরু॥

—শ্রীবলাই চাঁদ ঘোষ, সেবাসুহৃদ্
সাংবাদিক পি. টি. আই.

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৫শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৩৬ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক নবলক্ষণা ভক্তির অনুষ্ঠানই উত্তম শাস্ত্রাধ্যয়ন বলে মনে করি। বিষ্ণুবিদ্বেষী—ভগবদ্‌বিদ্বেষী পিতা হিরণ্যকশিপু ক্রোধে স্বীয় ক্রোড় হতে দূরে নিক্ষেপ করলেন প্রহ্লাদকে। 'আমার বিরোধী বিষ্ণু, আমার শত্রু বিষ্ণু, তুই কিনা তার কথা বলছিস্!' ভগবদ্‌বিদ্বেষী হিরণ্যকশিপুর পক্ষে ত' প্রহ্লাদের ভক্তিমূলক বিচার ভাল লাগবে না।

এখানে নবধা ভক্তির কথা এসেছে। শাস্ত্র আলোচনা করতে গিয়ে দেখছি, নবধা ভক্তি যাজন ত' কষ্টকর। এখানেও আবার কিছু Concession এর কথা এসে যায়। শাস্ত্র বলেছেন,—

সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥
সকল সাধনশ্রেষ্ঠ—এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প অঙ্গ॥

এই পাঁচ রকম ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান কর। না—আরও সংক্ষিপ্ত ব্যবস্থা চাই। তখন শাস্ত্রে তিন রকমের ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে। "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণম্"—এই তিন প্রকার ভক্ত্যঙ্গ যাজন কর। তাও পারছি না। তখন শাস্ত্র বলছেন,—কেবল নাম-কীর্ত্তন কর। এই নাম-কীর্ত্তনের ভিতর বাকী তেষট্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গই অনুস্যূত।

সত্যযুগে তপস্যাদ্বারা, ত্রেতাযুগে যাগ-যজ্ঞদ্বারা, দ্বাপরযুগে সেবা-পূজাদ্বারা এবং কলিতে নাম-সঙ্কীর্ত্তনদ্বারা ভগবানকে লাভ করা যাবে। "যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্য কেশবম্।" ভগবান্ জীবহৃদয়ে আবির্ভূত হচ্ছেন, বিশেষ করে তিনি তাঁর ভক্তের হৃদয়ে সর্ব্বদাই প্রকটিত—আবির্ভূত। যেখানে ভগবানের নাম-কীর্ত্তন হয়, যেখানে ভগবানের রূপ-গুণ-লীলাকথা কীর্ত্তন হয়, ভগবান্ সেখানে স্বয়ং আবির্ভূত হন। কৃষ্ণ এক জায়গায় বলছেন,—

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥

নারদকে বলছেন শ্রীকৃষ্ণ,—আমি বৈকুণ্ঠে থাকি না সবসময়, যোগিগণের হৃদয়েও সবসময় থাকি না, কিন্তু আমার ভক্তগণ যেখানে আমার নাম-রূপ-গুণ-

লালাকথা কীর্ত্তন করেন, আমি সেখানে সর্ব্বদা অবস্থান করি, হাজির থাকি। আবার ভক্তও একথা বলছেন,—

ন যত্র বৈকুণ্ঠকথা-সুধাপগা, ন সাধবো ভাগবতাস্তদাশ্রয়াঃ।
ন যত্র যজ্ঞেশ-মখা-মহোৎসবাঃ, সুরেশ-লোকোঽপি ন বৈ স সেব্যতাম্॥

যেখানে বৈকুণ্ঠ—বিষ্ণু ভগবানের নাম-গুণগাথা কীর্ত্তিত হয় না, ভাগবতাশ্রয়ী সাধুগণ যেখানে অবস্থান করেন না, যেখানে তাঁর যাত্রা-মহোৎসবাদি অনুষ্ঠিত হয় না, সেটা হোক না কেন ইন্দ্রপুরী, আমি সেখানে থাকতে চাই না, যেতে চাই না। সুতরাং দুজনেরই কথায় মিল আছে, ভগবান্ যেটা বুঝাতে চাচ্ছেন, ভক্তও সেই জিনিসটা বলছেন।

দুর্ব্বাসা যখন কৃষ্ণের শরণাপন্ন হয়েও কিছু উল্টোপাল্টা করে ফেলছেন, তখন সুদর্শন-চক্র তাঁকে ছাড়ছে না। তিনি ব্রহ্মার কাছে গেছেন, শিবঠাকুরের কাছে গেছেন, কেউ তাঁকে রক্ষা করতে পারছেন না সুদর্শন চক্রের হাত থেকে। তখন ভগবানের কাছে গিয়ে হাজির হয়েছেন,—প্রভু, আমায় বাঁচাও। কৃষ্ণ তখন বলছেন,—তোমাকে কি করে বাঁচাব? আমার ক্ষমতা নাই। সাধুগণ আমার হৃদয়; আমি সাধুগণের হৃদয়, তুমি সেই সাধুকে আঘাত করেছ, সাধুগণ আমাকে ভিন্ন কাহাকে জানেন না, আমিও সাধু ভিন্ন অন্য কাহাকে জানি না। আর আমার কোন হৃদয় নাই, অন্তর নাই। তোমাকে রক্ষা করতে গেলে আমার হৃদয় লাগবে, অন্তঃকরণ প্রয়োজন। ভক্ত আমার অন্তঃকরণ নিয়ে নিয়েছে। সুতরাং আমি কোন্ হৃদয় দিয়ে, কোন্ অন্তঃকরণ দিয়ে তোমাকে দয়া করতে পারি? বর্ত্তমানে তোমায় কোন ব্যবস্থা আমি নিতে পারছি না। আশ্চর্য্য ব্যাপার! সেই যে প্রেমময় ভগবান্ তিনি যুগে যুগে বারে বারে আসছেন যখন প্রয়োজন হচ্ছে। সেই ভগবানেরই তিনটে অবস্থা রয়েছে, শাস্ত্রে বর্ণনা আছে।—

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—এই তিনটে Aspect হল ভগবানের। ঠিক এই কথাটা বুঝিয়েছেন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের মধ্যে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। একটা শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন তিনি,—

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশ-বিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥

—ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ বলে বর্ণনা করে যাচ্ছেন। ঠিক এইরকম আর একটী শ্লোক শ্রীল জীব গোস্বামী আবার তত্ত্বসন্দর্ভে ব্যবহার করেছেন,—"যস্য ব্রহ্মেতি সংজ্ঞাং ক্বচিদপি নিগমে যাতি চিন্মাত্রসত্তা" প্রভৃতি। ভগবান্ তুমি তোমার প্রেমিক ভক্তের কাছে তোমার অপূর্ব্ব রসমাধুরী, লীলামাধুরী প্রকাশ কর। সব জিনিসটা ত' বুঝবার বিষয়। সেই যে প্রেমময় ভগবান্ তিনি জগতে আসছেন বিভিন্ন অধিকারী ভক্তের কাছে বিভিন্ন অধিকার স্বীকার করে নিয়ে। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর প্রভৃতি বিভিন্ন রসের অধিকারী ব্যক্তির কাছে বিভিন্ন ভাব নিয়ে ধরা দিচ্ছেন। সেই যে প্রেমময় ভগবান্ তিনি কে?—তিনি অবতারী। যাঁর থেকে অসংখ্য অবতার আসছেন এ জগতে, তাঁকে বলা হয় অবতারী। ব্রহ্মা গোবিন্দ-স্তব করেছেন, এক জায়গায় তাতে বলেছেন,—

রামাদিমূর্ত্তিষু কলা নিয়মেন তিষ্ঠন্
নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

সেই আদিদেব গোবিন্দকে ভজনা করি। কে তিনি?—সমস্ত অবতারের মূল পুরুষ তিনি, তাঁকে আমি বন্দনা করি।

শ্রীরামচন্দ্র ত্রেতাযুগে এসেছেন, আর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দ্বাপর যুগে এসেছেন। এই ভেবে যদি আমরা মনে করি,—কৃষ্ণচন্দ্র থেকে রামচন্দ্র Senior, আর যেহেতু কৃষ্ণচন্দ্র পরে এলেন সেহেতু তিনি Junior, তাহলে তত্ত্বদর্শনের কাছে অপরাধ হয়ে যাবে—এগুলো ত' শাস্ত্রে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। পূর্ণদর্শন, পূর্ণতত্ত্ব হলেন ভগবান্। যেখানে পূর্ণত্বের বিচার আছে সেখানে পূর্ণ, পূর্ণতর, পূর্ণতম-শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু পূর্ণদর্শনকে খণ্ডিত করা চলবে না। পূর্ণ থেকে যদি পূর্ণ নেওয়া যায় তাহলে পূর্ণ অবশেষ থাকে। এই অঙ্ক কষেছেন Spiritual Mathematics এ কে মিলাবেন অঙ্কটা? পূর্ণ থেকে যদি পূর্ণ নেওয়া যায়, তাহলে পূর্ণ অবশেষ থাকে, এ অঙ্ক কে কষতে পারবেন? ১০-১০=০ হয় সাধারণতঃ, কিন্তু পূর্ণত্বের অঙ্কের ক্ষেত্রে ১০—১০=১০ হচ্ছে। এই হল পূর্ণ-দর্শনের বিচার বা হিসাব।

সেই ভগবান্ কেমন, স্তব করেছেন ভাগবতে,—ইন্দ্র, বরুণ, বায়ু, ব্রহ্মা, শিবাদি যাঁকে স্তব করছেন, যোগিগণ যাঁকে ধ্যানে পাচ্ছেন না, 'দেবায় তস্মৈ নমঃ' বলছেন, তাহলে কে তিনি? যাঁকে বলছেন, ভগবানের পাদধৌত বারি ব্রহ্মা কমণ্ডলু থেকে ছেড়ে দিলেন, শিবঠাকুর মস্তকে ধারণ করলেন এবং এজগতে তিনি নেমে এলেন। কে তিনি? প্রভাবটা কার?

অথাপি যৎপাদনখাবসৃষ্টং, জগদ্বিরিঞ্চোপহৃতার্হণাম্ভঃ।
সেশং পুণাত্যন্যতমো মুকুন্দাৎ, কো নাম লোকে ভগবৎ-পদার্থঃ॥

ব্রহ্ম যিনি, তিনি হলেন ভগবানের অঙ্গকান্তি, অঙ্গজ্যোতি। পরমাত্মা হলেন ভগবানের অংশ, আর ভগবান্ হলেন পূর্ণদর্শন, পূর্ণপ্রকাশিত বস্তু, সর্ব্বশক্তিমান্ তত্ত্ব।

কেহ কেহ বলছেন,—ভগবান্ নিরাকার, নির্গুণ, নিঃশক্তিক। একদেশদর্শী তারা, শাস্ত্র ঠিক আলোচনা করেন নাই তারা। শাস্ত্র যদি আলোচনা করতে হয়, তাহলে অন্বয় এবং ব্যতিরেকভাবে—Positive ও Negative side এ আলোচনা করতে হবে; তা না হলে শাস্ত্র আলোচনা হয় না। স্বয়ং ভগবান্ ব্রহ্মাকে ভাগবতের Synopsis উপদেশ করেছেন সংক্ষিপ্তভাবে, তার ভিতরেও রয়েছে এই কথাটা,—

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা॥

ব্রহ্মা! যদি তুমি শাস্ত্র আলোচনা করবে, তাহলে অন্বয়-ব্যতিকেভাবে আলোচনা করতে হবে। তবে তোমার আলোচনা পূর্ণাঙ্গ হবে, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হবে। আমরা এসব জিনিসগুলো বুঝতে পারছি না, শুনছি না, মুস্কিল্ ত' হয়ে যাচ্ছে এইখানে। শাস্ত্রে যেখানে যতভাবে যতগুলো কথা বর্ণনা আছে, সবগুলোর উদ্দেশ্যটা আমাদের বুঝতে হবে। যদি আমরা উদ্দেশ্যটা না বুঝতে পারি, তাহলে শাস্ত্রালোচনা নিষ্ফল হয়ে যায়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন পুরীতে অবস্থান করছিলেন, একজন যদ্বাতদ্বা কবি সেইসময় গিয়ে হাজির হলেন তাঁকে তার কবিতাটা শুনাবেন। মহাপ্রভু বললেন,—আমি ত' ওসব কিছু বুঝি না, ওসবের দায়িত্ব দেওয়া আছে স্বরূপ-দামোদরের উপর। আপনি তাঁর কাছে যান। স্বরূপ-দামোদরের কাছে গেলে তিনি বললেন,—আচ্ছা পড়ুন। পড়তে পড়তে এক জায়গায় তত্ত্বসিদ্ধান্তের ভুল—দোষ-ত্রুটী হয়ে গেছে ধরা পড়ল। সচল জগন্নাথ, অচল জগন্নাথ দুরকম কথা হয়ে গেছে। শাস্ত্রে রয়েছে,—ঈশ্বরে দেহ-দেহী ভেদ নাই। "দেহ-দেহী বিভেদোঽয়ং নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ।" কিন্তু উনি ঈশ্বরে দেহ-দেহী ভেদ করে ফেলেছেন। তখন স্বরূপ-দামোদর বললেন,—আর পড়তে হবে না। সব শুনা হয়ে গেছে। কি হল প্রভু?—হয় নাই কিছু, একটু তত্ত্ববিরোধ হয়েছে, সিদ্ধান্তবিরোধ হয়েছে। তখন ওঁর কাছে পরামর্শ চাইলেন কবি। স্বরূপ দামোদর তখন বলেছেন,—

যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে॥

চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে জানিবা সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ॥

বিষয়টী এই। তত্ত্বজ্ঞান লাভ না হলে কিছুই হচ্ছে না যতই আমরা শাস্ত্র আলোচনা করি না কেন। অনেক কিছু শিখেছি, অনেক কিছু বুঝেছি, জেনেছি কিন্তু কিছুই শেখা হল না, কিছুই বুঝা হল না।

তপন্তু তাপৈঃ প্রপতন্তু পর্ব্বতাদটন্তু তীর্থানি পঠন্তু চাগমান্।
যজন্তু যাগৈর্বিবদন্তু বাদৈর্হরিং বিনা নৈব মৃতিং তরন্তি॥

এখানে শ্রীভগবানের নিকট Submission দিতে হচ্ছে আগে, তা না হলে কিছুই হচ্ছে না।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আজ আবির্ভূত হয়েছেন। আমরা একটা বিশেষ দিনকে নিয়ে কিছু কথা আলোচনা করছি। কিন্তু শাস্ত্র কি বলছেন?—সবসময় ভগবৎ কথা আলোচনা করতে হবে। শুধু সাত দিনে একদিন আলোচনা করব, তা হবে না। প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্ত্তে সেই ভগবানের কথা স্মরণ করতে হবে। তাহলে আমাদের কিছু হবে। আমরা ভগবানকে ভালবাসি এটা তার প্রমাণ। কালে ভদ্রে কখনও একটু আলোচনা করলাম, ঠাকুরের কথা একটু শুনতে হয় শুনলাম, তা নয়। যেমন লক্ষ্মীর পরব কেউ পালন করছেন, লক্ষ্মীর পাঁচালী একটু শুনলেন, শনির ব্রত কেউ করছেন, একটু শনির পাঁচালী শুনলেন, এমন ধরণের কথা নয়। কৃষ্ণকথা-কীর্ত্তন আলোচনা সর্ব্বক্ষণ, সর্ব্বদা করতে হবে। ২৪ ঘণ্টার ভিতরে ২৪ ঘণ্টা কি করে ভগবানের চিন্তা-ভাবনা করা যায়? কোন তার্কিক ব্যক্তি হয়ত' প্রশ্ন করে ফেলবেন,—মশায়, আপনি ত' ৬-৮ ঘণ্টা ঘুমান, তা সে সময় ভগবানের কথা মনে রাখেন কি করে? শাস্ত্রে বলছেন—ভগবানের যে ধ্যান, সেই ধ্যানটা নিদ্রাবস্থায়ও হতে পারে। "স্বপ্নে রাধাগোবিন্দ দেখে"—এ জিনিসটা হবে সাধক-সাধিকার ক্ষেত্রে। নৈরন্তর্য্য ভাবটা আসবে, ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও তিনি দেখবেন,—আমি কোথাও বিগ্রহ দর্শন করছি, ঠাকুরের আরতি দর্শন করছি। সেই জিনিসটা বলেছেন। জাগ্রতাবস্থায় যে জিনিসটা আমার মন গ্রহণ করে, সুপ্তাবস্থায় স্মৃতিপটে তাহাই জাগরূক হয়।

'অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ'—বিস্মরণ হবে না, সবসময় সেটা চলবে, চিন্তাধারার মধ্যে চলছে তার। এটা ত' অভ্যাসের ব্যাপার, অভ্যাস-যোগ। মনটাকে স্থির রাখবার জন্য যে অভ্যাস-যোগের ব্যবস্থা নেওয়া হয়, সেটা যখন পাকাপোক্ত হয়, তখন সেটা সংস্কারে পরিণত হয়। যখন মানুষ সংস্কার লাভ করে, তখন আর তার কোন অসুবিধা হয় না। সবসময় ভগবানের স্মরণ চলছে

তাঁর ভিতরে। খাওয়া, থাকা, পরা, ঘুম সব হচ্ছে, কিন্তু ভগবৎস্মৃতি চলছে সব-সময় তাঁর। Main factor বন্ধ নাই, সেটা ঠিক চলছে। ঠিক সেই ভাবটার নাম হল সাধন। 'নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা।' জীবের যে নিত্যসিদ্ধ ভাব—ঈশ্বরের উপাসনা করা, ভগবানকে ভালবাসা, ভগবানের নাম-কীর্ত্তন করা—সেটা সবসময় তাঁর চলতে থাকে। ওটা আসে কি করে?—অভ্যাসের ব্যাপার। এটা একপ্রকার যোগ। 'যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্'—এটা আপনারা পেয়েছেন গীতার মধ্যে। (ক্রমশঃ)

কৃপণ

মনুষ্যজন্ম জীবের পক্ষে একটী অমূল্য সম্পদ। অনেক সৌভাগ্যের ফলে এই জন্মলাভ হয় বলিয়া ইহা অনিত্য হইলেও অত্যন্ত দুর্ল্লভ। জীব মনুষ্যজন্মের সদ্ব্যবহার করিয়া জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান করিতে সক্ষম হন। ভগবদ্ভক্তি লাভে জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান অনায়াসে হইয়া যায়। মনুষ্যজন্মরূপ অমূল্য সম্পদ লাভ করিয়া যিনি তাহার সদ্ব্যবহার না করেন, তিনিই প্রকৃত 'কৃপণ'। মনুষ্যমাত্রেরই শ্রীকৃষ্ণভজন করিবার অধিকার রহিয়াছে, কিন্তু যাহারা তাহা করেন না; তাহারাই কৃপণ। কৃপণ বলিতে ধনহীনকে বুঝায় না, ধন আছে অথচ তাহার যে সদ্ব্যয় করে না, তাহাকে বুঝায়। ধনের অপব্যবহারকারীও কৃপণের মধ্যে পরিগণিত।

কৃপণ-শব্দের আক্ষরিক অর্থে অদাতা, ব্যয়কুণ্ঠ, নীচ, কুৎসিৎ, দীন প্রভৃতিকে বুঝায়। নীলকণ্ঠও বলিয়াছেন,—"কার্পণ্যং দীনত্বং।" আনন্দগিরির মতে, 'কৃপণ' শব্দ শ্রুতিতে 'অজ্ঞানী', 'অব্রহ্মবিৎ' ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কৃপণের কর্ম্মই কৃপণতা করা। গীতায় 'কার্পণ্যদোষোপহত' ইত্যাদি বাক্যে কার্পণ্য শব্দের অর্থ ভগবদ্‌তত্ত্বজ্ঞানাভাবকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীধরস্বামী 'কার্পণ্য-দোষোপহত' শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন,—ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্যাদি আত্মীয়গণকে বধ করিয়া কিরূপে বাঁচিয়া থাকিব—অর্জ্জুনের এই যে বুদ্ধি ইহাই কার্পণ্য। এই সম্বন্ধে শ্রুতিতে পাওয়া যায়,—"য এতদক্ষরং গার্গি অবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ" (বৃহদারণ্যক ৩।৯।১০) অর্থাৎ হে গার্গি! এই অক্ষর পরব্রহ্মকে না জানিয়া যিনি ইহলোক হইতে প্রস্থান করেন, তিনি কৃপণ। শ্রীভাগবত "কৃপণঃ গুণবস্তুদৃক (ভাঃ ৬।৯।৪৮)" শ্লোকে গুণজাত বস্তুকেই যাহারা তত্ত্ব বলিয়া জানেন,

তাহাদিগকে 'কৃপণ' সংজ্ঞায় সংজ্ঞি করিয়াছেন। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিও কৃপণ। "কৃপণো যোঽজিতেন্দ্রিয়ঃ" (ভাঃ ১১শ স্কন্ধ)। এই শ্লোকের বিবৃতিতে শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—"ইন্দ্রিয়তোষণপর, অদান্ত গো, লোভী ব্যক্তিই কৃপণ।"

ফলকামনা-যুক্ত কর্ম্মসমূহ সংসার বন্ধনের হেতুভূত এবং জন্মমরণাদি অনর্থ-মূলক। যাঁহারা ভগবৎপ্রীতিমূলক কর্ম্ম ব্যতীত অন্যান্য কাম্যকর্ম্মের আচরণ করেন, তাঁহারা সংসার-ক্লেশে-ক্লিষ্ট হইয়া দুঃখী হইয়া জীবনযাপন করিতে বাধ্য হয়। তাই গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া কাম্যকর্ম্মসমূহকে অতিশয় নিকৃষ্ট জ্ঞানে জীবগণকে পরিত্যাগ করিতে উপদেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ॥ (গীতা ২।৪৯)

"হে ধনঞ্জয়! যেহেতু ঈশ্বরার্পিত নিষ্কাম কর্ম্মযোগ হইতে কাম্যকর্ম্ম অতি নিকৃষ্ট; অতএব নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ আশ্রয় কর। ফলকামী ব্যক্তিগণ কৃপণ।" উপরোক্ত শ্লোকের 'গীতাভূষণ' ভাষ্যে গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু বলিয়াছেন,—"ফলের প্রত্যাশায় কাম্যকর্ম্মগুলি সম্পন্নকারী—নিকৃষ্ট কর্ম্মিগণ কৃপণ—তাহার ফল, জন্মান্তরলাভরূপ কর্ম্মাদি বশে অবসন্ন হইয়া অতিশয় দীন অর্থাৎ নিকৃষ্টভাজন হয়। এই জগতে কৃপণ ব্যক্তিগণ অতিশয় কষ্টার্জ্জিত ধন, অদৃষ্ট-তুচ্ছ সুখের প্রতি লোভবশতঃ দানে অক্ষম হইয়া, সুমহৎ দানসুখে বঞ্চিত হয়। তাদৃশ কষ্টে অনুষ্ঠিত কর্ম্মগুলি করিতে করিতে তাহার তুচ্ছ ফলের প্রতি লোভবশতঃ অতিমহৎ আত্মসুখ হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকে, ইহাই ব্যক্ত করা হইয়াছে।"

বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া অথবা অসীম সৌভাগ্যের ফলে কৃপণ যে মনুষ্য-জন্মরূপ অমূল্য-সম্পদ অর্জ্জন করে, কিভাবে তাহা ব্যয় করিতে হয় তাহা সে জানে না। এই অমূল্য-সম্পদ লাভ করা সত্ত্বেও ভগবানের সেবায় ব্রতী না হইয়া কৃপণ দুর্ভাগ্যবশতঃ পরিবার, সমাজ, দেশ, জাতি প্রভৃতির প্রতি আসক্তিপ্রকাশপূর্ব্বক অমূল্য-সম্পদের বৃথা অপচয় করে। কৃপণ মনে করে যে, সে তাহার পরিবারের তথাকথিত আত্মীয়দের মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারিবে, অথবা সে মনে করে যে তাহার আত্মীয়-স্বজন তাহাকে মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারিবে। কৃপণের আকাশকুসুম কল্পনা বাস্তবে কখনও রূপায়িত হয় না। কৃপণের কড়ি অর্থাৎ অত্যন্ত যত্নের সহিত রক্ষিত অর্থাদি কোন সৎকার্য্যে ব্যয়িত হয় না। কথায় বলে,—"কৃপণের ধন বর্ব্বরেই খায়।" আত্মীয়স্বজনাদি অসৎলোকই

প্রতারণা করিয়া কৃপণের ধনসমূহ উপভোগ করে। মাটির মধ্যে রক্ষিত ধন থাকা বা না থাকা দুইই যেরূপ সমান, তদ্রূপ দুর্ল্লভ মনুষ্যদেহের সদ্ব্যবহার না করিলে তাহা লাভ করা, না লাভ করা দুইই সমান। মৃত্তিকাভ্যন্তরে রক্ষিত ধন চোরে চুরি করিয়া লইলে কৃপণ যেরূপ ধনের জন্য বৃথা শোক প্রকাশ করে, তদ্রূপ মনুষ্যজন্মের অসদ্ব্যবহারকারী জরাব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত হইয়া অন্তিমকালে কৃপণের ন্যায় বৃথা হাহুতাশ করিয়া মরে।

ভগবদ্ভক্তিযুক্ত কর্ম্ম ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত কর্ম্মই ঘৃণ্য, কেন না, সে সমস্ত কর্ম্ম মানুষকে জন্ম-মৃত্যুচক্রে আবর্ত্তিত করে। তাই কখনও কৃপণের ন্যায় কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষা করা উচিত নয়। মানবজীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য হইতেছে ভগবানের সেবা করিয়া মনুষ্যজন্মকে সার্থক করা। একমাত্র ভগবানের সেবাই মানুষের 'কৃপণের' পরিচয়কে নিশ্চিহ্ন করিয়া 'ভক্ত' আখ্যায় আখ্যায়িত করিতে পারে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

হইতে পারিতাম যদি

আহা!—
হইতে পারিতাম যদি নামপ্রভুর দাস!
তবে যে পূরিত তাঁহার বামনদেবের আশ॥
কিন্তু নিজ কর্ম্মদোষে আমি হইনু হতভাগা।
এতেকে মোর লাগি হইল, তাঁহার দ্বার বাধা॥
শ্রীনামপ্রভুর বৈভব মোর গুরু-বৈষ্ণবগণ।
কত যে জনম্ করিলু মুই বিরুদ্ধ আচরণ॥
সেই দোষে চিত্ত হইল বজ্রাদপি কঠিন।
বজ্র গলয়ে হায়, তবু আমি বিকারহীন॥
তথাপি—
গৌরহরির গণ তাঁরা, তাই কৃপা অবতার।
প্রভুপাদের গণ, তাই ভক্তিসিদ্ধান্ত অপার॥

"কালঃ কলির্ব্বলিন ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গাঃ।"
"বেদান্ত সমিতি" স্থাপিলেন করিতে মোরে রক্ষা ॥
"শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটি-রুদ্ধঃ।"
হায়! সহজিয়াবাদ না হয় মায়াবাদে তুষ্ট ॥
শ্রীজীবের সিদ্ধান্ত সলিলে করিয়া পবিত্র।
দিলেক সনাতন নাম আর রূপানুগ মন্ত্র ॥
কিন্তু—
"বানরের গলায় মুক্তার হার" না বুঝিয়া মূল্য।
ভোগোপকরণ না হইলে যেরূপ নিমেষে করে খণ্ড ॥
সেইরূপ মনুষ্যদেহে আমি মর্কট অবতার।
নামাপরাধ দশ করিলু মোর সাধন সার ॥
বৈষ্ণবাপরাধের সূক্ষ্ম বিচার না হইল জ্ঞান।
"অর্দ্ধকক্কটী"তে তুষ্ট মুই নাহি কভু ধ্যান ॥
একেরে করিয়া অতিস্তুতি, অন্যেরে জাঠি মারি।
নামপ্রভুর দ্বার মানা হইল, মাথা কুটিয়া মরি ॥
হে নামধেয়—
তব বামন হৃদে নিত্য বন, ভরসা মোর এই।
শ্রীগুরুদেব হন গো তিনি, ধরি সূত্রটি সেই ॥
প্রার্থনা শুনিতে যদি মুরারে, বুদ্ধি শোধিতে মোর।
বাঁচিতাম তবে, নতুবা পুনঃ তলাই তিমিরে ঘোর ॥
শ্রীবৈষ্ণব পাদসেবন যদি হইত মোর প্রাণ।
নিরন্তর কীর্ত্তনে অধিকার করিতে যদি দান ॥
হইত তবে ইন্দ্রিয়তর্পণ, পূরিত তাঁহার আশ।
তুষ্ট বামনদেব করিতেন, তাঁহার দাসের দাস ॥

—শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী, বৃন্দাবন

———

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব

ভারতের প্রতিটি রাজ্য যখন সাম্প্রদায়িকতার (?) বিদ্বেষ-বহ্নিতে প্রজ্জ্বলিত হইতেছে, হিন্দু-মুসলমানের ভ্রাতৃবিরোধী দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলিতেছে, দেশবাসী যখন চরম অস্থিরতার করালগ্রাসে নিপতিত, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে আমাদের সম্মুখে সর্ব্বাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর শুভাবির্ভাব-তিথি সমুপস্থিত। এই শ্রীমন্মহাপ্রভু কলি-কল্মষ-নাশকারী তারকব্রহ্ম নাম-সঙ্কীর্ত্তনকে অস্ত্র করত সাম্প্রদায়িকতার বিদ্বেষ-বহ্নির লেলিহান শিখা নির্ব্বাপিত করিয়া সকল সম্প্রদায়ের উর্দ্ধে জাতি-বর্ণ-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে এক নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টি করিলেন। আত্মার আত্মা—পরমাত্মা, শ্রীমন্মহাপ্রভু তাই দেহধর্ম্ম, মনোধর্ম্মের অতীত আত্মধর্ম্ম তথা ভাগবত-ধর্ম্ম প্রচার করিলেন। এই আত্মধর্ম্ম কোন দেশ-কালের অধীন নহে, কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম নয়। শাস্ত্র বলেন,—"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।" আমরা সবাই সেই অমৃত ভগবানেরই সন্তান। প্রত্যেক জীবাত্মা সেই একই পরমাত্মা হইতে উদ্ভূত। অতএব আমরা যদি সেই আত্মার প্রকৃত স্বরূপ অবগত হই, তাহা হইলে চিরতরে এই সাম্প্রদায়িক-বিদ্বেষের অবসান ঘটাইয়া আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিব। তখন আর কোন জাতিভেদ, বর্ণভেদ, ভাষাভেদ, প্রাদেশিকতা আমাদের মধ্যে বিভেদের প্রাচীর সৃষ্টি করিতে পারিবে না। সাম্প্রদায়িক-সম্প্রীতির জন্য তখন ক্ষণস্থায়ী 'মানব-শৃঙ্খল', 'পদযাত্রার' প্রয়োজন হইবে না। আমরা সবাই সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের নিত্যদাস বলিয়া সগর্ব্বে আমাদের মনুষ্যত্বের প্রকৃত স্বরূপ বা পরিচয় প্রদান করিতে সমর্থ হইব।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি মূলকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ হইতে ৫২ বৎসর যাবৎ ক্রমাগত প্রতি বৎসরই শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব বিরাট্‌ভাবে অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন। শ্রীসমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ বিগত ১৪ই ফাল্গুন ১৩৪৮, ইং ২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪২, বৃহস্পতিবার হইতে ২০শে ফাল্গুন, ৪ঠা মার্চ্চ বুধবার পর্য্যন্ত সপ্তাহব্যাপী এই পরিক্রমা ও জন্মোৎসবের পুনঃ প্রবর্ত্তন করেন। জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদ ১৯১৫ সাল হইতে ১৯৩৬ সাল পর্য্যন্ত ২২ বৎসর যাবৎ এই শ্রীধাম-পরিক্রমা ও জন্মোৎসব করিয়াছিলেন। শ্রীবেদান্ত সমিতি তাঁহারই পদাঙ্কানুসরণ করিয়া আনুকরণিকগণের রীতি-নীতি হইতে বৈশিষ্ট্য

সংরক্ষণপূর্ব্বক এই বিরাট্ সেবা বিশুদ্ধভাবে সংরক্ষণ ও প্রচলন করিয়াছেন। জনসাধারণ সর্ব্বতোভাবে আজ ৫২ বৎসর যাবৎ এই পরিক্রমা-সেবায় যোগদান করিয়া প্রভূত সুকৃতি ও ভক্তিলাভের সুযোগ পাইয়াছেন। তজ্জন্য আমরা পরিক্রমাকারী সকল সজ্জনমণ্ডলীকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

বর্ত্তমান বর্ষে ১৯শে ফাল্গুন বুধবার হইতে ২৩শে ফাল্গুন রবিবার পর্য্যন্ত পঞ্চ-দিবস নবদ্বীপ-মণ্ডলের ৯টী দ্বীপ পরিক্রমা করা হয়। প্রকৃতিদেবী প্রসন্ন থাকায় এ বৎসর অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে পরিক্রমা পরিচালিত হইয়াছে। পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিজীবন জনার্দ্দন গোস্বামী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিগ্রহ আশ্রম মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, শ্রীমৎ বৈষ্ণব মহারাজ, শ্রীমৎ ত্রিদণ্ডী মহারাজ, শ্রীমৎ পর্য্যটক মহারাজ, শ্রীমৎ সন্ন্যাসী মহারাজ, শ্রীমৎ বিষ্ণু মহারাজ, শ্রীমৎ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীমৎ যতি মহারাজ প্রভৃতি ত্রিদণ্ডি-পাদগণ এবং কতিপয় ব্রহ্মচারী প্রত্যহ শ্রীধাম-মাহাত্ম্য ও হরিকথা পরিবেশন করিয়া যাত্রিগণের অশেষ কল্যাণ বিধান করেন।

শ্রীনৃসিংহপল্লীতে ও শ্রীমায়াপুর-যোগপীঠে বিপুল সংখ্যক যাত্রীসাধারণকে এবং স্থানীয় ভক্তবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। যোগপীঠে প্রসাদবিতরণ-নৈপুণ্য দর্শন করিয়া সকলে সমিতির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন।

২৪শে ফাল্গুন, সোমবার অর্থাৎ শ্রীগৌরাবির্ভাব-তিথি-বাসরে ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যভাগবত-পারায়ণ ও মধ্যে মধ্যে কীর্ত্তন হইতে থাকে। অদ্য শ্রীসমিতির সভাপতি-আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ তিনজন সেবককে এবং দেড় শতাধিক হরিভজন-পিপাসু নর-নারীকে শ্রীনাম-দীক্ষা প্রদান করেন। সন্ধ্যায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিষেক ও বিশেষ ভোগ-রাগাদির পর যাত্রিগণকে অন্নকল্প-প্রসাদ পরিবেশন করা হয়। তৎপরে ব্রহ্মচারিগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত কৃষ্ণলীলা-সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতান্তে ব্রহ্মচারীবৃন্দ ভাগবতীয়-শিক্ষা সম্বন্ধে একটী ছোট নাটক মঞ্চস্থ করেন। তৎপরে ভি. ডি. ও. যোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শিত হয়।

২৫শে ফাল্গুন, মঙ্গলবার সাধারণ-মহোৎসবের দিন যাত্রিগণ ব্যতীত আগন্তুক সকলকেই মহাপ্রসাদ পরিবেশন করা হয়। এই মহোৎসবের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত আনুমানিক প্রায় এক লক্ষ জনসাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

এই মহোৎসবে সমিতির সেবকগণের সেবাপ্রচেষ্টা সত্যই প্রশংসনীয়।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিচালক-সমিতির পক্ষ হইতে সভাপতি-আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ সমিতির সেবকগণের বিভিন্ন প্রকার সেবা-সৌষ্ঠব সন্দর্শনপূর্ব্বক শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে নিম্নলিখিত ব্রহ্মচারিগণকে সেবাসূচক উপাধিদ্বারা ভূষিত করিয়াছেন।—

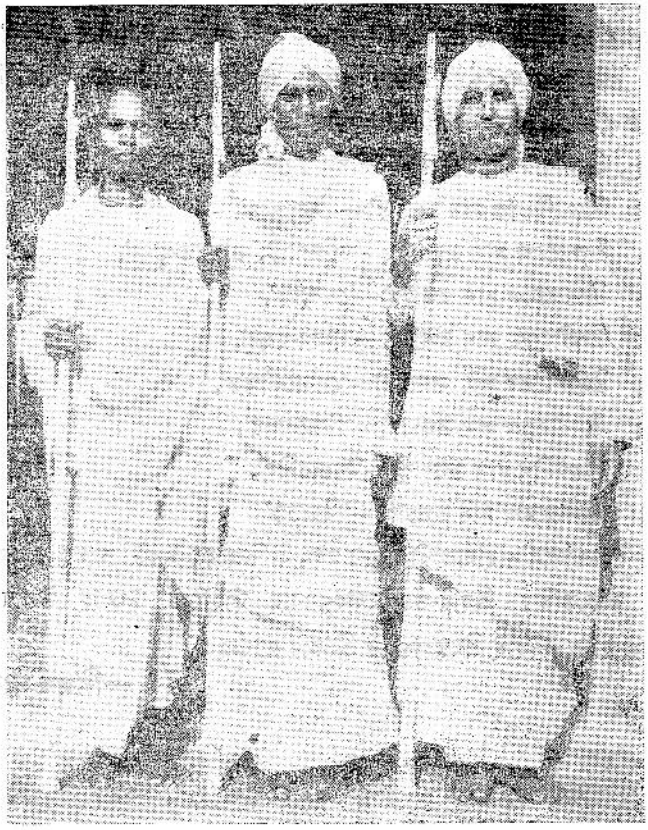
১। শ্রীগৌরাঙ্গপদ ব্রহ্মচারী—'কীর্ত্তন-সুধাকর',
২। শ্রীগোপীকান্ত দাস ব্রহ্মচারী—'সেবাভূষণ',
৩। শ্রীশুভানন্দ দাস ব্রহ্মচারী—'ভক্তিশাস্ত্রী, ভাগবত-ভূষণ',
৪। শ্রীপ্রেমানন্দ দাস ব্রহ্মচারী—'সেবারত্ন',
৫। শ্রীশচীনন্দন দাস ব্রহ্মচারী—'সজ্জন-সুহৃদ্',
৬। শ্রীনীলমাধব দাস ব্রহ্মচারী—'সেবাকৌস্তুভ',
৭। শ্রীনবীনকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী—'বিদ্যালঙ্কার',
৮। শ্রীজগদীশ দাস ব্রহ্মচারী—'নয়কোবিদ্',
৯। শ্রীসত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী—'বিদ্যারত্ন'।

এই মহদনুষ্ঠানে সাহায্যকারী সহৃদয় মহৎ ব্যক্তিগণের নিকট আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় তাঁহাদের উৎসাহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক—ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণে প্রার্থনা।

—নিজস্ব সংবাদ

ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস

গত ২৪শে ফাল্গুন ১৩৯৯, (ইং ৮।৩।৯৩) সোমবার—শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে সমিতির সভাপতি-আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের নিকট হইতে পূজ্যপাদ শ্রীখগপতি দাসাধিকারী, শ্রীরামগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীবলভদ্র দাস ব্রহ্মচারী ত্রিদণ্ডি-যতিবেষ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা যথাক্রমে—**ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত গোবিন্দ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ** নামে সর্ব্বজন-সমক্ষে অভিহিত হইয়াছেন। উপরিউক্ত ত্রিদণ্ডিপাদগণ কায়, মন ও বাক্যকে দণ্ডিত করিয়া শ্রীভগবৎ-সেবায় চিরতরে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।



বামদিক হইতে যথাক্রমে শ্রীমৎ পুরী মহারাজ, শ্রীমৎ বোধায়ন মহারাজ ও শ্রীমৎ গোবিন্দ মহারাজ

ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন ভক্তগণ প্রাতঃকাল হইতেই উপবাস-মুখে সংকীর্ত্তন-সহযোগে শ্রীশ্রীগৌরজয়ন্তী-তিথিবরার আরাধনায় মগ্ন ছিলেন। বেলা ১০-৪৫ মিনিটে উক্ত সেবকত্রয়ের সন্ন্যাস-গ্রহণোপলক্ষে বৈষ্ণব-স্মৃতি সংস্কার-দীপিকার বিধানানুযায়ী যজ্ঞ ও হোমাদি অনুষ্ঠিত হয়। পরমারাধ্য শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে ও পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের পরিচালনায় উচ্চসঙ্কীর্ত্তন ও জয়ধ্বনিতে দিঙ্‌মণ্ডল মুখরিত ও নিনাদিত হয়। সেইকালে সর্ব্বজন-সমক্ষে পূর্ব্বোক্ত সেবকগণ শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট হইতে সন্ন্যাস-মন্ত্র ও অষ্টোত্তরশত-নামের অন্তর্গত ভক্তি-সূচক নাম প্রাপ্ত হইয়া ত্রিদণ্ডি-যতিবেষ ধারণ করেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পুরী মহারাজ

শ্রীমৎ পুরী মহারাজ বাংলা ১৩৩১ সালের আষাঢ় মাসে আসাম-প্রদেশান্তর্গত বর্ত্তমান বঙ্গাইগাঁও জেলার কাছুয়াগাঁও গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্বনাম ছিল—শ্রীখগেন্দ্রনাথ রায়। পিতা—শ্রীবাণেশ্বর রায় ও মাতা—শ্রীমতী বুধেশ্বরী রায়। সংসারী-জীবনে তিনি একজন আদর্শ নিষ্ঠাবান্ ও সদ্‌গৃহস্থ ছিলেন। গৃহস্থাবস্থা হইতেই তাঁহার শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি অনুরাগ, শ্রদ্ধা-ভক্তি ও দৃঢ়বিশ্বাস ছিল। শ্রীসমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ আসাম প্রদেশে প্রচারকালে তাঁহার গৃহে শুভাগমনপূর্ব্বক শ্রীভাগবত-ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। নিয়ামক-মহারাজের শ্রীমুখনিঃসৃত হরিকথায় আকৃষ্ট হইয়া তিনি সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতিতে যোগদান করেন। ইংরাজী ১৯৫৪ সালে শ্রীল কেশব গোস্বামীর নিকট হইতে শ্রীহরিনাম গ্রহণ করেন এবং ১৯৫৬ সালের মাঘ মাসে দীক্ষাগ্রহণপূর্ব্বক শ্রীখগপতি দাসাধিকারী নামে পরিচিত হন। তদবধি তিনি একনিষ্ঠভাবে শ্রীসমিতির শাখামঠ—শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠে (আসাম) শ্রীগুরু-বৈষ্ণবসেবা করিতেছেন।

কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে তিনি সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-আচার্য্যের নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণের প্রার্থনা জানাইয়া আসিতেছিলেন। বর্ত্তমান বর্ষে শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহাকে সন্ন্যাস-বেষ প্রদান করেন এবং তিনি **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পুরী মহারাজ** নামে পরিচিত হন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত গোবিন্দ মহারাজ

শ্রীমৎ গোবিন্দ মহারাজ শ্রীধাম নবদ্বীপের অন্তর্গত মধ্যদ্বীপে নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর ও শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নামহট্ট আনন্দবাস গৌরনগরের নিকট নূতন ঘোলাপাড়ায় ইং ১৯৫৮ সালে পৌষী-পূর্ণিমায় শ্রীদেবেন চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতা শ্রীমতী পুষ্পরাণী ঘোষ শ্রীসমিতির আশ্রিতা। তাঁহার পূর্ব্বনাম ছিল শ্রীরামচন্দ্র ঘোষ। বাল্যকাল হইতে হরিভজনে তাঁহার প্রবল উৎসাহ ছিল। সেকারণে ছাত্রজীবনে ১৮ বৎসর বয়সেই গৃহত্যাগ করত শ্রীসমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে যোগদান করেন। ১৯৭৬ সালে শ্রীগৌর-পূর্ণিমার পরদিবস অর্থাৎ শ্রীগৌর-প্রতিপদ তিথিতে শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের নিকট শ্রীনাম গ্রহণ করেন এবং ১৯৭৭ সালে দীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীরামগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী নামে পরিচিত হন।

তদবধি সেবকসূত্রে সমিতির শাখামঠ শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ (পুরী) এবং শিলিগুড়িস্থ শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষকরূপে সেবাকার্য্য করিতেছেন। তিনি মধ্যে মধ্যে শ্রীল গুরুপাদপদ্মের প্রচারপার্টিতেও যোগদান করিতেন। বর্ত্তমানে শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে সন্ন্যাস-বেষ গ্রহণ করিয়া চতুর্থাশ্রমে প্রবেশ করত **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত গোবিন্দ মহারাজ** নামে অভিহিত হন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

শ্রীমৎ বোধায়ন মহারাজ মেদিনীপুর জেলার সবং থানার অন্তর্গত বিকলবাড় গ্রামে ১লা আশ্বিন ১৩৬৩ (ইং ১৭।৯।১৯৫৬), সোমবার জন্মগ্রহণ করেন। পিতা—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ জানা ও মাতা—শ্রীমতী চারুবালা জানার স্নেহ-যত্নে লালিত-পালিত হন। তিনি ছিলেন তাঁহার পিতার দ্বিতীয় পক্ষের মধ্যম সন্তান। তাঁহার পূর্ব্বনাম—শ্রীবাদল কুমার জানা। তাঁহার মাতা-পিতা উভয়েই শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট হইতে শ্রীনাম-দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীমৎ বোধায়ন মহারাজ প্রায় ৮ বৎসর বয়স হইতে নিরামিষাশী ছিলেন। ছাত্রাবস্থাতেই তাঁহার রামায়ণ ও মহাভারত আলোচনায় বিশেষ অনুরাগ ছিল। ১৯৭৫ সালে নারায়ণবাড় হাইস্কুল হইতে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপরে ১৯৭৮ সালে পদার্থবিদ্যায় অনার্স লইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত পাঁশকুড়া বনমালী কলেজ হইতে B. Sc. পাশ করেন এবং ১৯৭৯ সালের মার্চ্চ মাসে শ্রীধাম নবদ্বীপে সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে আসিয়া শ্রীগুরুপাদাশ্রয় করেন। ঐ বৎসর এপ্রিল মাসে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের নিকট হইতে শ্রীহরিনাম গ্রহণ করত সমিতির শাখাকেন্দ্র শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠে সেবকরূপে নিযুক্ত হন এবং আগষ্ট মাসে দীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক গৈরিক বেষ প্রাপ্ত হন।

পরবর্ত্তিকালে মঠের বিভিন্ন সেবাকার্য্যের মধ্যে নিযুক্ত থাকিয়াও ১৯৮০ সালে Guwahati Homeopathic Medical College হইতে M. D. (H) ও B.D. D. ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৮৩ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ হইতে 'জ্যোতিষার্ণব' উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯৮৪ সালে শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষকের সেবাভার গ্রহণপূর্ব্বক অদ্যাবধি সুষ্ঠুভাবে সেবাকাজ করিতেছেন। ১৯৮৭ সালে শ্রীসমিতির পরিচালনাধীন শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত বিদ্যাপীঠের প্রধান-শিক্ষক ও সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি শ্রীসমিতির মাসিক মুখপত্র শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিয়া শ্রীপত্রিকার সেবাও করিতেছেন। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ তাঁহার বিবিধ সেবাকার্য্যে বিশেষ সন্তুষ্ট ও প্রীত আছেন। বর্ত্তমান বর্ষে শ্রীগুরুপাদপদ্মের নির্দ্দেশে তিনি ত্রিদণ্ডি-যতিবেষ গ্রহণ করত চতুর্থাশ্রম—সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশপূর্ব্বক **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ** নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

—শ্রীসত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষক্সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪৫শ বর্ষ | ৮ ত্রিবিক্রম, গর্ভোদশায়ী, ৫০৭ শ্রীগৌরাব্দ | ৩য় সংখ্যা
৩১ বৈশাখ, শুক্রবার, ১৪০০, ইং ১৪/৫/৯৩

সানুবাদং শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস-বিলিখিতম্

শ্রীমার্কণ্ডেয়-কৃতম্ শ্রীশ্রীবদরীনারায়ণ-স্তোত্রম্

[শ্রীস্কান্দে বিষ্ণুখণ্ডে বদরীমাহাত্ম্যে দ্বিতীয়েঽধ্যায়েঃ]

১। অন্তেকঃ পরমোপায়ো ভবতঃ পাপনিষ্কৃতৌ।
সর্ব্বভক্ষাখ্যদোষস্য বদরীং শরণং ব্রজ॥ ২৮॥

(শ্রীব্যাস বলিলেন,—) হে বৈশ্বানর! আপনার পাপ-নিষ্কৃতির এক পরম উপায় বিদ্যমান রহিয়াছে। **আপনি বদরীর শরণ গ্রহণ করুন,** তবেই আপনার সর্ব্বভুক্ নামের দোষ উপশম হইবে॥ ১॥

২। যত্রাস্তে ভগবান্ সাক্ষাদ্দেবদেবো জনার্দ্দনঃ।
ভক্তানামপ্যভক্তানামঘহা মধুসূদনঃ॥ ২৯॥

৩। তত্র গঙ্গাম্ভসি স্নাত্বা কৃত্বা প্রদক্ষিণং হরেঃ।
দণ্ডবৎ-প্রণিপাতেন সর্ব্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ৩০ ॥

যে-স্থানে সাক্ষাৎ ভগবান্ দেবদেব জনার্দ্দন বিরাজ করেন এবং সেই মধুসূদন কি অভক্ত, কি ভক্ত, সকলেরই পাপ বিনষ্ট করিয়া থাকেন; আপনি তথায় গমনপূর্ব্বক জাহ্নবীজলে স্নান, হরির প্রদক্ষিণ এবং তাঁহার চরণকমলে দণ্ডবৎ প্রণিপাত করুন। এইরূপ করিলেই আপনার সকল পাপ ক্ষয় হইবে ॥ ২-৩ ॥

৪। ততো ব্যাসমুখাচ্ছ্রুত্বা ঋষীণামনুবাদতঃ।
উত্তরাভিমুখো বহ্নির্গন্ধমাদনমাযযৌ ॥ ৩১ ॥

অনন্তর বৈশ্বানর শ্রীব্যাসের মুখে এবম্বিধ বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক ঋষিগণের অনুমোদন-ক্রমে উত্তরাভিমুখ হইয়া গন্ধমাদনে গমন করিলেন ॥ ৪ ॥

৫। ততো বদরিকাং প্রাপ্য স্নাত্বা গঙ্গাম্ভসি স্বয়ম্।
নারায়ণাশ্রমং গত্বা নত্বা প্রোবাচ ভক্তিমান্ ॥ ৩২ ॥

তিনি ক্রমে **বদরিকাশ্রমে উপনীত** হইয়া গঙ্গাজলে স্নান করত **নারায়ণাশ্রমে** গমনপূর্ব্বক ভক্তিভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন,—॥ ৫ ॥

অগ্নিরুবাচ,—

৬। বিশুদ্ধ-বিজ্ঞানঘনং পুরাণং, সনাতনং বিশ্বসৃজাং পতিং গুরুম্।
অনেকমেকং জগদেকনাথং, নমাম্যনন্তাশ্রিত-শুদ্ধবুদ্ধিম্ ॥ ৩৩॥

অগ্নি বলিলেন,—যিনি বিশুদ্ধ, বিজ্ঞানঘন, পুরাণ, সনাতন, প্রজাপতিপতি, গুরু, অনেক, এক, জগতের একমাত্র নাথ, অনন্ত, আশ্রয় ও শুভবুদ্ধি—আমি সেই বিভুকে নমস্কার করি ॥ ৬ ॥

৭। মায়াময়ীং শক্তিমুপেত্য বিশ্ব-কর্ত্তারমুদ্দিশ্য রজোপযুক্তম্।
সত্ত্বেন চাস্য স্থিতিহেতুমুগ্রমথো তমোভির্গ্রসিতারমীড়ে ॥ ৩৪ ॥

যিনি বিশ্ব-সৃষ্টির নিমিত্ত স্বীয় মায়াময়ী শক্তির আশ্রয়ে রজোযুক্ত হইয়াছেন, বিশ্বপালনের জন্য যাঁহার সত্ত্বমূর্ত্তির বিকাশ এবং সেই বিশ্বের গ্রাসের জন্যই যিনি পুনরায় উগ্র তমোমূর্ত্তি অবলম্বন করেন, আমি সেই বিভুকে পূজা করি ॥ ৭ ॥

৮। অবিদ্যয়া বিশ্বমোহিতাত্মা, বিদ্যৈকরূপং বিততং ত্রিলোক্যাম্।
বিদ্যাশ্রিতত্বাৎ সকলজ্ঞমীশ মবিদ্যায় তু জীবোঽহং
প্রপদ্যে ॥ ৩৫ ॥

যিনি অবিদ্যাদ্বারা বিশ্বকে বিমোহিত করেন, ত্রিলোকে যাঁহার একমাত্র

বিদ্যা-রূপ বিস্তৃত, বিদ্যার আশ্রয়ে যিনি সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর, আমি অবিদ্যাহত জীব তাঁহার শরণাগত হই ॥ ৮ ॥

৯। ভক্তেচ্ছয়াবিষ্কৃত-দেহযোগমাভোগ-ভোগার্পিতযোগযোগম্।
কৌশেয়-পীতাম্বর-জুষ্টশক্তিং, বিচিত্রশক্ত্যষ্টময়েষ্টমীড়ে ॥ ৩৬ ॥

যিনি ভক্তের ইচ্ছায় দেহযোগের আবিষ্কার করেন এবং ভক্তের ইচ্ছাতেই ভোগ-ব্যাপার প্রকাশাপ্রকাশ করেন ; যিনি পীত-বসনধারী ও শক্তির সহিত মিলিত এবং যিনি বিচিত্র অষ্টশক্তিময়, আমি সেই ইষ্টদেবকে স্তব করি ॥ ৯ ॥

১০। অথ প্রসন্ন ভগবান্ স্তুতঃ সর্ব্বৈর্হৃদি স্থিতঃ।
প্রোবাচ মধুরং বাক্যং পাবকং পাবনার্থিনম্ ॥ ৩৭ ॥

অনন্তর সর্ব্বভূতের দেহবিহারী প্রসন্নাত্মা ভগবান্ এইরূপে স্তুত হইয়া পাবনার্থী পাবককে মধুর বাক্য বলিতে লাগিলেন,—॥ ১০ ॥

শ্রীনারায়ণ উবাচ,—

১১। বরং বরয় ভদ্রান্তে বরদোঽহমুপাগতঃ।
স্তবেনানেন তুষ্টোঽস্মি বিনয়েন তবানঘ ॥ ৩৮ ॥

ভগবান্ নারায়ণ বলিলেন,—হে অনঘ! আমি তোমার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বরদরূপে সমাগত হইয়াছি, তোমার মঙ্গল হউক, তুমি বর প্রার্থনা কর ॥ ১১ ॥

অগ্নিরুবাচ,—

১২। জ্ঞাতং ভগবতা সর্ব্বং যদর্থমহমাগতঃ।
তথাপি কথয়াম্যেতদীশ্বরাজ্ঞানুপালনম্ ॥ ৩৯ ॥

১৩। সর্ব্বভক্ষ্যো ভবাম্যেব নিষ্কৃতিস্তু কথং ভবেৎ।
অত্যন্ত-ভয়সম্পত্তিরেতস্মাজ্জায়তে মম ॥ ৪০ ॥

অগ্নি উত্তর করিলেন,—হে ভগবন্! যদিও আপনি সমস্তই জানিতে পারিয়াছেন যে, কিজন্য আমি উপস্থিত হইয়াছি, তথাপি ঈশ্বরাজ্ঞা পালন করা আমার উচিত ; এই কর্ত্তব্যবোধে বলিতেছি,—হে বিভো! আমি যদি সর্ব্বভক্ষ্যই হইলাম, তবে আমার নিষ্কৃতি কিরূপে হইবে? এজন্য আমার অত্যন্ত ভীতি জন্মিতেছে ॥ ১২-১৩ ॥

শ্রীনারায়ণ উবাচ,—

১৪। ক্ষেত্রদর্শনমাত্রেণ প্রাণিনাং নাস্তি পাতকম্।
মৎপ্রসাদাৎ পাতকন্তু ত্বয়ি মাস্তু কদাচন ॥ ৪১ ॥

শ্রীনারায়ণ কহিলেন—হে অগ্নে! এই ক্ষেত্র দর্শনমাত্রেই প্রাণিগণের পাতক বিনষ্ট হইবে, আর আমার অনুগ্রহে কদাচ তোমাকে পাপ স্পর্শ করিতে পারিবে না ॥ ১৪ ॥

১৫। ততঃ প্রভৃতি ভূতাত্মা পাবকঃ সর্ব্বতো ভৃশম্।
কলয়াবস্থিতশ্চাত্র সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিতঃ ॥ ৪২ ॥

হে স্কন্দ! তদবধি ভূতাত্মা পাবক সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিত হইয়া পূর্ণ-কলায় সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে ॥ ১৫ ॥

১৬। য এতৎ প্রাতরুত্থায় শৃণোতি শ্রাবয়েচ্ছুচিঃ।
অগ্নিতীর্থ-কৃতস্নানফলং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥ ৪৩ ॥

যে শুচি মানব প্রভাতে শয্যা পরিত্যাগের পর এই উপাখ্যান শ্রবণ করে, নিঃসংশয়ে তাহার অগ্নিতীর্থ-স্নানের ফললাভ হয় ॥ ১৬ ॥

প্রশ্নোত্তর

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৫শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৪৭ পৃষ্ঠার পর]

৩০। কৃষ্ণলীলা কি মানব-কল্পিত ব্যাপার নহে?

"কৃষ্ণলীলা কোন নর কল্পনার বিষয় নয়, অথবা বঞ্চিত লোকের অধম ও অন্ধ বিশ্বাস নয়, ইহা কেবল পরমার্থজ্ঞ ব্যক্তিগণই বুঝিতে পারেন। ** তার্কিক ও নৈতিক বুদ্ধি কৃষ্ণলীলার মাহাত্ম্য স্পর্শ করিতে পারে না। ** তর্ক, নীতি, জ্ঞান, যোগ ও ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার একদিকে অতিশয় ক্ষুদ্ররূপে পড়িয়া থাকে এবং ব্রজতত্ত্বের মহাদীপক অপ্রাকৃত-বুদ্ধিশালী ব্যক্তিদিগের হৃদয়ে অন্যদিকে দেদীপ্যমান হইয়া চিদালোক বিতরণ করে।"

—শ্রীমঃ শিঃ ৫ম পঃ

৩১। কৃষ্ণলীলা কি আধ্যাত্মিক বা রূপক?

"আমরা বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণ-লীলাকে অপ্রাকৃত মনে করি, আধ্যাত্মিক মনে করি না। রূপক-বর্ণনদ্বারা শুষ্ক অভেদবাদকে বুঝাইবার জন্য যে-সকল চেষ্টা হয়, তাহা আধ্যাত্মিক; কেন না, তাহাতে প্রাকৃত-বৈচিত্র্য অবলম্বনপূর্ব্বক তন্নিরসন-দ্বারা অদ্বৈতবাদ বলা হয়। কিন্তু ব্রজলীলা বর্ণন সেরূপ নয়। প্রাকৃত বৈচিত্র্যের আদর্শ-স্থলীয় অপ্রাকৃত-চিন্ময়-বৈচিত্র্য আছে। যে-সকল বর্ণন পাঠ করিয়া অপ্রাকৃত-বৈচিত্র্য উপলব্ধি করা যায়, তাহাকে অপ্রাকৃত বর্ণন বলে।"

—'সমালোচনা', সঃ তোঃ ৬।২

৩২। কৃষ্ণলীলা কেন আধ্যাত্মিক নহে ?

"কৃষ্ণলীলা আধ্যাত্মিকী নয়। যে-স্থলে সকল তত্ত্বই একমাত্র ব্রহ্মাত্মায় পর্য্যবসিত করা যায়, সেই স্থলে আধ্যাত্মিক ক্রিয়ার উদয় হয়, মায়াবাদই আধ্যাত্মিক ব্যাপার। আধ্যাত্মিক অর্থের ও ভাবের যেখানে প্রবলতা, সেখানে কৃষ্ণলীলা ও চিন্ময় বৃন্দাবন-লীলার নির্ব্বাণ হয়। কৃষ্ণলীলা বিচিত্র। আধ্যাত্মিক-ভাব ও বৈচিত্র্য-ভাব – পরস্পর বিপরীত। আধ্যাত্মিক-ভাবে সেই পরম তত্ত্ব এক ও অদ্বিতীয় সুপ্তশক্তিক ব্রহ্ম। বিচিত্র শক্তি-ক্রিয়াতেই কেবল নিত্যরূপে কৃষ্ণ-লীলার উদয় হয়। এই দুইটী ভাব পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও পরম-তত্ত্বে পরস্পর বিরোধ করে না। সুতরাং জ্ঞানমার্গে আধ্যাত্মিক ভাবে যখন 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ব্রহ্ম উদিত থাকেন, সেইকালেই বিচিত্রশক্তিসম্পন্ন পরমতত্ত্ব নিত্যধাম বৃন্দাবনে কৃষ্ণলীলা প্রকাশ করিতে থাকেন। মানব-বিচারে এইরূপ যুগপৎ আধ্যাত্মিক ও অপ্রাকৃত-তত্ত্ব স্থান পায় না ; কিন্তু যাঁহার প্রতি সেই পরম-তত্ত্বের কৃপা হয়, তিনিই সেই বিরুদ্ধ তত্ত্বে সামঞ্জস্য দেখিতে পান। অচিন্ত্যশক্তিক্রমেই এই যুগপৎ ভেদাভেদ সিদ্ধ হইয়াছে।"　　—'সমালোচনা', সসঙ্গিনী সঃ তোঃ ৮।৭

৩৩। কৃষ্ণলীলা কি পাঞ্চভৌতিক ব্যাপার-বিশেষ ?

"অপ্রাকৃত-লীলায় যে-কিছু ব্যাপার বর্ণিত আছে, সকলই নিত্যসত্য, কখনই রূপকভাবে কল্পিত হয় নাই। জড়ীয় ইতিহাস ও অপ্রাকৃত লীলার ভেদ এই যে, জড়ীয় ইতিহাস সম্পূর্ণ ভৌতিক ও দেশ-কালের অধীন, সুতরাং অনিত্য। অপ্রাকৃত-লীলা জড়ীয় ব্যাপারের ন্যায় ভাসমান হইলেও তাহাতে ভৌতিকত্ব নাই ; সে-সমস্তই চিন্ময়। ভৌতিক চক্ষে কৃষ্ণকৃপায় দৃষ্ট হইতে পারে বলিয়া তাহার কোন অংশই এই পাঞ্চভৌতিক জগতের ব্যাপার নয়। কৃষ্ণলীলা প্রকৃতির অতীত, বস্তুতঃ ইন্দ্রিয়াতীত বলিলে জড়েন্দ্রিয়ের অতীত— এইমাত্র বুঝিতে হইবে ; তাহা চিন্ময় জীবের চিদিন্দ্রিয়েরই গ্রাহ্য বটে।"

—'সমালোচনা', সসঙ্গিনী সঃ তোঃ ৮।৭

৩৪। কৃষ্ণলীলা কিরূপে নির্গুণ ? কৃষ্ণলীলার উপকরণ কি ?

"এই জগৎ চিজ্জগতের প্রতিফলিত তত্ত্ব। এখানে মায়াদ্বারা সকলই কলুষিত হইয়া আছে। চিজ্জগতে মায়া ও তদীয় ত্রিগুণ না থাকায় সমস্তই অনবদ্য ; সমস্তই শুদ্ধসত্ত্বময়। কালও তদ্রূপ ; দেশও তদ্রূপ। কৃষ্ণলীলা মায়াতীত ত্রিগুণাতীত ; সুতরাং নির্গুণ। সেই লীলার রস পুষ্টি করিবার জন্য নির্দ্দোষ-কাল, নির্দ্দোষ-দেশ ও নির্দ্দোষ-আকাশ-জলাদি কৃষ্ণলীলার উপকরণ। সুতরাং সেই চিন্ময়কালে (যাহাতে জড়ীয় কালের বিক্রম নাই) কৃষ্ণ-

লীলা অষ্টকালীয়,—নিশান্তকাল, প্রাতঃকাল, পূর্ব্বাহ্নকাল, মধ্যাহ্নকাল, অপরাহ্ণ-কাল, সায়ংকাল, প্রদোষকাল ও রাত্রিকাল—এইরূপ অষ্টকালে দিবা-রাত্রি বিভক্ত হইয়া কৃষ্ণলীলার নিত্য অখণ্ডরসের পুষ্টি করিতেছে।" —চৈঃ শিঃ ৬।৫

৩৫। প্রকট-ব্রজলীলা কয়প্রকার ?

"প্রকট-ব্রজলীলা নিত্য ও নৈমিত্তিক-ভেদে দুই প্রকার—ব্রজে অষ্টকালীয়া লীলাই নিত্য ; আর পূতনা-বধাদি ও দূর প্রবাসাদি নৈমিত্তিক লীলা।"

—জৈঃ ধঃ ৩৮ শ অঃ

৩৬। অসুর-মারণাদি-লীলায় কি শিক্ষা আছে ?

"অসুরমারণাদি-লীলায় ব্যতিরেকরূপে কৃষ্ণতত্ত্ব জানা যায়।"

—চৈঃ শিঃ ২ খণ্ড ৭।৭

৩৭। ভগবান্ সাকার,—না নিরাকার ?

"তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তিতে তিনি যুগপৎ নিরাকার ও চিৎসাকার। চিৎসাকার হইতে পারেন না—একথা বলিলে তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তি অস্বীকার করা হয়।"

—জৈঃ ধঃ ১ শ অঃ

৩৮। বেদ পরমেশ্বরকে নিরাকার বলেন কেন ?

"জড় পদার্থের যেরূপ একটী স্থূল আকার থাকে, ঈশ্বরের সেরূপ আকার নাই। এইজন্যই আমরা তাঁহাকে ইন্দ্রিয়দ্বারা লক্ষ্য করিতে পারি না—এইজন্যই বেদে কোন কোন স্থানে তাঁহার নিরাকার (?) বলিয়া উক্তি হইয়াছে।" —চৈঃ শিঃ ১।১

(ক্রমশঃ)

—জগদগুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

যত dear and near ones—সকলেরই সঙ্গ ছেড়ে দিতে হবে, যদি তাঁরা চৈতন্যবিমুখ হন। চৈতন্যবিমুখ কিনা, তা জানবার উপায়—প্রকৃত চৈতন্যভক্তের প্রতি মৎসরতা কার কতটুকু আছে, তাই দেখে। প্রকৃত চৈতন্যভক্তের প্রতি মৎসর ব্যক্তি চৈতন্যবিমুখ, আর চৈতন্যভক্তের মনোঽভীষ্টপূরণে আনুকূল্যকারী ব্যক্তিই শ্রীচৈতন্যের সেবোন্মুখ। প্রাকৃত সহজিয়াগণ চৈতন্যভক্তের বিদ্বেষ করে নিজদিগকে চৈতন্যের প্রতি উন্মুখ মনে করে থাকেন। এরূপ লোক যতই আত্মীয় বলে পরিচিত থাকুক না কেন, তাদের দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করতে হবে।

যাঁরা নিত্য কৃষ্ণকথা নিয়ে দিন কাটান, তাঁরাই সৎ বা সাধু, আর যারা জগদ্-ভোগের অনিত্য কথা নিয়ে বা কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ বা বিলাসের কথা বাদ দিয়ে নির্ব্বিশেষ-বিচারের কথা নিয়ে দিন কাটান, তারাই হলেন অসৎ বা অসাধু। আমাদের কেবল কার্য্য হচ্ছে দুঃসঙ্গটা ছেড়ে দেওয়া ও অকৃত্রিম সাধুতে পরিনিষ্ঠিত হওয়া।

জীব আত্মবিস্মৃত হয়ে নিজেই কর্ত্তা সেজে পড়েন, তখন ভূতোদ্বেগ প্রদান অথবা শ্রীগোবিন্দের সেবক বৈষ্ণবগণের উপরও প্রভুত্ব বিস্তার করবার ইচ্ছা হয়। কৃষ্ণদাস জীবকে উদ্বেগ প্রদান করলে কৃষ্ণসেবা হয় না। ভগবানের সেবকগণ তাঁর সেবকের সেবা করেন। হরিসেবা-বিমুখগণ গুরুদাস নন। এই মায়িক জগতে—এই বিবাদের যুগে ইতর কথার প্রাবল্যই অধিক। সুতরাং আমাদের পক্ষে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত এই বিবদমান জগতে ভগবান্ অনন্তের কথা প্রচার করে যাওয়া কর্ত্তব্য। শ্রীঅনন্তদেবের কৃপা হলে এবং কৃপাপ্রার্থী ব্যক্তি নিষ্কপট হলে সেই জীব মায়ামুক্ত হয়ে তাঁকে লাভ করেন।

ভগবানের নিকট হতে সেবা গ্রহণ করতে হবে না, তাঁকে সেবা নিবেদন করতে হবে। লোক নাস্তিক হয়ে জলবায়ু, পোশাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি কতরূপে ভগবানের সেবা গ্রহণ করছে। ইতর জন্তুগুলিও ভগবানের সেবার জন্য সৃষ্ট হয়েছে; পশুগুলিকে আমাদের সেবায় নিযুক্ত করলে ভগবানের প্রতি অবজ্ঞা করা হয়।

জীব কখনও কৃষ্ণমায়াকে জয় করতে পারে না। কৃষ্ণভক্তের সঙ্গফলে সাধু-গুরু-কৃপায় জীব মায়ার কবল থেকে উদ্ধার পেতে পারে; আর গুরুসেবা করলেই সমস্ত বৈষ্ণবের ও শ্রীহরির সেবা হয়ে যায়। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবমাত্রই মায়ামুক্তির একমাত্র উপায়-স্বরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা নিষ্কপটে করলে তাঁদের আর কোন ভয় থাকে না; তাঁরা অনায়াসে কৃষ্ণসেবা-লাভে সমর্থ হন। নিজের ইন্দ্রিয়-সুখের জন্য জীবকুলের যে চেষ্টা, সেটাই হচ্ছে যত অনর্থের মূল। সেটাকে প্রথমেই ছাড়তে হবে। আমরা যা সাধন-ভক্তির ক্রমাদি দেখছি, সমগ্র মনকে নিগ্রহ করবার উপায় ছাড়া আর কিছুই নয়। গুরুকৃপায় মন নিগ্রহ হলে আমরা সেবা যোগ্যতা-লাভে সমর্থ হতে পারব। মনুষ্য জন্ম ক্ষণভঙ্গুর, অতএব আমাদের প্রত্যেকের নিত্যমঙ্গলের জন্য চেষ্টা করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

হরিকথার শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণে নৈরন্তর্য্য না থাকলে ভোগ-বিচার আমাদিগকে গ্রাস করবে। আমরা প্রজল্পে মস্‌গুল হয়ে ধামসেবার বিচার হারাব, গ্রামবাস করে বসব, নানা অসুবিধায় পড়ব। হরিকথার শ্রবণ-কীর্ত্তনই সাধন ও সাধ্য। কত ভাগ্যফলে মনুষ্য জন্ম লাভ হয়, কত ভাগ্যফলে গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে

শ্রীধামে আসবার সৌভাগ্য হয়। প্রজল্পেই সময় কাটালে এই সৌভাগ্যকে অবজ্ঞা করা হল। সুতরাং সর্ব্বক্ষণ হরিকথা আলোচনা ও হরিসম্বন্ধীয় বিষয়ের অনুশীলন কর্ত্তব্য। ভগবৎ-প্রসঙ্গের অনুশীলনেই শ্রীমন্দিরের অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য উপলব্ধি হয়।

প্রাক্তন কর্ম্ম ও বাসনা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত চিত্ত স্থির হতে পারে না। আরোহবাদিগণ কৃত্রিম যোগ, তপস্যা প্রভৃতির দ্বারা চিত্তের যে স্থৈর্য্যবিধানের চেষ্টা করেন, তাতে চিত্তের আত্যন্তিক স্থৈর্য্য লাভ হয় না। হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে ও হরিলীলা-আলোচনার দ্বারা যে স্বাভাবিক স্মরণের উদয় হয়, তদ্দ্বারাই আমাদের চিত্ত বশীভূত হতে পারে। হাজার হোক্ না কেন চিত্ত শতভাবে অস্থির, যদি হরিপাদপদ্মসেবার জন্য চিত্তের সেই গতি থাকে, তাহলে চিত্ত কোথায় যাবে? হরিসেবার জন্য সহস্র কামনা—অনুক্ষণ হরিসেবার জন্য লৌল্যই চিত্তের প্রকৃত স্থৈর্য্য।

সৃষ্টিকর্ত্তা কে?

ব্রহ্মবাদিগণ বলেন,—ব্রহ্ম হইতেই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে; ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কোন বস্তু জগতের কারণ নহে। সেই পরমাত্মার মায়া তাঁহার শক্তিপ্রভাবে সৃষ্টি করিতে সমর্থা। মায়াবাদিগণ বলেন,—প্রকৃতি হইতেই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। প্রকৃতিবাদী প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধগণ দৃশ্য বস্তুকে প্রাকৃত বলিয়া জানিবার পরিবর্ত্তে ব্যবহারিক বা নিঃশক্তিক ব্রহ্মে বিলীন মনে করেন। ব্রহ্ম হইতে প্রকৃতির বিশেষত্ব নিরূপণ করতে গেলে অদ্বয়জ্ঞান বস্তু জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা ত্রিবিধ বিভাগে বিভক্ত হইয়া পড়েন, এই আশঙ্কায় বিবর্ত্তবাদাশ্রয় ব্যতীত মায়াবাদীর নিকট সৃষ্টির অন্য কারণ প্রতিভাত হয় না। কিন্তু ব্রহ্মবাদিগণ প্রকৃতিকে অজাগলস্তনসদৃশ জানিয়া তাহার কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করেন না। পরন্তু বিচার করেন, ব্রহ্মেতর শক্তি শক্তিমান্ হইতেই শক্তিত্ব লাভ করিয়াছেন ব্রহ্মই। জগতের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ। সেই উপাদান কারণ ভগবানের ইচ্ছাশক্তি-প্রভাবে প্রকৃতিতে ন্যস্ত হইয়াছেন মাত্র। ব্রহ্মবিদ্‌গণ উদাহরণ-স্থলে বলিয়াছেন,—"লৌহ যৈছে অগ্নি-শক্ত্যে করয়ে জারণ।"—সেই প্রকার প্রকৃতি শক্তিমত্তত্ত্ব ভগবান্ হইতেই শক্তি পাইয়াছেন। প্রকৃতির উপাদান কারকত্বে স্বকীয়া স্বতন্ত্রতা নাই। প্রকৃতি-পুরুষ-যোগ বা উপাদান কারণ হইতেই কার্য্যের উৎপত্তি।

ব্রহ্মসূত্রের ষষ্ঠপাদের শেষভাগে যে উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণ আলোচিত হইয়াছে উহা ব্রহ্মবাদের বিরোধী বা স্বতন্ত্র শক্তিবাদ নিরসনোদ্দেশ্যেই লিখিত। পঞ্চরাত্র বলেন,—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ পরব্যূহ হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। যাঁহারা বলেন,—পঞ্চরাত্রের বিচার নিরাস করিবার জন্যই উৎপত্ত্যসম্ভবাদিকরণ লিখিত হইয়াছে, সেই ভ্রান্ত মতবাদিগণ মনে করেন, পঞ্চরাত্রের বিচারে বাসুদেব হইতে যে সঙ্কর্ষণ উদ্ভূত হন, তিনি জীবতত্ত্ব। সেই জীবতত্ত্ব সঙ্কর্ষণ হইতে মনস্তত্ত্ব প্রদ্যুম্নের উদ্ভব হইয়াছে। আবার মনস্তত্ত্ব প্রদ্যুম্ন হইতে অহঙ্কারতত্ত্ব অনিরুদ্ধ উদ্ভূত হইয়াছেন। কিন্তু বিষ্ণুচতুর্ব্যূহ একটী অপরের সৃষ্ট নহে। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ বলেন,—

আদ্যস্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়স্ত্বণ্ডসংস্থিতম্।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং যানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে॥

পুরুষাবতারগণ নিত্যকাল সঙ্কর্ষণবৈভব হইতে প্রকটমান। কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু বৈকুণ্ঠ ও ব্রহ্মাণ্ডের কারণ। তিনি জীবতত্ত্বের মূলকারণ, সেব্য মহাবিষ্ণু। তিনি স্বয়ং জীব নহেন। জীবের স্বরূপে জড়ত্বের পরিবর্ত্তে অণুচেতন ধর্ম্ম বর্ত্তমান থাকায় ভগবানের তটস্থশক্তি জীব তাঁহার অধীন সৃষ্টবস্তু মাত্র নহেন। চেতনবস্তু নিত্যসিদ্ধ ও স্বতঃপ্রকাশবিশিষ্ট। মন, অহঙ্কার প্রভৃতি প্রাপঞ্চিক ইন্দ্রিয়গুলি প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের সহিত একবস্তু নহেন। দীপ হইতে অন্য দীপ প্রজ্বলিত হয় এবং পরবর্ত্তী দীপে পূর্ব্বদীপের ন্যায় সমানধর্ম্ম অবস্থান; সেই প্রকার চতুর্ব্যূহ এবং কারণ-গর্ভ-ক্ষীর সমুদ্রত্রয়ে অবস্থিত ভগবদ্-ব্যূহগণের পুরুষাবতার সকলেই বিষ্ণুতত্ত্ব। এই বিষ্ণুব্যূহ চতুষ্টয় জানিতে পারিলেই জীব সৃষ্টিতত্ত্ব অবগত হইয়া প্রাকৃত ভোগময় বদ্ধজগতের তত্ত্ব অবগত হয়।

—জগদ্‌গুরু শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

দৈব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৫শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৫৩ পৃষ্ঠার পর]

দাম্ভিক, ক্রোধী এবং কামুক বর্ণীগণ রজোগুণ-তাড়িত হইয়া সত্ত্বগুণে অবস্থিত সাধকগণের প্রতি মাৎসর্য্য প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে অনাদর করিয়া থাকে। তাহারা নিজেদের ওজন বুঝিতে না পারিয়া পরমসত্যে প্রতিষ্ঠিত ভগবৎপ্রিয়গণের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হয়। এই খলস্বভাব জনগণ কেবল সাধুগণকে অবজ্ঞা বা অবমাননা করিয়াই ক্ষান্ত হয় না, অধিকন্তু সাধুগণের আরাধ্যবস্তু ভগবান্ বিষ্ণুরও

নিন্দা করিতে থাকে। এইরূপে তাহাদের অপরাধের মাত্রা বৈষ্ণবকে ছাড়াইয়া বিষ্ণু পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়। তখন আপনাদিগকে ভোগে উন্মত্ত করাইয়া 'সমগ্র দৃশ্যজগৎ—আমার ভোগ্য কামিনীময়' এই বিচারবশে অন্য কিছুই তাহার লক্ষ্য হয় না। ফলে ভোগবুদ্ধি প্রবল হওয়ায় সেব্য-সেবকভাব বিস্মৃত হইয়া বৈষ্ণব ও বিষ্ণুকে তাহাদের নিজেদের ভোগে লাগাইবার চেষ্টা করে। তাহারা "বিদ্যামদে, ধন-মদে বৈষ্ণব না চিনে।" "এক কৃষ্ণ সর্ব্বসেব্য জগৎ-ঈশ্বর। আর যত সব,—তাঁর সেবকানুচর।"— ইহা ভুলিয়া গিয়া তাঁহাকে অবজ্ঞাপূর্ব্বক প্রাপঞ্চিক ধারণা-বশে ভগবানের সর্ব্বোত্তম অপ্রাকৃত নরলীলাকে মায়িক-ধারণা ও তাঁহাতে মর্ত্ত্যবুদ্ধির আরোপ করে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দৈব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম বা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা ও মূলকারণ হইলেও, মায়ামুগ্ধ ব্রহ্মবন্ধুগণ ভগবানের সেবার পরিবর্ত্তে দাম্ভিকতাবশে প্রাকৃত-বুদ্ধিক্রমে তাঁহাকে ক্ষত্রিয়কুলজাত বা গোপবংশীয় বলিয়া তাহাদের সেবক জ্ঞান করায় অপরাধী ও ভক্তিচ্যুত হইয়া অধঃপতন বরণ করেন। "সর্ব্বে ব্রহ্মজা ব্রাহ্মণাঃ ভবন্তি" বিচারে পরব্রহ্ম ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণের পুত্রত্বে বা ব্রাহ্মণত্বে স্নেহ-প্রদর্শন বা মর্য্যাদা প্রদানকে তাঁহারা ভুল বুঝিয়া থাকেন। সাত্বতপতি শ্রীকৃষ্ণ নিখিল জগতের পূজ্যতম তত্ত্ব হইয়াও নিজ প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের মর্য্যাদা-রক্ষণার্থে অনেক সময়ে লোকচক্ষে বিসদৃশ আচরণ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। একদা শ্রীনারদ-ঋষি দ্বারকা-পুরীতে উপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ উক্ত মুনিবরের পদযুগল প্রক্ষালনপূর্ব্বক স্বীয় মস্তকে ঐ পাদোদক ধারণ করেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বহুক্ষেত্রে তিনি বিপ্রগণের পাদোদক পান, স্বহস্তে তাঁহাদের সেবা-পূজা ও অম্লান-বদনে যদুকুলের প্রতি তাঁহাদের অভিশাপাদি গ্রহণপূর্ব্বক ধর্ম্ম-মর্য্যাদা স্থাপন করিয়া 'মর্য্যাদা-পুরুষোত্তম' নামেও অভিহিত হইয়াছেন। যাঁহার চরণ প্রক্ষালন-বারি গঙ্গা সমস্ত লোকের তীর্থরূপে বিরাজমান এবং যিনি স্বয়ং 'ব্রহ্মণ্যদেব' এই সার্থক নামে পরিচিত, তাঁহার পক্ষে এরূপ আচরণ সঙ্গতই হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া কি প্রাকৃত ব্রাহ্মণাভিমানিগণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ সর্ব্বকারণকারণ মনুষ্যবিগ্রহাশ্রিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে এইরূপ পূজাগ্রহণের অধিকারী অথবা তাঁহাকে ব্রাহ্মণাধীন হীন গোত্রে গোত্রিত করিতে পারেন?

ভগবানের এইরূপ বিষম আচরণে কেহ তাঁহাকে মায়িকবুদ্ধি করিয়া নরকগামী না হন, তজ্জন্য শ্রীনারদ বলিলেন,—"হে বিশ্বকীর্ত্তে বিভো! সজ্জনগণের প্রতি আপনার সুহৃদ্‌ভাব এবং দুষ্টগণের প্রতি দণ্ডবিধান বিচিত্র নহে। কোন ব্যক্তিই আপনার জগন্মঙ্গলকর চেষ্টা সম্যক্ অবগত হইতে পারে না। জগতের স্থিতি,

পালন ও পরমমঙ্গল-সাধনের জন্য স্বেচ্ছাক্রমে আপনার এই কৃষ্ণাবতার। আপনার শ্রীপাদপদ্মযুগল সংসারকূপ-নিমগ্ন জনগণের উদ্ধারার্থ অবলম্বন-স্বরূপ; হে ভুবন-মঙ্গলকর! ত্রিলোকে সুবিস্তৃত ও দিঙ্মণ্ডলে ভূষণস্বরূপ ভবদীয় যশোরাশি এবং শ্রীপাদপদ্মপ্রক্ষালন-বারি বিশ্বকে পবিত্র করিতেছে। অহঙ্কার-দাম্ভিকতাবশে আমি কখনও যেন সেই শ্রীচরণযুগল বিস্মৃত না হই—এইরূপ অনুগ্রহ করুন।" শ্রীকৃষ্ণ তদুত্তরে বলিলেন,—

ব্রহ্মন্ ধর্ম্মস্য বক্তাহং কর্ত্তা তদনুমোদিতা।
তচ্ছিক্ষয়ন্ লোকমিমমাস্থিতঃ পুত্র মা খিদঃ॥ (ভাঃ ১০।৬৯।৪০)

"হে ব্রহ্মন্! আমি ধর্ম্মসমূহের বক্তা, কর্ত্তা এবং তৎসমর্থক হইয়া নিজ আচরণদ্বারা লোকমধ্যে উহা প্রচারার্থ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছি, অতএব হে পুত্র! তোমার পাদপ্রক্ষালনরূপ মদীয় অসামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণে তুমি মোহিত হইও না।"

'সারার্থ-দর্শিনী'-টীকাকার উক্ত শ্লোক-ব্যাখ্যায় বলিতেছেন,—"অহং তাবৎ ক্ষত্রিয়ো গৃহস্থস্তাং ব্রাহ্মণং স্বগৃহমায়াতং যদি নার্চ্চয়ামি তদা স্বাচরণেন মৎপ্রচারিতো ধর্ম্মঃ কথং তিষ্ঠেৎ? যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ" ইতি ন্যায়াত্তেন ধর্ম্মপ্রচারণার্থমেব ত্বৎপাদৌ ময়াদ্য ক্ষালিতৌ, **ন তু বস্তুতঃ।**** স্নেহং জ্ঞাপয়িত্বা সান্ত্বয়তি—হে পুত্রেতি। যথা পিতরি তদঙ্কনিহিত-পাদোঽপি পুত্রস্য নাপরাধস্তথৈব ময়ি তথেতি বুধ্যস্বেতি ভাবঃ।"

অর্থাৎ ভগবান্ বলিতেছেন,—আমি ক্ষত্রিয়কুলজাত গৃহস্থ হইয়া যদি মৎগৃহাগত ব্রাহ্মণ তোমাকে শাস্ত্রোক্ত বিধিক্রমে পূজার্চ্চনাদিদ্বারা সম্মান প্রদর্শন না করি, তাহা হইলে আমার প্রচারিত সাত্বত-ধর্ম্ম কিরূপে লোকের গ্রহণযোগ্য হইয়া ফলদায়ক হইবে? "শ্রেষ্ঠব্যক্তি যেরূপ আচরণ করেন, তদধীন ব্যক্তিসকল তাঁহার অনুগমন করিয়া থাকেন"—এই ন্যায়ানুসারে স্বয়ং আচরণমুখে মৎপ্রণীত ধর্ম্ম-প্রচারার্থই অদ্য তোমার পাদ-প্রক্ষালন করিয়াছি। কিন্তু বস্তুতঃ এইরূপ আচরণ আমার কর্ত্তব্য নহে। আরও বিগর্হ্য এই যে,—আমিই ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হওয়ায় ব্রাহ্মণাদি তোমরা সকলেই আমার পুত্রস্থানীয়। তাই আমার বিরুদ্ধ আচরণ জন্য তোমাকে সান্ত্বনা দিবার নিমিত্তই 'পুত্র' বলিয়া সম্বোধন করিতেছি। স্নেহ-বৎসল পিতার ক্রোড়ে আরূঢ় অজ্ঞ শিশুপুত্রের পাদস্পর্শাদি-দোষ যেরূপ তিনি গ্রহণ করেন না, তোমাতেও আমার তদ্রূপ ভাব জানিবে।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সচ্চিদানন্দতনু ও আবির্ভাব-তিরোভাবাদি-লীলা মায়িক নহে, ইহা বুঝাইবার জন্যই গীতায় তিনি অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া অর্ব্বাচীন মায়াবাদী সম্প্রদায়কে সাবধানপূর্ব্বক স্বীয় তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন,—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া **মানুষীং তনুমাশ্রিতম্**।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ (গীঃ ৯।১১)
জন্ম-কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥ (গীঃ ৪।৯)

অজ ভগবান্ হইয়াও তিনি যাঁহাদিগকে পিতৃ-মাতৃত্বে বরণ করিয়াছিলেন, সেই বসুদেব-দেবকীকেও তাঁহার ভগবত্তা-বিষয়ে সুষ্ঠু ধারণা প্রদানার্থই পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতারের আবির্ভাব সম্বন্ধে বর্ণনা দিয়াছিলেন। এমন কি, পাছে তাঁহাকে বসুদেব-দেবকী চিনিতে না পারেন বা ভুল বুঝেন, এইজন্য শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতেই প্রথমে তিনি আবির্ভূত হইয়া পশ্চাৎ দ্বিভুজ শিশুর রূপ পরিগ্রহ করেন।

এতদ্বাং দর্শিতং রূপং প্রাগ্‌জন্ম স্মরণায় মে।
নান্যথা মদ্ভবং জ্ঞানং মর্ত্ত্যলিঙ্গেন জায়তে॥ (ভাঃ ১০।৩।৪৪)

অর্থাৎ আমার (শ্রীকৃষ্ণের) পূর্ব্বজন্ম স্মরণের জন্যই তোমাদিগকে এই চতুর্ভুজ রূপ প্রদর্শন করাইলাম। অন্যথা মনুষ্যোচিত লক্ষণদ্বারা বিষ্ণু-আবির্ভাব-জ্ঞান হইতে পারে না।

শ্রীবসুদেব-দেবকীও ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন,—আপনি প্রকৃতির অতীত পুরুষ, সর্ব্বান্তর্যামী, বিশুদ্ধ জ্ঞানানন্দ-স্বরূপ, সাক্ষাৎ ভগবান্—তাহা জানিতে পারিয়াছি। আপনি ইন্দ্রিয়াতীত, ব্রহ্ম ও পরমাত্মার আশ্রয়, গুণাতীত, স্ব-স্বরূপে বিশুদ্ধরূপে মর্ত্ত্যলোকের রক্ষণেচ্ছায় আমাদের গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আপনি সমস্ত জগতের ঈশ্বর ও সর্ব্বমঙ্গলকারণ। ভক্তগণের নিত্যারাধ্য ভবদীয় অপ্রাকৃত বিষ্ণুরূপ আমাদের অজ্ঞানময় চর্ম্মচক্ষুর গোচরীভূত নহে। এই গুণ-প্রবাহ-মধ্যে সর্ব্বান্তর্যামী আপনার সূক্ষ্মগতি সম্বন্ধে যাহারা অজ্ঞ, তাদৃশ জনগণই দেহাভিমান-জনিত কর্ম্ম-নিবন্ধন সংসার-দশা প্রাপ্ত হইয়া অশেষ দুঃখ ভোগ করে। হে ভগবন্! নিখিল জীবসমূহ দেহে অহং-বুদ্ধিবশতঃ পুত্রাদি-বিষয়ে মমত্ব-বুদ্ধিরূপ স্নেহপাশদ্বারা আবদ্ধ হয়। কিন্তু আপনি বস্তুতঃ আমাদের পুত্র নহেন, পরন্তু ভূভারভূত দুষ্কৃতকারিগণের বিনাশার্থ প্রকৃতি-পুরুষের ঈশ্বর হইয়াও মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

বাৎসল্য-রসাশ্রিত শ্রেষ্ঠ সেবকগণের অজ ভগবানের অপ্রাকৃতত্ব সম্বন্ধে এইরূপ উক্তিসত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্ম-মর্য্যাদা-রক্ষণের সুযোগ লইয়া ব্রাহ্মণব্রুবগণ যদি তাঁহাকে 'বৈশ্য গোপকুল-জাত' বা 'ক্ষত্রিয়-কুলজাত' বলিয়া অবজ্ঞা করেন বা নিজদিগকে ব্রাহ্মণোত্তম বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন, তাহা কি সঙ্গত হইবে? যে ব্রহ্মণ্যদেবকে আশ্রয় করিয়া তাঁহারা প্রতিষ্ঠিত, তাঁহাকে অবজ্ঞা বা হীন প্রতিপন্ন

করিতে চেষ্টা করিলে তাঁহাদের স্বীয় অস্তিত্ব কিরূপে সংরক্ষিত হইতে পারে? ইহা 'পিতৃ-দ্রোহাচরণ' ভিন্ন আর কিছুই নয়। কোন বৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট ব্যক্তি যদি সেই শাখাই মূলবৃক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে চেষ্টা করে, তাহার ন্যায় অর্ব্বাচীন আর কে আছে? পিতাকে অস্বীকার বা অবজ্ঞা করিলে পুত্রের পুত্রত্ব কোথায়? তাই কোনও বিশিষ্ট মহাজন গাহিলেন,—

"জগতের পিতা কৃষ্ণ, যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্মে জন্মে তাপ॥"

ব্রাহ্মণাদি বর্ণীর শ্রৌতপথে অধোক্ষজ-কৃষ্ণসেবাই একমাত্র বৃত্তি। কিন্তু সেই অচ্যুতের সেবাপূজাদ্বারা তাঁহার সর্ব্বসিদ্ধি হইবে, ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিয়া বিষ্ণুকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যান্য আধিকারিক দেবগণের সেবায় প্রবৃত্ত হইয়া বহ্বীশ্বরবাদের আবাহন করেন। মায়াধীশ কৃষ্ণকে মায়িক দেব-দেবীর সহিত সমজ্ঞান করিয়া তাহারা অপরাধক্রমে পাষণ্ডী-শ্রেণীভুক্ত হন। ব্রাহ্মণ-ধর্ম্ম হইতে চ্যুত হইয়া তাহারা বিষ্ণুকে বাদ দিয়া 'উদ্দিশ্য দেবতা এব জুহোতি চ দদাতি চ'—ইতর দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে পূজা-হোমাদির অনুষ্ঠান করেন এবং কর্ম্মকাণ্ডই বেদের একমাত্র তাৎপর্য্য ও নশ্বর ক্রিয়ানুষ্ঠানদ্বারা যে ফললাভ হয়, তাহাই চরম প্রয়োজন—এইরূপ বিবর্ত্তবুদ্ধিতে পতিত হন। প্রাকৃত কামনা-বাসনাদ্বারা প্রপীড়িত হইয়া উহার সত্বর ফললাভোদ্দেশ্যে তাহারা বিষ্ণু হইতেও দেবদেবীর ক্ষমতা অধিক মনে করিয়া তাঁহাদেরই প্রপত্তি স্বীকার করেন। কিন্তু বহু আয়াসযুক্ত ক্রিয়াবিশেষদ্বারা সেই অল্পবুদ্ধিগণ যে ফললাভ করেন, তাহা নশ্বর এবং আত্যন্তিক মঙ্গলের পরিপন্থী। কৃষ্ণ স্বরূপের উপর অশ্রদ্ধা বা অবিশ্বাসই তাহাদিগকে এইরূপ দুর্দ্দশায় উপনীত করে।

ভোগৈশ্বর্য্যাসক্ত এই মূঢ় বর্ণীগণ কৃষ্ণভজনে বিমুখ হইয়া নারায়ণ-তত্ত্বের প্রতিই তাহাদের শ্রদ্ধা-ভক্তি আরোপের ভাণ করেন। কারণ তাহারা জানেন যে, নারায়ণ বা শালগ্রাম-শিলা ব্যতীত তাহাদের কাল্পনিক ভোগের যোগানদানকারী দেব-দেবীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা ও পূজা সম্ভব নয়। শ্রীকৃষ্ণ ও নারায়ণে রসগত বৈশিষ্ট্য বা বৈচিত্র্য আছে, পরন্তু তত্ত্বতঃ কোন পার্থক্য না থাকিলেও, ইহাদিগকে ভেদবুদ্ধি করায় ঐ অনিত্য দেবযাজিগণ নামাপরাধী হইয়া অবশেষে নারায়ণকেও 'সাংখ্যের পুরুষ' মনে করিয়া তাঁহার দ্বারা কাজ হাসিলের চেষ্টা করেন। অর্থাৎ তাহারা উভয় তত্ত্বেই বস্তুতঃ আস্থাহীন হইয়া পড়েন; বিষ্ণুই সকল দেবতার প্রাণ ও মূল—তাঁহার পূজা করিলেই সকলের পূজা ও তুষ্টি হয়—"তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং, প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ"—ইহা জানিয়াও নানা দেব-দেবীর আশ্রয় গ্রহণ করেন।

কামনা-মূলে বহু দেবতার পূজা অপসাম্প্রদায়িকতা ও বেদবিরুদ্ধ মত—ইহা বহুতর শাস্ত্রে প্রতিধ্বনি করিলেও, ইহারা পঞ্চোপাসক-শ্রেণীভুক্ত হইয়া শক্তি, গণেশ, রুদ্র, কল্পিত বিষ্ণু (কর্ম্মের অঙ্গ বা কর্ম্মফলবাধ্য) ও সূর্য্যের উপাসনায় ব্যাপৃত হন। ব্রহ্মসংহিতা ও অপরাপর সাত্বত শাস্ত্রে এই পঞ্চোপাসকগণের আরাধ্যদেবতা সকলেই মূল-পুরুষ (নারায়ণেরও অংশী) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে জগতে বিভিন্ন কার্য্য করিতেছেন, তাহা বর্ণিত হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

শ্রীহরিনাম করো সার

(১)

ধর্ম্ম নিয়ে দেশ জুড়ে হানা-হানি,
প্রাণ লয়ে হয় টানা-টানি ;
রক্তগঙ্গা বয়ে যায়—
গৃহ-যুদ্ধে, হায় !
'রাম'-নামে
ধামে ॥

(২)

সর্ব্ব ধর্ম্মে মূলমন্ত্র—এক থাকা,
শুধু ভিন্ন নামে 'তাঁকে' ডাকা—
যথা—সত্যকথা বলা,
সৎপথে চলা,
বিশ্ব-মাঝে
কাজে ॥

(৩)

তবে কেন হয় ফাঁক-ফুঁক খোঁজা,
এটা যায় না-কো ঠিক বোঝা,—
তবু কেন চিন্তা হয়
আসে মনে ভয়,
হোক্ দ্বন্দ্ব
বন্ধ ॥

(৪)

বেশ-ভূষা জাতে জাতে ভিন্ন ভিন্ন,
মূলে নেই তো অমিল-চিহ্ন,
রুচিমত মোরা খাই,
এক সাথে যাই,
জানে সবে
ভবে ॥

(৫)

ধর্ম্ম-পথ সব ধর্ম্মে এক নয়,
তবু আজ বেশ মনে হয়—
দেশে বহুজাতি আছে,
থাকি কাছে কাছে
সবে মিলে-
ঝুলে ॥

(৬)

বৃক্ষমূল-নীচে থাকে ধীর, স্থির
তার পরে ওঠে উচ্চ শির—
কেহ ডাল-পালা ছাড়ে,
কেহ কম বাড়ে,
শত শত
কত ॥

(৭)

রাম-জন্মস্থান, বলা হয়—'আদি'
উর্দ্দু-মার্কা জাতি হয় বাদী—
এই নিয়ে বাঁধে দ্বন্দ্ব,
তাই কাটে ছন্দ,
দেশে দেশে
শেষে ॥

(৮)

দেশে বহু দল, আর দলাদলি,
তাতে ভেসে যাই যে সকলি—
'রাজনীতি ধর্ম্মে এসে
ধ্বংস করে শেষে,
স্থিতাবস্থা,
আস্থা ॥

(৯)

দেশে আছে বহু নেতা পথভ্রষ্ট,
তাই দেশে এতো কষ্ট—
মিলা পাওয়া ভার,
গণ্ডী নেই তার,
যথা—ধর্ম্ম-
কর্ম্ম ॥

(১০)

রাম-ধামে তিন গম্বুজ গেল যে—
হিংসা ফেটে পড়ে যে সহজে—
তার মূলে দলাদলি,
আর ঠেলাঠেলি
বলে—"আমি
স্বামী ॥"

(১১)

সব দল দেশে কর্ত্তা হ'তে চায়,
তাতে কি-বা আসে কি-বা যায়,
ভেদ সৃষ্টি হয় হোক্,
নেই দুঃখ-শোক,
হোক ধ্বংস
বংশ ॥

(১২)

দয়া-মায়া-স্নেহ-প্রীতি দেশে নাই
ভুলে গেছি মোরা ভাই ভাই—
চাই শুধু 'নাম', 'ভক্তি'—
সে-যে মহাশক্তি
ধর্ম্ম-মত
সৎ ॥

(১৩)

"নামে" যেন ডুবে থাকি মোরা সবে,
'নাম' ছাড়া গতি নাই ভবে—
এতে আছে সুখ-শান্তি,
দূর করে ক্লান্তি
সব শেষে
এসে ॥

(১৪)

চলো সবে মিলে হরিনাম করি,
ভুল-ভ্রান্তি সব তুলে ধরি—
এক হ'য়ে মিশে যাই,—
অন্য পথ নাই,
এই পথ
সৎ ॥

(১৫)

'নামে' রুচি হ'লে যাবে সব ভয়,
হিংসা-দ্বেষ সব হবে ক্ষয়—
ভেদাভেদ নাহি রবে
সব এক হবে,
হবে বিশ্ব
শিষ্য ॥

(১৬)

দুষ্ট নেতা হবে ক্ষুব্ধ, হবে জব্দ,
রবে না-কো আর টুঁ-টাঁ শব্দ
মিত্র হবে যে সবাই,
এর ভুল নাই,
সর্ব্ব কর্ম্মে-
ধর্ম্মে ॥

—শ্রীবলাইচাঁদ ঘোষ (সেবাসুহৃদ্), সাংবাদিক পি. টি. আই.

অজিত ভগবান্ ভক্তজিৎ

ভগবান্ ভক্তের অধীন, তাই তিনি স্বতন্ত্র স্বরাট্ পুরুষ হইয়াও নিজ ভৃত্যবর্গের বশ্যতা স্বীকার করেন অর্থাৎ ভক্তের প্রেমের নিকট পরাজিত হইতে বাধ্য হন। পশুরাজ সিংহ যেরূপ পশুগণের নিকট নিজ পরাক্রম দেখাইলেও নিজ শাবকের স্নেহে নিরীহ শিশুতুল্য হইয়া যান, তদ্রূপ ভগবান্ অভক্তের নিকট মহাভয়ঙ্করূপ হইলেও নিজ সেবকের নিকট নিজকে বিক্রয় করিয়া তাঁহার অধীনস্থ হইয়া যান। সতী স্ত্রী যেরূপ সৎপতিকে বশীভূত করিয়া থাকেন, ভগবানে আসক্তচিত্ত সমদৃষ্টি-সম্পন্ন সাধুগণ তদ্রূপ ভক্তিপ্রভাবে ভগবান্‌কে বশীভূত করেন। ভগবান্ পরিপূর্ণ-স্বরূপ, তাহা সত্ত্বেও তাঁহার নিজজন অনুরাগভরে বাষ্পগদ্‌গদ-স্তুতিবাক্য, জল, শুদ্ধ-পল্লব, তুলসীদ্বারা তাঁহার যে পূজা-সম্পাদন করেন, তিনি ভক্তের সেই পূজাদ্বারা বিশেষভাবে সন্তুষ্ট হন।

অকিঞ্চন ব্যক্তির ভগবান্‌ই একমাত্র ধন, শ্রীহরি ভক্তগণকেই প্রিয় এবং ভক্তিকেই সুখদ বলিয়া জ্ঞান করেন। যে-সকল ব্যক্তি জড় পাণ্ডিত্য, ধন, আভিজাত্য, রূপ ও যৌবনের অহংকারে মত্ত হইয়া অকিঞ্চন সাধুগণকে তিরস্কার করেন, শ্রীহরি সেই সকল কুমনীষি ব্যক্তির পূজা কখনও স্বীকার করেন না। অন্যের কা কথা, তিনি নিরন্তর সেব্যমানা লক্ষ্মীদেবী, শ্রীকামী নরেন্দ্র এবং দেবতাগণেরও অনুবর্ত্তন করেন না।

ভক্তি ব্যতীত ভগবানকে কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি প্রভৃতি হেয় উপায়দ্বারা কখনও বশীভূত করা যায় না। এই প্রসঙ্গে শ্রীভাগবতে ভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছেন,—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জিতা ॥ (ভাঃ ১১।১৪।২০)

—"হে উদ্ধব! তীব্র ভক্তিযোগদ্বারা আমাকে যেরূপ বশ করা যায়, আসন-প্রাণায়ামাদিরূপ যোগ, তত্ত্ববিচাররূপ সাংখ্য, অহিংসাদিরূপ ধর্ম্ম, বেদপাঠ, তপস্যা, ত্যাগ—এই সকল উপায়দ্বারা আমাকে সেরূপ পাওয়া যায় না।" শাস্ত্রের অন্যত্রও উল্লিখিত আছে,—

জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগধর্ম্মে নহে কৃষ্ণ বশ।
কৃষ্ণবশ-হেতু এক—প্রেমভক্তি-রস॥ (চৈঃ চঃ আদি ৭।৭৫)

মুক্তি পর্য্যন্ত বাসনারহিত ভক্তগণ ভগবানের হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়া থাকেন। ভক্তের কথা কি, ভক্তের পাল্যজনসমূহও ভগবানের প্রিয়। যে-সকল সাধু গৃহ, দারা, পুত্র, আত্মীয়-স্বজন, ধন, প্রাণ, ইহলোক, পরলোক পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র ভগবানকে আশ্রয়স্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, ভগবান্ তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া নিজস্বরূপগত আনন্দ ও নিত্য ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পত্তির করেন না।

ঐকান্তিক ভক্তগণ কখনই ভক্তবৎসল প্রভু শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম-সেবা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন না অর্থাৎ তাঁহাদের স্বাভাবিকী সর্ব্ববিধা নিত্যচেষ্টা কৃষ্ণেতর অন্য কোন বস্তুর তর্পণোদ্দেশে বিহিত নহে, পরন্তু সর্ব্বক্ষণ কেবল কৃষ্ণসেবার্থই বিহিতা। আর কৃষ্ণেরও যাবতীয় চেষ্টা বা লীলা সকল সময় কেবলমাত্র ভক্তের সন্তোষ-বিধানার্থই প্রকটিত হয় অর্থাৎ কৃষ্ণভক্ত নিজ প্রেমসেবাদ্বারা কৃষ্ণকে বশ করিয়া বিক্রয় করিতেও সমর্থ। ভগবান্ ও ভক্ত পরস্পরের সঙ্গ ক্ষণকালও কেহই পরিত্যাগ করিতে পারে না অর্থাৎ প্রেমের অচ্ছেদ্য বন্ধনে তাহারা পরস্পর পরস্পরের বশীভূত হইয়া থাকেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীভাগবতে ভগবান্ দুর্ব্বাসাকে বলিয়াছেন,—

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥ (ভাঃ ৯।৪।৬৮)

—"সাধুগণ আমার হৃদয় এবং আমিও সাধুদিগের হৃদয়। তাঁহারা আমা ব্যতীত অন্য কাহাকেও জানেন না, আমিও তাঁহাদের ছাড়া অন্য কিছু জানি না। এই প্রসঙ্গে ভাগবতের অন্যত্র মহারাজ চিত্রকেতু ভগবানের স্তব করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

অজিত জিতঃ সমমতিভিঃ সাধুভির্ভবান্ জিতাত্মভির্ভবতা।
বিজিতাস্তেঽপি চ ভজতামকামাত্মনাং য আত্মদোঽতিকরুণঃ॥
(ভাঃ ৬।১৬।৩৪)

—"হে অজিত, আপনি অন্য-কর্ত্তৃক অজিত হইলেও সমচিত্ত সাধুগণ-কর্ত্তৃক জিত অর্থাৎ তাঁহারা আপনাকে তাঁহাদের নিজের অধীন করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহার কারণ এই যে, আপনি—অতীব কারুণিক, নিষ্কাম-ভজনাকারিগণকে আপনি আত্মদান করিয়া থাকেন, সেইজন্য আপনিও তাঁহাদিগকে বশীভূত করিয়াছেন।"

ভগবান্ সেব্যতত্ত্ব হইয়াও নিজের সর্ব্বসেবনীয়-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সেবকগণের সুখবিধানের নিমিত্ত তাঁহাদের তৃপ্তিকর কার্য্য করিয়া থাকেন। যদিও নিজের সেবকের সেবা ভগবানের ধর্ম্ম নহে, তথাপি তাঁহার এমন কোন কার্য্য নাই —যাহা তিনি সেবকের প্রীতির নিমিত্ত না করিতে পারেন। ভগবান্ ভক্তের মহিমা বৃদ্ধি করিবার জন্য—এমন কোন কার্য্য নাই—যাহা করেন না, এমন কোন ভাষা নাই—যাহা বলেন না। ভগবান্ অজিত বলিয়া তাঁহার দ্বারাই লোকাতীত কার্য্যের সম্ভাবনা হয়। ভগবান্—প্রেমবাধ্য। ভক্ত প্রেমের দ্বারা ভগবানকে এরূপ বাধ্য করিতে সমর্থ যে, তিনি ভগবানের অভিপ্রায় পরিবর্ত্তন করিতেও সর্ব্বদাই যোগ্য। উদাহরণস্বরূপে, "আমি কুরুক্ষেত্র রণে শস্ত্রহীন থাকিয়া কেবলমাত্র অর্জ্জুনের সারথ্য গ্রহণ করিব"—শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ নিজপ্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া "শ্রীকৃষ্ণকে শস্ত্রধারণ করাইব"—ভীষ্মের এইরূপ প্রতিজ্ঞা যাহাতে অধিকভাবে সত্য হয়, তদ্রূপ বিধান করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ভক্ত অর্জুনের রথ হইতে সহসা অবতীর্ণ হইয়া চক্রধারণপূর্ব্বক পদভরে পৃথিবীকে বিচলিত করিতে করিতে পথিমধ্যে স্বীয় উত্তরীয় বসন পরিত্যাগ করিয়াই গজ-নিধনোদ্যত সিংহের ন্যায় ভীষ্মের অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন। ভগবান্ ভক্তের নিকট পরাজয় স্বীকার করেন,—ইহাই ভগবত্তার স্বভাব। কেহ কেহ পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিতে পারেন,—"ভগবান্ কেবলমাত্র ভক্তের নিকট পরাজিত হন—ইহা সর্ব্বৈব মিথ্যা কথা। ভগবান্ অসুরের নিকটও পরাজিত হন। তাহা না হইলে, শ্রীকৃষ্ণ অনুশাল্ব দানবের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন বলিয়া কেন মহাভারতে উল্লেখ রহিয়াছে?" পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলা যাইতে পারে, "ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তবৎসল, নিজ ভক্ত গর্গাচার্য্যের 'তুমি অনুশাল্ব দানবের নিকট পরাজিত হইবে' এই বাক্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য ইচ্ছাপূর্ব্বক অনুশাল্ব দানবের নিকট পরাজয় বরণ করিয়াছিলেন। নতুবা অনুশাল্ব দানব কেন, পৃথিবীর কেহই তাহাকে পরাজিত করিতে কখনও সক্ষম হন না। আবার শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে গর্গাচার্য্যের বাক্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া পরমুহূর্ত্তে অতি অনায়াসে অনুশাল্ব দানবকে বধ করিয়াছিলেন।"

ভক্তবৎসল ভগবানের সেবা অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি ব্যতীত অপরে কেহ পরিত্যাগ করিতে পারে না। অক্ষজ-জ্ঞানদ্বারা ভগবৎস্বরূপৈশ্বর্য্য ও মহিমা বিচারের প্রয়াস সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধুসন্নিধানে অবস্থিত হইয়া যাঁহারা সাধুগণের মুখে স্বতঃ উচ্চারিত এবং তৎ সান্নিধ্যমাত্র আপনা হইতেই শ্রবণ পথে প্রবিষ্ট ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা কায়-মন-বাক্যের দ্বারা সৎকার করিতে করিতে জীবন ধারণ করেন, ত্রিলোকে অন্যান্য ব্যক্তির নিকট অজিত হইলেও ভগবান্ তাঁহাদের দ্বারা জিত অর্থাৎ বশীভূত হন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

যুক্তবৈরাগ্য ও ফল্গুবৈরাগ্য

কোন একটী বিষয়ে মন অভিনিবিষ্ট হইলে তাহার বিপরীত বস্তুতে আপনা হইতেই একটা বিতৃষ্ণার ভাব উপস্থিত হয়। একই সময়ে দুইটী বিপরীত বস্তুতে চিত্ত নিবিষ্ট করা যায় না। সাধারণ জীবগণ জাগতিক ব্যাপারে রুচিবিশিষ্ট; এইজন্য তাহারা জড়বিপরীত অপ্রাকৃত বস্তুসম্বন্ধে উদাসীন থাকে। আবার যাঁহারা ভগবদ্বহির্মুখ, তাঁহাদের নিকট কৃষ্ণেতর বিষয় রুচিকর হয় না। ঐ সকল বস্তু তাঁহাদের স্বাভাবিক বিরাগের পাত্র হয়।

'বৈরাগ্য' বলিতে বিষয়সুখভোগে বিতৃষ্ণা বুঝায়। যাঁহাদের হৃদয়ে তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, তাঁহারা জাগতিক সুখভোগসমূহ অমঙ্গল জানিয়া উহা ত্যাগ করেন। আজ পর্য্যন্ত জীবের চরম-কল্যাণ-লাভের উপায়-স্বরূপে বহুবিধ মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। শ্রুতি যে পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা সত্য ও সনাতন। অন্যান্য অশ্রৌত পন্থা-গুলির কতক শ্রুতির বিকৃত ব্যাখ্যামূলে এবং কতক শ্রুতির অপৌরুষেয়তা অস্বীকারপূর্ব্বক নাস্তিকতাকে ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সমস্ত মতগুলিতেই বৈরাগ্য বা ভোগত্যাগকে বহুমানন করা হইয়াছে। শ্রুতিসার শ্রীমদ্ভাগবত প্রপত্তিশীল ব্যক্তির প্রপত্তি-অনুসারে ভক্তি, পরেশানুভব ও বিরক্তি একসঙ্গেই হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে বলিয়া জানাইয়াছেন। কিন্তু অবৈদিক পন্থাসমূহে বৈরাগ্যকে যে অর্থে গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা হইতে ভাগবত-উপদিষ্ট বৈরাগ্যের কিছু পার্থক্য আছে।

প্রকৃত অশ্রৌতপর পন্থাগুলির মধ্যে অনেকগুলিতেই, বিশেষ করিয়া যাহাতে কর্ম্ম, যোগ বা জ্ঞানের বহুমানন করা হইয়াছে, এরূপ বিচার দেখা যায় যে, এই জগৎটা যদিও আমাদের ভোগ্যরূপেই সৃষ্ট এবং আমরা ইহার ভোক্তা, তথাপি নিরবচ্ছিন্ন ভোগ এখানে করা যায় না। জীবনের পথে চলিতে গেলে প্রতিপদেই বাধা আসিয়া গতিরোধ করে এবং তাহাতে সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখই লাভ হয়। সুতরাং অপরিচ্ছিন্ন সুখ লাভ করিতে হইলে একটু কষ্ট স্বীকার অর্থাৎ ইহজগতের সুখভোগের ইচ্ছাটা আপাততঃ ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। এইরূপ বিচার করিয়া তাঁহারা এই জগৎকে কাকবিষ্ঠাবৎ অসার মনে করিয়া উহা হইতে নির্ম্মুক্ত হইবার চেষ্টা করেন এবং যাহাতে সেদিকে চিত্ত আকৃষ্ট হইতে না পারে, তজ্জন্য ইন্দ্রিয়নিগ্রহমূলক নানা অনুষ্ঠানের আবাহন করেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বা শ্রীমদ্ভাগবত কিন্তু ঐরূপ ভোগত্যাগের চেষ্টাকে আদর করেন নাই। উহা প্রকৃতপক্ষে বৈরাগ্য নহে, অভিনয় মাত্র। ফল্গু নদীকে বহির্দর্শনে

জলশূন্য মনে হয়; কিন্তু ঈষৎ পরিমাণে বালুকা খনন করিলেই উহার নীচে জল দেখিতে পাওয়া যায়। সেইরূপ অশ্রৌতপন্থিগণ বাহিরে ভোগত্যাগের অভিনয় করিলেও অন্তরে তাঁহাদের ভোক্তৃ অভিমান ও ভোগস্পৃহা পূর্ণ মাত্রাতেই থাকে। শ্রীমন্মহাপ্রভু যে যুক্ত-বৈরাগ্যের কথা বলিয়াছেন, তাহাতে মায়াবাদীর ত্যাগবিচার স্থান পায় নাই। অন্তরে ভোক্তৃ-অভিমান প্রবল রাখিয়া বাহিরে যে বৈরাগ্যের ছলনা করা যায়, তাহা লোকচক্ষে প্রশংসার বস্তু বা আত্মপ্রসাদ-লাভের উপায় হইতে পারে; কিন্তু নিত্যমঙ্গল তাহাতে নাই। সম্বন্ধজ্ঞান অর্থাৎ আপনার নিত্যস্বরূপ, নিত্যস্বভাব ও নিত্যক্রিয়ার সন্ধান না পাওয়া পর্য্যন্ত নিত্যমঙ্গল-লাভের যে চেষ্টা, তাহা অন্ধকারে "বস্তু হাত্‌ড়ান" মাত্র। পরবস্তুর সন্ধানতৃষ্ণা হৃদয়ে কিঞ্চিৎ পরিমাণে জাগ্রত হইলেই মন আপনা হইতেই বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইতে থাকে, তাহার জন্য স্বতন্ত্র কোন চেষ্টার আবশ্যকতা নাই। বিষয়-ভোগ হইতে মন পরাঙ্মুখ হইলে বিষয়ভোগে বা কৃষ্ণেতর বিষয়ে সহজ বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে জানিতে হইবে। বৈরাগ্য কখনও ভক্তির উপায় নহে। নশ্বর সুখভোগ হইতে নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগে উপনীত হইবার মাঝখানে ভোগের ক্ষণিক বিরতি মাত্রই নিত্য স্থির-বৈরাগ্য নহে—উহা ফল্গুবৈরাগ্য। ভক্তি, ভগবৎসাক্ষাৎকার, বিরক্তি একত্র অবস্থিতি করে। সাধনভক্তির বিচারে ভক্তিকে উপায়স্বরূপে জানিলেও উহাই পরিস্ফুট অবস্থায় একমাত্র উপেয়। ভক্তি—আত্মার নির্ম্মল সহজধর্ম্ম। যে পরিমাণে সপরিকর শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তির উন্মেষ হয়, সেই পরিমাণে কৃষ্ণেতর বিষয়ে বিরাগ লক্ষিত হয়। কৃত্রিম চেষ্টাদ্বারা তাহা লাভ করা যায় না।

বৈধভক্তিমার্গের অনুসরণকারী ক্রমোন্নতির মধ্য দিয়া অগ্রসর হন। চিত্তের মলিনতা যে পরিমাণে দূর হয়, সেই পরিমাণে যুক্তবৈরাগ্যের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ ও নির্ম্মল পরিস্ফুটভাব তাঁহার মধ্যে দৃষ্ট হয়। কনিষ্ঠ অধিকারী সদ্‌গুরুর চরণ আশ্রয় করিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হইতেছেন মাত্র। ভক্তিসিদ্ধান্তবিষয়ে অনভিজ্ঞ হওয়ায় তিনি ভগবান্ অপেক্ষাও ভক্তের পূজার শ্রেষ্ঠত্ব সম্যক্ অবগত নহেন বলিয়া ভক্ত-পূজায় ঔদাসীন্য প্রদর্শনপূর্ব্বক অর্চ্চনাদিতেই অধিক আদর-বিশিষ্ট হন। কিন্তু তত্ত্ববস্তুর স্বরূপোপলব্ধি না হওয়ায় শ্রীঅর্চ্চাবিগ্রহের অপ্রাকৃতত্বও তাঁহার অনুভূতির বিষয় হন না। পঞ্চোপাসক ও শুদ্ধভক্তিপথের কনিষ্ঠাধিকারীর মধ্যে পার্থক্য এই যে, পঞ্চোপাসকগণ সাধনকালে চিত্তশুদ্ধির উপায়রূপে শ্রীবিগ্রহকে কাষ্ঠ, প্রস্তর বা মাটীর বিকার বলিয়া জানিয়াও তাঁহাকে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতীকরূপে কল্পনা করেন, পরে সিদ্ধিকালে স্বয়ং ব্রহ্ম বলিয়া অভিমান হয়। কিন্তু কনিষ্ঠাধিকারী ভক্ত শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে অর্চ্চাবতার-তত্ত্ব-সম্বন্ধে শ্রবণ করিয়া শ্রীবিগ্রহকে জড়বস্তু

মনে না করিলেও শ্রদ্ধা দৃঢ় না হওয়ায় তাঁহাতে সর্ব্বদ্রষ্টা সাক্ষাদ্‌ব্রজেন্দ্রনন্দন-স্ফূর্ত্তিও তাঁহার হয় না। এই কনিষ্ঠ ভক্তের মধ্যে যে বৈরাগ্যের লক্ষণ দেখা যায়, তাহা প্রকৃত বৈরাগ্যের অস্ফুটাবস্থা মাত্র। অনর্থযুক্ত ভোক্তৃবিচার হইতে তখনও তিনি নিষ্কৃতি পান নাই। যুক্তবৈরাগ্যকে ভক্তি যাজনের পক্ষে অনুকূল জানিয়া তিনি উহার পালনে যত্নপর হন বটে, কিন্তু যুক্তবৈরাগ্য ও ফল্গুবৈরাগ্যের পার্থক্য ঠিকমত বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। নিখিল বস্তুকে কৃষ্ণসেবোপকরণ জানিয়া কৃষ্ণসেবার উদ্দেশ্যে শরীর ধারণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি অনাসক্তভাবে স্বীকার করাই যুক্ত বৈরাগ্যের লক্ষণ। কিন্তু কনিষ্ঠাধিকারী প্রাকৃত ধারণা-বিমুক্ত না হওয়ায় জাগতিক বস্তুসমূহ কৃষ্ণেরই ভোগ্য—এই বিচার ঠিক যথাযথ গ্রহণ করিতে পারেন না। সেইজন্য জাগতিক বিষয়সমূহও ভোগ্যরূপে প্রতিভাত হইয়া তাঁহাকে ক্রমাগত বাধা দিতে থাকে। এই শরীরও কৃষ্ণসেবার জন্যই। সুতরাং ইহার প্রতি অত্যন্ত অবহেলা-প্রদর্শনও যুক্তবৈরাগ্যের বিচার নহে। কিন্তু মুমুক্ষুর অনুকরণে অনেক সময় কনিষ্ঠাধিকারী সেবাপরাধ ফলে ইহা না বুঝিয়া ভগবৎপ্রসাদ গ্রহণকেও ভোগ বলিয়া বিবেচনা করিয়া নানা কৃচ্ছতা অবলম্বন করেন। ভোক্তৃ-অভিমান এইরূপ প্রবল থাকায় তাঁহার বৈরাগ্য ভোগ বা শুষ্কত্যাগে পর্য্যবসিত হইবার প্রবল আশঙ্কা থাকে। দৃঢ়তার সহিত শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের পাদপদ্মের সেবা করিতে থাকিলে এই সকল অসুবিধা দূর হয়।

মধ্যম অধিকারী শ্রীগুরুকৃপাবলে যুক্তবৈরাগ্যের বিচারে প্রতিষ্ঠিত হন। সম্বন্ধ-জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হওয়ায় তিনি বুঝিতে পারেন যে, জীব স্বরূপে আদৌ ভোক্তা নহেন, সুতরাং ভোগ বা ত্যাগের অধিকারও তাঁহার নাই। এ জগতের যাহা কিছু পদার্থ, সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের সেবার উপকরণ, তাহাতে জড় বা ভোগবুদ্ধি করা অপরাধ। কৃষ্ণসেবোপকরণ সমূহকে হেয় দুঃখপ্রদজ্ঞানে পরিত্যাগ করার চেষ্টা বিকৃতবুদ্ধি হইতে প্রসূত। যাহা কৃষ্ণেতর বিষয় বা পরিমেয়, তাহাই কৃষ্ণসেবায় বাধা জন্মায় অর্থাৎ দেহে আত্মবুদ্ধি ও নিজের ভোক্তৃ-অভিমান—ইহাই ত্যাগ করিতে হইবে,—কৃষ্ণসেবার উপকরণগুলিকে প্রাপঞ্চিকজ্ঞানে ত্যাগ করিতে হইবে না। এইরূপ আত্মসম্বন্ধজ্ঞান হৃদয়ে উদিত হওয়ায় জাগতিক বস্তুসমূহ ভোগ্যরূপে প্রতিভাত হইয়া বাধা জন্মাইবার পরিবর্ত্তে সেবার সহায়ক হইয়া reciprocate respond ও co-operate করিতে থাকে। মধ্যম অধিকারী জড় ভোগত্যাগকেই কনিষ্ঠাধিকারীর ন্যায় কতকটা ইন্দ্রিয়নিগ্রহমূলক না জানিয়া কৃষ্ণপ্রীতির উৎপাদক বলিয়া উহাকে আদরের সহিত বরণ করে। এই হরি-গুরু-বৈষ্ণব-প্রীণন চেষ্টাই মধ্যম অধিকারীর বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করে। বৈরাগ্য তাঁহার পক্ষে শুষ্ক ত্যাগ

নহে। আপনাকে অপ্রাকৃত কৃষ্ণদাস জানিয়া হরি-গুরু-বৈষ্ণবের তোষণার্থ তাঁহার যে ভোগ ত্যাগ স্বীকার, তাহাতে গুরুবৈষ্ণবের প্রতি মৈত্রীভাবই থাকে।

মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান।
যাহা দেখি তুষ্ট হন গৌর ভগবান্॥

—এই বাণীর অনুসরণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগণের অর্থাৎ আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যে মধ্যম অধিকারী যুক্তবৈরাগ্য বরণ করেন; কারণ তাহাতে শ্রীগৌর-ভগবান্ তুষ্ট হন। কনিষ্ঠাধিকারীর বৈরাগ্যে ভগবানের প্রতি এই প্রেম, ভাগবতের প্রতি এই মৈত্রী নাই, উহা অনেকটা আরোপিত মাত্র।

কনিষ্ঠাধিকারীর যেরূপ ভোগ বা ত্যাগপথে চলিয়া যাইবার আশঙ্কা আছে, অনুকূল-বিচার গ্রহণ করিবার ফলে মধ্যমাধিকারীর সেরূপ কোন আশঙ্কা কম। ন্যূনাধিক সম্বন্ধজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থাকায় তিনি আপনার ও জগতের স্বরূপ ন্যূনাধিক অবগত আছেন। তজ্জন্য কখনও কখনও দুঃসঙ্গক্রমে তাঁহার সেবাপ্রবৃত্তি কিছুকালের জন্য স্তব্ধভাব ধারণ করিলেও শ্রীগুরুদেবের বিচারধারা হইতে তিনি একেবারে ভ্রষ্ট কখনও হন না। মহাজন-কথিত যথাযোগ্য ভোগ, নাহি তথা রোগ" এই বাণী মধ্যম ভাগবতের জীবনের গতিকে নিয়মন করেন।

কনিষ্ঠ ও মধ্যম অধিকারীর বৈরাগ্য ন্যূনাধিক নিষেধবাচক। কনিষ্ঠে ঐ বৈরাগ্য অস্ফুট ও অস্থায়ী, মধ্যমে স্ফুট ও কতকটা হরিতোষণানুকূল বলিয়া স্থায়ী, কিন্তু উত্তম অধিকারীতে উহা স্ফুটতম, পূর্ণতম স্থায়িভাবে বিরাজমান। উপরন্তু উত্তম অধিকারী বা মহাভাগবতের বিচারে বৈরাগ্য কেবলমাত্র নিষেধবাচকরূপে প্রকাশিত না হইয়া অপর একটী চমৎকারিতাপূর্ণ ভাবের সূচনা করে। বিরাগ-শব্দে কেবল আসক্তিহীনতা নহে, মুখ্যতঃ উহা বিশিষ্টরূপে রাগ বা কৃষ্ণে গাঢ় আনুরক্তি-রূপে প্রকাশিত হয়। মহাভাগবত—

স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র স্ফুরয়ে তাঁর ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি॥

সুতরাং কৃষ্ণেতর বিষয়ে তাঁহার অভিনিবেশ কখনই হয় না বলিয়া কৃষ্ণেতর বিষয়ের প্রতীতি ও উহাকে পরিত্যাগ করিবার স্বতন্ত্র চেষ্টার অবকাশও তাঁহাতে নাই। কৃষ্ণেতর বিষয়ে তাঁহার বিরাগ স্বাভাবিক। মহাভাগবতের আচরণে আপাতবৈষম্য বহু অজ্ঞব্যক্তির চিত্তে নানাপ্রকার সন্দেহের উদয় করায়। অনেক সময় আধ্যক্ষিকদর্শনে তাঁহার বিলাস-দর্শনে অনেকে বঞ্চিত হন। বৈষ্ণব কেন বিলাসী হইবেন বা ভোগসুখে নিমগ্ন থাকিবেন?—ইত্যাদি প্রশ্ন অনেকেই

আধ্যক্ষিকদর্শনে করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার এই সকল প্রশ্নের সুন্দর মীমাংসা করিয়াছেন। যাঁহারা শুদ্ধভক্তিমার্গ আশ্রয় করিয়া ক্রমশঃ ব্রজের পথে অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহাদের অনর্থ নিবৃত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত স্বতন্ত্র সুখ-ভোগের ইচ্ছা ও ভোক্তৃঅভিমান তাঁহাদের প্রগতিতে বাধা দিতে পারে; সেইজন্য জাগতিক ভোগবিলাস হইতে দূরে থাকাই তাঁহাদের পক্ষে শ্রেয়ঃ। কিন্তু যাঁহারা শ্রীআশ্রয়-বিগ্রহের নিত্য অনুগতাভিমানী, নিত্য অন্তরঙ্গ সেবক, তাঁহাদের প্রতি সেরূপ বিচার প্রযোজ্য নহে। "দেহস্মৃতি নাহি যাঁর, সংসার-কূপ কাঁহা তার।" অনাত্ম প্রতীতিতে অবস্থিত ব্যক্তির ন্যায় তাঁহাদের জড়াহঙ্কার নাই বা কৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্রভাবে আপন সুখবাঞ্ছাও নাই। কৃষ্ণ-সুখবর্দ্ধনই তাঁহাদের একমাত্র কৃত্য। সুতরাং ভোগবিলাসের যে কুফল, তাহা তাঁহাদের নিকট হইতে লক্ষ যোজন দূরে ও নিম্নে অবস্থিত। তাই তাঁহাদের বিলাস জড়ভোগীর বিলাস-সাম্যে দর্শন করিলেও মহা অপরাধের আবাহন করা হইবে। জড়ভোগী আপনার ইন্দ্রিয়-তোষণতৎপর; অপ্রাকৃত ভক্তগণ কৃষ্ণসুখান্বেষণে নিরন্তর যত্নশীল। তাঁহাদের যাবতীয় চেষ্টাই কৃষ্ণের অসীম সুখ উৎপাদন করে। তাঁহাদের আচরণ, বেশ-ভূষা, বিলাস সমস্তই কৃষ্ণপ্রীতি-তাৎপর্য্যময় এবং যখন তাঁহারা উপলব্ধি করেন—কৃষ্ণ তাঁহাদের যাবতীয় চেষ্টায় সুখলাভ করিতেছেন, তখন কৃষ্ণের সুখে তাঁহাদেরও সুখ হয়। সেইজন্যই যে দেহ কৃষ্ণের সেবার উপকরণ, তাহার অনাদর না করিয়া প্রীতির সহিত তাহার পোষণ করেন।

এখানে এরূপ একটী সন্দেহ আসিতে পারে—উপরিউক্ত বিচার সম্ভোগ-লীলাকালেই প্রযোজ্য হইতে পারে। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবকগণ সকলেই বিপ্রলম্ভরসের সেবক, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীরায়-রামানন্দের ন্যায় কাহারও কাহারও সৌখীনতা লক্ষিত হয় কেন? শ্রীরূপ-রঘুনাথই বা এত কঠোরতা অবলম্বন করিলেন কেন?

উত্তরে প্রথমেই বলিতে হয়,—শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবকগণের মধ্যে শ্রীরায়-রামানন্দ প্রভৃতি ভোগবিলাসে রত ছিলেন এবং শ্রীগোস্বামিবর্গ এ বিষয়ে খুব কঠোরতা দেখাইয়াছেন—এইরূপ বিচার রায়-রামানন্দ ও গোস্বামিবর্গ, উভয়ের চরণেই অপরাধজ্ঞাপক। অপ্রাকৃত রসরসিক শ্রীরায়-রামানন্দকে প্রাকৃত ভোগিকুলের ন্যায় বিলাসব্যসনে আসক্ত মনে করা যেরূপ অপরাধ, নিত্যসিদ্ধ আচার্য্যশিরোমণি গোস্বামিগণকে সাধক জীবের ন্যায় জড়ভোগত্যাগে যত্নশীল শুষ্ক বৈরাগ্যপরায়ণ মনে করাও তদ্রূপ অপরাধ। কেবলমাত্র বাহ্য কঠোরতাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের বৈরাগ্যের মানদণ্ড নহে। শ্রীরূপ-রঘুনাথ ও শ্রীরায়-রামানন্দ প্রভৃতি

সকলেই যুক্তবৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ ও অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভরসসেবার পরিপোষ্টা। তাঁহাদের বাহ্য আচরণে আধ্যক্ষিকদর্শনে যে বৈষম্য দেখা যায়, বস্তুতঃ তাহা একই তাৎপর্য্যময়। একটী জড়ীয় উদাহরণ অতি ভয়ে ভয়ে দেওয়া যাইতেছে, সারগ্রাহী পাঠক উহার তাৎপর্য্য নির্ণয় করিয়া লইবেন—ইহাই প্রার্থনা।

সাধ্বী স্ত্রী স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্যই প্রসাধন সামগ্রী ও অলঙ্কারাদি ধারণ করেন। প্রিয়তম পতি যখন অন্যত্র গমন করেন বা কার্য্যোপরোধে তাঁহাদের মধ্যে বিচ্ছেদ উপস্থিত হয়, তখন পতিগতপ্রাণা স্ত্রী পতির বিরহদুঃখে কাতর হইয়া ভূষণাদি গ্রহণ করেন না, এমন কি ঐগুলি দেখিলেও তাঁহার দুঃখ বর্দ্ধিত হয়। আবার অন্য সময়ে কখনও কখনও এরূপও দেখা যায়—পতিবিয়োগবিধুরা পত্নী ঐ সকল বসন-ভূষণাদি স্বামীর প্রীতির উদ্দীপকজ্ঞানে যথাযথভাবে ব্যবহার করিয়া থাকেন। এখানে বাহ্যদর্শনে দুইটী দৃষ্টান্তে ভেদ প্রতীতি হইলেও বস্তুতঃ এই ত্যাগ ও গ্রহণ একই তাৎপর্য্যপর। দুইটীই স্বামীর প্রতি সাধ্বী স্ত্রীর প্রগাঢ় প্রীতিরই পরিচায়ক। মহাভাগবতগণের আচরণও সেইরূপ প্রাকৃতদর্শনে বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হইলেও বস্তুতঃ উহা একই উদ্দেশ্যে বিহিত ; বাহ্য আধ্যক্ষিক বিচারে ভেদ থাকিলেও প্রকৃত-প্রস্তাবে কোন পার্থক্য নাই।

জন্ম-মৃত্যু-রহস্য

এই মনুষ্য-জীবনে তিনটী প্রধান ঘটনা ঘটিয়া থাকে, তাহা আমরা দেখিতে পাই। জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ। একটা স্ত্রীলোকের পুত্র কি কন্যা জন্মিয়াছে, বলিলে আমরা বুঝিয়া থাকি, এ স্ত্রীলোকটী আমাদের ন্যায় দেহধারী একটা প্রাণী প্রসব করিয়াছে। জন্ম বলিলে সাধারণতঃ ইহাই বুঝায়। আবার যখন বলি, অমুক লোকের মৃত্যু হইয়াছে, তখনও সাধারণতঃ আমরা বুঝিয়া থাকি, ঐ ব্যক্তির পাঞ্চভৌতিক দেহের সমস্তই আছে অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়ই আছে, অথচ যে ঐশ্বরিক চেতনাশক্তির প্রভাবে ঐ ব্যক্তিটী হস্ত-পদাদি সঞ্চালন করিতে পারিত, তাহা উহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে এবং সকল ইন্দ্রিয়গণের কার্য্য স্থগিত হইয়া গিয়াছে। সকল মনুষ্যই নিজের, কি বন্ধু-বান্ধবের কন্যা, কি পুত্রের জন্ম ও বিবাহে আনন্দিত হয়, এবং পিতামাতা, স্ত্রী-পুত্র ও বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতি সকলের মৃত্যুতেই দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকে। এমন কি, জগতে যত প্রকারের ভয় আছে, মৃত্যুভয়কেই অধিকাংশ লোক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক

ভীতিজনক বলিয়া মনে করে। কারণ, অন্যান্য ভয়ের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার নানাপ্রকার উপায় আছে, কিন্তু মৃত্যুভয় হইতে এড়াইবার কোনও লোকের উপায় নাই, যেহেতু জন্মিলেই মরিতে হইবে। ইহাই ভগবানের অপরিহার্য্য নিয়ম।

জগতে তিন শ্রেণীর লোক দেখিতে পাই। এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহারা আপনাদিগকে অজর ও অমর মনে করিয়া যৌবন ও ধনমদে মত্ত থাকিয়া বৃথা সময় অতিবাহিত করে, অপরের মৃত্যু দেখিয়াও নিজেদের মৃত্যু-বিষয়ে একবারও চিন্তা করিয়া দেখে না। ২য় শ্রেণীর লোকেরা মনে করে যে, তাহারা এখন বিষয়-সম্পত্তি ভোগ করিয়া বৃদ্ধাবস্থায় হরিভজন করিবে, তাহা হইলেই মৃত্যুর হাত হইতে এড়াইতে পারিবে। আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা জ্ঞানোদয়ের পর হইতেই হরিভজনে রত হন। তবে এই শেষোক্ত শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে কতকগুলি লোক মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া হরিভজন করিয়া থাকেন। কতকগুলি লোক ফলাদি-কামনায় হরিভজন করিয়া থাকেন। তাঁহারা ভাবেন, মৃত্যুর পর স্বর্গাদি ধামে বাস করিয়া সুখে জীবন অতিবাহিত করিবেন। কতকগুলি লোক ভাবিতেছেন, পরমেশ্বর তাঁহাদের সৃষ্টিকর্ত্তা, তাঁহার ভজন না করিলে মহাপাপ হয়, তাঁহার ভজন করাই কর্ত্তব্য। আবার কতকগুলি লোক কেবল অনুরাগভরে শ্রীহরি ভজনা করিতেছেন; তাঁহারা কোনও ফলাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বক বা ভজন না করিলে মহাপাপ হইবে, এরূপ কর্ত্তব্যবোধে ভজন করে না। তবে ভজন না করিয়া থাকিতে পারেন না, তাই কেবল অনুরাগভরেই করিয়া থাকেন, কারণ, তাঁহাদের আত্মজ্ঞান বা নিজস্বরূপ-উপলব্ধি হইয়াছে অর্থাৎ তাঁহারা সদ্‌গুরুর কৃপায় বুঝিয়াছেন যে, তাঁহারা স্বরূপে কৃষ্ণের দাস, কৃষ্ণসেবাই তাঁহাদের কার্য্য, নশ্বর জগতে মায়ামুগ্ধ হইয়া নিজে ভোক্তা সাজিয়া বৃথা কালক্ষেপণ করা নির্ব্বোধের কার্য্য; অতএব কৃষ্ণসেবা না করিয়া থাকিতে পারেন না। কৃষ্ণের সেবা করাই তাঁহাদের স্বতঃসিদ্ধ প্রবৃত্তি।

কবে মৃত্যু হইবে তাহার কোনও স্থিরতা নাই বলিয়া নীতিশাস্ত্রকারগণ বলিয়া গিয়াছেন, যথা,—

অজরামরবৎ প্রাজ্ঞঃ বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।
গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ॥

প্রাজ্ঞ ব্যক্তি আপনাকে অজর অমর মনে করিয়া ধন ও বিদ্যা উপার্জ্জন করিবেন এবং কৃতান্ত যেন (নিজ সদনে লইয়া যাইবার জন্য) তাঁহার কেশে ধরিয়াছে, এইরূপ ভাবিয়া ধর্ম্মোপার্জ্জন করিবেন; অর্থাৎ মৃত্যু আমাদের কেশে ধরিয়া রহিয়াছে, কখন মরিব, তাহার কোনও স্থিরতা নাই, কি জানি

বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত বাঁচিয়া না থাকি, অতএব বাল্যাবস্থা হইতেই ধর্ম্মোপার্জ্জন করা উচিত।

বকরূপী ধর্ম্ম মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—'এ সংসারে আশ্চর্য্য কি?' তদুত্তরে যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন,—প্রত্যহই শতশত জীব যমালয়ে গমন করিতেছে; কিন্তু যাহারা অবশিষ্ট থাকিতেছে, তাহারা ইহা দেখিয়াও আপনাদিগকে অমর বলিয়া মনে করিতেছে; অতএব ইহা হইতে আশ্চর্য্য আর কি থাকিতে পারে? যথা মহাভারতে—

"অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্॥"
প্রাণিগণ অনুক্ষণ যায় যমঘরে।
সবাই দেখিছে তাহা চক্ষের উপরে॥
তথাপি যে ভাবে লোক, মরিতে না হবে।
ইহা হ'তে কি আশ্চর্য্য আছে বল ভবে??

আমরা অনেক সময়ই অনেক লোককে সাংসারিক কোন কষ্টে পড়িয়া "আমার মৃত্যু হইলে বাঁচিতাম, কেন মৃত্যু হইতেছে না" ইত্যাদি কথা বলিতে শুনিয়া থাকি, কিন্তু তাই বলিয়া কি তাহারা বাস্তবিকই মরিতে প্রস্তুত? কখনই না, কারণ, নিজ প্রাণাপেক্ষা বড় প্রিয় বস্তু জগতে আর দ্বিতীয় নাই। একটী উদাহরণ দিতেছি, শুনিলেই এ বিষয়টী বেশ বুঝা যাইবে। কোনও স্থানে একটা ভদ্র বিধবা স্ত্রীলোক তাঁহার একমাত্র নাবালিকা কন্যা লইয়া বাস করিতেন। কন্যাটীর বয়স যখন ১ বৎসর, তখন স্ত্রীলোকটী স্বামীহীনা হন। স্ত্রীলোকটীর প্রচুর ভূ-সম্পত্তি ও বহুল নগদ টাকা ছিল। সংসারে কোনও অভাব ছিল না। কন্যাটীর যত বয়স হইতে লাগিল, ততই মায়ের অত্যন্ত আদরের পাত্রী হইতে লাগিল। এমনকি কোনও ভাল সুখাদ্য পাইলে অগ্রে তাহাকে না দিয়া নিজে কখনও খাইতেন না। কন্যাটীর নাম গোপী রাখিয়াছিলেন। কোনও স্থানে একাকী গেলে গোপীর জন্য তাঁহার মন সর্ব্বদাই চঞ্চল থাকিত। তাহার অদর্শনে নিমেষকালও যুগবৎ প্রতীয়মান হইত। স্ত্রীলোকটী মনে করিয়াছিলেন, গোপীর বিবাহ দিয়া জামাতাকে গৃহে রাখিবেন। দেখিতে দেখিতে গোপীর বয়স প্রায় দ্বাদশ বৎসর হইল, এবার জামাতার অনুসন্ধান করিবেন, এইটী দুই একদিন মনে করিতে লাগিলেন। কিন্তু মানুষ যাহা মনে করে, তাহা সকল সময় ঘটিয়া উঠে না, ভগবানের যাহা ইচ্ছা, তাহাই ঘটিয়া থাকে। আষাঢ় মাস প্রায় শেষ হইয়া আসিল, একদিন গোপীর হঠাৎ মাথা ধরিয়া শরীর অসুস্থ হইল; তারপর জ্বর হইল, এইরূপে ৫।৬ দিন গত

হইলেও জ্বর ছাড়িল না, বরং দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। চিকিৎসা খুব চলিতেছে, তথাপি রোগের উপশম হইল না। এইরূপে ১৭।১৮ দিন গত হইল, রোগ খুব বাড়িয়াছে, প্রাণ পাইবার আর আশা নাই, বহু বিজ্ঞ চিকিৎসক আনা হইল, কিন্তু কোনও ফল হইল না। এইরূপ অবস্থায় একদিন অমাবস্যার ঘোর তামসী নিশায় প্রায় ১ টার সময় তিনি একাকী গোপীর পার্শ্বদেশে বসিয়া আকাশ-পাতাল নানা বিষয় চিন্তা করিতেছেন, মিটি মিটি একটী প্রদীপ জ্বলিতেছে এবং মুষলধারে এরূপ বৃষ্টিপাত হইতেছে যে, কোনও লোকের গৃহ হইতে বহির্গত হওয়া অসম্ভব। এমন সময়ে একটী কৃষ্ণবর্ণ বৃষ নিকটস্থ এক কৃষকের ধান্য সিদ্ধ করিবার কলসীতে তাহার মুখ প্রবেশ করাইয়া মুখে সেই কলসীসহ সেই স্ত্রীলোকের গৃহে উপস্থিত। স্ত্রীলোকটী হঠাৎ সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব জন্তুটী অবলোকন করিয়া চিন্তা করিল, হয়ত' স্বয়ং যম-রাজাই গোপীকে লইতে আসিয়াছেন। তখন তিনি ভয়ে কম্পান্বিত-কলেবর হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি জানি যমরাজ গোপী-ভ্রমে তাঁহাকেই ধরিয়া লইয়া যান; এইজন্য তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি গোপী নই; যাহাকে খুঁজিতেছেন, সেই গোপী ওখানে রহিয়াছে।" এই কথা বলিয়া দূর হইতে দেখাইয়া দিয়া নিজে সরিয়া গেলেন। এখন পাঠকবর্গ ভাবিয়া দেখুন যে, মৃত্যুভয় কিরূপ ভয়ঙ্কর এবং নিজপ্রাণ কিরূপ প্রিয়। যে কন্যাটীকে নিজ প্রাণাপেক্ষাও অধিকতর ভালবাসিতেন, অনায়াসে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া নিজ প্রাণরক্ষার জন্য পলাইয়া গেলেন। মৃত্যুভয় যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভীতিজনক, তাহার আরও একটী দৃষ্টান্ত এস্থলে প্রদত্ত হইল। ইহা পাঠ করিয়াও পাঠকবর্গ বেশ বুঝিতে পারিবেন যে, মৃত্যুভয় জীবের পক্ষে কিরূপ অসহনীয়।

কোনও স্থানে এক কৃষক বাস করিত। তাহার কেবল একটী মাত্র পুত্র ছিল। পুত্রটী কুসঙ্গে পড়িয়া জীবহিংসা করিতে বড় ভালবাসিত। মৎস্য, মাংস না পাইলে তাহার খাইতে বড় কষ্ট হইত। ক্রমে ক্রমে তাহার স্বভাব ব্যাধের ন্যায় হইয়া পড়িল। এই সময়ে কৃষকের বয়স প্রায় ৬০ বৎসর। বৃদ্ধ প্রায়ই তাহাকে জীবহিংসা করিতে নিষেধ করিত। কিন্তু সে কখনও তাহা শুনিত না; বরং পিতার সহিত গণ্ডগোল করিয়া সময়ে সময়ে তাহাকে প্রহার করিত। কৃষক তাহার পুত্রকে সময়ে সময়ে বুঝাইয়া বলিত "দেখ বাবা, জীবহিংসা মহাপাপ; অনেকে মনে করে, মৎস্য-মাংস খাইলেই শরীরে বল হয়, কিন্তু তাহা ভুল; সাত্ত্বিক আহারেও সেইরূপ বল জন্মে। তামসিক কিম্বা রাজসিক খাদ্যের দ্বারা যে বল উৎপন্ন হয়, সেই বলের সঙ্গে জীবকে উদ্ধত-প্রকৃতি ও নিষ্ঠুর স্বভাবাপন্ন করিয়া তুলে এবং

তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভগবদ্বিমুখও করিয়া তুলে। আর দেখ দুগ্ধ-ঘৃত প্রভৃতির ন্যায় সাত্ত্বিক দ্রব্য আহার করিলেও শরীরে বেশী বল হয়, এবং যাহারা ঐ প্রকার সাত্ত্বিক দ্রব্য খাইয়া থাকে, তাহাদের প্রকৃতি খুব মৃদু ও ধীর হয়; এবং তাহাদের মনও স্বতঃই ভগবানের দিকে ধাবিত হইয়া থাকে। আরও দেখ, যখন কোনও প্রাণীকে বধ করা হয়, তখন সেই প্রাণিটী ক্রোধান্বিত হয়; আবার কোনও প্রাণী রাগান্বিত হইলে তাহাদের রক্ত গরম হইয়া বিষাক্ত হইয়া উঠে, এবং সেই বিষ সমস্ত শরীরে ব্যাপিয়া পড়ে; তাই অতিশয় ক্রোধে ক্রোধী ব্যক্তি অনেক সময় মারা গিয়া থাকে। দেখ, গো, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি গৃহ-জন্তুসকল বৃক্ষের পাতা, ফল, মূল প্রভৃতি খাইয়া থাকে বলিয়া তাহাদের স্বভাব মৃদু ও ধীর।" এইরূপ অনেক উপদেশ দেওয়া সত্ত্বেও একদিন কথায় কথায় উভয়ের মধ্যে ঝগড়া হইয়া বৃদ্ধের পুত্র বৃদ্ধকে যষ্টিদ্বারা প্রহার করে। বৃদ্ধ দুঃখিত-মনে নিকটস্থ এক বিচারপতির নিকট এই বিষয় সম্বন্ধে অভিযোগ করিল। বিচারপতি কৃষকের নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া যুবককে বিচারালয়ে ডাকিয়া আনিলেন এবং তাহার এজাহার গ্রহণ করিয়া তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করত বলিলেন,—"তোমার সাত দিবস পরে ফাঁসি হইবে, তুমি সাত দিবসের মধ্যে যাহা ইচ্ছা খাইতে পার, তবে তোমাকে অদ্য হইতে সাত দিন এখানে কারাগৃহে আবদ্ধ থাকিতে হইবে। তুমি যাহা খাইতে চাইবে, প্রহরীগণ তাহা আনিয়া দিবে, আমি তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিলাম। তুমি তোমার পিতাকে অনেক সময় অত্যন্ত কষ্ট দিয়াছ! তোমার পিতা একজন সৎ লোক; কৃষক হইলে কি হইবে?—ব্যবহারে সদসৎ বুঝা যায়।" এই বলিয়া বিচারপতি তাহাকে কারাগৃহে পাঠাইয়া দিলেন। পরে প্রহরীগণকে বলিয়া দিলেন—"দেখিও, যেন ইহার খাবার বিষয়ে কোনও ত্রুটী না হয়, সাত দিন পরে ইহাকে আমার নিকট আনিবে।" যে ব্যক্তি জানিতে পারে যে সাত দিন পরে তাহার মৃত্যু হইবে, তাহার নিকট স্ত্রী-পুত্র, ধনরত্নাদি ও নানাবিধ উৎকৃষ্ট উপাদেয় খাদ্য-দ্রব্য কি আর ভাল লাগে? কৃষক-পুত্রেরও তাহাই ঘটিল। সে আর সময়মত কিছু খাইতে চাহে না, তবে যখন বেশী ক্ষুধা লাগে, তখন কিঞ্চিন্মাত্র খাইয়া প্রাণ ধারণ করিয়া থাকে। এইরূপে সাতদিন কাটিয়া গেল। পরে আদালতে বিচারপতির নিকট তাহাকে আনা হইল। বিচারপতি তাহাকে অত্যন্ত কৃশ দেখিয়া কহিলেন,—"তুমি এত দুর্ব্বল হইলে কেন? তোমার কি শারীরিক কোনও পীড়া হইয়াছে, কিম্বা প্রহরীগণ কি তোমাকে সময়মত খাইতে দেয় নাই?" এই কথা শুনিয়া কৃষক পুত্র বলিল,—"যে ব্যক্তি পূর্ব্বেই জানিতে পারে যে, সাত দিবস পরে তাহার

মৃত্যু হইবে, তাহার কি আর কিছু খাইতে ইচ্ছা হয়, বা জগতের ঐশ্বর্য্যাদিতে তাহার মন আকৃষ্ট হয়? কখনই না। আপনি কি বুঝিতে পারিতেছেন না, আমার অবস্থা এখন কিরূপ?" বিচারপতি বলিলেন,—"প্রাণ কিরূপ প্রিয়বস্তু এবং মৃত্যু কিরূপ ভীতিজনক, তাহাত' এখন বেশ বুঝিয়াছ? এখন বুঝিয়া দেখ, আমাদের ন্যায় কোনও জীবই মরিতে ইচ্ছুক নহে এবং আমাদের ন্যায় প্রত্যেকের প্রাণও তাহাদের নিকট সেইরূপ প্রিয়। তুমি এখন প্রতিজ্ঞা কর যে, অদ্য হইতে তোমার পিতার আদেশানুসারে চলিবে এবং অদ্য হইতে কোনও প্রাণীকেও বিনষ্ট করিবে না, তাহা হইলে তোমাকে আমি ফাঁসি-দণ্ড হইতে মুক্ত করিয়া দিব।" কৃষ্ণকপুত্র তাহাতে স্বীকৃত হইলে বিচারপতি তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, মৃত্যু অপেক্ষা ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি জগতে আর দ্বিতীয় নাই।

রাজা পরীক্ষিৎ একদা মৃগয়ার্থ অরণ্যে গমন করিয়া একটী মৃগকে বাণবিদ্ধ করিলেন। মৃগ বাণবিদ্ধ হইয়া পলায়নপর হইলে রাজা একাকী তাহার অনুসরণ করিলেন। পরে পিপাসার্ত্ত হইয়া শমীক ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট জল প্রার্থনা করিলে ঋষি ধ্যানমগ্ন থাকায় তাঁহাকে জল প্রদান করিলেন না। তাহাতে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার গলদেশে একটী মৃত সর্প ঝুলাইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। পরে শুনিলেন, তাহার প্রতি অভিসম্পাৎ হইয়াছে যে, সর্পরাজ তক্ষক সপ্তাহমধ্যে তাঁহাকে দংশনপূর্ব্বক শমন-সদনে প্রেরণ করিবে। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া মহর্ষি ও রাজর্ষিগণ সংঘবদ্ধ হইয়া রাজা পরীক্ষিতের নিকট আসিতে লাগিলেন। বেদব্যাস, নারদ, অত্রি, বশিষ্ঠ, চ্যবন, ভৃগু, অঙ্গিরা, পরাশর, বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ, গৌতম, অগস্ত্য প্রভৃতি মুনিগণ প্রায় সকলেই আসিয়াছেন। পরীক্ষিৎ তাঁহাদের নিকট কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক নিবেদন করিলেন,—"আপনারা মূর্ত্তিমান্ ব্রহ্মতেজঃস্বরূপ, জ্ঞানামৃতের আধার। আমার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইয়াছে, আর কতিপয় দিবসমাত্র অবশিষ্ট। এ সময় এ স্থানে এই মুমূর্ষুর পারত্রিক মঙ্গলের জন্য কি কার্য্য অবলম্বনীয়।" "নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।" রাজার এই কথা শুনিয়া কেহ কহিলেন,—'যাগ-যজ্ঞই এ সময় উত্তম কর্ম্ম।' কেহ যোগ, কেহ তপস্যা, কেহ বা দান-ধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তন করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে এইরূপ বাদ-বিতণ্ডা হইতেছে। এমন সময়ে ব্যাসপুত্র মহাযোগী শুকদেব গোস্বামী উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া সকলে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিলে রাজা প্রণতিপূর্ব্বক পাদ্য-অর্ঘ্য আসনাদিদ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,—"হে ভগবন্! আপনার পদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া আজি আমি পবিত্র হইলাম। ভবাদৃশ

মহাপুরুষদিগের স্মরণেও যখন দেহ ও গেহ পবিত্র হইয়া থাকে, তখন দর্শন ও স্পর্শনে যে অধিকতর পবিত্র হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি ?" সাধু-সমাগমের কি অপূর্ব্ব মহিমা ! তদীয় আবির্ভাবে তথা এক আশ্চর্য্য ব্যাপার উপস্থিত হইল। মহারাজ সেই দুর্ঘটনার পর হইতে জীবদ্দেহে অনুতাপের চিতানলে দগ্ধ হইতেছিলেন। তাঁহার পক্ষে ঐশ্বর্য্যোদ্ভাসিতা রাজপুরী ও রাজসম্পদ্ এবং প্রাণাধিক পুত্র-কলত্রাদি স্বজনবর্গ সকলই অন্ধকারময় জ্ঞান হইতেছিল। অকস্মাৎ সেই গভীর শোকান্ধকার ভেদ করিয়া এক দিব্যজ্যোতিঃ প্রকাশিত হইল। সে হাহাকার ও শোকোচ্ছ্বাস দূর করিয়া অপূর্ব্ব শান্তিধারা প্রবাহিত হইল। পরিবারবর্গের সহিত মহারাজ যেন এ জ্বালাময় সংসার-পার হইয়া কল্পনাতীত, অনির্ব্বচনীয় প্রেমরাজ্যে উপনীত হইলেন। সে ভীষণ ব্রহ্মশাপ ঈশ্বর-কৃপায় পরিণত হইল। এইজন্য শাস্ত্রকারেরা বলেন,—

"সাধূনাং দর্শনং পুণ্যং তীর্থভূতা হি সাধবঃ।
কালে ফলন্তি তীর্থানি সদ্যঃ সাধুসমাগমঃ॥"

সাধুর দর্শনমাত্রে পুণ্যলাভ হয়।
তীর্থের অধিক সাধু জানিবে নিশ্চয়॥
বিলম্বে সফল হয় তীর্থাদি-সেবন।
সদাই সফল হয় সাধু দরশন॥

পরীক্ষিত বলিলেন,—"বোধ হয়, পাণ্ডবদের সখা শ্রীকৃষ্ণ আজি আমার উপর প্রসন্ন হইয়াছেন, আবার এই ঘোর বিপদ জানিতে পারিয়া তিনিই আপনাকে মিলাইয়া দিয়াছেন। তাহা না হইলে আজি আপনার দর্শন আমার ভাগ্যে ঘটিবে কেন ? ভগবন্ ! আপনি যোগিগণের আরাধ্য ও জ্ঞানিগণের শ্রেষ্ঠ ; আমারও মৃত্যুকাল উপস্থিত। অতএব আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, মৃত্যুকালে মানুষের যাহা কর্ত্তব্য, দয়া করিয়া তাহা আমাকে উপদেশ দিন্।" রাজা বিনয়সহকারে এই প্রশ্ন করিলে শুকদেব তাঁহার মুক্তির জন্য হরিভক্তি-লাভের পরম উপায় হরিলীলা বর্ণন করিতে লাগিলেন। শুকমুখ-বিনিঃসৃতা সে ভাগবতী সুধা পরম ভক্তিযোগে পান করিয়া মহারাজ পরীক্ষিৎ সেই করাল কাল-ফণীকে পুষ্পমালার ন্যায় কণ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন, তিনি ভৌতিক দেহপিণ্ডমাত্র কৃতান্ত-হস্তে অর্পণপূর্ব্বক সচ্চিদানন্দ-ধামে প্রস্থান করিয়াছিলেন।

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৫শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৭১ পৃষ্ঠার পর]

কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, যোগযোগ, তপস্যাযোগ, ভক্তিযোগ প্রভৃতি বহুপ্রকারের যোগ আছে। যোগ মানে একটা channel, Line। কিন্তু সমস্ত Systemটা নিয়ে ভক্তিযোগ। এটা শাস্ত্রে ব্যাখ্যা করেছেন। কেন না, ভক্তি ছাড়া সমস্ত অনুষ্ঠানটা নিষ্ফল হয়ে যাচ্ছে, পণ্ড হয়ে যাচ্ছে। কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, তপযোগ—সবটাই ভক্তিযোগ ছাড়া বিফল হয়ে যাচ্ছে। সেখানে ভক্তিযোগকে বলছেন মূল বিষয়বস্তু। 'ভক্ত্যা মামভিজানাতি', 'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্য', 'ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলম্'। তাহলে ভক্তিযোগ ছাড়া কিছু হচ্ছে না—সেই কথা বলছেন শাস্ত্রে।

ভগবান্ এ জগতে আবির্ভূত হচ্ছেন, তিনি বিশেষ সময়ে বিশেষ তত্ত্বদর্শন শিক্ষা দিচ্ছেন জগৎকে। আমাদের সবটাই সেই সেই অনুসারে গ্রহণ করতে হবে। আজকাল বহু ব্যক্তি আমাদের বলছেন,—মশায়! ধর্ম্মকে যুগোপযোগী করলে ত' ভাল হয়। তাদেরকে উত্তর দেওয়া হয় যে, শাস্ত্রে যুগোপযোগী করে বলা আছে। যুগোপযোগী করার দায়িত্ব ভগবান্ আমাদের উপর ছেড়ে দেন নাই। ওটা তিনি নিজেই রেখে দিয়েছেন এবং শাস্ত্রে ব্যবস্থা দিয়েছেন।

কৃষ্ণ যখন চলে যাচ্ছেন তখন তাঁর একান্ত ভক্ত উদ্ধবাদি সব কান্নাকাটি করছেন। ভগবান্ সান্ত্বনা দিচ্ছেন—আমার সময় হয়েছে, আমি চলে যাচ্ছি। তোমাদের কিছু কাজ বাকী আছে। উদ্ধব, তুমি কান্নাকাটি করো না। যে কথা আমি জগতে বলে গেলাম, সেটা জগজ্জীবকে বুঝাও তোমরা। সেইজন্য তোমাকে থাকতে হবে। ভগবান্ ত' কাজ করে দিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু কোন কোন ভক্তকে আবার রেখে যাচ্ছেন। ভগবানের পরিশ্রম বেশী ভক্তের থেকেও, কিন্তু ভগবান্ বলছেন,—না, তোমার পরিশ্রম বেশী। এটা প্রেমের স্বভাব, স্নেহের স্বভাব। সেইজন্য তিনি তাঁর সবটারই প্রাধান্য দিচ্ছেন। ভক্ত ভগবানকে ভালবাসেন, ভগবান্ ভক্তকে ভালবাসেন, কিন্তু ভগবান্ কেন ভক্তকে ভালবাসেন ভগবান্ উত্তর দিতে পারবেন না। আবার ভক্ত ভগবানকে ভালবাসেন কেন যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহলে ভক্তও উত্তর দিতে পারবেন না। উত্তরটা নাই কেন?—অন্তরের উপলব্ধির ব্যাপার এটা, কাউকে বুঝিয়ে বলা যাবে না। ওটা অন্তরের অনুভবের বিষয়, সেইজন্য বলা চলে না। শাস্ত্রীয় দর্শন বহু কিছু রয়েছে। আমাদের ঠিক সেইভাবে বুঝতে হবে।

অরুণোদয় বিদ্ধাস্তু সংত্যজ্য হরিবাসরঃ।
জন্মাষ্টম্যাদিকং সূর্য্যোদয়বিদ্ধাং পরিত্যজেৎ॥

বিদ্ধা জন্মাষ্টমী-তিথি পালন করলে লাভ হবে না। ভক্তি-শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আমরা এই ব্রত পালন করব। উপবাস করলে পরে কল্যাণ হবে বলা আছে। উপবাস মানে সারাদিন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলাম তা নয়। 'উপ' মানে সমীপে। কার সমীপে?—ভগবানের সমীপে, নামব্রহ্মের সমীপে, নাদব্রহ্মের সমীপে, শব্দব্রহ্মের সমীপে বাস। অন্যদিনে যতটুকু ভগবানের নাম করি, তার থেকে বেশী করব উপবাসের দিন; অন্যদিনে যতটুকু ঠাকুরের সেবা-পূজা করি, তার থেকে ভালভাবে করব এই দিনে; অন্যদিনে যতটুকু সেবাকাজ করি, তার থেকে বেশী সেবাকাজ করব এই দিনে; অন্যদিনে যতটুকু হরিকথা আলোচনা করি, তার থেকে বেশী হরিকথা আলোচনা করতে হবে এই দিনে। এটা হল উপবাস, ভগবৎসমীপে বাস। সুতরাং আমাদের এ বিষয়ে বিশেষ যত্ন থাকা দরকার।

একাদশী, জন্মাষ্টম্যাদি ব্রত পালন করার প্রয়োজন আছে। আজকাল গৃহস্থদের মধ্যে ওসব উঠে যাচ্ছে, আবার মঠ-মন্দিরেও উঠে যাচ্ছে। আমাদের গুরুবর্গ যে-সব উপবাস করেছেন, সে-সব আজ উঠে যাচ্ছে। কোন কোন মঠে তাঁরা এই সব উপবাসের কিছু কিছু বাদ দিয়ে দিচ্ছেন। মহাবিষ্ণুর অবতার অদ্বৈতপ্রভুর আবির্ভাব-তিথি মাকরী-সপ্তমীর উপবাস বাদ যাচ্ছে। নিত্যানন্দ-ত্রয়োদশী, শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব-তিথি বাদ যাচ্ছে। সাধনের ক্ষেত্রে এই বিধি-নিষেধ ত' রাখতে হবে। বিধি-নিষেধ ছাড়া কি কিছু চলবে? ভগবানকে ভালবাসতে গেলে বিধি-নিষেধ আমাদের পূর্ণভাবে মেনে নিতে হবে। আগে বিধি-নিষেধ পালন করলে তবে ত' আমরা উন্নত অবস্থায় উঠব। বিধি-নিষেধকে বাদ দিয়ে রাগমার্গে প্রবেশের সম্ভাবনা নাই। রাগ কাকে বলছেন?—ইষ্টবস্তুর প্রতি স্বাভাবিক নিষ্ঠা হল রাগ। সাধারণ ভাব অতীত হলে আসে সে অবস্থাটা। ওটা গায়ের জোর জুলুমের ব্যাপার নয়।

সাধন-ভজনের যে কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে সাধন এবং ভজন দুটো ক্ষেত্রের কথা বলা হয়েছে। যতদিন আমাদের চিত্তবৃত্তি প্রাকৃত ভূমিকায় রয়েছে, যতদিন আমাদের মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য রয়েছে, যতদিন আমাদের মধ্যে তত্ত্বজ্ঞানের অভাব রয়েছে, ততদিন পর্য্যন্ত সাধন কথাটা রয়েছে। কিন্তু যখন এই অবস্থার অতীত অবস্থায় উন্নীত হব আমরা, তখন ভজনের কথা আসবে। ভজন মানে Realisation—অনুভব—বাস্তব অনুভূতি। আমি যাঁরই ভজন করি না কেন, যাঁরই উপাসনা করি না কেন ফলটা একই হবে—এটা বাজে

কথা, অযৌক্তিক কথা। আমি যে Authorityর কাছে Submission দেব, শরণাগত হব, আত্মসমর্পণ করব, আমার অবস্থাটাও সেইরকমই আমি পাব। এটা শাস্ত্র বলছেন। ভগবানকে ভালবাসতে হবে এটা বড় কথা।

আমরা শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী-ব্রত ও জয়ন্তী-তিথি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেছি। এ সম্বন্ধে বহু বক্তব্য থাকলেও একটা জিনিস আলোচনা করতে ইচ্ছা হয়। 'অদ্বৈত-সিদ্ধি' প্রমুখ গ্রন্থ-প্রণেতা শ্রীমধুসূদন সরস্বতীপাদ তিনি তাঁর ভক্তিরসায়ন-গ্রন্থে মুখবন্ধে একটা শ্লোক উল্লেখ করেছেন। সেই শ্লোকের উদ্দিষ্ট বিষয়বস্তু হচ্ছেন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। যিনি পূর্ব্বে অদ্বৈতবাদী, মায়াবাদী ছিলেন, তিনি পরে শ্রীল জীব গোস্বামীর সঙ্গে বিচারে পরাস্ত হয়ে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। সেই ব্যক্তি—যিনি অদ্বৈতবাদকে শেষ স্থাপন করে গেলেন, তিনিই আবার নামকরা গোঁড়া বৈষ্ণব হয়ে গেলেন। বৈষ্ণব হয়ে যাওয়ার পর তাঁর যে গ্রন্থ রচনা তারই একখানার নাম হল 'ভক্তিরসায়ন'। ভক্তিরসায়ন-গ্রন্থের মধ্যে তিনি কৃষ্ণের মহিমা বর্ণন করেছেন একটা শ্লোকে—

বংশীবিভূষিত-করান্নবনীরদাভাৎ পীতাম্বরাদরুণবিম্বফলাধরোষ্ঠাৎ।
পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখাদরবিন্দনেত্রাৎ কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে॥

শ্লোকটা খুব প্রাঞ্জল ভাষা। শ্লোকটার শেষ লাইনে বলছেন,—"কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে॥" ভগবান্ কৃষ্ণ ছাড়া অন্য কেউ পরতত্ত্ব—শ্রেষ্ঠতত্ত্ব আছে বলে আমি জানি না। কৃষ্ণ হচ্ছেন পরতত্ত্ব, আমাদের যেটা বিশেষ আলোচ্য বিষয়। চৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্যচরিতামৃতের একটী শ্লোকে লিখেছেন,—আমরা দেখছি "কৃষ্ণাৎ পরংকিমপি তত্ত্বমহং ন জানে" যেমন, "ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ" তদ্রূপ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—এই যে পরতত্ত্ব, ইনি ছাড়া জগতে আর কেউ শ্রেষ্ঠ আরাধ্য বস্তু নাই। দুটো কথা দু জায়গায় উল্লেখ আছে। অর্থ একই রকম। একজন বলছেন কৃষ্ণ ছাড়া আমি পরতত্ত্ব জানি না। আর একজন বলছেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্ব ছাড়া আমি অন্য কোন শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব জানি না। দুটোর মধ্যে বিচার আছে। কৃষ্ণ স্বয়ং সর্ব্বারাধ্য তত্ত্ব, পরম ভজনীয় বস্তু—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। চৈতন্যমহাপ্রভুকেও একই কথা বলা হয়েছে। চৈতন্যমহাপ্রভু হচ্ছেন "রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণ-স্বরূপম্।" এইভাবে চৈতন্যমহাপ্রভুকে প্রণাম করা হচ্ছে। রাধাভাবকান্তি নিয়ে যিনি গৌরমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হয়েছেন, তিনিই হলেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। সেই যে পরতত্ত্ব তাঁকে শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণনা করেছেন,—

যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিত-তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ॥

ব্রহ্মা, রুদ্র, বরুণ প্রভৃতি যত দেবতাবৃন্দ আছেন, তাঁরা সবাই যাঁর স্তব করছেন, যোগিগণ যাঁকে ধ্যানে পাচ্ছেন না, ব্রহ্মর্ষি, মহর্ষি, দেবর্ষি তাঁরা যে ভগবানকে জানতে পারছেন না, বুঝতে পারছেন না, সেই অবাঙ্‌মনসগোচর তত্ত্ব যে ভগবান্ তাঁকে আমি প্রণাম করি। তাহলে কে সেই ভগবান্? ভগবান্-শব্দের ব্যাখ্যা শাস্ত্রে রয়েছে।—

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥

ষড়ৈশ্বর্য্যশালী যে তত্ত্ব তিনি হলেন ভগবান্, তিনি হলেন কৃষ্ণ। এই কৃষ্ণ সমস্ত অবতারের অবতারী। সে কথা সনাতন শাস্ত্রসমূহে—গীতা, ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারতে বলেছেন।

বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে॥

ভগবান্ শ্রীহরির পারতম্য, ভজনের শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্বশাস্ত্রে প্রমাণ করছেন। সেই প্রেমময় ভগবান্ যখন প্রকাশিত হচ্ছেন এজগতে, তখনকার জগতের অবস্থার একটা বর্ণনা রয়েছে। ভক্ত তাঁকে সাক্ষাদ্ভাবে দর্শন করছেন, তাঁর তত্ত্ব উপলব্ধি করছেন; আবার সাধককে দর্শন করছেন সেই ভগবান্। ভগবানকে সামনে দর্শন করেও তাঁকে ভগবান্ বলে চিনতে পারা, জানতে পারা এটা ভগবানের বিশেষ করুণা। সবাইয়ের পক্ষে সেটা সম্ভব হচ্ছে না।

ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত' যাহারে।
সেই ত' ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে॥
অনুমান প্রমাণ নহে ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞানে।
কৃপা বিনা ঈশ্বরতত্ত্ব কেহ নাহি জানে॥

ভগবানকে জানতে বুঝতে গেলে তাঁর কৃপা একমাত্র তাঁকে জানবার উপায়। কৃষ্ণচন্দ্র যখন এজগতে এসেছেন, তখন তাঁকে কয়জন বা স্বয়ং ভগবান্ বলে বুঝতে পেরেছেন, চিনতে পেরেছেন। চৈতন্যমহাপ্রভু যখন জগতে প্রকটিত হয়েছেন—স্বয়ং ভগবান্ যখন রাধাভাবকান্তি লয়ে এজগতে আবির্ভূত হয়েছেন, তখন বা তাঁকে কয়জন বুঝতে পেরেছেন, জানতে পেরেছেন। তাঁর প্রতি ত' অনেকে অনেক রকমের কটূবাক্য প্রয়োগ করেছেন, বহু উল্টোপাল্টা কথা বলেছেন। পড়ুয়া, পাষণ্ডী তারা তাঁকে বুঝতে পারে নাই, সাধারণ ভাবুক বলে মনে করেছেন। যার জন্য মহাপ্রভুকে জীবকল্যাণের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করতে হচ্ছে। আপনারা সবাই জানেন, চৈতন্যমহাপ্রভু যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করতে যাচ্ছেন তখন একটা

কারণ দেখিয়েছেন, আমি কেন সন্ন্যাস গ্রহণ করতে যাচ্ছি? স্মৃতিশাস্ত্রে রয়েছে,—

দেবতা-প্রতিমাং দৃষ্ট্বা যতিং চৈব ত্রিদণ্ডিনম্।
নমস্কারং ন কুর্য্যাচ্চেদুপবাসেন শুদ্ধ্যতি ॥

শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহকে দর্শন করে যদি কেউ দণ্ডবৎ-প্রণাম না করেন, প্রতিমা, শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করে যদি মাথা না নোয়ায়, তাহলে তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় কিসের দ্বারা?—উপবাসের দ্বারা। স্মৃতিতে এরূপ বিধান আছে। চৈতন্যমহাপ্রভু দেখলেন আমাকে ত' এরা চিনতে পারছে না, বুঝতে পারছে না, তাই তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করতে যাচ্ছেন জীবকল্যাণের জন্য। এরা আমাকে সন্ন্যাসী জ্ঞানেও যদি প্রণাম করে, আমার প্রতি শ্রদ্ধাবিধান করে, তাহলে এদের কল্যাণ হবে। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের এটাও একটা কারণ। মূল তত্ত্ববস্তু যে কৃষ্ণচন্দ্র তিনি নিঃশক্তিক নন, সশক্তিক; রাধাসহ শ্রীমাধব। তাঁকে প্রকাশ করবার জন্য, প্রচার করবার জন্য তিনি আবির্ভূত হয়েছেন এ জগতে। সেই যে অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র—যিনি রাধা ছাড়া কখনও নন, সেই তত্ত্ববস্তুই জগতে প্রথম প্রকটিত হয়েছেন, আবার তাঁরই ভাবকান্তি নিয়ে চৈতন্যমহাপ্রভু জগতে এসে সেই রাধাগোবিন্দের সেবাই প্রকাশ, প্রচার করেছেন। কিছু বৈশিষ্ট্য এর ভিতরে আছে, সে বৈশিষ্ট্য আমাদের বুঝতে হবে।

বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাস যেভাবে এই শ্রীকৃষ্ণ-জন্ম-জয়ন্তী-তিথি উপবাসমুখে পালন করতে হবে, সে সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে বিধান দিয়েছেন। আমরা সংক্ষিপ্তভাবে তারই কিছু আলোচনা করতে ইচ্ছা করি। (ক্রমশঃ)

ব্যঞ্জন-বর্ণমালায় শ্রীগুরু-মহিমা

ক—কৃষ্ণের প্রকাশ শ্রীগুরুদেব আমার।
খ—খেয়াঘাটে মাঝি হয়ে জীবে করে পার ॥ ১ ॥
গ—গুরুর চরণ-তরী করিয়া ভরসা।
ঘ—ঘাটে আছি বসে আমি পার হব আশা ॥ ২ ॥
ঙ—উচ্চ অভিলাষ মনে—হব আমি পার।
চ—চিত্ত মোর রিপুবশে হইল ছারখার ॥ ৩ ॥

ছ—ছট্‌ফট্‌ করে মন না দেখি কাণ্ডারী।
জ—জন্মান্তরীণ বায়ুবেগ সহিতে না পারি ॥ ৪ ॥
ঝ—ঝঞ্ঝাবর্ত্তরূপ-কাম মোরে লৈয়া যায়।
ঞ—এস শ্রীগুরুদেব ঝট রক্ষ আমায় ॥ ৫ ॥
ট—টান কেশে ধরি' মোরে রাখ শ্রীচরণে।
ঠ—ঠিকানায় লৈয়া মোরে চল নিজগুণে ॥ ৬ ॥
ড—ডোরি গলে বেঁধে মোরে রাখ তব ঠাঁই।
ঢ—ঢাক মোরে কৃপাঞ্চলে তবে রক্ষা পাই ॥ ৭ ॥
ণ—নাহি ভক্তিলেশ কিংবা শুভ-অনুষ্ঠান।
ত—তুমি মোরে প্রসন্ন হই' দেও আত্মজ্ঞান ॥ ৮ ॥
থ—থির করিতে নারি মন অনেক যতনে।
দ—দয়া কর গুরুদেব এ অধম-জনে ॥ ৯ ॥
ধ—ধর্ম্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত নাশ সর্ব্বসংশয়।
ন—নিতান্ত অযোগ্য মুই ধরি তব পায় ॥ ১০ ॥
প—পরম পবিত্র তব মহিমা অপার।
ফ—স্ফুট হও পদ্মরূপে হৃদয়ে আমার ॥ ১১ ॥
ব—বর্ণনাতীত তব গুণ শাস্ত্রে অগোচর।
ভ—ভক্তিতে ভূষিত অঙ্গ দেখিতে সুন্দর ॥ ১২ ॥
ম—মকরন্দ জিনি শ্রীবচন সুধাকর।
য—যতীন্দ্র শ্রীদীর্ঘতনু অতিমনোহর ॥ ১৩ ॥
র—রবিরশ্মি-নিন্দিত শ্রীঅঙ্গ-জ্যোতি রাশি।
ল—লাবণ্য শ্রীমুখপদ্ম মন্দ মন্দ হাসি ॥ ১৪ ॥
ব—বচন সুগম্ভীর শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত অপার।
শ—শ্রবণে ত্রিতাপ নাশে ঘুচায় সংসার ॥ ১৫ ॥
ষ—ষড়্‌ভিজ্ঞ দানে তুমি জীবে কর পার।
স—সংসারে পতিত আমি করহ উদ্ধার ॥ ১৬ ॥
হ—হতভাগা ভক্তিহীন অতি দুরাচার।
ক্ষ—ক্ষম মম অপরাধ কর ভব পার ॥ ১৭ ॥

যাঁ'র কৃপায় মূক বাচাল, পঙ্গু লঙ্ঘে গিরি।
সে-গুরুচরণ আমি বন্দনা যে করি ॥ ১৮ ॥
এই চৌত্রিশ পদাবলী যে করে গান।
নিত্যপদে দাস করি' ঘুচাও অজ্ঞান ॥ ১৯ ॥
সবে মিলি কর কৃপা এই মোর আশ।
জন্মে জন্মে হই যেন গুরুর নিত্যদাস ॥ ২০ ॥

শ্রীনিত্যপদ দাস ব্রহ্মচারী

স্বধামে শ্রীপাদ সত্যসঙ্কল্প প্রভু

আমরা বিশেষ দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীপাদ সত্যসঙ্কল্প প্রভু গত ২রা চৈত্র ১৩৯৯, ইং ১৬।৩।১৯৯৩, মঙ্গলবার সকাল ৬টায় ঐহিক লীলা সম্বরণ করিয়াছেন।

অধুনা বাংলাদেশস্থ ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত খেউরাজালী গ্রামে পরমহংস-কুলচূড়ামণি ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত পূজ্যপাদ শ্রীসুরগণেশ্বর দাসাধিকারী প্রভু ও তদীয় সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী সৌদামিনী দেবীকে পিতামাতারূপে অঙ্গীকারপূর্ব্বক ১৩৪০ সালের ৫ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবার প্রথম সূর্য্যালোক দর্শন করেন। তথায় তিনি শৈশব-বাল্যাদিক্রমে কৈশোরান্তে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হইতে চিকিৎসাবিদ্যায় উত্তীর্ণ হন। ইত্যবসরে তাঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটে। তাহাতে তিনি শ্রীহরিভজনোপদেশ-দাতা ভক্ত-পিতার অভাবে বড়ই মর্ম্মাহত হন এবং দুঃখিনী মাতাকে সান্ত্বনা দানের যত্ন করেন। সেই সময় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম চলিতে থাকে। মাতা সৌদামিনী ও অনুজ দুই ভাই যথাক্রমে শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র দে ও শ্রীসুব্রত দে (কানাই) কে সঙ্গে লইয়া ডাক্তার শ্রীসঞ্জীব দে মহাশয় ভারতের শিলিগুড়ি শহরে আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন। ভারত সরকার-কর্ত্তৃক চিকিৎসা বিভাগের চাকুরীতে বহাল থাকিয়া ডাক্তারবাবু শিলিগুড়িস্থ হাসপাতালে কর্ম্মময় জীবনযাপন করিতে থাকেন। তিনি কল্যাণী-নাম্নী সহধর্ম্মিণীর পাণিগ্রহণ করিয়া দেশবন্ধু পাড়ায় ৩৯১/২ নং গৃহে বসবাস করিতে থাকেন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির শক্তিগড়স্থ শাখামঠ শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠে ও দেশবন্ধু পাড়ার সন্নিকটে মিলনপল্লীতে শ্রীশ্যামসুন্দর

গৌড়ীয় মঠে শ্রীমদ্ভাগবত কথা শ্রবণ করিয়া ভাগবত-ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অনুরাগ বর্দ্ধিত হয়।

মাননীয় ডাক্তারবাবু পারমার্থিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া শ্রীসমিতির সভাপতি-আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণাশ্রয়ে শ্রীনামদীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীসত্যসঙ্কল্প দাসাধিকারী নামে পরিচিত হন।

শ্রীপাদ সত্যসঙ্কল্প প্রভু তাঁহার দৈনন্দিন কর্ম্মজীবন যথাযথরূপে পরিচালন করিয়াও নিত্যকর্ম্ম শ্রীভগবৎ-সেবা-পূজা, পাঠ-কীর্ত্তনে যোগদান ও প্রতি বৎসর শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমায় সমাগত যাত্রিগণের প্রাথমিক চিকিৎসার গুরুদায়িত্ব যত্ন-সহকারে পালন করায় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির ধন্যবাদার্হ হইয়াছিলেন। তাঁহার নিরভিমান জীবনযাত্রা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা প্রবৃত্তি এবং শ্রীকৃষ্ণের সংসারের সহায়ক-সহায়িকারোধে পুত্র-কন্যা, পরিবার-পরিজনদের প্রতি অপ্রাকৃত স্নেহ-মমতায় আদর্শ পিতারূপে শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন। তিনি জাগতিক চিকিৎসায় রোগ নিরাময় করা অপেক্ষা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবাদ্বারা পারমার্থিক চিকিৎসায় কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা ব্যাধি হইতে মুক্তির পরামর্শ দিতেন। তিনি শ্রীসমিতির পারমার্থিক মাসিক মুখপত্র 'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা'র একজন আজীবন সদস্য ছিলেন।

ডাক্তার প্রভুর পুত্রকন্যাগণ পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠের রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজের পৌরহিত্যে ও শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠের রক্ষক শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত গোবিন্দ মহারাজের সহযোগিতায় গত ১২ই চৈত্র শুক্রবার (ইং ২৬।৩।১৯৯৩) সাত্বত-বিধানে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ও বিরহ-মহোৎসব সুসম্পন্ন করিয়াছেন। ডাক্তার প্রভুর অনুজ শ্রীভূপেন্দ্র চন্দ্র দে ও শ্রীসুব্রত দের সেবা-প্রচেষ্টায় পূজ্যপাদ শ্রীগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভু ও শ্রীধাম নবদ্বীপ হইতে সমাগত শ্রীপাদ কমলাপতি ব্রহ্মচারী প্রভু, শ্রীসুবলকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী প্রমুখ প্রভুদের সহায়তা করায় সমিতির প্রশংসার্হ হইয়াছেন। স্থানীয় ভক্তগণ শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারীর বিচিত্র মহা-প্রসাদ সেবা, শ্রাদ্ধানুষ্ঠান দর্শন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত 'শ্রীহরিদাস নির্য্যাণ' প্রসঙ্গ শ্রবণ-কীর্ত্তন করিয়া অনুষ্ঠানকে সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন।

—নিজস্ব সংবাদদাতা

———

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিপূজা

ও

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা

মহোৎসবে আহ্বান

(পুরীধামের প্রথানুসারে)

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য,
১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব
গোস্বামী মহারাজ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া,
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।
৩১শে বৈশাখ, ১৪০০ বঙ্গাব্দ

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দের উদ্যোগে উক্ত মঠে শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিপূজা-পালন ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছে। এই উপলক্ষে আগামী ৫ই আষাঢ়, ১৪০০ (ইং ২০।৬।৯৩) রবিবার হইতে ১৪ই আষাঢ়, ১৪০০ (ইং ২৯।৬।৯৩) মঙ্গলবার পর্য্যন্ত দশমদিবসব্যাপী পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, নগর-সঙ্কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহের বিশেষ সেবা-পূজা, ভোগরাগ, আরাত্রিক প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-যাজনমুখে বিরাট মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও পরমোৎসাহিত হইবেন। এই মহৎ অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। পরপৃষ্ঠায় দৈনন্দিন সেবাপঞ্জী প্রদত্ত হইল।

শুদ্ধভক্তকৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি (রেজিঃ)

—ঃ সেবাপঞ্জী ঃ—

১। **৫ই আষাঢ়** (ইং ২০।৬।৯৩), রবিবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৭ ঘটিকায় **নগর সঙ্কীর্ত্তনমুখে** গুণ্ডিচাবাড়ী গমন ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠান্তে **গুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন** এবং মঠে প্রত্যাবর্ত্তন। অপরাহ্ণ ৫টা হইতে রাত্র ১০টা পর্য্যন্ত ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব**-তিথিপূজা উপলক্ষে পাঠ, কীর্ত্তন, আরতি ও বক্তৃতা।

২। **৬ই আষাঢ়** (ইং ২১।৬।৯৩), সোমবার—**শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা ;** অপরাহ্ণ ৪টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তনযোগে শোভাযাত্রাসহ রথারূঢ় শ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচাবাড়ী গমন। পরে শ্রীমঠে সন্ধ্যায় আরাত্রিক, সঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে **রথযাত্রা-প্রসঙ্গ** পাঠ।

৩। **৭ই আষাঢ়,** ২২শে জুন মঙ্গলবার হইতে ৯ই আষাঢ়, ২৪শে জুন বৃহস্পতি পর্য্যন্ত দিবসত্রয় প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৫টা হইতে রাত্রে ৯টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন ও আরাত্রিকান্তে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ।

৪। **৮ই আষাঢ়** (ইং ২৫।৬।৯৩,) শুক্রবার—**হেরাপঞ্চমী-দিবসে** শ্রীলক্ষ্মী-বিজয় উৎসব। পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে মধ্যাহ্ন ১২টা পর্য্যন্ত গুণ্ডিচাবাড়ীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও **নগর-সঙ্কীর্ত্তন**। অপরাহ্ণ ৫টা হইতে সঙ্কীর্ত্তন, সন্ধ্যায় আরাত্রিক, তদনন্তর **শ্রীমদ্ভাগবত** পাঠ।

৫। **৯ই আষাঢ়,** ২৬শে জুন শনিবার হইতে ১৩ই আষাঢ়, ২৮শে জুন সোমবার পর্য্যন্ত শ্রীমঠে সঙ্কীর্ত্তন ও আরাত্রিকান্তে **শ্রীমদ্ভাগবত** পাঠমুখে বক্তৃতা।

৬। **১০ই আষাঢ়** (ইং ২৯।৬।৯৩), মঙ্গলবার—অপরাহ্ণ ৩টা হইতে সঙ্কীর্ত্তন ও শোভাযাত্রাযোগে **শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা**। পরে শ্রীমঠে সঙ্কীর্ত্তন, আরতি, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও সাধারণ মহোৎসব।

দ্রষ্টব্য ঃ—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে হইলে সমিতির **"সাধারণ-সম্পাদক"**-এঁর নিকট উল্লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য ও প্রেরিতব্য।

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪৫শ বর্ষ | ১১ বামন, প্রদ্যুম্ন, ৫০৭ শ্রীগৌরাব্দ | ৩২ জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, ১৪০০, ইং ১৫/৬/৯৩ | ৪র্থ সংখ্যা

সানুবাদং শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস-বিলিখিতম্

শ্রীমার্কণ্ডেয়-কৃতম্ শ্রীশ্রীবদরীনারায়ণ-স্তোত্রম্

[শ্রীস্কান্দে বিষ্ণুখণ্ডে বদরীমাহাত্ম্যে তৃতীয়েঽধ্যায়ে]

১। মার্কণ্ডেয়স্ততঃ শ্রুত্বা তীর্থাটন-পরিশ্রমম্।
দর্শনং নারদস্যাসীন্মথুরায়াং ষড়ানন॥ ৪৮॥

২। পূজিতো বন্দিতস্তেন নারদো মুনিসত্তমঃ।
কথয়ামাস মাহাত্ম্যং বদর্য্যা যত্র কেশবঃ॥ ৪৯॥

(শিব বলিলেন,—) হে ষড়ানন! অনন্তর মার্কণ্ডেয় তীর্থ-পর্য্যটনের শ্রমের বিষয় আলোচনা করিয়া মথুরায় গমন করেন এবং তথায় নারদের দর্শন লাভ করত সেই মুনিসত্তমের পূজা ও বন্দনা করেন। নারদ মথুরায় অবস্থানপূর্ব্বক হরির

আবাস বদরীতীর্থের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছিলেন। তিনি মার্কণ্ডেয়কে দেখিতে পাইয়া বলিতে লাগিলেন,—॥ ১-২ ॥

নারদ উবাচ,—

৩। কিমিতি ক্লিশ্যতে সাধো তীর্থাটন-পরিশ্রমৈঃ।
বদর্য্যাখ্যং মহাক্ষেত্রং সান্নিধ্যং নিত্যদা হরেঃ ॥ ৫০ ॥

৪। তত্র যাহি যত্র সাক্ষাদ্ধরিং পশ্যসি চক্ষুষা।
তচ্ছ্রুত্বা বিস্ময়োপেতো **বিশালামাযযাবৃষিঃ ॥ ৫১ ॥**

৫। স্নাত্বা শিলামুপবিশন্ জজাপাষ্টাক্ষরং পরম্।
ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ ত্রিরাত্র্যন্তে জনার্দ্দনঃ ॥ ৫২ ॥

নারদ বলিলেন,—হে সাধো! তুমি তীর্থাটন-পরিশ্রমে কেন ক্লিষ্ট হইতেছ? **বদরী-নামক মহাক্ষেত্রের সন্নিধানে হরি নিত্য বিদ্যমান।** সেই **বদরীবনে** গমনপূর্ব্বক সাক্ষাৎ হরিকে চক্ষুদ্বারা দর্শন কর। মুনি মার্কণ্ডেয় দেবর্ষি নারদের বাক্যে বিস্মিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ সেই **বিশাল বদরীক্ষেত্রে** গমনপূর্ব্বক স্নান করিয়া শিলায় উপবেশন করত অষ্টাক্ষর পরম মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর রজনীত্রয় অতীত হইলে ভগবান্ জনার্দ্দন প্রসন্ন হইয়া মার্কণ্ডেয়-সমীপে উপনীত হইলেন ॥ ৩-৫ ॥

৬। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-বনমালা-বিভূষণম্।
তং দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় প্রেমগদ্গদয়া গিরা।
তুষ্টাব প্রণতো ভূত্বা মার্কণ্ডেয়ো জনার্দ্দনম্ ॥ ৫৩ ॥

মার্কণ্ডেয় জনার্দ্দনের শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম-শোভিত ও বনমালা-বিলম্বিত রূপরাশি দর্শন করিয়া সহসা উত্থিত হইলেন এবং প্রণতঃ হইয়া প্রেমগদ্গদ-বাক্যে তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ,—

৭। অশাশ্বতে চ সংসারে সারে তে চরণাম্বুজে।
সমুদ্ধারঃ কথং নৃণাং ত্রাহি মাং পরমেশ্বর ॥ ৫৪ ॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—এই অনিত্য সংসারে আপনার পাদপদ্মই একমাত্র সার। সংসাররত নরগণের কিরূপে উদ্ধার হইবে? হে পরমেশ্বর! আমাকে ত্রাণ করুন ॥ ৭ ॥

৮। তাপত্রয়-পরিশ্রান্তমনেকাজ্ঞান-জৃম্ভিতম্।
সংসার-কুহরে ভ্রান্তং ত্রাহি মাং কৃপয়াচ্যুত ॥ ৫৫ ॥

হে অচ্যুত! আমি এই সংসারকুহরে পড়িয়া ভ্রান্তবুদ্ধিবশে আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ে পরিশ্রান্ত ও অনেকরূপ অজ্ঞানে বিজৃম্ভিত হইয়াছি, কৃপাপূর্ব্বক আমাকে পরিত্রাণ করুন ॥ ৮ ॥

৯। অনেক-যোনিযন্ত্রেষু নিঃসৃতেস্তনুবেদনাম্।
গর্ভবাসকৃতাং প্রাপ্তং ত্রাহি মাং করুণাম্বুধে ॥ ৫৬ ॥

হে করুণানিধে! আমি অনেক যোনিযন্ত্রে প্রবিষ্ট হইয়া গর্ভবাস-ক্লেশ ও পরে নির্গমনের বেদনা অনুভব করিয়াছি, আমাকে পরিত্রাণ করুন ॥ ৯ ॥

১০। কৃমিভক্ষিত-সর্ব্বাঙ্গং ক্ষুৎপিপাসাকুলঞ্চ হি।
আন্ত্রমালাকুলে গর্ভে ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥ ৫৭ ॥

আমি যখন নাড়ীমালাকুল গর্ভে বাস করিয়াছি, তখন আমি ক্ষুধায় পিপাসায় আকুল হইলেও কৃমিকুল আমার সর্ব্বাঙ্গে দংশন করিয়াছে; হে মধুসূদন! আমাকে ত্রাণ করুন ॥ ১০ ॥

১১। অমেধ্যাদিভিরালিপ্তং নিশ্চেষ্ট-শ্রমমাকুলম্।
স্মরন্তং নিজকর্ম্মোত্থং ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥ ৫৮ ॥

গর্ভবাস-সময়ে আমার কোন চেষ্টাই ছিল না, তথাপি আমি শ্রমাকুল হইয়াছি। যখন অতি অপবিত্র মল-মূত্রাদিতে আমার সর্ব্বশরীর বিলিপ্ত হইয়াছিল, তখন আমি কেবল আমার স্বীয় কর্ম্ম স্মরণ করিতাম; হে মধুসূদন! আমাকে ত্রাণ করুন ॥ ১১ ॥

১২। বচনাদাননিঃশ্বাসাশক্তং ভয়মুপাগতম্।
গর্ভবাসমহাদুঃখং ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥ ৫৯ ॥

গর্ভবাসে পরিভাষণ, আদান বা নিশ্বাস-ত্যাগ-সামর্থ্য থাকে না, সর্ব্বদা ভীত হইয়া বাস করিতে হয়; হে মধুসূদন! গর্ভবাসে অতীব দুঃখ, আমাকে ত্রাণ করুন ॥ ১২ ॥

১৩। জরা-মরণ-বাল্যাদি-দুঃখ-সংসার-পীড়িতম্।
দুঃখাব্ধৌ সুখবুদ্ধিং মাং কৃপাসিন্ধো প্রপালয় ॥ ৬০ ॥

জরা, মরণ ও বাল্যাদি দুঃখে সংসার অতীব দুঃখময়; কিন্তু সেই ক্লেশবহুল সংসার-সাগরে আমার সুখবুদ্ধি হইয়াছে; হে কৃপাসিন্ধো! আমাকে রক্ষা করুন ॥ ১৩ ॥

১৪। কদাচিৎ কৃমিতাং প্রাপ্তং কদাচিৎ স্বেদ-জন্মিতাম্।
কদাচিদুদ্ভিজ্জত্বঞ্চ কদাচিন্নরতাং গতম্ ॥ ৬১ ॥

১৫। সর্ব্বযোনি-সমাপন্নং বিপন্নং বিগতপ্রভম্।
অনাথং ত্বাং সমাপন্নং ত্রাহি মাং কৃপয়াচ্যুত ॥ ৬২ ॥

আমি কখনও কৃমিযোনি, কখন স্বেদজ-জন্ম, কদাচিৎ উদ্ভিদ্‌যোনি এবং কখন নরদেহ এইরূপে সর্ব্ববিধ যোনি পরিভ্রমণ করিয়া বিপন্ন হইয়াছি, আমার প্রভাব বিলুপ্ত হইয়াছে ; হে অচ্যুত! আমি অনাথ হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি ; কৃপাপূর্ব্বক আমাকে ত্রাণ করুন ॥ ১৪-১৫ ॥

১৬। উপস্থানমিদং পুণ্যং সর্ব্বপাপ-প্রণাশনম্।
শৃণুয়াচ্ছ্রাবয়েন্মর্ত্ত্যো গোবিন্দে লভতে গতিম্ ॥ ৬৬ ॥

এই পুণ্য উপাখ্যান শ্রবণে সর্ব্ববিধ পাপ বিনষ্ট হয়। যে মানব এই উপাখ্যান শ্রবণ করে বা কাহাকেও শ্রবণ করায়, তাহার গোবিন্দে গতি লাভ হয় ॥ ১৬ ॥

প্রশ্নোত্তর

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৫শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ৮৬ পৃষ্ঠার পর]

৩৯। পরমেশ্বরকে সাকার, অথবা নিরাকার, কোন্ বিচারে বিচার করা ভাল ?

"পরমেশ্বর—বস্তুতঃ চিৎসাকার ও নিরাকার উভয়াত্মক। যে-সকল ব্যক্তি উভয়ের মধ্যে কোন একটীর প্রতি শ্রদ্ধা করিয়া অপর স্বরূপকে অগ্রাহ্য করেন, তাঁহারা উভয় চক্ষে দৃষ্টি করেন না, বলিতে হইবে।" —তঃ সূঃ, ৪ সূঃ

৪০। নিরাকার ও চিদাকারের স্বরূপ কি ?

"বেদশাস্ত্র-মতে ঈশ্বরের সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ নিত্য। নিরাকার ধর্ম্ম প্রাকৃত সত্ত্বগুণের বৈপরীত্যরূপ বিকার-বিশেষ অর্থাৎ জড়ীয় সত্ত্বে যে আকার আছে, তন্নিষেধক ভাববিশেষ। প্রকৃতির অতীত যে চিন্ময় বিগ্রহ, তাঁহার আকারও চিন্ময়। মায়িক-সত্ত্বের নিরাকারত্ব তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ মঃ ৬।১৬৬-১৬৭

৪১। সাকার ও নিরাকার উভয় কথাই পরমেশ্বরের প্রতি যুগপৎ সত্য কিরূপে ?

"সাকার ও নিরাকার লইয়া বিবাদ নিতান্ত অকর্ম্মণ্য। পরমেশ্বরের ভৌতিক আকার নাই, কিন্তু ভূতাতীত অপ্রাকৃত তত্ত্বময় বিভুর অপ্রাকৃত

সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ-সকল—ভক্তেরই গ্রাহ্য। সিদ্ধান্ত এই যে, প্রাকৃত-চক্ষের পক্ষে পরমেশ্বর নিরাকার এবং অপ্রাকৃত-চক্ষের পক্ষে সাকার,—ইহা বলা যাইতে পারে; অতএব তাঁহার উভয় স্বরূপই স্বীকৃত।" —তঃ সূঃ, ৪ সূঃ

৪২। কিরূপে ভগবানের একই কালে সর্ব্বব্যাপী ও সাকার থাকা সম্ভব হইতে পারে?

"বিচিত্র শক্তিক্রমে ভগবান্ একই কালে সর্ব্বব্যাপী ও চিৎসাকার থাকিতে পারেন। ইহা কেবল ব্রহ্মেতর পদার্থের পক্ষে দুঃসাধ্য।" —তঃ সূঃ, ৪ সূঃ

৪৩। পরমেশ্বর কি জীবকৃত অথবা স্বকৃত বিধি-বাধ্য?

"শারীরিক নিয়ম এই যে, একহস্ত পরিমিত দড়িতে এক হস্ত দড়ি সংযোগ করিলে দুই হস্ত হইবে, কখনই তিন হস্ত হইবে না। কিন্তু এই সমস্ত নিয়মে পরমেশ্বর বাধ্য নহেন। তিনি বিধিসকলের বিধাতা; অতএব স্বকৃত বিধিতে তিনি বাধ্য হন না।" —তঃ সূঃ, ৪ সূঃ

৪৪। পরমেশ্বর কি দেশ-কালের অধীন-তত্ত্ব?

"Our ideas are constrained by the idea of space and time, but God is above that constraint."

—The Bhagabat : Its Philosophy, Its Ethics & Its Theology

৪৫। কোন্ সময়ে সাকার-নিরাকারের বিবাদ-ভঞ্জন হয়?

"সাত্বত-তত্ত্ব—সমস্ত সম্প্রদায়ের অতীত। অতএব সাকার-নিরাকার-রূপ বিবাদে সারগ্রাহিগণ কদাচ লিপ্ত হইবেন না। ভক্তির উদয় হইলেই মানবের বুদ্ধি-বৃত্তিতে উভয়াত্মক ঈশ্বর প্রতীত হইবেন।" —তঃ সূঃ, ৪ সূঃ

৪৬। শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধত্ব কেন?

"চতুঃষষ্টি গুণ সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ চিদ্ভাবে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণে নিত্য দেদীপ্যমান। শেষোক্ত চারিটী গুণ কেবল শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ ব্যতীত তাঁহার কোন বিলাস-মূর্ত্তিতেও নাই। সেই চারিটী পরিত্যাগ করিয়া ষষ্টি-সংখ্যক গুণ সম্পূর্ণ-রূপে চিদ্ভাবে চিদ্ঘনবিগ্রহ পরব্যোম-পতি নারায়ণে দীপ্যমান। শেষোক্ত নয়টী গুণ বিযুক্ত হইয়া অবশিষ্ট পঞ্চান্নটী গুণ অংশরূপে শিবাদি দেবতায় আছে। প্রথমোক্ত পঞ্চান্নটী গুণ বিন্দু-বিন্দুরূপে সমস্ত জীবে পরিলক্ষিত হয়। শিব, ব্রহ্মা, সূর্য্য, গণেশ ও ইন্দ্র—ইহারা সেই ভগবানের অংশ, গুণ-বিশিষ্ট, জগদ্ব্যাপারে অধিকার-প্রাপ্ত ভগবদ্বিভূতিরূপ অবতার-বিশেষ; স্বরূপতঃ তাঁহারা সকলেই ভগবদ্দাস। তাঁহাদের কৃপায় বহু বহু জন শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়াছেন।"

—জৈঃ ধঃ ১৩শ অঃ

৪৭। শ্রীকৃষ্ণ শরণাগতের নিকট কিরূপ ?

"সদা শুদ্ধ সিদ্ধকাম, ভকত-বৎসল নাম,
ভকত-জনের নিত্য স্বামী।
তুমি ত' রাখিবে যা'রে, কে তা'রে মারিতে পারে,
সকল বিধির বিধি তুমি ॥" —শঃ

৪৮। শ্রীকৃষ্ণ লীলাময় কেন ?

"শ্রীকৃষ্ণ—পরম তত্ত্ব, তাঁর লীলা—শুদ্ধ সত্ত্ব,
মায়া যাঁ'র দূরস্থিতা দাসী।
জীবপ্রতি কৃপা করি', লীলা প্রকাশিল হরি,
জীবের মঙ্গল-অভিলাষী ॥"

—'শ্রীরূপানুগ-ভজন-দর্পণ,' ২৮, গীঃ মাঃ

৪৯। পরব্রহ্মের অপ্রাকৃত-স্বরূপ-সম্বন্ধে বৈদিক প্রমাণ কি ?

"বহু স্যাম্' (তৈঃ উঃ ব্রঃ—৬অঃ) ইত্যাদি শ্রুতি-মতে ভগবান্ যখন অনেক হইতে ইচ্ছা করিলেন, তখন 'স ঐক্ষত' (ঐতঃ উঃ—১।১) এই বাক্য-মতে প্রাকৃত শক্তিতে তিনি দৃষ্টিপাত করিলেন। সে-সময় প্রাকৃত-মন-নয়নের সৃষ্টি হয় নাই। তবে ভগবান্ যে মনে চিন্তা করিলেন, যে নয়নে প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করিলেন, সে মন-নয়ন প্রাকৃত সৃষ্টির পূর্ব্বেই ছিল। সুতরাং পরব্রহ্মের স্বরূপতঃ অপ্রাকৃত নেত্র-মন ছিল,—ইহা সর্ব্ববেদ-সম্মত।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ মঃ ৬।১৪৩-১৪৮

৫০। ভগবানের ষড়ৈশ্বর্য্যের মধ্যে অঙ্গাঙ্গি-বিচার কিরূপ ? নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম কি স্বয়ংসিদ্ধ তত্ত্ব,—না আপেক্ষিক ?

"সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী অর্থাৎ সৌন্দর্য্য, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য—এই ছয়টী অচিন্ত্যগুণবিশিষ্ট তত্ত্বস্বরূপ ভগবান্। এই গুণগুলি পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে ন্যস্ত। ইহার মধ্যে অঙ্গী কে ? অঙ্গই বা কাহারা ? অঙ্গী তাহাকেই বলি—যাহাতে অঙ্গগুলি ন্যস্ত থাকে, যথা, বৃক্ষ—অঙ্গী, তাহার ডালপালা—অঙ্গ। শরীর—অঙ্গী, হস্ত-পদাদি—অঙ্গ। এই গুণগুলি অঙ্গ-স্বরূপে যাহাতে অবস্থিতি করে, তাহাই অঙ্গী। ভগবানের চিন্ময় বিগ্রহের শ্রীই অঙ্গী এবং আর গুণগুলি—অঙ্গ। ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ—এই তিনটী অঙ্গ; যশ হইতে বিস্তৃত জ্যোতিঃস্বরূপ জ্ঞান ও বৈরাগ্য অঙ্গ-কিরণরূপে প্রতীয়মান; যেহেতু উহারা গুণের গুণ, স্বয়ং গুণ নয়। নির্ব্বিকার জ্ঞানই জ্ঞান ও বৈরাগ্য, তাহাই ব্রহ্মের স্বরূপ। সুতরাং ব্রহ্ম চিন্ময় ব্রহ্মাণ্ডের অঙ্গ-কান্তি।

নির্ব্বিকার, নিষ্ক্রিয়, নিরবয়ব, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম স্বয়ং সিদ্ধতত্ত্ব নন—শ্রীবিগ্রহের আশ্রিত-তত্ত্ব। অগ্নির প্রকাশগুণ স্বয়ং সিদ্ধতত্ত্ব নয়,—অগ্নির স্বরূপাশ্রিত গুণবিশেষ।"　　—জৈঃ ধঃ ১৩শঃ অঃ

—জগদ্‌গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

বহির্ম্মুখী প্রবৃত্তি সর্ব্বক্ষণই আমাদিগকে মায়িক রাজ্যে আকর্ষণ করিতেছে। ভগবৎ-প্রসঙ্গবিমুখ হইলে সেই ছিদ্র পাইয়া মায়াদেবী আমাদিগকে হরিকথা হইতে ছুটী করাইবার যত্ন করাইতেছে।

পরম শ্রদ্ধা-সহকারে গুরুসেবা করিলে মঙ্গল লাভ হয়। লৌকিক বিচারে যে জগৎ-দর্শন, তাহাতে অমঙ্গল ভরা। পুরুদুঃখপূর্ণ জগতে কেবল কষ্ট পাইবার জন্যই মানুষের যাবতীয় চেষ্টা। ভগবৎসেবা-বিমুখের জন্যই মায়ার এই বিধান। যাঁহারা জগৎসৌখ্যে ব্যস্ত হন, তাঁহারা অমঙ্গল বরণ করেন, মনুষ্যের সেবাবিমুখতাক্রমে এই বিচার আসে। তাহা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া দরকার। কৃষ্ণসেবা-রাহিত্য হইতে সচ্চিদানন্দবস্তু-বিবেকের অভাব হইলে—কৃষ্ণচৈতন্য-সেবা-বঞ্চিত হইলেই জীবের এই দুর্দ্দশা। ভোগ্য-ভূমিকায় প্রভুসূত্রে ভোগ করার বুদ্ধি প্রবল। তাহাতে সেব্যের অমল পাদপদ্মের শোভা-সন্দর্শনের বিচার হয় না।

আমি কর্ত্তা—এই অভিমান প্রবল হইয়াছে। এই বিচার হইতে কিরূপে নিস্তার পাইব? "আদৌ গুরুপাদাশ্রয়"—এই বিধিকে অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। অন্য বস্তুকে যে ভোগ বা ত্যাগ করিবার বিচার আসিয়াছে, তাহা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। আমরা রিপুর বশ হইয়া বিশ্বদর্শনে ব্যস্ত হইয়াছি। ইহা হইতে উদ্ধারের উপায় গুরুপাদপদ্মসেবা। তাঁহার কাজ ষাট্ দণ্ডকাল কৃষ্ণপাদ-পদ্মসেবা করা। যিনি বিশ্বদর্শন করেন, তিনি ভোগী। যিনি ভোগ করিয়া নির্ব্বিশেষ বিচারপর হইয়া নিজত্ব স্থাপন করেন, তাঁহার গুরুপাদপদ্ম-আশ্রয় হয় নাই। আমরা বর্ত্তমানে সেবা-বিমুখ হইয়া এ জগতে আসিয়াছি। সকলে আমার ইন্দ্রিয়-তর্পণ করুক—এই বিচার আমাদের প্রবল। কেহ ইন্দ্রিয়-তর্পণে ব্যাঘাত করিলে সে বড় খারাপ লোক; এই দুর্গতির হাত হইতে উদ্ধারের উপায়—শ্রীগুরুপাদাশ্রয়।

হরিভজন ব্যতীত জীবের আর কোন কর্ত্তব্য নাই। বালক হউক, বৃদ্ধ

হউক, যুবা হউক, স্ত্রী হউক, পুরুষ হউক, পণ্ডিত হউক, মূর্খ হউক, দরিদ্র হউক, পুণ্যবান্ হউক,—যে যে অবস্থায় থাকে থাকুক, তাহাদের অন্য কোন সাধনপ্রণালী আর কিছুই নাই ; সাধন—একমাত্র কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন।

শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনই একমাত্র কার্য্য। তাহার দ্বারা সাতপ্রকার মঙ্গল লাভ হয়। চিত্ত-দর্পণ মলিন থাকিলে,—কর্ম্মজ্ঞানকাণ্ডে প্রবেশ হইলে যাঁহারা প্রত্যেক ক্রিয়ার হরিভজন করেন, তাঁহাদের সঙ্গে থাকিলেই চিত্ত মার্জ্জিত হয়, এই পুরুদুঃখ বিশ্বের ভোগে বা ত্যাগে যে অবিচার আসে, তাহার হাত হইতে ত্রাণ হয়। সর্ব্বতোভাবে শতকরা শত অংশ সেবা না করিলে তাঁহার বিচার গ্রহণ করিতে পারিব না।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাগোবিন্দ সংকীর্ত্তন—"বহুভির্মিলিত্বা যৎকীর্ত্তনম্ তদেব সঙ্কীর্ত্তনম্" বেণী ভজনশীল আমাদের অভাব পূরণ করিয়া দেন, এজন্যই একত্রে কীর্ত্তন। অর্চ্চন নিজে নিজে করা হয়—অপরে দেখে না, কিন্তু কীর্ত্তন অপরের কানে নিনাদিত হয়। কীর্ত্তন শুনিয়া শ্রীগুরু ও তাঁহার অনুগত জনগণ আমাদের ত্রুটী সংশোধন করিয়া দেন—কীর্ত্তনের মধ্যে বিশ্বের সংযোগ আসিলে ভোগ্য ও ত্যাজ্য কথার সঙ্গে মিশ্রিত হইলে গুরু-বৈষ্ণবগণ সেই অমঙ্গল হইতে রক্ষা করেন।

যাহারা অতি দুস্তর সংসার-সিন্ধুতে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন, তাহাদের এক মুহূর্ত্তের জন্যও শান্তি নাই। ভগবানের লীলাকথা নিরন্তর কর্ণপুটে পান করা ব্যতীত দুস্তর সংসার-সিন্ধু উত্তীর্ণ হইবার আর অন্য প্রথা নাই। ভগবৎ-প্রসঙ্গ-বিমুখ হইলে জীবের পতন অবশ্যম্ভাবী।

আমরা কৃষ্ণ কি জিনিষ তাহা জানি না, তাই কৃষ্ণ নিজ সর্ব্বশক্তি কৃষ্ণনামে অর্পণ করিয়া শ্রীনামরূপে অবতীর্ণ। গৌণনামে শব্দ ও শব্দীর মধ্যে কিছু ভেদ আছে, কিন্তু মুখ্যনামে শব্দ ও শব্দীতে অভেদ। নাম-গ্রহণে যোগ্যতার বিচার নাই, কিন্তু ঠাকুরের পূজায় যোগ্যতার বিচার আছে, যেমন দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে, স্নান করিতে হইবে ইত্যাদি।

———

দৈব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৫শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ৯৪ পৃষ্ঠার পর]

ভ্রান্ত বর্ণী বিবিধ কামনাপূর্ত্তির আশু প্রয়োজনে ভগবানের স্বরূপশক্তির ভজন ছাড়িয়া তাঁহার ছায়াশক্তির পূজায় ব্যস্ত হন। কিন্তু বিমুখমোহিনী মায়াশক্তি স্বরূপশক্তির ছায়ারূপে পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে যে ব্যক্তি যেরূপভাবে ভগবানে বিমুখ হইতে চাহে তাহাকে সেইরূপভাবেই নানাপ্রকার সুখ-দুঃখ দিয়া মোহিত করেন। এইসকল অজ্ঞগণ নিজেরা পুরুষের অভিমান বা শিবের অভিমান করিয়া ভগবানের স্ত্রীরূপ বা মহামায়ার রূপ দেখিবার ইচ্ছা করে, কিন্তু তাঁহার স্তব-স্তুতি সাধনা করিয়াও ঐরূপভাবে মোহিত হয়। শাস্ত্রে ভগবানের সহিত শান্ত, দাস, সখা, মাতা-পিতা ও পত্নী-সম্বন্ধ—এই পাঁচপ্রকার আত্মার নিত্যসম্বন্ধের কথা উক্ত হইয়াছে। কিন্তু জীবাত্মার সহিত ভগবানের স্ত্রী বা জননী-সম্বন্ধের কথা বলেন নাই। ভগবানকে স্ত্রী বা জননীরূপে দেখিতে চাহিলেই জীবদিগকে মহামায়া মোহিত করেন। ভগবান্ ক্লীব বা স্ত্রী নহেন ; তিনি লীলা-পুরুষোত্তম, জীবমাত্রেই তাঁহার প্রকৃতি।

এইরূপে আসুর বর্ণী লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের ভজন পরিত্যাগপূর্ব্বক পঞ্চোপাসনার অন্তর্গত যে কাল্পনিক কর্ম্মফলবাধ্য নারায়ণ-উপাসনার ভাণ করেন, তাহাতেও তাহার অস্তিত্ব সংরক্ষিত হয় না। কারণ মূলকে অস্বীকার করায় নারায়ণ-তত্ত্বেরও কোন প্রতিষ্ঠা থাকে না। অথচ চেতন জীবের সেবাবৃত্তির ক্রম-বিকাশের বিভিন্ন অবস্থায় আরাধ্য নৃসিংহ-রামাদি নারায়ণের বিভিন্ন অবতারাদিরও মূল-পুরুষ—শ্রীকৃষ্ণ। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—"এতে চাংশ-কলা পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।" ব্রহ্মসংহিতা বলেন,—"রামাদি-মূর্ত্তিষু কলা-নিয়মেন তিষ্ঠন্, নানাবতারমকরোদ্ ভুবনেষু কিন্তু। কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো, গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥" শ্রীকৃষ্ণের চতুঃষষ্টি গুণের তালিকায় তাঁহাকে "অবতারাবলী-বীজম্" বলা হইয়াছে। গর্গ-ঋষি নন্দ মহারাজকে বলিলেন,—তোমার এই তনয় প্রতিযুগে স্বীয় মূর্ত্তি প্রকট করিয়া থাকেন। শুক্ল, রক্ত ও পীত এবং অন্য দ্বাপরযুগে শুকপক্ষীর ন্যায় বর্ণ যদিও ইনি ধারণ করিয়াছিলেন তথাপি সেই সকল যুগাবতার সম্প্রতি এই শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহে প্রবেশ করিয়াছেন। ইহা হইতে কৃষ্ণের সর্ব্বাবতারিত্ব প্রমাণিত হইতেছে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন,—"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ", "মত্তঃ পরতরং নান্যৎ" ইত্যাদি। লোক-পিতামহ ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণ-স্তবে বলিতেছেন,—

নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনামাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নর-ভূ-জলায়নাৎ তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া॥

(ভাঃ ১০।১৪।১৪)

যখন প্রলয়-বারিতে ত্রিলোক নিমগ্ন হইয়াছিল, তখন ঐ সলিলে অবস্থিত নারায়ণের উদরস্থ নাভিনাল হইতে ব্রহ্মা প্রকাশিত হইয়াছিলেন। একথা বস্তুতঃ মিথ্যা নহে, তথাপি হে সর্ব্বেশ্বর! আমি কি আপনা হইতে বহির্গত হই নাই? বস্তুতঃ আমি আপনা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছি, যেহেতু আপনিই নারায়ণ—সর্ব্বদেহ-ধারী জীবসমূহের আশ্রয়স্বরূপা। হে অধীশ! আপনার নারায়ণত্বের আরও কারণ এই যে, আপনি অখিল লোকসাক্ষী এবং ত্রিকালজ্ঞ। নরজাত জল (কারণবারি) শব্দে নার, তাহাতে যাহার অয়ন অর্থাৎ শয়ন, তিনিই নারায়ণ। সেই নারায়ণ আপনার অঙ্গ অর্থাৎ বিলাস-মূর্ত্তি। এ সকলই আপনার অচিন্ত্য-শক্তির পরিচয় ও পরম সত্য।

জলশায়ী অন্তর্যামী সেই নারায়ণ।
সেহো তোমার অংশ, তুমি মূল-নারায়ণ॥
'অঙ্গ'-শব্দে অংশ কহে, সেহো সত্য হয়।
মায়াকার্য্য নহে—সব চিদানন্দময়॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৩।৬৯-৭০)

এইসকল উক্তি হইতে 'শ্রীকৃষ্ণ যে নারায়ণেরও অংশী ও সকল অবতারের অবতারী' ইহা দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। অথচ নাস্তিক বর্ণীসকল এই দুই তত্ত্বেরই চিৎসবিশেষত্ব লোপ করিয়া তাঁহাদিগকে 'ক্লীব ব্রহ্মে' পরিণত করিতে বিশেষ যত্নবান্ হন। মহামায়া প্রকৃতির দাস হইয়া তাহারা ভগবানকে নির্ব্বিশেষ, নিঃশক্তিক প্রতিপন্ন করেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ ভোগোন্মুখী হইয়া বিরাট্-রূপোপাসনা বা বিশ্ব-রূপোপাসনার প্রবর্ত্তন করেন, আবার কেহ কেহ নির্ব্বিশেষ অদ্বৈত-চিন্তাস্রোতকে বহুমানন করত ফল্গুত্যাগী নামে অভিহিত হন। একজন জড়ীয় সবিশেষবাদী, অপরজন অচিৎ নির্ব্বিশেষপন্থী। প্রাকৃত জগতের বাহ্য ব্যাপকতা বুঝাইবার জন্যই বিরাট্ পুরুষের ধারণা; জড়ধারণায় যে বৃহতের কল্পনা, উহাই বিরাট্রূপ বা বিশ্বরূপ—ইহা জড়-সবিশেষবাদীর বোধগম্য হয় না। আবার অচিৎ-নির্ব্বিশেষভাবের ঊর্দ্ধে থাকিয়া ভগবান্ অপ্রাকৃত রূপ-গুণ-লীলাদি চিদ্-বৈশিষ্ট্যযুক্ত—ইহা কেবল নির্ব্বিশেষবাদী বা মায়াবাদীর বুদ্ধির অগম্য। এই শ্রেণীর লোক মনে করেন—'যত কিছু ইন্দ্রিয়, নাম, রূপ, গুণ সমস্ত আমাদেরই থাকিবে, তাহা হইলে আমরা বিশ্বভোগের অধিকারী হইতে পারিব।' ইহারা মুখে ভগবানকে 'সর্ব্বশক্তিমান্' বলিয়াও কার্য্যকালে তাঁহাকে 'নিঃশক্তিক', 'নপুংসক'

প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করেন। ইহারা পরাৎপর তত্ত্ব পরমেশ্বরকেও 'মায়াময়' বলিয়া তাঁহার অচিন্ত্য সর্ব্বশক্তিমত্তার প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। কারণ ভগবানকে জড়বৎ 'ঠুঠোরাম' করিতে না পারিলে ইহারা জগতের নিরঙ্কুশ কর্ত্তা ও ভোক্তা সাজিতে পারেন না। পরিশেষে ইহারা ভগবানকে ইন্দ্রিয়বিহীন করিয়াই ক্ষান্ত হন না, পরন্তু তাঁহার অস্তিত্ব জগৎ হইতে সম্পূর্ণরূপে লোপ করিবার চেষ্টা করেন। ইহারা স্বয়ং ভগবানের আসন দখল করিয়া বসেন। "ঈশ্বরোঽহং অহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী"—ইহাই ইহাদের ধ্যান-জ্ঞানে পরিণত হয়। গীতায় এইরূপ বহুমুখী নাস্তিকের তালিকা ও তাহাদের অপগতি সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,—

অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহেতুকম্॥ (গীঃ ১৬।৯)
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয়! ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥ (গীঃ ১৬।২০)

"জগদাহুরনীশ্বরম্", "অপরস্পর সতম্" ইত্যাদি বাক্যে জড়বাদ, স্বভাববাদ, ক্রমোন্নতিবাদ ও ক্রমোৎপত্তিবাদরূপ নাস্তিকতাই খণ্ডিত হইয়াছে। ইহাদের মরণান্তে জড়ধর্ম্মপ্রাপ্তিই ফল। আসুরী-যোনি প্রাপ্ত হইয়া সেইসকল মূঢ় ভগবৎ-সাক্ষাৎকার-লাভে অসমর্থ হইয়া ততোঽধিক অধম গতি প্রাপ্ত হয়।

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি বর্ণীর শ্রেষ্ঠবৃত্তি যে হরিসেবা বা ভগবদ্ভজন, তাহা পরিত্যাগ করিলে তাহাদিগকে কিরূপ দুর্ভাগ্য বরণ করিতে হয়, তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচিত হইল।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

ভগবল্লোক ও ভক্ত—কাল-মায়াতীত

কাল প্রাণিগণের নিয়ন্তা, অব্যয় ও বলবানগণের মধ্যেও মহাবলশালী। পশুপালক যেরূপ পশুগণকে ইতস্ততঃ পরিচালিত করে, সেইরূপ কালও ক্রীড়া-সহকারে প্রাণিসমূহকে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করাইয়া থাকেন। ক্ষুধাতুর সর্প যদ্রূপ সহসা মূষিককে আক্রমণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ মহাবলশালী কালও যাহারা নিরন্তর "এই কার্য্যের পর অমুক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব"—এইরূপ মনোরথ পরম্পরায় নিতান্ত অসাবধান হইয়া বিষয়লালসাযুক্ত এবং বিষয়প্রাপ্ত হইলেও

পুনরায় অত্যধিক লোভগ্রস্ত হয়, তাহাদিগকে হঠাৎই আক্রমণ করিয়া থাকেন। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষারূপ পরিচ্ছেদত্রয়বিশিষ্ট ভগবানের ভ্রূভঙ্গরূপ সংবৎসরাত্মক কাল ভগবানের অনাশ্রিত জনেরই পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণরূপ ভয়ের উৎপাদন করে, পরন্তু ভগবানের শরণাগতজনের ভবভয় সম্ভবপর হয় না। কথায় বলে,—"কালস্য কুটিলা গতিঃ।" কালের গতি অতি কুটিল অর্থাৎ কালচক্রে কখন কি ঘটে, বলিতে পারা যায় না।

গুণময়ী মায়া শ্রীকৃষ্ণেরই বহিরঙ্গা শক্তি। ইহা অলৌকিকা, অতিশয় অদ্ভুতা এবং সত্ত্বাদি-গুণত্রয়াত্মিকা। মায়া কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবের পক্ষে দূরতিক্রমণীয়া, কারণ ইহা ত্রিগুণ-রজ্জুদ্বারা জীবগণকে অতি দৃঢ়ভাবে বদ্ধ করিয়া রাখে। এই-জন্য এই মায়াকে মহাপাশরূপাও বলা যায়। একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে শরণাগতি দ্বারাই মায়ার হস্ত হইতে ত্রাণ পাওয়া যায়। যেমন আলোকের ছায়া আলোক হইতে দূরে অবস্থান করে, তেমনি মায়া কৃষ্ণ, কৃষ্ণলোক ও কৃষ্ণভক্ত হইতে বহুদূরে অবস্থান করে। মায়া জড় জগতের চৌদ্দভুবন, ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও জড়ীয় দেহে আমিত্ব-রূপ অহংকার প্রকাশ করিয়াছে। বদ্ধজীবের স্থূল ও লিঙ্গ উভয় দেহই মায়িক, মুক্ত হইলে জীবের চিদ্দেহ লভ্য হয়। জীব যতদূর মায়াবদ্ধ, ততদূর কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ। যতদূর মায়ামুক্ত, ততদূর কৃষ্ণ-সাম্মুখ্য-প্রাপ্ত। মায়িক জগৎ জীবের নিত্য বাসস্থান নয়, এই জগৎ কেবল জীবের কারাগার মাত্র।

মায়িক ব্রহ্মাণ্ড ও ভগবানের ধাম বৈকুণ্ঠ কখনও সমপর্য্যায়ভুক্ত নহে। ব্রহ্মাণ্ড ও বৈকুণ্ঠের মধ্যে ভেদ দেখাইতে গিয়া জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যভাগবতের অনুভাষ্যে বলিয়াছেন,—"বৈকুণ্ঠ—স্বপ্রকাশবস্তু, আর ব্রহ্মাণ্ড—সৃষ্ট বস্তু। ব্রহ্মাণ্ডের জন্ম, স্থিতি ও লয়—কালাধীন, আর বৈকুণ্ঠের নিত্যাধিষ্ঠান—কালাতীত। বৈকুণ্ঠের মাতা নাই, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের জননী আছে, তিনি স্বরূপতঃ চিন্ময়ী শক্তি হইয়াও গুণময় জগতের সৃষ্টিকর্ত্রী।"

বিরজার পারে অবস্থিত অমৃত, নিত্য, সনাতন, অনন্ত, পরমপদস্বরূপ, ত্রিপাদভূত সেই পরব্যোম বৈকুণ্ঠধাম। তথায় রজোগুণ না থাকায় সৃষ্টি নাই, তমোগুণ না থাকায় নাশ নাই, আর প্রাকৃত সত্ত্বগুণ না থাকায় তাহা সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ। তথায় কালের কোন বিক্রমই নাই এবং তাহা সৃজ্যপ্রপঞ্চের অন্তর্বর্ত্তী নহে। চিন্ময়, অপরিচ্ছিন্ন, সত্য, স্বপ্রকাশ নিত্য ও ব্রহ্মস্বরূপ সেই বৈকুণ্ঠ-ধামকে নির্গুণপ্রাপ্ত ভক্তিযোগিগণ সর্ব্বদাই দর্শন করিয়া থাকেন। এই প্রসঙ্গে নারদ-পঞ্চরাত্রে উল্লেখ রহিয়াছে,—"বৈকুণ্ঠ-নামক ধামে মায়িক সত্ত্ব, রজঃ ও

তমঃ—এই তিনটী গুণই নাই, উহা দিব্য (মায়াতীত) গুণযুক্ত, অবৈষ্ণবগণের সেইখানে প্রবেশ নাই।"

বৈকুণ্ঠলোকে মায়ার প্রভাবে প্রকটিত অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পঞ্চক্লেশ এবং মোহ ও ভয়াদি থাকিতে পারে না। বৈকুণ্ঠ সুকৃতিবান্ আত্মবিদ্‌গণের বন্দিত ধাম। সেইস্থানে যখন মায়ার কোন প্রভাবই নাই, তখন কি-প্রকারে জন্ম, বিকার, বিনাশ, বৃদ্ধি, অপক্ষয় ও বিপরিণাম—এই ষড়্‌বিকারহেতু কালের বিক্রম লাক্ষিত হইবে? সেইখানে কিরূপেই বা প্রাকৃত গুণাদির অবস্থান সম্ভব হইতে পারে? সেইস্থান অশোক, অমৃত, নিত্যনবনবায়মান চিদ্‌বিলাস—বৈচিত্র্যোদ্ভাসিত। সেইস্থানে স্বরাট্ পুরুষ, অপ্রাকৃতস্বরূপ, অদ্বয়জ্ঞান শ্রীভগবান্ তদীয় তদ্রূপবৈভব নিত্যপরিকর, পার্ষদ ও ধামাদিসহ নিত্য রমমাণ।

ভগবানের ধাম, ভক্ত প্রভৃতির পরমকল্যাণ বা কুশলত্ব আপনা হইতেই হইয়া থাকে, যেহেতু তাঁহারা কালদ্বারা নিয়ম্য নন। ব্রহ্মলোক হইতে সমস্ত লোক বা লোকবাসীই পুনরাবর্ত্তনশীল অর্থাৎ তাঁহাদের পুনর্জ্জন্ম হয়; কিন্তু যাঁহারা ভগবানকে আশ্রয় করিয়া থাকেন তাঁহাদের কখনও পুনর্জ্জন্ম হয় না। এই প্রসঙ্গে শ্রুতিতে (ছাঃ ৮।১৫।১) উক্ত রহিয়াছে,—"ভগবানের আশ্রিতজন আর পুনরাবর্ত্তন (সংসার লাভ) করেন না।" শ্রীনৃসিংহ-পূর্ব্বতাপনী শ্রুতিও বলিয়াছেন,—"বৈকুণ্ঠ পরমধাম মন্ত্ররাজ অধ্যাপকের, এখানে দুঃখাদি নাই, প্রাকৃত সূর্য্য দীপ্তিময় নয়, প্রাকৃত বায়ু প্রকাশিত হয় না, প্রাকৃত চন্দ্র কিরণ দেয় না। মৃত্যু এখানে প্রবেশ করিতে পারে না, কামজ-কোপজ কোন দোষ এখানে নাই। অতএব ইহা আনন্দময়, নিত্য, সর্ব্বদা মঙ্গলময়, ব্রহ্মা প্রভৃতি কর্ত্তৃক বন্দিত বা স্তুত, ভক্তিযোগিগণের ধ্যেয়, ভক্তিযোগিগণ এই ধামপ্রাপ্ত হইলে তাঁহাদের আর পুনরাবর্ত্তন হয় না।" শ্রীভাগবতে ভগবান্ শ্রীকপিল মাতা দেবহূতিকে বলিয়াছেন,—"মাতঃ! স্বর্গাদি লোকে ভোক্তা এবং ভোগ্যবস্তুর কোন না কোন একসময়ে বিনাশ সাধিত হয়, কিন্তু মদীয় বৈকুণ্ঠলোকে মৎপরায়ণ ভক্তগণের কখনও তদ্রূপ ভোগ্যবস্তু নষ্ট হইবার কোন আশঙ্কা নাই—আমার অনিমিষ কালচক্রও তাঁহাদিগকে গ্রাস করিতে সমর্থ হয় না। আমিই তাঁহাদের আত্মবৎ প্রিয়, পুত্রবৎ স্নেহপাত্র, সখার ন্যায় বিশ্বাসাস্পদ ও গুরুর তুল্য উপদেষ্টা, সুহৃদের মত হিতকারী এবং ইষ্টদেব-সম পূজ্য অর্থাৎ যাঁহারা এইপ্রকারে সর্ব্বভাবে আমাকেই ভজনা করে, আমার কালচক্র তাঁহাদিগকে কখনও গ্রাস করিতে পারে না।" শ্রীভাগবতের ৩।২৫।৩৮ শ্লোকে উক্ত রহিয়াছে,—"বৈকুণ্ঠবাসী

লোকসকল একমাত্র ভগবানে সমাশ্রিত, তাঁহারা কখনও নাশ প্রাপ্ত হন না। ভগবানের অনিমিষ হেতি বা কালচক্র তাঁহাদিগকে গ্রাস করেন না।”

বিবেকিগণ জীবগণের মধ্যে উত্তরোত্তর জন্মগ্রহণের হেতুস্বরূপ এবং ভগবানের মায়া প্রভাবহেতু ভ্রম দর্শন করিয়া সংসার-নিবারক ভগবানের প্রতি চিত্তের অনুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকেন। ভগবানকে লাভ করিবার নিমিত্ত নৃপতিগণও পুরাকালে রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক বনগমন করিয়াছিলেন, মানবগণ সুরম্য-কৃষ্ণকথার শ্রবণ-কীর্ত্তনযুক্ত চিন্তাদ্বারা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ভক্তিবলে দুর্লঙ্ঘ্য কাল-প্রভাবকে অতিক্রম-পূর্ব্বক ভগবানের নিত্যলোক বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কৃষ্ণভক্তের উপর মায়া বা কাল কেহই বিক্রম প্রকাশ করিতে পারে না। যেখানে শ্রীকৃষ্ণের অধিষ্ঠান সেখানে মায়ার প্রবেশের কোন অধিকার নাই। “যাঁহা কৃষ্ণ, তাহা নাহি মায়ার অধিকার।” বৈষ্ণবের হৃদয়ে সতত শ্রীগোবিন্দ বিশ্রাম গ্রহণ করেন বলিয়া তাঁহার কখনও মায়াগ্রস্ত হইবার কোন আশঙ্কা থাকিতে পারে না। কৃষ্ণবহির্ম্মুখগণের নিকটেই কাল ও মায়া সর্ব্বদা বিক্রমপ্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু ভক্ত ও ভগবল্লোকের নিকট হীনবল ও পরাজিত হইয়া তাঁহারা সতত দূরে অবস্থান করেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

“শ্রীগুরুপাদপদ্ম মৃত নহেন, প্রকটে-অপ্রকটে তাঁহার সমান অস্তিত্ব প্রমাণিত। তাঁহার আবির্ভাব-তিরোভাব একতাৎপর্য্যপর; সুতরাং আবির্ভাবে বিরহ-স্মৃতি ও তিরোভাবে মিলন-মহোৎসব যুগপৎ সম্ভব।”

“যাঁহারা চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালন না করিয়া, কেবলমাত্র ‘উর্জ্জাদর’ করিয়া থাকেন, তাঁহারা চাতুর্ম্মাস্যের ভক্তিফল সম্পূর্ণরূপে লাভ করিতে পারেন না। ইহার দ্বারা চাতুর্ম্মাস্যের প্রতি অনাদরই প্রকাশ পায়।”

—শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

স্বরবর্ণমালায় শ্রীগুরু-মহিমা

অ—অনন্ত-অভিন্ন শ্রীগুরুদেব আমার।
আ—আশ্রয় করিয়া বন্দি চরণ তাঁহার ॥ ১ ॥
ই—ইষ্টদেব হও মোর, বাঞ্ছাকল্পতরু।
ঈ—ঈশ্বরের ভক্তিদাতা জগৎপূজ্য গুরু ॥ ২ ॥
উ—উত্তম অপূর্ব্ব তত্ত্বশিক্ষা করি' দান।
ঊ—ঊন জীবের দুঃখ হেরি' দিলে কৃষ্ণনাম ॥ ৩ ॥
ঋ—ঋণগ্রস্ত জীব-প্রতি হইয়া সদয়।
ৠ—রীতিমত কৃষ্ণনামে করাইলা আশ্রয় ॥ ৪ ॥
ঌ—লিপ্তাঙ্গ শ্রীগৌরপ্রেমে গৌর-শশধর।
ৡ—লীলা-প্রকাশক সেই গুরুদেব আমার ॥ ৫ ॥
এ—এ হেন শ্রীগুরুপদে না জন্মিল মতি।
ঐ—ঐহিক বিষয়ভোগে সদা বাড়ে রতি ॥ ৬ ॥
ও—ওহে গুরুদেব! তুমি পতিত-পাবন।
ঔ—ঔষধ শ্রীহরিনাম মোরে কর দান ॥ ৭ ॥
অজ্ঞান-তিমিরান্ধে অনাদিকাল আমি
পড়ে আছি ভবার্ণবে ত্রাণ কর তুমি ॥ ৮ ॥
ভগবত্তত্ত্বে চক্ষুরুন্মীলিত কর মোর।
তব পদে নতি আমি করি বার বার ॥ ৯ ॥
এ চতুর্দ্দশ স্বরাবলী যে করে গান।
শ্রীগুরু-কৃপাপাত্র সেই মহাভাগ্যবান্ ॥ ১০ ॥

—শ্রীনিত্যপদ দাস ব্রহ্মচারী

সম্বন্ধ-জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা

'সম্বন্ধ'-শব্দের অর্থ সম্যক্‌রূপে বন্ধন। দুইটী বস্তুর মধ্যে প্রায়ই একটা স্বাভাবিক যোগসূত্র বা বন্ধন থাকে; এইজন্য কোন বস্তুই সম্পূর্ণ অনন্যাপেক্ষ হইয়া থাকিতে পারে না। এই যোগসূত্র বা বন্ধন যদি অনুকূল হয়, তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে স্নেহ, প্রীতি প্রভৃতির সঞ্চার হয়; আর যদি প্রতিকূল সম্বন্ধ থাকে, তাহা হইলে ক্রোধ, বিদ্বেষ প্রভৃতি দেখা যায়। এই বন্ধনই সম্বন্ধ। শাস্ত্রে জীবের স্বরূপ কি, সেই স্বরূপগত ধর্ম্ম কি, স্বরূপাবস্থিত জীবের সহিত ভগবানের কি সম্বন্ধ—এইসকল বিষয়ে যে সুষ্ঠু জ্ঞান—তাহাকেই সম্বন্ধ-জ্ঞান বলিয়াছেন।

জীবের পক্ষে এই সম্বন্ধ-জ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজন। সম্বন্ধের রূপানুসারে প্রয়োজন-বোধ এবং তাহা পাইবার যে উপায় বা সাধন, তাহারও রূপভেদ দেখা যায়। এই জগতে আমরা যে-সকল বস্তু পাইবার জন্য যত্ন করি, সে সমস্ত বস্তুর সহিতই আমাদের একটা সম্বন্ধ আছে। আমরা মনে করি, জাগতিক বিষয়গুলি ভোগের উপকরণ এবং আমরা উহাদের ভোক্তৃ। এই ভোক্তৃ-ভোগ্য-জ্ঞান যদি আমাদের না থাকিত—যদি আমরা জানিতাম, ঐ সকল বস্তু আমাদের ভোগে আসিবে না, তাহা হইলে উহা পাইবার জন্যও কিছুমাত্র ব্যস্ত হইতাম না। যখনই বুঝিতে পারি, এই জিনিসটি আমাকে সুখ দিতে পারিবে অর্থাৎ ইহার সহিত আমার সম্বন্ধ আছে, তখনই উহা পাইবার আবশ্যকতা অনুভব করি এবং এইজন্য নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করি। সুতরাং যে কোন বস্তু পাইতে হইলে তাহার সহিত আমার কি সম্বন্ধ তাহা জানিতে হইবে।

এই জগতে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, মনুষ্য—সকলেরই প্রয়োজন-বোধ আছে। একটা তীব্র অভাব-বোধ সকল সময়েই জীবকে পীড়িত করে এবং যাহাদ্বারা এই অভাব দূর হয়, সেই বস্তু পাইবার স্পৃহাও তাহার থাকে। সকলের প্রয়োজনানুভব একপ্রকার নহে। স্থান, কাল এবং পারিপার্শ্বিকতার বিভিন্নতা জীবকে বিভিন্ন প্রকারের অভিজ্ঞতা দান করে। সেই অভিজ্ঞতা-অনুসারে জীবের প্রয়োজন-বোধও বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। মনুষ্যেতর প্রাণীসকল প্রকৃতির নিয়মাধীন হইয়া থাকে বলিয়া তাহাদের ইচ্ছা ও ক্রিয়ার মধ্যে অনেকটা ঐক্য দেখা যায়। মানুষের চিত্তবৃত্তিই সাধারণতঃ নানাপ্রকারের বলিয়া তাহাদের লক্ষ্যও বিচিত্র। কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহারা মনে করেন,—"এই বিশ্বস্থিত বিষয়সমূহ সমস্তই ভোগের ইন্ধনস্বরূপ এবং তাঁহারাই

ঐ সকলের ভোক্তা ; ভগবান্ একজন থাকিলেও থাকিতে পারেন—তাঁহার সহিত আমাদের বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই।" কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন সুখ-ভোগ এখানে বড় একটা হইয়া উঠে না, যেটুকু হয়, তাহার জন্য বহু ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় এবং পরিণামে সে সুখও দুঃখেই রূপান্তরিত হইয়া যায়। ইহাতে অপর কতকগুলি লোক চিন্তা করিলেন,—"গুণগত রাজ্যে যে সুখ, তাহা অত্যন্ত সংকীর্ণ ; বস্তুতঃ এই জগৎ কেবল দুঃখময় এবং আমাদিগকে আপাত সুখের আশায় লুব্ধ করিয়া পরিশেষে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করাইবার একটা কৌশলমাত্র ; সুতরাং যদি কোন-প্রকারে ত্রিগুণাতীত অবস্থা লাভ করা যায়, তাহা হইলে আর দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে হয় না, বরং ব্রহ্মানুভূতিরূপ অখণ্ড আনন্দলাভ করা যায়।" এইজন্য তাঁহারা জাগতিক সমস্ত দ্রব্যই দুঃখময় জ্ঞানে পরিত্যাগ করেন এবং মায়াজয়ের জন্য শম-দমাদি ইন্দ্রিয়-নিরোধক প্রক্রিয়াসকল অবলম্বন করেন। কিন্তু শাস্ত্র বলেন,—ঐরূপ চেষ্টা সমস্তই পণ্ডশ্রম মাত্র।

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

আরোহবাদমূলে অতিকষ্টে পরমপদ পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়াও মুক্তাভিমানী অভক্ত পতিত হইয়া যায়।

শম, দম প্রভৃতি প্রক্রিয়াদ্বারা যাঁহারা ভোগপ্রবৃত্তি হইতে চিত্তকে নিরুদ্ধ করিতে চান, তাঁহারা প্রায়ই সফলকাম হইতে পারেন না ; এইজন্য পৃথিবীতে থাকাকাল-পর্য্যন্ত যতই না কেন নিজকে বিষয় হইতে পৃথক্ রাখিতে চান—বিষয়ের সংস্পর্শে অল্পাধিক পরিমাণে আসিতেই হয়। সাধন-আরম্ভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়গুলি প্রচুর পরিমাণে বিষয়ের আস্বাদন করিয়াছে, কাজেই আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি রূপ, রস প্রভৃতি বিষয় ভোগ করিয়া কিরূপ সুখানুভব করে, মনের মধ্যে তাহার সম্বন্ধে একটা সংস্কার থাকিয়া যায়। কোনপ্রকারে একবার বিষয়ের সংস্পর্শে আসিলেই সেই পূর্ব্বস্মৃতি প্রবল হইয়া চিত্তবিক্ষোভ আনয়ন করে। এইজন্য সাধক বেশীদিন বিষয় সম্বন্ধে নিরপেক্ষ থাকিতে পারেন না—স্থূলভোগে লিপ্ত হইয়া পড়েন। নানাপ্রকার প্রক্রিয়ার ফলে চিত্তের একটা সাময়িক প্রশান্ততা আসিতে পারে ; এই শান্ত অবস্থায় উপস্থিত হইলেই সাধারণতঃ জীব আপনাকে মুক্ত বলিয়া অভিমান করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মুক্তি তাঁহাদের হয় না।

"জ্ঞানী জীবন্মুক্ত দশা পাইনু করি মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণ-ভক্তি বিনে॥"

মুক্ত বলিয়া তাঁহারা অভিমানই করেন মাত্র ; কিন্তু প্রচ্ছন্ন ভোক্তৃ-অভিমান প্রবল থাকায় শীঘ্রই তাঁহাদের চিত্তবিক্ষেপ ঘটিয়া অধঃপতিত হইতে হয়। বিশ্বামিত্র, সৌভরিঋষি প্রভৃতি এ বিষয়ে প্রমাণ।

তৃতীয় প্রকার ব্যক্তিগণ মনে করেন,—"সত্যবস্তু মাত্র একটী, তাহা ব্রহ্ম। কিন্তু এই ব্রহ্ম নিরাকার, নির্ব্বিশেষ এবং নিঃশক্তিক। এই জগৎটা বাস্তবিক স্বপ্নের ন্যায় অলীক। উহার কোন অস্তিত্ব নাই। জীব বস্তুতঃ ব্রহ্মস্বরূপ ; সম্প্রতি মায়া-কবলিত হইয়া তাঁহার সে জ্ঞান লুপ্ত হইয়াছে।" তাঁহারা জ্ঞানালোচনার দ্বারা মায়া-বিমুক্ত হইয়া আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু শাস্ত্র তাঁহাদের চেষ্টাকেও আদর করেন নাই।

শ্রেয়ঃস্মৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবল-বোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥

এই বিভিন্ন সাধক-সম্প্রদায়ের বিফলতার কারণ অনুসন্ধান করিলে জানা যায়, সম্বন্ধ-জ্ঞানের অভাবই তাঁহাদের ব্যর্থতার একমাত্র কারণ। সম্বন্ধ-জ্ঞান না থাকায় তাঁহাদের প্রয়োজন-সম্বন্ধে যে ধারণা হয়, তাহা ভ্রমপূর্ণ ; সুতরাং তাঁহাদের সাধনও বৃথা ক্লেশস্বীকারেই পর্য্যবসিত হয়।

জীব জড়াতীত বস্তু। সুতরাং জড়-বিচারে আবদ্ধ থাকা-পর্য্যন্ত স্বরূপানুভূতি হয় না। জড়েন্দ্রিয়দ্বারা জাগতিক অভিজ্ঞতা হইতে যে জ্ঞান সংগ্রহ করা যায়, তাহা প্রাকৃত বিচার অতিক্রম করিতে পারে না। আবার অনেক সময় জড়জগতের সকল বস্তুই ইন্দ্রিয়জ্ঞানগম্য, শান্ত এবং নশ্বর দেখিয়া জড়জগতের বিপরীতভাব-বিশিষ্ট বস্তুই ঈশ্বর, এরূপ কল্পনা করা হয়। এই বিচারে—"পরতত্ত্ব নিরিন্দ্রিয়, নির্ব্বিশেষ —এরূপ ধারণা করা ব্যতীত উপায় থাকে না ; জগৎ বিচিত্রতাময়, এখানে শক্তি-পরিণাম লক্ষিত হয়, এখানে পরস্পরের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের রস বিদ্যমান্, সুতরাং ভগবান্ নিশ্চয়ই বিচিত্রতাশূন্য ক্রিয়াবিহীন বস্তু হইবেন ; তাহা না হইলে জগৎ যেরূপ বস্তুতঃ মিথ্যা, ভগবান্‌ও তদ্রূপ হইয়া পড়িবেন।" যদিও এই সিদ্ধান্ত জড়নিরাসের চেষ্টাই করে, তথাপি এই সিদ্ধান্ত সুষ্ঠু নহে, কারণ জাগতিক অভিজ্ঞতাই ইহার মূল ; সুতরাং এই ধারণাও জড়বিচার হইতে মুক্ত নহে।

শ্রীগুরুকৃপায় প্রকৃত সম্বন্ধ-জ্ঞান জীবহৃদয়ে স্ফূর্ত্তিলাভ করে। তখন জীব নিজের স্বরূপ এবং ধর্ম্ম কি, তাহা অবগত হইতে পারেন। জীব চিদ্‌বস্তু। তাঁহার ধর্ম্ম তাঁহাকে আশ্রয়জাতীয় বস্তু বলিয়া প্রতীত করে। জীব চিদ্‌বস্তু হইলেও অত্যন্ত ক্ষুদ্রতা-হেতু নিতান্ত দুর্ব্বল। এইজন্য তিনি স্বতন্ত্রভাবে থাকিতে পারেন না, কাহাকেও অবলম্বন করিয়া থাকিতে হয়। মায়া ও কৃষ্ণ—এই দুইএর মাঝখানে

জীবের অবস্থিতি। ঐ স্থানটী জড়সবিশেষ এবং চিৎসবিশেষ এই দুই রাজ্যের সীমান্ত-প্রদেশ। ইহা গুণবিকাররহিত, কোনপ্রকার ক্রিয়াদিশূন্য এবং শান্ত-ভাবাপন্ন একটী অবস্থা-বিশেষ। জীব এখানে স্থিরভাবে থাকিতে পারেন না, এই-জন্য প্রথমতঃ জীব স্বরূপতঃ অণুসচ্চিদানন্দ হওয়ায় বিচিত্রতার দিকে তাঁহার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে। দ্বিতীয়তঃ এইস্থানে আশ্রয়োপযোগী কোন অবলম্বন নাই। তৃতীয়তঃ জীবের যে স্বভাবগত-বৃত্তি অনুরাগ, তাহার একটী পাত্র বা বিষয় থাকা প্রয়োজন, নতুবা উহার অস্তিত্ব অর্থহীন হইয়া পড়ে। এইজন্য জীব এই মধ্যপ্রদেশে থাকিতে পারেন না। তাঁহার স্বতন্ত্রতাধর্ম্ম তাঁহাকে মায়া অথবা বিভুচিৎ কৃষ্ণের দিকে গতিবিশিষ্ট করে। চিদ্‌রাজ্যে প্রবেশ করিলে অণুচিৎ জীব বিভুচিৎ কৃষ্ণের আশ্রয়লাভ করেন, তখন তাঁহার ধর্ম্ম স্বাভাবিক গতিবিশিষ্ট হয় ও তিনিও স্বরূপে অবস্থান করেন। মায়ার কবলে পতিত হইলে নানাপ্রকার জড়োপাধিদ্বারা আবৃত হইয়া পড়েন এবং নানাপ্রকার ক্লেশ ভোগ করেন।

সম্বন্ধ-জ্ঞানের উদয়েই জীব বুঝিতে পারেন—'কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা। জীব ভোক্তা নহেন, তিনি ভোগ্যবস্তু।' তবে জীব চেতনধর্ম্ম-বিশিষ্ট হওয়ায় তাঁহার বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি কৃষ্ণকে সুখী করিয়া নিজেও সুখী হন। স্বতন্ত্রভাবে নিজ-সুখবাঞ্ছা তাঁহার নাই বটে, কিন্তু কৃষ্ণ সুখী হইয়াছেন—এই চিন্তাই তাঁহাকে সুখ-প্রবাহে নিমজ্জিত করে। জীবের মধ্যে যে শাশ্বত রসাস্বাদন-ক্ষমতা আছে, তাহার সার্থকতা জড়ভোগে নহে; পরন্তু সেবা-সুখ-আস্বাদনই তাহার চরম সার্থকতা।

আবার ভোক্তৃত্ব যেরূপ জীবের স্বরূপগত ধর্ম্ম নহে, সেইরূপ "এই জগৎ জীবেরই ভোগাগার, অথবা জীবকে প্রলুব্ধ করিয়া অধিকতর ক্লেশ-প্রদানের নিমিত্ত মরীচিকার ন্যায় ছলনা-বিশেষ কিম্বা এই জগৎ বস্তুতঃ মিথ্যা"—এইসকল পরিচয়ও বিশ্বের সম্যক্ পরিচয় নহে। ভোগ্য-ভূমিকায় অবস্থিত থাকিয়া ভোক্তৃ-অভিমানী মনের দাসত্ব করিতে করিতে যখন জগৎ দর্শন করি, তখন তাহাকে এইরূপ ব্যতীত আর কিছু মনে করিতে পারি না। দেহ বা মনকেই 'আমি' বুদ্ধি করিয়া যে-কাল পর্য্যন্ত জড়াভিনিবিষ্ট থাকি, সে-কাল পর্য্যন্ত বিশ্বের সকল বস্তুকেই এই দেহের সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত এবং ভোগপিপাসু মনের ক্ষুধা মিটাইবার রসদ বলিয়া মনে করাই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রকৃত সম্বন্ধ-তত্ত্বের স্ফুরণ হইলে এই বিশ্বকে নিজের ভোগ্য না জানিয়া কৃষ্ণের ভোগ্য বলিয়াই জানিতে পারি। যাহাকে ভোগোপকরণ বলিয়া জানিতাম, তাহাকেই কৃষ্ণসেবার উপকরণ বলিয়া জানিবার বিচার আসিয়া উপস্থিত হয়। বিশ্বের কোন বস্তুই তখন আর হৃদয়ে ভোগলালসা জন্মাইয়া উন্নতির পথে বাধা হইয়া দাঁড়ায় না; পরন্তু প্রত্যেক বস্তুই কৃষ্ণের সেবোপচাররূপে প্রতিভাত

হইয়া জীবকে অনুকূলভাবেই কৃষ্ণভজনে সহায়তা করে। স্ব-স্বরূপে অবস্থানকালে যে মনোদ্বারা চিন্তা করি, তাহা আত্মানুগত—তাহাই অভিন্ন বৃন্দাবন। সেই ব্রজভূমিকায় অবস্থিত হইয়া যে জগদ্দর্শন হয়, তাহা বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল এবং সেবার সহায়ক; তাহা জড়প্রতীতিযুক্ত মনের জগদ্দর্শন হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। শ্রীগুরু-কৃপাবলে ক্রমশঃ হৃদয় হইতে সকল অনর্থ দূর হইয়া জীব যখন সম্পূর্ণভাবে উপাধি-মুক্ত হন, তখন সম্বন্ধ-জ্ঞানের সম্যক্ স্ফুরণ হয়; বিশ্ব তখন পূর্ণ সুখের আগার বলিয়া অনুমিত হয় এবং বিশ্বস্থিত কোন বস্তুকে আর ভগবান্ হইতে পৃথক্—বিরুদ্ধধর্ম্ম-বিশিষ্ট, এরূপ মনে হয় না। প্রত্যেক পদার্থই কৃষ্ণ-সম্বন্ধ-যুক্তরূপে, কৃষ্ণের লীলার সহায়করূপে প্রতীত হইয়া সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে কৃষ্ণেরই স্ফূর্ত্তি করায়।

স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় তাঁর ইষ্টদেব-স্ফূর্ত্তি॥

তখন বিশ্ব-দর্শন হয় না। কৃষ্ণবিরহ-ব্যাকুল কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ রসানুশীলনের ক্ষেত্র বলিয়া সর্ব্বত্র বাস্তব অনুভূতি হয়।

এইরূপ সম্বন্ধতত্ত্ব হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিলাভ করিলে জীবের চরম প্রয়োজন কি, তাহা উপলব্ধির বিষয় হয় এবং তখন তিনি যে সাধন অবলম্বন করেন, তাহাই সর্ব্বোত্তম সিদ্ধিলাভের উপায়।

—শ্রীমতী অসীমা দেবী

'যদি তোমার দেখা না পাই প্রভু!'

'ছোট্ট গৌরবর্ণের এক বালক এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে ছুটছে! ছুটছে ত' ছুটছেই। ছোটার আর শেষ নেই। সামনে সুদর্শন মুরলীধারী কোন এক মূর্ত্তি। ছেলেটা ঐ মূর্ত্তিকে ছুঁতে চাইছে, কিন্তু কিছুতেই ধরা হয়ে উঠছে না যে! কি করবে সে? এদিক-ওদিক তাকিয়ে আবার ছুটে চলে অবোধ বালক—ধরতে একদিন সে পারবেই—মনে এই দৃঢ় আশা নিয়ে!'

চমক ভেঙে গেল আমার। একি! এতক্ষণ কি স্বপ্ন দেখছিলাম? হয়ত' তাই। এই বাস্তবসম্মত স্বপ্ন শুধু আমারই নয়, আমার মতো অনেকেরই! আমরা অর্থাৎ সাধারণ মানুষরা নিজেদের অজান্তেই কার উদ্দেশ্যেই যেন বলে চলেছি,—'যদি তোমার দেখা না পাই প্রভু' তবে জীবন আমার বৃথা।

শ্রীবৃন্দাবনের পথে পথে কৃষ্ণায়িত রাধা ফিরে চলেছেন রাধায়িত কৃষ্ণের অন্বেষণে। কোথায় কৃষ্ণ? সেই মোহন-মুরলীধারী পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ? অন্তরের গোপন গহনস্থানে যাঁর বাস, নয়নের তারায় যাঁর লীলাখেলা, জীবনের হৃৎস্পন্দনে যাঁর বাঁশীর ছন্দ। সত্যিই কি তিনি আমাদের সম্পূর্ণ অগোচরে, আমাদের প্রাত্যহিক জীবন-গণ্ডীর বহুদূরে? তিনি কি আমাদের ছেড়ে থাকতে পারেন, একান্তই একা হয়ে? না,—তিনি কখনই পারেন না শুধু একা থাকতে। ভক্তের জন্য তাঁর প্রাণ আকুলি-বিকুলি করে ওঠে নিয়তই। ভক্ত পাওয়ার উদ্দেশ্যে সেই পরমপুরুষের একান্ত সন্নিকটে বলেন,—

বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ।
দেহ-মন আদি,　　সকলি সঁপেছি,
কুল-শীল জাতি-মান॥"

নিজের ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য, কুল-শীল সবই সমর্পণ করেন ভক্ত। এর জন্য অনেক কলঙ্ক তাঁকে মাথা পেতে নিতে হয়। তবুও তাঁর কণ্ঠে নির্ভীক সুর ভেসে ওঠে,—

কলঙ্কী বলিয়া,　　ডাকে সব লোকে,
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া,　　কলঙ্কের হার,
গলায় পরিতে সুখ॥

বিশ্বপতি শ্রীকৃষ্ণের চরণে কৃষ্ণায়িত রাধা ওরফে ভক্তের অসঙ্কোচপূর্ণ নির্ভরতা। তাই তিনি সব শুচির তিক্ততাকে কাটিয়ে প্রিয়জনের পায়ের ছাপ বক্ষে ধারণ করে রাখবেন। মাঝে মাঝে কোন এক অকল্পনীয় মিলনছবি ভেসে ওঠে ভক্তের মানস-পটে। ভক্ত হতবাক্ হয়ে যান—সত্যিই কি এ পরমপুরুষের সঙ্গে তাঁর মিলনের ছবি? যদি সত্যিই তাই হয়, তাহলে,—

সোই কোকিল অব,　　লাখ লাখ ডাকউ,
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচবাণ অব,　　লাখ বাণ হউ,
মলয় পবন বহু মন্দা॥

এত আনন্দোল্লাস ভক্তের অভাবনীয়। এতদিন প্রকৃতির সমস্ত আনুকূল্যকে ভক্ত বার বার তিরস্কার করেছেন, কারণ তাতে শুধু তাঁর বিরহ-জ্বালাই বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে; কিন্তু আজ তিনি কল্পনার চরম সীমায় পৌঁছে গেছেন—আর তাই প্রকৃতির সমস্ত আনুকূল্যকে আজ প্রাণভরে আশীর্ব্বাদ করে চলেছেন। তবুও এরই

মধ্যে একটা 'কিন্তু' থেকে যায়। যদি ঐ মহামিলনের ছবি—যেটা কিনা মানসপটে ভেসে উঠেছিল, তা যদি সত্য না হয়ে শুধু স্বপ্নই হয়, তাহলে,—

না, না - ভক্ত আর ভাবতে পারেন না। যদি সত্যই আকাঙ্ক্ষিত পুরুষের দেখা না পান, তবে হয়ত' এই পৃথিবীর আলো, জল, বায়ু কাউকেই আর কিছুতেই আস্বাদন করা যাবে না। পৃথিবীর গাছ-পালা, পশু-পক্ষী সবার কণ্ঠে ভেসে ওঠে সেই চরম প্রার্থনার গান। কেবল ভক্তই যেন পারছেন না। তাই তাঁর কণ্ঠে বার বার আপসোসের সুর বেজে উঠছে—

I know not how thou siugest my master.
I ever listen, in silent amazment."

যদি তাঁর দেখা না পান, তবে তাঁর আর দুঃখের সীমা থাকবে না। প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁকে কঠিন মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। একুল-ওকুল—দুকুল-গোকুলে যাঁকে তাঁর একমাত্র আপনজন বলে ভেবে নিয়েছেন, তাঁকে আঁখির আড়াল করতে মন চায় না যখন, সেই কাল্পনিক পরম প্রেমময় পুরুষের দেখা যে ন যে ভক্ত পাচ্ছেন না তা কিছুতেই বোধগম্য হয় না ভক্তের। তাঁকে পাওয়ার এত সাধনা বুঝি আজ বিফল, সব চেষ্টা আজ বৃথা, সব কথা আজ শূন্য, সব স্থান আজ ধোঁয়াশায় ধূমায়িত। সব স্বপ্ন আজ মরীচিকাময়। কি এর সমাধান? কে জানে! ভক্ত তাই অনবরত কষ্ট পান, কেঁদে চলেন অবিরাম, গেয়ে চলেন সেই পরম শিহরণযুক্ত পদ,—

"যদি তোমার দেখা না পাই প্রভু,
এবার এ জীবনে,
তবে তোমায় আমি পাইনি যেন সে কথা রয় মনে।
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই, শয়নে-স্বপনে॥"

—শ্রীমতী কুহু বেরা, অমৃষি (মেদিনীপুর)

———

হরিজন

অপার্থিব বৈষ্ণবসাহিত্যের পরিভাষার অবৈধ বিকৃত অনুকরণ করিয়া যে-সকল শব্দ সাধারণ সাহিত্যে ব্যবহৃত হইতেছে, তাহাদেরই অন্যতমরূপে 'হরিজন'-শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। দশ পনর বৎসর পূর্ব্বের সাধারণ বঙ্গসাহিত্যেও আধুনিক প্রচলিত অর্থে ঐ শব্দটির ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় নাই; কিন্তু গৌড়ীয়াচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বাঙ্গালা ১৩১৮ সালের ২২শে ভাদ্র মেদিনীপুর জেলার বালিঘাই উদ্ধবপুর-গ্রামে শ্রীগোপীবল্লভপুরের পণ্ডিতপ্রবর স্বধামগত আচার্য্য শ্রীল বিশ্বম্ভরানন্দ দেবগোস্বামী ও বৃন্দাবনের স্বধামগত পণ্ডিতপ্রবর মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম মহাশয় এবং বাঙ্গালার তদানীন্তন বহু শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতব্যক্তিগণের সভায় "ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব" সম্বন্ধে যে এক সুগবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে আমরা বঙ্গসাহিত্যে সর্ব্বপ্রথম 'হরিজন'-শব্দ দেখিতে পাই। অবশ্য ঐ প্রবন্ধ পাঠের পূর্ব্বে উক্ত শব্দটি গৌড়ীয়াচার্য্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন ও ব্যবহার করিতেন। তাঁহার প্রাচীন পত্রাবলীর মধ্যেও তিনি তাঁহার নামের পূর্ব্বে 'হরিজনকিঙ্কর' এই শব্দটি ব্যবহার করিতেন, তাহারও নিদর্শন আমরা যথেষ্ট পাই। পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধের মধ্যে 'প্রকৃতিজনকাণ্ড' ও 'হরিজনকাণ্ড' নামক দুইটী অধ্যায় রহিয়াছে। তদ্বারা 'হরিজন' হইতে 'প্রকৃতিজনে'র পার্থক্য বিশেষভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

পূর্ব্বে যখন 'গৌড়ীয়' পত্র প্রচারিত হয়, তখন কতকগুলি প্রবন্ধের পূর্ব্বে 'প্রকৃতিজনপাঠ্য' আর কতিপয় প্রবন্ধ 'হরিজনপাঠ্য' বলিয়া প্রকাশিত হইত। 'প্রকৃতিজনপাঠ্য' প্রবন্ধগুলিতে প্রাকৃতিক বা জাগতিক নানাপ্রকার তথ্য ও সংবাদের বাহুল্য থাকিত; আর 'হরিজনপাঠ্য' প্রবন্ধে শুদ্ধভক্তি ও ঐকান্তিক পরমার্থের কথা গুম্ফিত দেখা যাইত।

গৌড়ীয়াচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ উক্ত প্রবন্ধের হরিজনকাণ্ডে লিখিয়াছেন,—"পুরাকালে অজামিলকে লইয়া হরিজনের সহিত প্রকৃতিজনের বিচার উপস্থিত হয়। প্রকৃতিজন নিজ স্বভাবক্রমে হরিজনকেও তাঁহাদের তুল্যজ্ঞানে বিচারাধীন করিতে প্রয়াস করেন; পরিশেষে হরিজনগণ যে কর্ম্মফলের অধীন নহেন, তাহা ধর্ম্মবিচারকগণ তাঁহাদের প্রভুর নিকট হইতে জানিতে পারেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীগৌড়ীয়াচার্য্য শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধের অজামিল-সংবাদের শ্লোক ও অসংখ্য শাস্ত্র হইতে শাস্ত্রবচন উদ্ধার করিয়াছেন।

প্রকৃতিজনকাণ্ডে প্রাকৃতরাজ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার পুণ্যবান্ অধস্তন চ্যুত-গোত্রীয়গণের গৌরব প্রদর্শিত হইয়াছে। যাঁহারা পুণ্যকর্ম্মফলে পুণ্য দেহ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই জন্মগত ব্রাহ্মণ। পাপ ও পুণ্য উভয়েই প্রকৃতির অন্তর্গত, সুতরাং পুণ্যময় দেহ কর্ম্মফলবাধ্য। প্রাকৃত পুণ্যকর্ম্মফল হইতে জাত ব্যক্তিগণ যদি প্রকৃতির অন্তর্গত পাপপুণ্যের বিচারে আবদ্ধ থাকে, তবে তাহারাও প্রকৃতিজন।

হরিজনের অপ্রাকৃত হরিসেবা-ব্যতীত অন্য কোন কার্য্য বা অভিমান নাই। আমি নিত্য কৃষ্ণদাসানুদাস—ইহাই যাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ অভিমান এবং হরিসেবাই যাঁহাদের প্রত্যেক অনুশীলনের মধ্যে প্রকাশিত, তাঁহারাই হরিজন। পূর্ব্বে গৌড়ীয়সাহিত্যে এইসকল কথা প্রকাশিত হইয়াছিল, তৎপূর্ব্বেও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ "সারগ্রাহী" ও "ভারবাহী", "সজ্জন" ও "দুর্জ্জন" প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করিয়া হরিজন ও প্রকৃতিজনের পার্থক্য নির্ণয় করিয়াছেন।

অকস্মাৎ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সাধারণ সংবাদপত্রে রাজনীতি ও সমাজনীতি আলোচনার মধ্যে 'হরিজন'-শব্দটি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। প্রথমে কয়েকটি ইংরাজী সংবাদ পত্রে হরি-শব্দের বর্ণবিন্যাস দেখিয়া তাহা 'হরি' না 'হারি' ঠিক করিতে পারা যায় নাই; কারণ তাহাতে উচ্চারণ-বৈচিত্র্য-নিরূপণের কোন সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহৃত ছিল না। কেহ কেহ বলিলেন,—বোধ হয় ইহা 'হাঁড়ি'জন শব্দ হইবে, কিন্তু হাঁড়ি-শব্দ ইংরাজীতে 'Handi' এইরূপ হওয়া উচিত। কাজেই 'Harijan' শব্দটির তাৎপর্য্য বুঝিতে অনেকেরই বেগ পাইতে হইয়াছিল। এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন একজন বিশেষ প্রবীণ অধ্যাপক ঐ শব্দটি কি, তাহা বুঝিতে না পারিয়া আমাদের সঙ্গে আলোচনা করিয়াছিলেন, কারণ ঐ শব্দটি যে-ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে প্রাকৃত বিষয় ব্যতীত অন্য কোন হরি-বিষয়ক চিন্তাস্রোতঃ নাই। যাহা হউক, বর্ত্তমান সাহিত্য 'হরিজন'-শব্দে প্রসিদ্ধ অর্থ বা রূঢ়ি করিয়া লইয়াছেন—পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তমাদি জাতি। মুচি, মেথর, হাঁড়ি, ডোম, মুদ্দাফরাস প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতিকে বর্ত্তমান সাধারণ সাহিত্য 'হরিজন'-শব্দে প্রকাশ করিয়া থাকে।

হরিজন-শব্দই যে মূলতঃ ঐ সকল জাতিবিশেষের জন্য ব্যবহৃত হয় নাই বা কোনকালে কোন সাহিত্যে তাহার ব্যবহার ছিল না, তাহা আমর উপরে সামান্য-ভাবে আলোচনা করিয়াছি। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠে শ্রীচৈতন্যদেবের উপদেশ হইতে জানিতে পারা যায় যে, জীবমাত্রই স্বরূপতঃ হরিজন—কৃষ্ণের নিত্যদাস। শ্রীচৈতন্যদেবের এই কথাটির মধ্যে দুইটী বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার আছে

প্রথমত **"জীবমাত্রই"** দ্বিতীয়তঃ "স্বরূপতঃ" ; 'জীবমাত্র' বলিলে মানবের মধ্যে কোন কোন জাতিবিশেষ ত' নহেই, এমন কি, কেবলমাত্র মানবজাতিও নহে। সমগ্র মানবজাতি, সমগ্র পশুজাতি, সমগ্র পক্ষীজাতি, সমগ্র সরীসৃপজাতি, সমগ্র উদ্ভিদ্‌জাতি অর্থাৎ এককথায় যাহাদের জীবন বা প্রাণ আছে, এরূপ প্রত্যেক চেতনই হরির জন। আবার স্বরূপ-শব্দের দ্বারা ইহা জানান হইতেছে যে, ভগবদ্‌-বহির্মুখ বা বিরূপ-গ্রস্তাবস্থায় হরিজনত্ব নাই, তাহা সুপ্ত। যেমন কাষ্ঠে অগ্নি আছে, কিন্তু যখন কাষ্ঠটি সম্পূর্ণ প্রজ্জ্বলিতরূপে প্রকাশিত থাকে না, তখন কাষ্ঠ-খণ্ডকে অগ্নিখণ্ড বলা যায় না, তদ্রূপ প্রত্যেক জীবে হরি অবস্থান করিলেও এবং প্রত্যেকে স্বরূপতঃ হরির জন হইলেও যখন তাহার বিরূপ অবস্থা অর্থাৎ হরিবিস্মৃতি প্রবল থাকে, তখন তাহাকে হরিজন বলা নিরর্থক—কেবল নিরর্থক নহে, তাহা অন্যায় ও অপরাধ। যাঁহাদের সেই বিরূপ অবস্থা কাটিয়া গিয়াছে, যাঁহারা স্বরূপে অবস্থিত হইয়াছেন অর্থাৎ আপনাকে হরির জন জানিয়া অনুক্ষণ হরির সেবায় নিযুক্ত আছেন, যাঁহাদের প্রত্যেক অনুশীলনে হরিসেবার অগ্নি-শিখা প্রজ্জ্বলিত, তাঁহাদিগকেই 'হরিজন' বলিলে 'হরিজন' শব্দের সার্থকতা। গৃহের অভ্যন্তরে অধিবাসী আছেন বলিয়া গৃহকেই অধিবাসী বলিতে গেলে অথবা খামের মধ্যে লিখিত পত্র বা সংবাদ থাকিলে খামটিকেই ভিতরকার পত্র বা সংবাদ বলিতে গেলে বিষম ভুলই হইবে।

যাঁহারা পঞ্চম, ষষ্ঠ বা সপ্তম জাতিবিশেষকে 'হরিজন' বলিতে চাহেন, তাঁহারা কি মনে করেন যে, তাঁহারা বা পৃথিবীর অন্যান্য লোক স্বরূপে হরির জন নহেন? কেবল কোন জাতিবিশেষই হরি বা ভগবানের জন বা সন্তান? এই কথা কি যুক্তিযুক্ত বা শাস্ত্রসম্মত? যদি তাঁহারা বলেন—পঞ্চম-ষষ্ঠ-সপ্তমাদি জাতি অন্যান্য দাম্ভিক উচ্চজাতিদ্বারা ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত হন বলিয়া তাঁহারা হরির অধিকতর প্রিয়ভাজন—এই বিচারে তাহাদিগকে হরিজন বলা হয়, কিংবা দাম্ভিক উচ্চজাতিগণকে 'পঞ্চম-ষষ্ঠ-সপ্তমাদি জাতিও ভগবানেরই সন্তান'—ইহা জানাইবার জন্য বিশেষ করিয়া ঐ সকল জাতিকে "হরির জন" বলা হয়, এরূপ যুক্তি পার্থিব সমাজে মনোরম হইলেও ইহাতে অত্যন্ত প্রাকৃত বিচারের প্রবলতা লক্ষিত হয়। বাহিরের খোসা বা পার্থিব পাপ-পুণ্য, পার্থিব উচ্চ বা নীচ জাতিত্ব কখনই ভগবানের প্রিয়তা বা অপ্রিয়তার কারণ নহে। একমাত্র তাঁহার প্রতি অকপট অনুরাগই তাঁহার প্রিয়তার কারণ। এজন্য যাঁহারা তাঁহার ঐকান্তিক ভজনকারী, তাঁহাদের প্রতিই তিনি অনুরক্ত এবং তাঁহারাই তাঁহার নিজজন। পাপযোনি-ব্যক্তিগণ যদি তাঁহাকে নিষ্কপটে অনুরাগের সহিত ভজন করেন, তখনই তাঁহাদের

পাপযোনিত্ব বিদূরিত হয় এবং তখনই তাঁহারা "ভগবানের জন" বলিয়া গৃহীত হন। আর যদি তাঁহারা ভগবানের ভজন না করেন, তাহা হইলে তাঁহারা পাপযোনিই থাকিয়া যান, এবং ক্রমে তাহা হইতেও অধিকতর নিম্ন পাপযোনিতে পতিত হইয়া থাকেন। পুণ্যযোনি বা উচ্চজাতির সম্বন্ধেও সেই বিচার। পুণ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি কেহ ভগবানের ভজন না করেন, তাহা হইলে তিনিও হরির প্রিয় নহেন এবং ক্রমে ক্রমে সর্ব্বাপেক্ষা নীচযোনিতে পতিত হইয়া থাকেন। কাজেই পার্থিব নীচযোনিত্ব বা উচ্চযোনিত্ব ভগবৎপ্রিয়তার কারণ নহে। তাই ভগবান্ শ্রীগীতায় বলিয়াছেন,—

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥

(গীঃ ৯।২৯)

আমি সর্ব্বজীবের প্রতি সমতা আচরণ করি, অতএব আমার বিদ্বেষের পাত্র বা প্রীতির পাত্র কেহ নাই, যাঁহারা ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে ভজনা করেন, তাঁহারা আমাতে আসক্ত এবং আমিও তাঁহাদের প্রতি আসক্ত।

শ্রীহরি নিরপেক্ষ হইলেও তিনি ভজনকারীর পক্ষপাতী, অতএব ভজনকারী ব্যক্তিগণই হরির জন। পাপযোনিসম্ভূত ব্যক্তিগণ একান্তভাবে শ্রীহরির চরণ আশ্রয় না করা পর্য্যন্ত "হরিজন"-পদবাচ্য নহেন।

মাং হি পার্থ **ব্যপাশ্রিত্য** যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি **যান্তি পরাং গতিম্**॥

(গীঃ ৯।৩২)

অতি দুরাচার ব্যক্তিও যদি দেবতান্তরে আসক্তিহীন হইয়া একমাত্র আমার ঐকান্তিক ভজনা করেন, তাহা হইলে তিনি সাধু বলিয়া গণ্য হন, কারণ তিনি আমাতেই সম্যগ্ অধ্যবসায়ী হইয়াছেন। পাপযোনিজাত জীবগণ—স্ত্রীলোক, বৈশ্য, শূদ্র ইহারাও যদি আমাকে সম্যগ্রূপে আশ্রয় করে, তবে নিশ্চয়ই পরমা গতি লাভ করিয়া থাকে।

কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্॥ (গীঃ ৯।৩৩)

পুণ্যযোনি ব্রাহ্মণ ও ভক্ত ক্ষত্রিয়গণ যে পরমাগতি প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি? অতএব হে অর্জ্জুন, তুমি এই অনিত্য ও অসুখকর মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া আমাকে ভজন কর।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥ (গীঃ ৯।৩৪)

তুমি মদ্গতচিত্ত আমার সেবক ও আমার উপাসক হও। আমার প্রতি নমস্কার বিধান কর। এইরূপে আমার শরণাপন্ন হইয়া আমাতে মন সম্পূর্ণরূপে নিবেশিত করিলে আমাকেই পাইবে।

শ্রীগীতায় শ্রীহরির এই বাণীদ্বারা সুস্পষ্টভাবে জানা যায়, একমাত্র তাঁহার অনন্যভজনকারীই তাঁহার জন। ভক্তিই তাহার প্রিয়তা অর্জ্জনের একমাত্র নিত্যসিদ্ধ উপায় ও উপেয়। আরও জানা যায় যে, মর্ত্ত্যলোকে স্ত্রী-শূদ্র-বৈশ্যাদি পাপযোনিজাত এবং ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি পুণ্যযোনিজাত ব্যক্তিগণ স্ব-স্ব কর্ম্মফলে এই জগতে আসিয়াছে, কাজেই তাহাদের কর্ম্মফললব্ধ জন্মের নীচতা ও উচ্চতাকে একাকার করিবার চেষ্টা করিলেই ভগবানের জন হওয়া যাইবে না। ভগবানের ভজন করিলেই ভগবানের জন হওয়া যাইবে। কর্ম্মফলে যাহারা নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কেহ যদি তাহাদের প্রতি মৌখিক সহানুভূতি দেখাইয়া 'হরিজন' বলেন, অথচ তাহাদিগকে ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত না করাইয়া পুনরায় কর্ম্মরাজ্যেরই নানা প্রকার প্রলোভন ও প্রতিযোগিতায় প্রলুব্ধ ও উদ্দীপ্ত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেইসকল কর্ম্মফলবাধ্য ব্যক্তিগণের প্রতি অধিকতর হিংসাই করা হয়, অর্থাৎ তাঁহাদের যে হরিভক্তিতে মতি হইত, কর্ম্মের প্রবৃত্তির মধ্যে পেষণ করিয়া তাঁহাদের সেই বৃত্তিটিকেও ধামাচাপা দেওয়া হইল। অতএব পুণ্যবান্ ব্রাহ্মণই হউন আর পাপাত্মা নীচজাতিই হউন, হরির ঐকান্তিক ভজন না করিলে বা হরির ঐকান্তিক ভজনকারীর শরণাগত না হইলে তাঁহারা 'হরিজন'-পদবাচ্য নহেন। অহিন্দুকুলে আবির্ভূত শ্রীল ঠাকুর হরিদাস, করণকুলে আবির্ভূত শ্রীল রায়-রামানন্দ, ভুঁইমালী কুলে আবির্ভূত শ্রীঝড়ুঠাকুর যেমন নিত্যসিদ্ধ হরিজন, আবার উচ্চতম ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত শ্রীবাসপণ্ডিত, ক্ষত্রিয় রাজকুলে আবির্ভূত শ্রীপ্রতাপরুদ্র প্রভৃতি তেমনই হরিজন। এই সকল হরিজনের চরণরেণু সমস্ত দেবতা, মনুষ্য ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ লাভ করিলে কৃতকৃতার্থ হইতে পারেন।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন—নীচ জাতিগণের ভিতরে শ্রীহরি বাস করেন, সুতরাং তাঁহারাও সেই সূত্রেই ভগবদ্ভক্ত ও হরিজন। শ্রীহরি কেবল তাহাদের হৃদয়ে বাস করেন তাহা নহে, তিনি পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, তৃণ, গুল্ম, লতা, ও মনুষ্য সকলের হৃদয়েই বাস করেন। যাহাদের হৃদয়ে নির্ম্মলা হরিসেবা-বৃত্তি প্রকাশিত হয় নাই, যাহারা এই পার্থিব জগতের লাভালাভ লইয়া ব্যস্ত আছে, তাহাদিগকে 'হরিজন' বলা যাইবে না। হরিজনের স্বভাব শ্রীমদ্ভাগবত এইরূপ বলিয়াছেন,—

ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠস্মৃতিরজিতাত্মসুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ।
ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দাল্লবনিমিষার্দ্ধমপি যঃ স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ॥

(ভাঃ ১১।২।৫৩)

অর্থাৎ অজিতাত্ম দেবগণ যে ত্রিভুবনের অনুসন্ধান করেন, উহা প্রাপ্তির লোভেও **যাঁহার মতি কৃষ্ণপাদপদ্ম হইতে লবনিমেষার্দ্ধের জন্যও বিচলিত হয় না, তিনিই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ বা হরিজন।**

বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাৎ হরিবশাদভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ॥

(ভাঃ ১১।২।৫৫)

অবশ হইয়াও যাঁহার নাম উচ্চারণ করিলে সেই নামের আভাসে সমস্ত পাপ দূরিত হয়, সেই **ভগবানের পাদপদ্ম যিনি নিজ হৃদয়ে প্রণয়রসনাদ্বারা আবদ্ধ রাখিয়াছেন অর্থাৎ যিনি সর্ব্বক্ষণ অনুরাগ-ভরে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া বিশ্বজীবের মঙ্গলবিধান ও পরমেশ্বরের ইন্দ্রিয়তর্পণ করেন,** এবং তজ্জন্য শ্রীহরি যাঁহার হৃদয়কে কখনই পরিত্যাগ করেন না, তিনিই হরিজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

পাপযোনি বা পুণ্যযোনিজাত ব্যক্তিগণের সমস্ত বহির্ম্মুখতা ও প্রবৃত্তিকে অটুট রাখিয়া ও তাহাতে ইন্ধন প্রদান করিয়া কেবল তাহাদের গাত্রে হরিজনের ছাপ লাগাইয়া দিলে তাহারা 'হরিজন' হইবে না। বরং ইহাতে প্রকৃত হরিজনগণের অপার্থিব উচ্চতম আদর্শ, যাহা সাধারণ লোকের অজ্ঞাত, সেই আদর্শকে সাধারণে বিজ্ঞাপিত করিবার পক্ষেও যথেষ্ট প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা হইবে। প্রাকৃত সহজিয়াগণের ন্যায় কর্ম্মফলবাধ্য ভারবাহী গাধাকে "বৈষ্ণব" বলিয়া পূজা করিলে যেরূপ সেই পশুবিশেষকে, নির্ব্বোধ জনসাধারণকে ও নিজকে বঞ্চনা করা হয় এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত বৈষ্ণবেরও অবমাননারূপ অপরাধের আবাহন করা হয়, তদ্রূপ আমরা কার্য্যতঃ হরিজন অর্থাৎ হরিভজনকারী না হইয়া যদি নিজকে নিজে 'হরিজন' বলি বা অপর বহির্ম্মুখ ব্যক্তিকে ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত রফা দফা করিয়া ঐ নামে অভিহিত করি, তাহা হইলেও আমাদের একাধারে নিজের বঞ্চনা, যাহাকে বা যাহাদিগকে ঐরূপ অবৈধ নামে অভিহিত করিতেছি, তাহাদের প্রতি বঞ্চনা এবং জনসাধারণকে বঞ্চনা ও তৎসঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত হরিজন অর্থাৎ একান্ত ভগবচ্চরণাশ্রিত ব্যক্তিগণের চরণে অপরাধ করিব।

———

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৫শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১১৫ পৃষ্ঠার পর]

সাত্বতস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাস বলেন,—নিত্যত্ব, পাপহারিত্ব ও সর্ব্বার্থলাভ-হেতু শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমীব্রত মানবমাত্রেরই অবশ্য পালনীয়। ভাদ্রমাসে শ্রীভগবানের জন্মদিনে ব্রতাচরণপূর্ব্বক বিশেষভাবে মহাপূজার পর বৈষ্ণবগণের পক্ষে মহোৎসব করা একান্ত কর্ত্তব্য।

শ্রীজন্মাষ্টমী-ব্রতোৎপত্তি

ভবিষ্যোত্তরে শ্রীযুধিষ্ঠির-মহারাজ শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেছেন,—হে অচ্যুত! অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার নিকট জন্মাষ্টমীব্রত বিস্তারিতভাবে বর্ণন করুন। কখন এই ব্রতের আবির্ভাব হয়েছে, এর পালনে কি পুণ্য হয় এবং তদ্বিধিই বা কিরূপ?

শ্রীকৃষ্ণ বললেন,—হে যুধিষ্ঠির! মথুরায় দুরাচার কংস নিহত হলে মল্লযুদ্ধ সমাপ্তির পর তত্রস্থ রঙ্গভূমি সর্ব্বজনের মহোৎসবে পূর্ণ হল। দেবকী দেবী তৎকালে অন্ধকাদি স্নেহশীল আত্মীয় ও স্ত্রীগণে পরিবেষ্টিত হয়ে আমাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কোলে নিয়ে কাঁদতে লাগলেন। বসুদেবও আমার নিকট এসে পুত্র বাৎসল্যবশতঃ আমাকে আলিঙ্গন করে 'পুত্র পুত্র' বলে কাঁদতে আরম্ভ করলেন। তিনি গদ্গদস্বরে দীনভাবে বাষ্পপূরিতলোচনে বলভদ্র ও আমাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক বললেন,—তোমরা দুইজন যদুকুলে জাত আমার পুত্র। আজ তোমাদের উভয়ের সাথে মিলনে আমার জন্ম সার্থক হল, আমার জীবনও ধন্য হল।

হে নৃপ! দম্পতী বসুদেব-দেবকীর এরূপ আনন্দ-দর্শনে সকলেই পুলকিত হলেন। উপস্থিত সকলে হর্ষান্বিত হয়ে আমাকে প্রণতি জানিয়ে বললেন,—'হে জনার্দ্দন! আজ আমাদের আনন্দের সীমা নাই; আজ মল্লযুদ্ধে দুরাত্মা কংসের নিপাত ঘটল। হে মধুসূদন! এরূপ মহোৎসব দর্শন করে সমাজের প্রতি তুষ্ট হউন এবং সকলের প্রতিও আশু কৃপা প্রদর্শন করুন। হে জনার্দ্দন! দেবকী দেবী যে-দিনে আপনাকে প্রসব করেছেন, আমরা সেইদিনে আপনার উৎসব সম্পাদন করব, আপনি আমাদের অনুমতি দিন। হে কেশব! আমরা সম্পূর্ণ ভক্তিভরে আপনার শরণ নিলাম, আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন।' এই বাক্য সভাস্থলে সকলের মুখে উচ্চারিত হলে বসুদেবও পরম বিস্ময়াপন্ন হয়ে বলদেবের দিকে দৃষ্টিপাত করে আনন্দে রোমাঞ্চিত দেহে আমার প্রতি বলতে লাগলেন,—'লোকসমূহের প্রার্থনা পূর্ণ হউক, তুমি যথারীতি আজ্ঞা প্রদান কর।'

হে যুধিষ্ঠির! তখন পিতার অনুমত্যানুসারে মথুরায় মানবগণের নিমিত্ত আমি জন্মাষ্টমীব্রত সম্যক্‌ভাবে প্রকাশ করলাম। পুরবাসিগণ ও অন্যান্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রাদি এবং অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বিগণ সকলে অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রম হইতে আরম্ভ করে অশীতিবর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত জন্মাষ্টমী-নামক মহদ্‌ব্রত পালন করুক।

হে মানবগণ! সূর্য্য সিংহরাশিগত হলে, আকাশে মেঘোদয়ে ভাদ্রমাসীয় কৃষ্ণাষ্টমীর অর্দ্ধনিশায় বৃষরাশিস্থ চন্দ্রে রোহিণী-নক্ষত্রে বসুদেব হতে দেবকীর পুত্ররূপে আমি স্বেচ্ছায় জন্মগ্রহণ করেছিলাম। এইরূপে এই জন্মাষ্টমীব্রত ভুবনে প্রসিদ্ধিলাভ করেছে। মথুরা-নগরীতে ভগবতী যোগমায়া দুর্গাদেবীরও ঐরূপ মহোৎসব অনুষ্ঠান কর। ইহাও জনসমাজে পরে প্রসিদ্ধিলাভ করবে। হে পার্থ! আমি যা বললাম তা শুনে মানবগণও তদনুরূপ আচরণ করতে লাগল। জগজ্জনের শান্তি হউক, আনন্দলাভ হউক ও লোকসমূহ নিরাময় হউক—"শান্তিরস্তু সুখঞ্চাস্তু লোকাঃ সন্তু নিরাময়াঃ।"

শ্রীজন্মাষ্টমী-ব্রতের নিত্যত্ব

শ্রীভগবান্ প্রীত হন, বর্ষে বর্ষে জন্মাষ্টমীব্রত পালনের শাস্ত্রবিধি রয়েছে এবং অকরণে অনিষ্ট হয়—এই ত্রিবিধ কারণেই এই ব্রতের নিত্যত্ব প্রসিদ্ধ।

স্কন্দপুরাণে বর্ণিত আছে,—প্রহ্লাদ প্রভৃতি নৃপগণ শ্রীহরির প্রীতির নিমিত্ত বিশেষ শ্রদ্ধাসহকারে হরিপ্রিয় পবিত্র এই জন্মাষ্টমীব্রত পালন করেছেন। চক্রপাণি হরির প্রীতির জন্য প্রতিবর্ষে রোহিণীনক্ষত্রযুক্তা শ্রাবণী কৃষ্ণাষ্টমীতে এই ব্রতের অনুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য।

জন্মাষ্টমীব্রতে ভোজনে প্রত্যবায়

শ্রীবিষ্ণুরহস্যে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে বর্ণিত আছে,—জন্মাষ্টমী-তিথিতে ভোজন করলে বিবিধ পাতকে লিপ্ত হতে হয়। যে ব্যক্তি জন্মাষ্টমীতে ভোজন করে, তার সেই ভোজন মাংসভোজন-তুল্য হয় ও ত্রিভুবনস্থ নিখিল পাতক ভোজন করা হয়। জয়ন্তীবাসরে স্বল্পমাত্র ভোজন করলেও যমদূতগণ-কর্ত্তৃক সেই ব্যক্তির শরীর তিল তিল পরিমাণে পীড়িত হয়। যে মূঢ়ব্যক্তি জয়ন্তীব্রতে ভোজন করে, একাদশী-দ্বাদশী-ব্রতানুষ্ঠান করলেও তার নরক হতে উদ্ধার নাই। শ্রীকৃষ্ণজন্মদিনে ভোজন করলে ভোজনকারীর অতীত ও অনাগত শতপুরুষ ভীষণ নরকে নিমগ্ন হয়।

উপবাসী হইয়াও পূজা-মহোৎসবাদি ত্যাগে প্রত্যবায়

জ্ঞানী হয়েও কৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রত পালন ও অনুষ্ঠান না করলে ঘোর অরণ্যে সর্পদেহে বাস করতে হয়। জয়ন্তীব্রতে বিমুখ ব্যক্তির ইহ বা পর কোন লোকেই সুখ নাই; অধিকন্তু ব্রহ্মহত্যা, গো-হত্যা ও স্ত্রীবধের পাপে লিপ্ত হতে হয়। যে

নারী প্রতিবর্ষে কৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রত অনুষ্ঠান না করে, সে ভুজঙ্গী হয়ে বনমধ্যে বাস করে থাকে। শ্রাবণমাসে কৃষ্ণজন্মাষ্টমী-ব্রতানুষ্ঠান না করলে তাকে ক্রূর রাক্ষসরূপ ধারণ করে জন্মগ্রহণ করতে হয়। কৃষ্ণাষ্টমীতে ব্রত না করলে বিকটানন ভয়ঙ্কর অস্ত্রধারী যমদূতগণ তৎপ্রতি হিংসাচরণ করে। শ্রীহরির জয়ন্তীব্রত পালন না করলে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। জন্মাষ্টমী-ব্রত ত্যাগ করে যারা অন্য সাধারণ ব্রতাচরণ করেন, তাদের শ্রুত বা দৃষ্ট কোন পুণ্যই লাভ হয় না। অকিঞ্চন বৈষ্ণবদিগেরও ভক্তবৃন্দসহ অল্পবিত্তব্যয়েও দেবকীসুত শ্রীহরির প্রীত্যর্থে ভক্তি-পূর্ব্বক জয়ন্তীব্রত উপবাসমুখে পালন করা কর্ত্তব্য।

শ্রীজন্মাষ্টমী-মাহাত্ম্য

ভবিষ্যোত্তরে কৃষ্ণ-যুধিষ্ঠির সংবাদে বর্ণিত হয়েছে,—জন্মাষ্টমী-ব্রতের উপবাস করলে সপ্তজন্মার্জ্জিত পাতক ধ্বংস হয় এবং আরোগ্য ও সৌভাগ্য লাভ হয়। সত্য-ধর্ম্মনিষ্ঠ সেই ব্যক্তির দেহান্তে বৈকুণ্ঠ-গতি হয়। তিনি এ জগতে সর্ব্বকামপূর্ণ সর্ব্বদুঃখহীন সর্ব্বধর্ম্মপরায়ণ ও দীর্ঘায়ু হয়ে বিশাল সাম্রাজ্য লাভ করেন এবং তাহার প্রভুরূপে বিবিধ অভিলষিত ভোগাদির পর অপুনর্ভব পরমপদে আরোহণ করেন। তদ্বংশে রূপবান্ ও হৃদয়বান্ মহাত্মগণের আবির্ভাব ঘটে। যে দেশে মানবগণ সর্ব্বদা ভগবানের লেখ্যা ও লেপ্যা অর্চ্চামূর্ত্তিকে তাঁর পবিত্র জন্মদিনে অলঙ্কারভূষিত ও উৎসবান্বিত অবস্থায় পূজা করেন, সে দেশে কখনও পাপ-চক্রের ভয় থাকে না; সেই দেশে মেঘ যথাকালে বারিবর্ষণ করে, তথায় অতিবৃষ্টি-অনাবৃষ্টির আশঙ্কা নাই। ভগবৎ-জন্মবৃত্তান্ত গৃহে লিখিত থাকিলে সর্ব্বসমৃদ্ধি লাভ হয় এবং কোনরূপ উপসর্গাদিভয়—পাপরোগ, নৃপ্যতি-চৌরভয়াদি থাকে না। তথায় মৃতসন্তান প্রসূত হয় না, গর্ভপাতের ভয় থাকে না, ব্যাধি-বৈধব্য-দৌর্ভাগ্য ঘটে না এবং দম্ভ-কলহেরও সৃষ্টি হয় না। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কেহ জন্মাষ্টমী-ব্রত পালন করলে নিঃসন্দেহে তার বিষ্ণুলোক লাভ হয়। এই তিথি সপ্তপাতকহারিণী ও নন্দ-যশোদার আনন্দদায়িনী। এই ব্রতে এদের ও বসুদেব-দেবকীর পূজা করলে দেহান্তে বিষ্ণুর পরমপদে গতিলাভ হয়।

'জয়ন্তী' কাহাকে বলে ?

কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতে রোহিণী-নক্ষত্রের যোগ হলে তাকে 'জয়ন্তী' বলে, ঐ তিথি সর্ব্বপাপহারিণী। জয়ন্তী-তিথিতে ভক্তিসহকারে গোবিন্দের পূজা করলে বাল্যে, কৌমারে, যৌবনে ও বৃদ্ধকালে সঞ্চিত পাপ সমস্তই বিনষ্ট হয়। মহাপাতকনাশিনী শ্রীকৃষ্ণজন্ম-জয়ন্তীতে **উপবাসী থাকলে** যজ্ঞ-হোম-দানাদি কার্য্যের শতগুণিত ফল ও মনোভীষ্টসমূহ লাভ হয়। জয়ন্তীতে উপবাস-সহকারে

কৃষ্ণপূজা করলে ভগবান্ নিখিল পাতক ধ্বংস করেন। এই ব্রতবাসরে স্নান, দান, স্বাধ্যায়, জপ, তপ প্রভৃতি যে-কোন অনুষ্ঠান করা হউক, তৎসমস্ত শতগুণ-ফলদায়ক হয়। কৃষ্ণভক্তিদায়িণী শুভা জয়ন্তীতে যত্নপূর্ব্বক উপবাস করলে ঐ তিথি উপবাসীকে অভিলষিত ফল প্রদান করেন।

কৃষ্ণাষ্টমী বৈষ্ণবী তিথি বলে অভিহিত। ঐ তিথির শরণ লইলে, বিশেষতঃ কলিযুগের জনগণ বিশুদ্ধ হইতে পারেন। যে সমস্ত ধন্য ব্যক্তি ঐ বিষ্ণুতিথিতে **উপবাসী ও জাগ্রত থেকে** হরিকে পূজা করেন, তাঁদিগকে কদাপি ঘোর সংসার-ভয়ে ভীত হতে হয় না। তাঁরা যথায় বাস করেন কলি তথায় থাকতে পারে না। ভগবান্ হরি কংসকে বিনাশ করবার জন্য যেদিন আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁর ঐ জন্মদিন নিখিল মঙ্গলের আধার। ঐ তিথি মানবগণের পক্ষে মুক্তি-ফল প্রদানকারিণী। সনাতন পুরাণপুরুষ শ্রীহরি যখন প্রত্যক্ষভাবে ঐ তিথিতে ভূতলে অবতীর্ণ হয়েছেন, তখন ঐ তিথি মুক্তিদা-ভক্তিদা, এতে আর আশ্চর্য্য কি?

শ্রীহরিব্রত পালনই পরম মঙ্গল, পরম তপস্যা ও পরমধর্ম্ম বলে শাস্ত্রাদিতে কীর্ত্তিত। এই তিথি কোটিযজ্ঞ ও অজুত তীর্থের তুল্য। জয়ন্তী-তিথিতে উপবাসী থাকলে প্রত্যহ সহস্র কপিলাধেনু দানের পুণ্য লাভ হয়। কুরুক্ষেত্র-তীর্থে সহস্র স্বর্ণভার অর্পণ করলে যে পুণ্য হয়, জয়ন্তীতে উপবাস করলে সেই ফল পাওয়া যায়। এই তিথিতে উপবাসী থাকলে সহস্রকোটী রত্নদানের ফল পাওয়া যায়। বহু সহস্র বাপী, কূপ, দেবালয় দান করলে যে ফল লাভ হয়, মাতা-পিতার প্রতি ভক্তি করলে যে ফল পাওয়া যায়, বিপ্র ও পতির নিমিত্ত দেহ বিসর্জ্জন করলে যে ফল হয়, পরোপকারী তীর্থসেবা-পরায়ণ ও ব্রত-নিষ্ঠগণ যে ফল প্রাপ্ত হন, শ্রীকৃষ্ণ-জয়ন্তীতে উপবাসীর তদপেক্ষা অধিকগুণ ফল লাভ হয়ে থাকে। তরুতলবাসী তাপসগণ যে ফল প্রাপ্ত হন, সহস্র রাজসূয় যজ্ঞ ও শতবার্ষিক অগ্নিহোত্র যজ্ঞ অনুষ্ঠানে যে ফল হয়, কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণজন্ম-জয়ন্তীতে উপবাসী থাকলে তৎসমুদয় ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। কৃষ্ণাষ্টমী-তিথি ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষদায়িকা ও বাঞ্ছিতফলপ্রদা। যাঁরা এই ব্রতানুষ্ঠান করেন কিম্বা করাইয়া থাকেন, তাঁহাদের নিকট শ্রীকমলা অচলা হয়ে বাস করেন। জন্মাষ্টমী-ব্রতপালন করলে যে ফল লাভ হয়, তদপেক্ষা অধিক ফল বেদে বা পুরাণেও দৃষ্ট হয় না। যিনি এই ব্রতদ্বারা দেবকীর সহিত শ্রীহরিকে আরাধনা করেন, তিনি যম-পথ বর্জ্জনপূর্ব্বক বিষ্ণুর পরমপদে গমন করেন। এই ব্রত ভক্তিপূর্ব্বক পালন করলে মৃত্যুকালে ভগবান্ শ্রীবাসুদেবের স্মরণ হয় এবং পালনকারীর

সর্ব্বাভীষ্ট লাভ হয়। যদি সাক্ষাদ্ ভগবৎসেবা প্রাপ্তির ইচ্ছা থাকে, তবে হে মানবগণ! তোমরা নিষ্ঠার সহিত শ্রীকৃষ্ণজন্ম-জয়ন্তী-ব্রত পালন কর। ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে উক্ত হয়েছে,—এই শাস্ত্রগুহ্য শ্রীকৃষ্ণব্রত-মাহাত্ম্য যাহা বর্ণিত হল, মনুষ্য শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ইহার শ্রবণ-কীর্ত্তন করলে সর্ব্বপাপ-বিমুক্ত হয়ে দেহাবসানে ভগবল্লোকে সাক্ষাৎ সেবাধিকার প্রাপ্ত হন।

জন্মাষ্টমী-ব্রত-নির্ণয়

ভাদ্রমাসের শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমীতে উপবাসী থাকা উচিত। সেইদিন অর্দ্ধরাত্রে যদি রোহিণী সংযোগ হয়, আর যদি সোমবার বা বুধবার এবং নবমী-সংযুক্ত হয়, তবে ঐ তিথি মহাফল দান করেন। ঐ মহাফলদায়িনী তিথিতেই যত্নপূর্ব্বক উপবাস করতে হবে। এই তিথি উপাসিতা হলে সকল পাতক ধ্বংস করেন, জয় প্রদান ও পুণ্য দান করেন, এজন্য বুধগণ এঁকে 'জয়ন্তী' আখ্যা দিয়েছেন। এতে উপবাসী থেকে গোবিন্দের পূজা করলে তিনি মানবের সপ্তজন্মের কৃত দৈহিক, বাচিক ও মানসিক ত্রিবিধ পাতক ক্ষালন করেন। বুধব্যক্তিগণ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরাদি যুগে এই জন্মাষ্টমীতে উপবাস করেছেন। শ্রীকৃষ্ণজন্ম-তিথিতে উপবাস ও হরিপূজা করলে কখনই কোনভাবে ব্রতীকে অবসন্ন হতে হয় না। রোহিণীনক্ষত্রযুক্ত কৃষ্ণ-অষ্টমীতে কৌস্তুভধারী অব্যয় জনার্দ্দন শ্রীহরি জন্মগ্রহণ করেছেন; সেইকালে সংযতচিত্ত, শুচি, কৃতস্নান ও উপবাসী হয়ে ঐ শুভ তিথির পূজাপূর্ব্বক জাগরণ করবে। এই তিথিতে বালরূপধারী শ্রীগোবিন্দ জন্মগ্রহণ করেছেন; অতএব যথাবিভবানুসারে অর্দ্ধরাত্রে বৃষরাশিস্থ চন্দ্রে রোহিণীনক্ষত্রের সংযোগে উপবাসী থেকে শ্রীকৃষ্ণ, যশোদা ও দেবকীদেবীকে পূজা করবে। যাঁরা এই তিথিতে উপবাসপূর্ব্বক ব্রতাচরণ করেন, তাঁরা প্রেত-যোনিগত ব্যক্তিদিগের প্রেতত্ব মোচনে সমর্থ হন। বিশেষতঃ জয়ন্তী-তিথি কোটী কুলকে মুক্তিদান করেন। নবমী-সংযুক্ত অষ্টমী, তথা সোম বা বুধবার ও রোহিণী নক্ষত্রের সংযোগ অতি দুর্ল্লভ, শতবর্ষেও এরূপ জয়ন্তী-যোগ পাওয়া যায় না। নবমীতে যোগমায়া ও অষ্টমীতে শ্রীহরি জন্মগ্রহণ করেছেন, তজ্জন্য অতিদুর্ল্লভ। কৃষ্ণ-জয়ন্তীতিথি কোটীকুলের মুক্তিদায়িণী, পুরুষ ও স্ত্রীগণ উভয়েই ইহার সমাদর করবেন।

সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমীতে ব্রত নিষেধ

বিবিধ যোগভেদে জন্মাষ্টমী-তিথি বহুবিধ হলেও শুদ্ধতিথিই পালনীয়া। যেরূপ দশমীবিদ্ধা একাদশী পরিত্যাজ্যা, তদ্রূপ সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমী পরিত্যাজ্যা।

যেরূপ পঞ্চগব্য শুদ্ধ হলেও মদ্যসংযুক্ত হলে তা গ্রহণযোগ্য হয় না, তদ্রূপ রোহিণী-সংযুক্ত হলেও সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমীকে ব্রতবিষয়ে বর্জ্জন করবে। সপ্তমীবেধরহিত রোহিণীনক্ষত্রযুক্ত অষ্টমীতে দেবকীনন্দন জন্মগ্রহণ করেছেন। গঙ্গোদকপূর্ণ কুম্ভ যেরূপ বিন্দুমাত্র সুরাযোগেও অশুদ্ধরূপে বর্জ্জনীয়, তদ্রূপ একপলমাত্র সপ্তমী-বিদ্ধা হলেও অষ্টমী বর্জ্জনীয়। বহ্নিপুরাণাদিতে বিদ্ধাষ্টমীতে যে ব্রতকরণবিধি বর্ণিত আছে, তা বৈষ্ণবগণের পক্ষে নহে, উহা বৈষ্ণবভিন্ন অন্যের পক্ষে এবং উহা দেবমায়াবৃত। পুরাকালে দেববৃন্দ ও ঋষিগণ নিজ নিজ পদচ্যুতির আশঙ্কায় সপ্তমীবেধরূপ জালদ্বারা অষ্টমীতিথিকে গুপ্ত করে রেখেছিলেন।

উমা-মাহেশ্বরীতিথি ও ব্রতে পারণ-বিধি

পুরাকালে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীহরি প্রজাপতির প্রার্থনানুসারে দেবকীদেবীর প্রতি কৃপা প্রকাশপূর্ব্বক দৈত্যকুল নিধনের নিমিত্ত রোহিণীনক্ষত্রযুক্তা শুভঙ্করী ভাদ্র-কৃষ্ণাষ্টমীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সুতরাং ঐ মঙ্গলময় দিনে যত্নপূর্ব্বক মহোৎসব করা উচিত। ঐ দিনে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র নিজ শক্তি-অনুসারে উপবাস করবেন, কদাচ অন্নাদি ভোজন করবেন না। শ্রীহরির জন্মদিবসে আহার করলে সেই নরাধমকে আপ্রলয় ঘোর নরকমধ্যে বাস করতে হয়। ঐ তিথিতে উপবাস করাই বুধজনের কর্ত্তব্য; এতে কোটী যজ্ঞফল লাভ হয় ও বিমল বৈকুণ্ঠধামে অবস্থিতি হয়। নবমীবিদ্ধা অষ্টমী উমা-মাহেশ্বরী তিথি বলে কীর্ত্তিতা। অগ্নিপুরাণাদিতে উক্ত হয়েছে,—দৈব ও অসুর—এই দ্বিবিধ ভূতসৃষ্টি; তন্মধ্যে বিষ্ণুভক্তগণ দৈব এবং বিষ্ণুভক্তিহীনেরা অসুর জানবে। অষ্টমীতিথি ও রোহিণীনক্ষত্রে কখনও পারণ করা উচিত নয়, ঐ সময়ে পারণ করলে ব্রত ও উপবাসের ফল নষ্ট হয়; এজন্য তিথি ও নক্ষত্রের অন্তে পারণ কর্ত্তব্য। বৈষ্ণবগণ শ্রেষ্ঠ ভগবজ্জন্মরূপ মহোৎসবদিনে ভক্তিমান্ হয়ে উপবাস-পূর্ব্বক পরদিবসে ব্রতের পারণ করে থাকেন।

———

শ্রীকৃষ্ণ-বংশীগীত-মাহাত্ম্য

"নদ্যস্তদা তদুপধার্য্য মুকুন্দগীতমাবর্ত্তলক্ষিত-মনোভব-ভগ্নবেগাঃ।
আলিঙ্গন-স্থগিতমূর্ম্মিভুজৈর্মুরারেগৃর্হ্ণন্তি পাদযুগলং কমলোপহারাঃ॥"

যশোদা-ললিত হরি, গোচারণে যায় চলি',
সঙ্গে ল'য়ে গোপীগণের মন।
ঘরে বসি' গোপীগণ, করে কৃষ্ণের স্মরণ,
পূর্ব্বরাগে করে আলাপন॥
দেখ সই প্রস্তরোপরি, বসিয়াছে শ্রীহরি,
বেণুখানি লইয়াছে করে।
স্মরিয়া লাবণ্যরাশি, প্রাণ কুবলয় শশী,
গোপীগণের সদা মন ঝুরে॥
দেখিয়া যমুনা-বক্ষ, শ্যামসুন্দর অতি দক্ষ,
বসে আসি' যমুনার তটে।
স্মর-বেগে হয়ে ভগ্ন, মিলিবারে অতি তৃষ্ণ,
রচে কিছু মানসের পটে॥
ত্যাগ করি' পতি-লালসা, উল্টা স্রোতে ফিরে আসা,
কৃষ্ণের নিকট সঙ্গোপনে।
উপরের স্রোতে মিলি, উভে করে ঠেলাঠেলি,
কবে করি কৃষ্ণ আলিঙ্গনে॥
ঊর্ম্মিরূপী বাহুদ্বারে, দৃঢ় আলিঙ্গন করে,
শ্রীকৃষ্ণ হইল নির্ব্বিকার।
লজ্জিতা হইয়া পরে, স্মর-বেগ ত্যাগ করে,
চরণে কৈল উপহার॥
ভাবনেত্রে গোপরামা, সব কাজে দেয় থামা,
হেনভাব কবে হবে চিতে।
দ্রুত কমল ল'য়ে করে, শ্রীকৃষ্ণের পূজা করে,
পাছে কেহ দেখে আচম্বিতে॥

অবলম্বি' অবহিত্থ, অন্যভাবে দেয় চিত,
গিরিরাজের করয়ে বর্ণন।
অন্য কেহ নাহি বুঝে, 'নবীন' মনে কিবা সুঝে,
কেবল বুঝিবে শ্রীনারায়ণ॥

—শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার

শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর-স্থাপন

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বার্ষিক সাধারণ-সভায় শ্রীসমিতির পরিচালকগণ বর্ত্তমান বর্ষের ১২ই বৈশাখ ১৪০০, ইং ২৫শে এপ্রিল ১৯৯৩, রবিবার অক্ষয়-তৃতীয়া-তিথিতে কলিকাতাস্থ প্রচারকেন্দ্র শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর-স্থাপন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন। বলা-বাহুল্য, বিগত বর্ষের বার্ষিক সাধারণ-সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তানুযায়ী উক্ত মঠের শ্রীমন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য কলিকাতা কর্পোরেশন হইতে শ্রীমন্দিরের ও সেবকখণ্ডের 'প্লান' পাস করানো হইয়াছিল। মাননীয় শ্রীবাসুদেব নন্দী (Civil Engineer) মহাশয় সোৎসাহে শ্রীমন্দিরের ও সেবকখণ্ডের প্লান করাইয়া শ্রীসমিতির বিশেষ প্রশংসার পাত্র হইয়াছেন।

পূর্ব্বপরিকল্পনানুযায়ী শ্রীমন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর-স্থাপনোদ্দেশ্যে শ্রীসমিতির সভাপতি-আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ, পরম পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ, শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি যথাসময়ে শ্রীমঠে উপস্থিত হন।

শ্রীমন্দিরের ও সেবকখণ্ডের প্লান অনুযায়ী জমি মাপিয়া ভিত্তিপ্রস্তর-স্থাপনের স্থান নির্দ্ধারণ করা হয়। ১২ই বৈশাখ রবিবার বেলা ৮-৩০ ঘটিকায় অক্ষয়-তৃতীয়ার শুভলগ্নে সঙ্কীর্ত্তনযোগে অধিবাস, বাস্তুপূজা ও শ্রীশ্রীঅনন্তবাসুদেবার্চ্চনাদির পর ভিত্তিপ্রস্তর-স্থাপন অনুষ্ঠিত হয়। তদনন্তর পরিক্রমান্তে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউ, শ্রীলক্ষ্মী-বরাহদেব, শ্রীলক্ষ্মী-নৃসিংহদেব, শ্রীগিরিরাজ-জীউ, শ্রীশ্রীজগন্নাথ-বলদেব-সুভদ্রাদেবীর জয়ধ্বনিপূর্ব্বক ভিত্তিপ্রস্তর-স্থাপনের কার্য্য সমাপন করা হয়।

মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউর বিশেষ ভোগরাগ ও

আরতি সম্পন্ন হয়। আরাত্রিকান্তে আহূত, অনাহূত প্রায় দুই শতাধিক ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ পরিবেশন করা হয়।



কলিকাতা কর্পোরেশনের Deputy Assessor মাননীয় শ্রীগৌরচন্দ্র পাল, স্বনামধন্য বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মাননীয় শ্রীপ্রদীপ কুমার রায়, শ্রীদীপক পাল (Civil Engineer), শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ পাইন এবং স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকিয়া এই অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন।

উল্লেখ থাকে যে, এই শাখামঠ বিগত ২৪শে অগ্রহায়ণ ১৩৮৮, ইং ১০ই ডিসেম্বর ১৯৮১ সালে স্থাপিত হইয়াছিল।

—নিজস্ব সংবাদ

"শ্রীগুরুপাদপদ্ম মৃত নহেন, প্রকটে-অপ্রকটে তাঁহার সমান অস্তিত্ব প্রমাণিত। তাঁহার আবির্ভাব-তিরোভাব একতাৎপর্য্যপর; সুতরাং আবির্ভাবে বিরহ-স্মৃতি ও তিরোভাবে মিলন-মহোৎসব যুগপৎ সম্ভব।"

"যাঁহারা চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালন না করিয়া, কেবলমাত্র 'উর্জ্জাদর' করিয়া থাকেন, তাঁহারা চাতুর্ম্মাস্যের ভক্তিফল সম্পূর্ণরূপে লাভ করিতে পারেন না। ইহার দ্বারা চাতুর্ম্মাস্যের প্রতি অনাদরই প্রকাশ পায়।"

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-চরণে প্রার্থনা

বাঞ্ছাকল্পতরু প্রভু, কৃষ্ণসেবা শিক্ষাগুরু,
এজগতে হইলে উদয়।
জগৎ পবিত্র কৈলে, প্রেমে জীব ভাসাইলে,
জীবপ্রতি হইয়া সদয়॥ ১॥
শিক্ষা দিলে ভক্তিতত্ত্ব, জ্ঞান কর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ,
দেখ ইহা সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
কৃষ্ণ হয় নিত্যতত্ত্ব, দেখাইলে সে মহত্ত্ব,
শ্রীকৃষ্ণের সম কেহ নয়॥ ২॥
ভক্ত-ভক্তি-ভগবান্— তিন হয় এক প্রাণ,
ভক্তকৃপায় ভক্তি লভ্য হয়।
ভক্ত তাঁর ভক্তিবলে, জগৎ পবিত্র করে,
ভক্ত-মহিমা সর্ব্ব বেদে গায়॥ ৩॥
কৃষ্ণগত ভক্তগণ, সেবাই তাঁর জীবন,
সেবা ছাড়া কিছু নাহি জানে।
ভক্ত-বৎসল কৃষ্ণচন্দ্র, সেবাসুখে হয়ে মগ্ন,
নিজ হইতে শ্রেষ্ঠ বলি মানে॥ ৪॥
ওহে প্রভু দয়াময়! কিসে তব ভক্তি হয়,
সে উপায় কভু না চিন্তিনু।
গন্ধ, স্পর্শ, রূপ, রস, ইন্দ্রিয়সুখে হই' বশ,
পরমার্থ কভু না ভাবিনু॥ ৫॥
বিষয়সুখে হয় মত্ত, হারাইলাম পরতত্ত্ব,
কৃপা কর বৈষ্ণবঠাকুর।
তব ভক্ত দাসের দাস, তাঁর ভক্তের চরণে আশ,
এ অভিলাষ জাগুক প্রচুর॥ ৬॥

—শ্রীনিত্যপদ দাস ব্রহ্মচারী

॥ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীঝুলনযাত্রা ও শ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে
সাদর আহ্বান

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)

শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ,
পোঃ তুরা, পিন্—৭৯৪০০১
জেলা—ওয়েষ্ট গারো হিলস্ (মেঘালয়)।
ফোন—৩২৬৯১

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন,—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দের উদ্যোগে সমিতির সভাপতি-অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের** আনুগত্যে আগামী ১৩ই শ্রাবণ (ইং ২৯।৭।৯৩), বৃহস্পতিবার হইতে ১৭ই শ্রাবণ (ইং ২।৮।৯৩), সোমবার পর্য্যন্ত পঞ্চদিবসব্যাপী **শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা** ও ২৬শে শ্রাবণ (ইং ১১।৮।৯৩), বুধবার **শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী** উপলক্ষে সমিতির শাখাকেন্দ্র শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, কীর্ত্তন, ধর্ম্ম-সভা, নগর-সঙ্কীর্ত্তন, ছায়াচিত্র ও বিভিন্ন প্রদর্শনীযোগে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলাদি প্রদর্শন এবং বিশেষভাবে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদ-বিহারীজীউর মঙ্গলারাত্রিক, ভোগরাগ ও শ্রীনন্দোৎসব-দিবসে সর্ব্বসাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইবে।

অতএব, ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিয়া সমিতির সেবকবৃন্দকে পরমানন্দিত ও উৎসাহিত করিবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎ-সেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। বিশেষ অনুষ্ঠান-সূচী পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। ইতি—৩২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৪০০।

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য ঃ— কোন বিষয়ে জানিতে হইলে বা আনুকূল্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজের** নিকট উপরিউক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

শ্রীজন্মাষ্টমীর অনুষ্ঠান-সূচী

২৫শে শ্রাবণ (ইং ১০।৮।৯৩), মঙ্গলবার—

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে—যথারীতি মঙ্গলারতি ও কীর্ত্তন।
পূর্ব্বাহ্ণে—শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন।
অপরাহ্ণে—মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন।
গোধূলিলগ্নে—সন্ধ্যারতি ও গীতিকীর্ত্তন।
রাত্রে—শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও অধিবাস-কীর্ত্তন।

২৬শে শ্রাবণ (ইং ১১।৮।৯৩), বুধবার—

মঙ্গলারতি—ভোর ৪টায়।
নগর-সঙ্কীর্ত্তন—মঙ্গলারতি অন্তে প্রাতঃ হইতে পূর্ব্বাহ্ণ ৮টা পর্য্যন্ত নগর-পরিক্রমা।
পূর্ব্বাহ্ণ—৮-৩০টার পর সম্পূর্ণ দিবস শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী হইতে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মলীলাপ্রসঙ্গ পারায়ণ।
সন্ধ্যায়—আরাত্রিক ও শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন।
রাত্রি—৮টা হইতে ধর্ম্মসভা, রামমঙ্গল ও ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শন।

২৭শে শ্রাবণ (ইং ১২।৮।৯৩), বৃহস্পতিবার—

মঙ্গলারতি—ভোর ৪টায়।
পূর্ব্বাহ্ণে—শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন।
মধ্যাহ্নে—ভোগারতি ও মহাপ্রসাদ বিতরণ।
সন্ধ্যায়—আরাত্রিক ও কীর্ত্তনান্তে ধর্ম্মসভা, পরে ছায়াচিত্র-যোগে শ্রীগৌরলীলা প্রদর্শন ও রামমঙ্গল।

বি. দ্রঃ—দৈব ও বিশেষ কার্য্যানুরোধে অনুষ্ঠান-সূচী পরিবর্ত্তনযোগ্য।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষক্সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্‌॥



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪৫শ বর্ষ | ১৩ শ্রীধর, গর্ভোদশায়ী, ৫০৭ শ্রীগৌরাব্দ ৩১ আষাঢ়, শুক্রবার, ১৪০০, ইং ১৬/৭/৯৩ | ৫ম সংখ্যা

সানুবাদং শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস-বিলিখিতম্‌

শ্রীগরুড়-কৃতম্‌ শ্রী শ্রীবদরীনারায়ণ-স্তোত্রম্‌

[শ্রীস্কান্দে বিষ্ণুখণ্ডে বদরীমাহাত্ম্যে চতুর্থোঽধ্যায়ে]

গরুড় উবাচ

১। জয় জয় ত্রিভুবন-জন মনোভবন বিদলিতাঘ-গুণ।
সকল-গীর্ব্বাণ-বন্দিত চরণ-কমল-যুগল-পরিমল-
বহল-রিপু-বন-বিভঞ্জন বিদ্যোতমান্‌ সকল-সুরাসুর-
মুকুটকোটি-বিলসিত নিজপীঠ-কমল নিরসিত-নিজজন-
হৃদয়-তিমির পটল-বহল হিমকর ইব ত্রিবিধ-সন্তাপ-
সন্দোহ-হরণ-চরণ, জগদুদয়-স্থিতি-লয়-বিলাস-বিলসিত-
ত্রিবিধমূর্ত্তি,-কীর্ত্তিফুর্জ্জিতজগদুদয়সন্দোহ দিনকর ইব,

নিজজন-মানস-সরোজ-ষট্‌পদ-বিদিত-সকলবেদ-
বিদ্যোতমান-মানস-নিজজন-মুনিজন-বন্দিতপদ-নখনীর-
পবিত্রকৃত-গীর্ব্বাণ-মুনি-মানস-বন্দিত-চরণরজঃ-
প্রসাদ-সারভূত জগতামধীশ নমস্তে নমস্তে ॥ ১০ ॥

গরুড় বলিল,—হে প্রভো! ত্রিভুবন-স্থিত জনগণের হৃদয়ই আপনার বাসভবন। আপনার গুণে দুরিত-রাশি বিদলিত হয়। যে-সকল দেবতা আপনার চরণ-কমল-যুগল বন্দনা করেন, আপনি তাঁহাদের রিপুরূপ বনরাজি বিভঞ্জন করিয়া থাকেন। আপনি নিয়ত প্রভা-যুক্ত; আপনার পীঠ-কমলে সকল সুরাসুরের কোটি কোটি মুকুট বিলুণ্ঠিত হয়। আপনি শশধরের ন্যায় নিজ ভক্তজনের হৃদয়-তিমির-রাশি বিদূরিত করেন। আপনার চরণে শরণ লইলে আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ তাপ আপনি হরণ করিয়া থাকেন। জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবরূপ আপনার ত্রিবিধ মূর্ত্তি প্রকটিত হন। আপনি আবির্ভূত হইলে দিনকরের উদয়ের ন্যায় নিখিল জগৎ উদ্ভাসিত ও আলোকিত হয়। আপনি স্বীয় ভক্তগণের মানস-সরোরুহের ষট্‌পদ-স্বরূপ, নিখিল বেদবিদ্যা আপনার বিদিত, আপনার মন নিরন্তর বিদ্যোতমান। মুনিগণ আপনার নিজজন, তাঁহারা আপনার পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া স্বদীয় নখর-নীরে আত্মা পূত করেন। আপনার চরণরেণুই আপনার অনুগ্রহের সারভূত জানিয়া সুর-মুনিগণ মনে মনে সেই চরণ-রেণু বন্দনা করেন; আপনি বিশ্বের অধীশ্বর, আপনি জয়যুক্ত হউন, আপনাকে নমস্কার, নমস্কার ॥ ১ ॥

২। অপি চ অষ্টশক্তি-সহিতো বনমালী পীত-চৈল-কুসুমাবলি-
শোভঃ।
পঙ্কজাকর-বিরাজিত-পাদঃ পাতু মামবহিতেন্দ্রিয়বর্গঃ ॥ ১১ ॥

আবার বলি,—যিনি অষ্ট-শক্তি-যুক্ত, যাঁহার গলে বনমালা বিলম্বিত, পীত-বসন ও কুসুমসমূহে যিনি শোভিত, পদ্মাকরে যাঁহার পাদপদ্ম বিরাজিত এবং যাঁহার ইন্দ্রিয়-নিচয় সংযত, সেই জগদীশ আমাকে রক্ষা করুন ॥ ২ ॥

৩। ভক্ত-হৃৎকমল-রাজিত-মূর্ত্তির্দুষ্ট-দৈত্য-দলনোত্থিত-কীর্ত্তিঃ।
বদ্ধসেতু-রবিতাশ্রিত-লোকঃ পাতু মামনুদিনং ভুবনেশঃ ॥ ১২ ॥

ভক্তগণের হৃদয়-পদ্মে যাঁহার মূর্ত্তি নিয়ত বিরাজিত, দুষ্ট দৈত্যদিগের দলনজন্য যাঁহার কীর্ত্তি অভ্যুত্থিত, যিনি সেতু-বন্ধন করিয়াছেন এবং যিনি আশ্রিতের পালক, সেই ত্রিভুবন-পতি আমাকে পালন করুন ॥ ৩ ॥

৪। স্থির-চল-ত্রিবিধ-তাপ-হিমাংশুর্ভাসমান-তরণী প্রতিভাসঃ।
এক এক বহুধা কৃত-বেষো মায়য়াবতু মহামতিরীশঃ॥ ১৩॥

যিনি নিয়ত ও অনিয়ত আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ তাপের হিমাংশু, যিনি স্বীয় প্রতিভায় ভানুর ন্যায় উদ্ভাসিত হন, মায়া এইরূপ বিবিধ বেশ রচনা করিয়া যাঁহার মহিমা প্রকাশ করে, সেই ঈশ আমাকে রক্ষা করুন॥ ৪॥

৫। ভক্তচিন্তনকৃতে কৃতরূপঃ শৈশবেন বহুশাসিতভূপঃ।
বেদমার্গ উরুধা হিতকারী রীতিরীশ-তুরীয়ং গুণশালী॥ ১৪॥

৬। যজ্ঞভুগ্-হৃদয়-বন্ধনকারী বিশ্ব-মূর্ত্তিরবলাংশুক-হারী।
পালনেঽপি মহতাং বহু-দেহো রাস এষ তনুমানবতান্ন॥ ১৫॥

যিনি সত্যরূপ-ধৃত বলিয়া ভক্তগণ যাঁহার চিন্তা করেন, শৈশবেই যিনি বহু অবনীপতিকে শাসন করিয়াছেন, যিনি বেদের পথস্বরূপ, যিনি স্বয়ংরূপে বহু হইয়াছেন, যিনি জগতের হিতকারী, যাঁহাতে এই ঐশীরীতি বিদ্যমান, যিনি তুরীয় অর্থাৎ পরব্রহ্ম, যিনি সর্ব্ব-গুণশালী, যিনি যজ্ঞভুক্, স্বেচ্ছায় যিনি বন্ধন ধারণ করেন, বিশ্বই যাঁহার মূর্ত্তি, যিনি অবলা গোপীগণের বসন হরণ করিয়াছেন, মহীয়ান্‌গণের পালনের জন্য যিনি বহুদেহ ধারণ করেন, রাস-রসিক সেই শরীরধারী হরি আমাদিগকে রক্ষা করুন॥ ৫-৬॥

৭। প্রেমভক্তি-পুরুষৈরুপলভ্যঃ পুরুষঃ কৃত-সমস্ত-নিবাসঃ।
দাস্যবৃন্দহৃষিতো নিজ-দাসঃ প্রেক্ষণৈক-করুণোঽবতু বিশ্বম্॥১৬॥

যিনি প্রেমভক্তিপূর্ণ পুরুষগণের লভ্য, যিনি পুরুষ-রূপে সর্ব্বত্র বাস করেন, যিনি ভক্তগণের সেবাদ্বারা হৃষ্ট হন, যিনি স্বয়ং স্বাধীন, সেই হরি একমাত্র করুণা-কটাক্ষে বিশ্বকে রক্ষা করুন॥ ৭॥

৮। কণ্ঠ-লম্বিত-তরক্ষু-নখাগ্র-ক্রুষ্ট-গোপ-রমণী কুচভারঃ।
লীলয়া যুবতিভিঃ কৃত-বেষঃ শেষ এষ ভবতাদুপশান্ত্যৈ॥ ১৭॥

যাঁহার কণ্ঠে গোপ-রমণীগণের কুচ-ভার ন্যস্ত হয়, যিনি ব্যাঘ্রনখের ন্যায় নখাগ্র-ভাগদ্বারা গোপীদিগের কুচদ্বয় আকর্ষণ করেন এবং যিনি লীলাবশতঃ যুবতী গোপী-গণের সহিত বিবিধ বেশ রচনা করেন, সেই অনন্ত আমাদিগকে ভবতাপ উপশম করুন॥ ৮॥

৯। দণ্ডপাণিরয়মেব জনানাং শাসিতাত্ম-নিয়মোক্ত-হিতানাম্।
পাবনায় মহতামনুশালী বিশ্ব-দুঃখ-শমনো ভবতান্নঃ॥ ১৮॥

যিনি স্বেচ্ছাচার নরগণের শাসনের জন্য দণ্ডধারণ করিয়াছেন, যিনি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির পবিত্রতা রক্ষার্থ আনুকূল্য করেন এবং যিনি বিশ্বের দুঃখ দূর করেন, সেই ঈশ আমাদের ক্লেশ বিনাশ করুন॥ ৯॥

প্রশ্নোত্তর

মহাপ্রসাদ

১। মহাপ্রসাদ কি জড়বস্তু নহে ?

"মহাপ্রসাদ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাম ও শুদ্ধবৈষ্ণব—এই চারিটী এ জগতের মধ্যে চিন্ময় ও চিৎপ্রকাশক।" —জৈঃ ধঃ ৬ষ্ঠ অঃ

২। কেন জগতে মহাপ্রসাদের অবতার হইল ?

"কৃষ্ণ বড় দয়াময়, করিবারে জিহ্বা জয়,
স্বপ্রসাদ-অন্ন দিল ভাই।
সেই অন্নামৃত পাও, রাধাকৃষ্ণ-গুণ গাও,
প্রেমে ডাক চৈতন্য-নিতাই॥"

—'প্রসাদ সেবায়', গীঃ

৩। প্রসাদ-সেবার ফল কি ?

"প্রসাদ-সেবা, করিতে হয়,
সকল প্রপঞ্চ-জয়॥"

—'প্রসাদ সেবায়', শঃ

৪। মহাপ্রসাদের কৃপায় কি লাভ হয় ?

"মহাপ্রসাদের কৃপা যেই জীবে হয়।
শুদ্ধকৃষ্ণভক্তি তা'র মিলিবে নিশ্চয়॥"

—নঃ ভাঃ তঃ ১৩১

৫। প্রসাদে প্রাকৃত-বুদ্ধি করিলে কি হয় ?

"যে-সময়ে আমরা শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে ছিলাম, সে সময়েও অনেক স্মার্ত্ত-পণ্ডিতকে মহাপ্রসাদ-বিষয়ে কুতর্ক করিতে শুনিয়াছি। কেহ বলিতেন,—মন্দিরের মধ্যে মহাপ্রসাদ সেবন করা কর্ত্তব্য ; কেহ বলিতেন, মন্দিরের বাহিরে পঞ্চ ক্রোশ পর্য্যন্ত প্রসাদ সেবন কর্ত্তব্য। কেহ কেহ বা বলিতেন, মহাপ্রসাদ সর্ব্বদা শূদ্রস্পৃষ্ট, মন্দিরের ভিতরে বা মন্দিরের বাহিরে কোথাও সেবন করা উচিত নয়। ঐ শ্রেণীর পণ্ডিতদিগের প্রতি যে-সকল দৈবদণ্ড হইয়াছিল, তাহাও আমরা দেখিয়াছি।" —'শ্রীমহাপ্রসাদে বিতর্ক', সঃ তোঃ ১০৮

৬। ভগবান্‌কে নৈবেদ্য বা ভোগ প্রদান করার আবশ্যকতা কি ? মহাপ্রসাদ গ্রহণেরই বা সার্থকতা কি ?

"The system of ***Mahaprasad*** is not only emblamatic of the superior life of the ***Vaishnavas***, but it is a part of the worship which ordinary theists cannot fully understand. The ordinary men are very much inclined to preserve the superiority of Reason over the intuitive feelings of man towards the God of Love. We must now proceed to show with healthy arguments that our intuitive feelings want us to offer everything we eat to the God of our heart.

We must first examine the arguments of the antagonists. The Rationalist holds that God is Infinite and without wants, and consequently it is foolish to offer eatables to such a Being. It is a sacrilege to offer created things to the Creator and thereby to degrade the Divinity of God into humanity. These are reasonable arguments indeed, and one who has heard them will be certainly inclined to declare to others "Down with the ***Mahaprasad.***" These conclusions, however reasonable, are dry and destructive. They tend to separate us from all connections with God in the form of worship. When you say that the Infinite wants nothing. You forbid all contemptation and prayer. The Infinite does not want your grateful expressions or, in other words, flattery, Utter a word to the Unconditioned and you are sure to degrade Him into a conditioned Being. Hymns, prayers and sermons are all over ! shut your tempie-door and the church-gates, because owr Rationalist has advised you to do so. Believe a creating principle and you have done your duty ! Oh ! what a shame ! What a dreadful fall ! Theists, beware of these degrading principles !

Now the Rationalist appears in another shape and admits prayers, sermons, psalms and church-going, saying that these things are wanted for the improvement of the soul, but God dose not want them at all. We are glad that the Rationalist has come towards us and will make further approaches in course of time.

Yes, the progressive Rationalist has admitted a very broad

principle in Theology, viz, whatever we do towards God is for owr own benefit and not for the benefit of God, who is not in want of any such thing. But the Rationalist is a Rationalist still and will Continue to be so, as long as he will seek self-interest. We know for certain that Religion promises to give eternal felicity to man and it is impossible to conceive of any Religion which has not at its bottom self-interest, This view, however, smells of Utilitarianism and can never claim to be Theistic. We must love God for God's sake however unreasonable our action may be. Our love must be without any object whatever that concerns ourselves. This love must be a natural emotion to the Deity as our Lover without inference or experience. Salvation, dear as it is, should not be the object of this love ; what then about other shapes of felicity ? "Love to God" is its own reward. Salvation as a concomitant consequence, must be a hand-maid of Love, but we must not look on it as its main object. If the Rationalist be prepared to believe this, he becomes a Theist of the *Vaishnava* class ; but the mere assuming of the name is of no consequence. Though fully aware that the Unconditioned has no conditions whatever, yet our holy and sweet principle of love takes a quite different view of the matter Reason says one thing but Love prescribes its contrary. Reason tells me that God has no sorrow, but Love sees God in tears for those of His sons that are misled to evil. Reason tells me that the strict laws of God reward and punish me in a cold manner but Love reveals that God slackens His laws to the Repentant soul ! Reason tells me that with all his improvements, man will never touch the Absolute God ; but Love preaches that on the conversion of the soul into a state of spiritual womanhood, God, Unconditioned as He is, accepts an eternal marriage with the conditioned soul of man ! Reason tells me that God is in Infinite space and time, but Love describes that the All Beautiful God is sitting before us like a respected relative and enjoying all the pleasures of society.

As a father in his amusements with his young children, God is spreading all sorts of delicious food all over the earth and expecting that His sons would gather them for their own benefit ; but the loving children out of their holy and unmixed love, gather all the scattered blessings and without the exercise of reason in consequence of a strong feeling of love, offer all the blessings to the Father whom they love more than their lives. The Father again, in reply to their kind feelings, gives back the blessings to the children and tells them these kindlier words. "O ! My children ! These are blessings intended for you ! Out of your natural love you bring them to me for my enjoyment ; but I have naturally no wants to supply. But then I have accepted that part of your offering which corresponds with me viz. your unmixed love and disinterested affections for which alone I am exceedingly anxious. Take back these sweet things and enjoy them." This process of disinterested love, which dry reason can never brook, sanctifies the food we take, and leaves us to harmless enjoyment for all the days of our natural life ! This is a system of sincere worship which Theists of a higher class alone can act upon. We connot express the joy we often felt when we took the holy *Mahaprasad* in the temple ! The holiness we attach to it is its sweetness and often pray that all men may enjoy it." — *The Temple of Jagannath at Puri*

—জগদ্‌গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

হরিভজন ব্যতীত জীবের কোন কর্ত্তব্য নাই, যে যে অবস্থায় থাকে থাকুক, তাদের আর অন্য সাধনপ্রণালী কিছুই নাই। সাধন একমাত্র শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন। "বহুভির্মিলিত্বা যৎ কীর্ত্তনং তদেব সঙ্কীর্ত্তনম্"—বহুলোক একত্র হইয়া যে কীর্ত্তন, তার নাম সঙ্কীর্ত্তন। যারা শ্রৌতপথ আশ্রয় করেছেন, তাদের সহিত যদি কীর্ত্তন করি, তবেই হরিসঙ্কীর্ত্তন হবে। লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার জন্য যে কীর্ত্তনের অভিনয়, তা হরিকীর্ত্তন নয়—উহা মায়ার কীর্ত্তন।

আমরা যদি হরির সত্যি সত্যি সেবক বা কীর্ত্তনকারীর সঙ্গে যোগ দেই, তবে আমাদেরও সঙ্কীর্ত্তন হবে। সংশ্রবণ হলে সঙ্কীর্ত্তন হবে। সম্যগ্‌রূপে কীর্ত্তন করাই আমাদের আবশ্যক। কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তনকারীর সহিত যে-কাল পর্য্যন্ত কীর্ত্তন না করি, সে-কাল পর্য্যন্ত মায়া আমাকে নানাভাবে বঞ্চনা করে থাকে।

খাওয়ার কোন আবশ্যকতা নাই, পান করার কোন আবশ্যকতা নাই, যদি কৃষ্ণভজন না করি। মনুষ্যজন্মলাভের যে যোগ্যতা হয়েছিল, সেটীও না হওয়া ভাল ছিল—যদি হরিভজন না হয়। যদি পশুর ন্যায় খাওয়া-দাওয়া, বিলাস প্রভৃতিতে মানুষের জীবন কেটে যায়, তাহলে যে যোগ্যতা লাভ হয়েছিল, সেটী ত' হারান হলই, তাছাড়া জন্ম-জন্মান্তরের অত্যন্ত অসুবিধার মধ্যে পড়তে হল। 'কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে আইনু।' পশুরা মানুষ হয়—হরিভজন করবার জন্য।

সঙ্গই মানব-জীবনের প্রধান হরিভজনের বৃত্তি। অবৈষ্ণব-সঙ্গক্রমে জীবের সংসারে উন্নতি হয়, আর সাধুসঙ্গ-প্রভাবে আত্মা উত্তরোত্তর হরিসেবায় প্রমত্ত হয়। মানব-জীবনে উহা একটী সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন। সুতরাং তাহাতে বিমুখ হওয়া উচিত নয়। যেখানে হরিকথা নাই, সেস্থান যতই আত্মীয়-স্বজন বেষ্টিত হউক না কেন, যতই বাসের সুবিধাজনক হউক না কেন, সেইসকল স্থান বা তাদৃশ জনসঙ্গ নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় বোধ হয়। শ্রীগৌড়ীয় মঠে সর্ব্বদাই হরিকথা ও সকলেই হরিসেবায় প্রমত্ত। তাঁহাদের সঙ্গ আমাদের সর্ব্বতোভাবে বরণীয়। ভগবানের পরীক্ষার স্থল এই পৃথিবী অর্থাৎ সংসার। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলে হরিজনগণের কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে হয়।

শ্রীহরিনাম গ্রহণ ও ভগবানের সাক্ষাৎকার—দুই একই। শ্রীনাম সাক্ষাৎ ভগবান্। কেবল সাংসারিক চক্ষে ভগবানের নাম ও ভগবান্ পৃথক্ বোধ হয়। সকল সঙ্গরহিত হইয়া সর্ব্বদা নিরপরাধে সংখ্যাপূর্ব্বক সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিতে হইবে।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাবলে ভজনের বাধা বাস্তবিক অপসারিত হয়। ভজনের বাধা বাস্তবিক অপসারিত হলে সুবিধা হয়। গুরুমুখে—সাধুগণের নিকট হতে শ্রবণ হয়। তাঁদের নির্দ্দেশমত পাঠাদি-কার্য্যও শ্রবণের অন্তর্গত। নতুবা বিপথগামী হয়ে কখনও সৎকর্ম্মের গাধা হয়ে যাই, প্রচুর পরিমাণে নীতিবাদী হবার যত্ন করি, আইন-কানুন বাঁচিয়ে চলি, আবার কখনও নির্ব্বিশেষ ভাব গ্রহণ করে অলসতা সাধন করি। শ্রবণ-কীর্ত্তনের অভাব হলেই এই দুর্গতি হয়।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম হতে একমুহূর্ত্তের জন্য বিচ্যুত হলে এরূপ অসুবিধা অনিবার্য্য। বিশ্রম্ভের সহিত সর্ব্বদা শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবনই একমাত্র কৃত্য।

হরিকথা শ্রবণ করতে করতে যদি কোন ব্যক্তি অপক্কদশায় স্খলিত বা মৃতও হন, তথাপি তাঁর অমঙ্গল ঘটে না। আর হরিকথা পরিত্যাগ করে যম-নিয়মাদি চেষ্টায় সমাধি প্রভৃতি প্রাপ্ত হলেও তার প্রকৃত মঙ্গল লাভ হতে পারে না। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে আত্মবৃত্তি ভক্তিতে প্রবিষ্ট হয়েও যদি কোন ব্যক্তি প্রপঞ্চে থাকাকালে দুর্ভাগ্যক্রমে ভজনপরিপাকের পূর্ব্বেই ভজন হতে কোনপ্রকারে ভ্রষ্ট বা মৃত্যুগ্রস্ত হয়, তথাপি আংশিক স্বরূপোদ্বোধন-জন্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় সেবাবাঞ্ছা থাকায় তার কোন অমঙ্গল হয় না।

ভগবান্‌কে কেন্দ্র করে আমাদের সকল কাজ করতে হবে। আমরা ভগবানের ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য সকল চেষ্টা করব—আকাশ-পাতাল আলোড়ন করব—প্রবল উৎসাহের সহিত ভগবানের সেবাসাধন করব। ভগবানের অবশেষ ব্যতীত—ভগবানের ভক্তের অবশেষ ব্যতীত যা কিছু গ্রহণ করি, তা স্থূল-পদার্থ হলে বিষ্ঠা এবং তরল-পদার্থ হলে মূত্রস্থানীয় হয়। প্রসাদ-গ্রহণ ব্যতীত অন্য বস্তু গ্রহণে অসুবিধা আনয়ন করে।

সাধুদিগের শ্রীমুখকথিত বার্ত্তা যিনি কাণ পেতে শ্রবণ করেন, তাঁরই মঙ্গল হয়। যদি আমাদের এমন সৌভাগ্য হয় যে, আমরা ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ পাই, তাহলে সেই সুযোগ করে দেওয়ার একমাত্র মালিক—কৃষ্ণচন্দ্র। গুরুর হাত দিয়ে তিনি বরাভয়প্রদ ব্যাপারটাকে প্রদান করেন। যাঁদের কপালের জোর আছে, তাঁরা এই সুবিধাটা পান। যিনি যেরূপ শরণাগত হন, তাঁর নিকট তদুপযোগী গুরুপাদপদ্ম উপস্থিত হন।

ভগবান্ যেরূপ সেব্য, তদপেক্ষা অধিকতর সেব্য ভগবানের সেবক-সম্প্রদায়। যাঁরা কায়-মনো-বাক্যে ভগবানের সেবা করেন, তাঁরা বিষয় ও আশ্রয়বিগ্রহের যুগপৎ সেবাই করে থাকেন। কার্ষ্ণসেবার সহিত আত্মপ্রতীতির সর্ব্বতোভাবে সংযোগ আছে। যাঁদের তা নাই; তাঁরা গুরুপাদপদ্মসেবা বুঝতে পারেন না। শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা করবার পূর্ব্বে গুরুসেবা, সেই গুরুসেবা সপার্ষদ গুরুসেবা। সর্ব্বাপেক্ষা পূজ্য—ভগবান্, আর সেই ভগবানের পূজার বা প্রেমের পাত্র প্রেমিক ভগবদ্ভক্ত। সেই ভক্তের অগ্রণী—গুরুপাদপদ্ম। ভগবান্ যাঁর পূজা করে থাকেন, সেই ভক্তের পূজা নিশ্চয়ই সবচেয়ে বড়। জীবনব্যাপি' ভগবানের পূজা করতে ইচ্ছা সর্ব্বক্ষণ দেখাচ্ছেন যিনি, তিনিই শ্রীগুরুপাদপদ্ম। সমগ্র জগৎ সেই গুরুপাদপদ্মের প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব। প্রত্যেক রেণু-পরমাণুতে গুরুর সম্বন্ধ

পরিস্ফুট। শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করতে হলে আমরা নির্ম্মোহ, নির্গুণ ও অশোক হতে পারি। যদি আমরা নিষ্কপটে প্রাণভরা আশীর্ব্বাদ-প্রার্থী হই, তাহলে শ্রীগুরুপাদপদ্ম অমায়ায় সর্ব্ববিধ মঙ্গল দান করেন।

বিষ খেয়ে মরে যাওয়া ভাল, তথাপি কৃষ্ণেতর বিষয়ী ও বিষয়ের সঙ্গ করা উচিত নয়। হরিভজন আরম্ভ করে যে ব্যক্তি বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে, তার সর্ব্বনাশ হয়ে গেল।

সাধুগণের একমাত্র কর্ত্তব্য—জীবের যে-সকল সঞ্চিত দুষ্টবুদ্ধি আছে, তা ছেদন করে দেওয়া। ইহাই সাধুগণের অকৃত্রিম অহৈতুকী বাঞ্ছা।

যাঁরা সরল, অমল, তাঁদেরই সঙ্গ করব; অপরের সঙ্গ করব না। দুঃসঙ্গকে আমাদের সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জন করতে হবে।

চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত

চারি বর্ণাশ্রমীর পক্ষেই চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত-ব্যবস্থা

এই বৎসর শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি বর্ত্তমান ১৯শে আষাঢ়, ৪ঠা জুলাই, রবিবার আষাঢ়ী পূর্ণিমা হইতে ১৩ই অগ্রহায়ণ, ২৯শে নভেম্বর, সোমবার কার্ত্তিকী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালন করিতেছেন। সমিতির প্রধানকেন্দ্র নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ ও তদধীনস্থ অপরাপর মঠসমূহের সভ্যগণ এবং আশ্রিত গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ সকলেই ঐ দিবস হইতে উক্ত ব্রত পালন আরম্ভ করিয়াছেন। চৌষট্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে ইহা উল্লিখিত না হইলেও শ্রীমন্মহাপ্রভু পুরী, শ্রীরঙ্গম্ ইত্যাদি স্থানে অবস্থানকালে স্বয়ং চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালন করিয়া জগজ্জীবকে এই ব্রতোদ্‌যাপনের প্রয়োজনীয়তা-বিষয়ে শিক্ষা দিয়াছেন। এই ব্রত কেবল গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পালনীয় এরূপ নহে, পরন্তু কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, স্মার্ত্তানুগামী সকলের পক্ষেই ইহা বিশেষ মঙ্গলজনক। এই ব্রত বৈধভক্তির অন্তর্গত হইলেও সাধক-জীবনে সকলের পক্ষেই ইহা অবশ্যই পালনীয়। পরমমুক্তপুরুষ মহাভাগবত মহাজনগণও অনুরাগের সহিত এই চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালন করেন ও ভগবৎ-প্রীতির অনুকূল জ্ঞান করিয়া থাকেন।

ব্রত-পালনের আবশ্যকতা ও নিয়ম

ভবিষ্যপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে,—

যো বিনা নিয়মং মর্ত্ত্যো ব্রতং বা জপ্যমেব বা।
চাতুর্ম্মাস্যং নয়েন্মূর্খো জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিয়ম, ব্রত, কিংবা জপ ব্যতিরেকে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতাচরণ করে, সে মূর্খ ও জীবিতাবস্থায়ই মৃততুল্য। সুতরাং বিনা নিয়মে উচ্ছৃঙ্খলভাবে খেয়াল-খুশীমত এই ব্রত পালন করিলে তাহাতে মঙ্গলের কোন সম্ভাবনা নাই। গীতাশাস্ত্র জানাইয়াছেন,—কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয়ে অসমর্থ হইলে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ। অতএব সেই শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন বা পরিত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাচারী হইলে সাধকের সাধনে সিদ্ধি ও চরমে পরাগতি লাভ হয় না।

"হে দেব! শ্বেতদ্বীপের মধ্যে ফণা-মণি-সুশোভিত শেষ-রূপ পর্য্যঙ্কে আপনি সুখে নিদ্রালাভ করুন, আপনাকে নমস্কার। হে জগন্নাথ! আপনি শয়ন করিলে এই জগৎ সুপ্ত হয় এবং আপনার জাগরণে সমস্ত জগৎ জাগরিত হয়। হে অচ্যুত! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন"—চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতী ব্যক্তি এইরূপ প্রার্থনাপূর্ব্বক প্রভুর অগ্রে **"কৃষ্ণভক্তিবৃদ্ধির নিমিত্ত"** চারিমাসে কর্ত্তব্য-কর্ম্মের নিয়ম গ্রহণ করিবেন।

ব্রতের কাল-নির্ণয়

'একাদশ্যাস্তু' গৃহ্নীয়াৎ **'সংক্রান্তৌ কর্ক্কটস্য'** তু।
'আষাঢ্যাং' বা নরো ভক্ত্যা চাতুর্ম্মাস্যোদিতং ব্রতম্॥

মানবগণ ভক্তিসহকারে **শয়ন একাদশী** অথবা **আষাঢ়ী পূর্ণিমা** কিম্বা **কর্ক্কট সংক্রান্তিতে চাতুর্ম্মাস্য-বিহিত ব্রত ধারণ করিবেন।** বৎসরের চারিমাসকাল এই নিয়ম অবশ্য কর্ত্তব্য।

চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতে বিধি-নিষেধ

শ্রাবণে বর্জ্জয়েচ্ছাকং, দধি ভাদ্রপদে তথা।
দুগ্ধমাশ্বযুজে মাসি, কার্ত্তিকে চামিষং ত্যজেৎ॥

চাতুর্ম্মাস্যের প্রথম মাস শ্রাবণে শাক, দ্বিতীয় মাস ভাদ্রে দধি, তৃতীয় মাস আশ্বিনে দুগ্ধ এবং চতুর্থ মাস কার্ত্তিকে আমিষ পরিত্যাজ্য। ধর্ম্মনিরত যাঁহারা স্বভাবতঃই আমিষ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে এস্থলে 'মাষকলাই' আমিষ বলিয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে। কালোচিত ফল-মূল—যাহার আস্বাদনে লোভ উপস্থিত হয় ও হরিবিস্মৃতি ঘটে এবং যাহা সেবা করিলে জড়বস্তুতে অতিরিক্ত অভিনিবেশ হয়, তাহা চাতুর্ম্মাস্যে বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতকালে নিষ্পাব বা সিম, রাজমাস বা বরবটী, কলিঙ্গ বা ইন্দ্রযব, পটোল, বৃন্তাক বা বার্ত্তাকু ভক্ষণ নিষিদ্ধ। সাদা বেগুন বা সাহেব বেগুন অশুদ্ধ-বিধায় সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। এতদ্ব্যতীত লাউ, পুঁই, কলমীশাক প্রভৃতি চারিমাসকাল বর্জ্জনীয়। মসুর, লশুন, পলাণ্ডু, গাজর, চিচিঙ্গা ইত্যাদি আমিষজাত দ্রব্য সর্ব্বকালেই বৈষ্ণবের পক্ষে পরিত্যাজ্য।

সমর্থবান্ ব্যক্তি তৈল, লবণ, মধু, পুষ্পোপভোগ এবং কটুম্লাদি সকল রস পরিত্যাগ করিবেন। চাতুর্ম্মাস্যে তাম্বূলাদি অনাবশ্যকীয় বিলাস-সামগ্রী এবং তামাক, গাঁজা প্রভৃতি কলি-সহচর মাদকদ্রব্য পান সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ। সাধারণ ব্রতীপক্ষে সুরা, মধু, মাংস প্রভৃতি পরিবর্জ্জনীয়। নখ-লোমাদির ক্ষৌরকার্য্য হরিশয়নে করিতে নাই। ক্ষৌরকার্য্যে ভদ্রতা বা বিলাসিতা উপস্থিত হয়। লবণ বর্জ্জন করিলে মধুর স্বর, তৈলমর্দ্দন পরিত্যাগ করিলে সুন্দর স্বাস্থ্য, কটুম্লাদি ত্যাগে সুরূপ, তাম্বূল পরিত্যাগ করিলে নির্ম্মলতা লাভ ও সুখী হয়। ভূমি বা প্রস্তরে শয়ন করিলে বিষ্ণুর অনুচর হওয়া যায়। মধু ও মাংস বর্জ্জনে মুনি ও যোগী এবং সুরা ও মদ্য বর্জ্জনে নীরোগ ও তেজস্বী হয়। নখ ও লোম (কেশ) ধারণ করিলে দিনে দিনে গঙ্গাস্নানের ফল লাভ হয়। যোগী হইলে বাক্‌সিদ্ধ এবং বিষ্ণু-মন্দিরে গীত-বাদ্য করিলে ভগবৎপার্ষদত্ব লাভ হয়।

ব্রতকালে সমর্থবান্ ব্যক্তি একবার মাত্র প্রসাদ পাইবেন, প্রত্যহ স্নান করিবেন, হরিনিষ্ঠ হইয়া চারিমাসকাল বিশেষ যত্নের সহিত শ্রীহরির অর্চ্চন-পূজাদি কর্ত্তব্য। হরি-শয়নকালে বিলাস-শয্যাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক ভূমিশায়ী হইলে ভগবান্ অধিক প্রীত হন। চারিমাস হরিকথা কীর্ত্তনের নিয়ম গ্রহণ করিলে অব্যক্তবাক্‌বেগ পরিত্যাগরূপ মৌনব্রতের বাস্তব-ফল লাভ করা যায়। ভূমিতে ভোজন করিলে হরিসেবানুকূল দৈন্য উপস্থিত ও ভজনের সুষ্ঠুতা লাভ হয়। অনুকূল-জ্ঞানে ভক্তের পক্ষে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতবিধি ভজনের সহায়ক সন্দেহ নাই। কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে ভোগ ত্যাগ ও তদর্থে অখিল চেষ্টাই ভক্তের একমাত্র কাম্য। শ্রীহরিসেবার অনুকূল বিষয় ভক্তের পক্ষে সর্ব্বদাই গ্রাহ্য। জড়াভিনিবেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক সংযত হইয়া সর্ব্বতোভাবে হরিকীর্ত্তন বা কৃষ্ণসেবাতৎপর হওয়াই চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত-বিধি শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ১৫শ বিলাসের ৫৯ সংখ্যা হইতে ৭৩ সংখ্যা পর্য্যন্ত বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এ বৎসর চাতুর্ম্মাস্যকালে পুরুষোত্তম-মাস প্রবেশ করায় ৫মাস যাবৎ ব্রতকাল। এ সম্বন্ধে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ৪৩শ বর্ষ, ৪৩ ও ৮৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত "শ্রীপুরুষোত্তম-মাস-মাহাত্ম্য" ও "শ্রীপুরুষোত্তম-মাস-কৃত্য" প্রবন্ধ আলোচ্য। আগামী সংখ্যায় 'চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত' সম্বন্ধে আরও আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

বর্ত্তমান ভারতের শাস্ত্রানাদর

'শাস্ত্র'-শব্দের অর্থ—যাহা মানবসমাজকে শাসন করে। ইহা অন্যায় আচরণ ও প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করাইয়া ন্যায় ও সৎ প্রবৃত্তিতে স্থাপনকারী অনুশাসনবাক্য। ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাটব-বিপ্রলিপ্সাদি দোষমুক্ত ত্রিকালদর্শী ঋষিগণ এবং ভগবান্ ইহার স্রষ্টা। ইহা সকলপ্রকার জীবের প্রতি প্রযোজ্য নহে। মনুষ্য ব্যতীত মনুষ্যেতর প্রাণীর প্রতি ইহার প্রয়োগ বা সার্থকতা নাই; যেহেতু মনুষ্যেতর প্রাণীর কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়তর্পণের উপযোগী ধারণা ও বুদ্ধি ব্যতীত ইন্দ্রিয়তর্পণ হইতে নিবৃত্তি-জনিত ফলের বিচার ও প্রয়োজনীয়তা ধারণা করিবার যোগ্যতা সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে লাভ করে নাই। তাহাদের কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়তর্পণই জীবনধারণের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে এবং ইন্দ্রিয়তর্পণ-কার্য্যটীও অতি উন্নতমানে তাহাদের দ্বারা সাধিত হয় না। মনুষ্যগণ ও তদূর্দ্ধ্বজীবগণ পশুপক্ষ্যাদি অপেক্ষা উন্নতপ্রথায় ইন্দ্রিয়তর্পণ-সুখ ভোগ করিবার অধিকারী। এই কারণে সাধারণ মনুষ্যগণ মনুষ্যেতর পশুপক্ষী প্রভৃতি জীব অপেক্ষা নিজদের শ্রেষ্ঠ প্রাণী বলিয়া অভিমান করে এবং এই ভোগপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার অনুকূল শাস্ত্রবাক্যগুলিকে স্বীকার ও আচরণ করিয়া থাকে। এইজন্য তাহারা অন্যের উপকার, ত্যাগস্বীকার, দান ও দেবতাগণের উপাসনাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে। সকলে সমাজ বা দলবদ্ধ হইয়া বসবাস করে। সমাজ, দল বা দেশগত ও বিশ্বগত প্রচেষ্টা এই ইন্দ্রিয়তর্পণকে কেন্দ্র করিয়াই চলিতেছে। সমষ্টিগত ইন্দ্রিয়তর্পণই সমাজসেবা বলিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণকামী মনুষ্যগণ বিবেচনা করে। সমগ্র বিশ্বে এই প্রকার চিন্তাস্রোত স্বাভাবিকভাবে বর্ত্তমান। যাহারা মূর্খ তাহারাই যে কেবলমাত্র এই পথের পথিক তাহা নহে, তাহাদের প্রতিষ্ঠিত তথাকথিত শিক্ষাকেন্দ্রগুলিরও অবদান ইহা ব্যতীত নিত্যমঙ্গল-বস্তুকে প্রদান করিতে সমর্থ নহে। বর্ত্তমান পরমুখাপেক্ষী ভারতের পৃথিবীর তথাকথিত শ্রেষ্ঠ বিদ্যামন্দিরের উচ্ছিষ্ট ভোজনদ্বারা যাহা কিছু পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার পরিণতি যে অতীব ভয়াবহ হইতেছে, তাহা সুধী ও শাস্ত্রবিদ্‌গণ প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া মর্ম্মাহত। যে ভারতের শাস্ত্রশিক্ষা সত্য, ন্যায়, শান্তি ও সমৃদ্ধিকে একদা সমস্ত বিশ্বকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে, আজ সেই ভারত ত্রিকালদর্শী, সত্যদ্রষ্টা, অপরোক্ষ অনুভূতিবিশিষ্ট আর্য্যঋষিগণ-প্রবর্ত্তিত শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়া আপাত ইন্দ্রিয়তর্পণকর বিচারকে বহুমানন করত সমাজ গঠন ও সংস্কার করিয়া কিরূপ ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়াছে তাহা বুঝিয়াও তাহা পরিত্যাগ করিতে নিরুপায় হইয়া পড়িয়াছে। পাশ্চাত্ত্য মোহাচ্ছন্ন বর্ত্তমান

ভারত ইন্দ্রিয়তর্পণকে মুখ্য প্রয়োজন-বিচারে ঋষিগণ-প্রবর্ত্তিত শাস্ত্রকে নিরর্থক, মিথ্যা, হেয়, পরিবর্জ্জনীয় ও সমাজের অনিষ্টকারক বলিয়া বিবেচনা করত পরিবর্ত্তনশীল কালোপযোগীরূপে তাহাকে উৎসাহিত ও রূপায়িত করায় যে পরিণাম প্রকাশ পাইয়াছে ও পাইতেছে, তাহা মর্ম্মন্তুদ নহে কি? পাশ্চাত্ত্যধারায় সমাজকে গঠন করিয়া যে উচ্ছৃঙ্খলতার সম্মুখীন এবং জনজীবন বিপদাপন্ন, তাহা কি অস্বীকার করা যাইবে?

ইন্দ্রিয়তর্পণকর পাশ্চাত্ত্য-মোহাচ্ছন্ন বর্ত্তমান ভারতবাসী তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ ও সত্যদ্রষ্টা, ত্রিকালজ্ঞ ঋষিদিগকে কি-প্রকারে হেয় প্রতিপন্ন করিতেছে তাহা সহজেই অনুমেয়। কালের পরিবর্ত্তনে সবকিছুরই পরিবর্ত্তন প্রয়োজন—ইহা ত্রিকালজ্ঞ ঋষি-সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইতে পারে না। কেন না, তাঁহাদের দিব্যদর্শনে বর্ত্তমানকালের শোচনীয় অবস্থাও তাঁহারা সম্যক্ অবহিত ছিলেন, তাহা শাস্ত্র-পাঠে তাঁহাদের বর্ণনায় পরিস্ফুট। বর্ত্তমানকালের অবস্থা সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানবান্ হইয়াই বর্ত্তমানকালের পরমমঙ্গলজনক—কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক, কি পারমার্থিক সর্ব্ববিষয়েই তাঁহারা কালোপযোগীরূপেই ব্যবস্থা দিয়াছেন। তাঁহাদের উপর কলম চালাইলে মূর্খতাই প্রকাশ পায়।

"কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥
কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥ (ভাঃ ১২।৩।৫১-৫২)
ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবম্॥ (বিষ্ণুপুরাণ)
কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞা সারভাসিনঃ।
যত্র সংকীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বস্বার্থোঽপি লভ্যতে॥ (ভাঃ ১১।৫।৩৬)

শাস্ত্রের এই বাক্যগুলি তাঁহাদের সার্ব্বকালিক ধারণা বা জ্ঞানের প্রমাণ নহে কি? কলিকালকে তাঁহারা 'দোষনিধি' বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। অর্থাৎ কলিকালের দোষের ইয়ত্তা নাই, সমুদ্রের ন্যায় সীমাহীন। সাধারণ মায়াবদ্ধ মনুষ্যের ঐ অসীম দোষসমূহের ধারণা নাই বা হইতে পারে না; কিন্তু আমাদের শাস্ত্রকারদিগের ঐ সকল অপার দোষেরও জ্ঞান বা ধারণা সম্যক্‌রূপে ছিল এবং তাহার প্রতিকার বা তাহা হইতে রক্ষা কিরূপে সম্ভব তাহাও তাঁহাদের অবিদিত ছিল না। প্রতিকারস্বরূপে তাঁহাদের ব্যবস্থা—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন। বৃহন্নারদীয় পুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

এই বাক্যে স্পষ্ট ও সুনিশ্চিতভাবে নির্দ্দেশ-জন্য তিন তিনবার করিয়া বিধি ও নিষেধের উল্লেখ করা হইয়াছে। বিধিস্বরূপে শ্রীহরিনামকীর্ত্তনকে তিনবার উক্তি এবং এতদ্ভিন্ন অন্যপথে অর্থাৎ যত মত তত পথে, গতি অর্থে রক্ষা নাই বুঝাইতে 'নাস্ত্যেব' পদটীরও তিনবার উল্লেখ রহিয়াছে। সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের ব্যবস্থায় কলিকালের সার্ব্বিক পরিস্থিতি এবং তাৎকালিক দুঃখ-দুর্দ্দশা হইতে পরিত্রাণের উপায়ও তাঁহাদের বিদিত থাকার পরিচয় প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহাদের অজ্ঞতা ছিল না বলিয়াই কালোপযোগী প্রতিকারোপায়ও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পরন্তু আমরা তাঁহাদিগকে অজ্ঞ সাব্যস্ত করিয়াই তাঁহাদের নির্দ্দেশ গ্রাহ্য করি না এবং আমাদের অদূরদর্শী, খণ্ড ও ভ্রান্ত বিচারকে সত্যজ্ঞানে প্রতিকারের নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিতেছি। ঋষিদের উপদিষ্ট উপায়কে অনাদর ও কার্য্যকরী নহে, পরন্তু সমাজের ক্ষতিকারক বলিয়া বিবেচনা করত পাশ্চাত্ত্য বিচারকে বহুমানন করিয়া বর্ত্তমান শিক্ষাকেন্দ্রগুলিদ্বারা তাহার প্রচার ও পরিবর্ত্তন সাধন করা হইয়াছে ও হইতেছে। স্ত্রী-পুরুষের বেশভূষায়, কথাবার্ত্তায়, খাদ্যব্যবস্থায়, আচার-বিচারে, রীতি-নীতিতে, সামাজিক ক্রিয়াকলাপে, মানসিকতায়, ধর্ম্মবিষয়ে ও পারমার্থিকতায়—সর্ব্বত্রই পাশ্চাত্ত্য বিচার ও প্রথার প্রবর্ত্তন করত বর্ত্তমান ভারত উন্নত হইয়াছে ও হইতেছে বলিয়া বিচার করিতেছে। পূর্ব্বপুরুষগণ অজ্ঞ ছিলেন, তাঁহাদের আচরিত রীতি-নীতি তাৎকালিক মঙ্গলজনক থাকিলেও কালের পরিবর্ত্তন-হেতু বর্ত্তমানকালে তাহা অনুপযোগী বিবেচনা করত তাহাকে পাশ্চাত্ত্য ব্যবস্থায় রূপায়িত করা হইয়াছে ও হইতেছে। প্রাচীন গুরুগৃহের স্থলে ইংরাজী বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। শিক্ষার বাহকরূপে সংস্কৃত ভাষাস্থলে ইংরাজী ভাষার প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে, আসবাবপত্র বিচারে পাশ্চাত্ত্য চেয়ার, টেবিল, কাঁটা-চামচের প্রচলন হইয়াছে, খাদ্যাদির মর্য্যাদায় স্নিগ্ধ-সাত্ত্বিক স্থলে উগ্র-তামসিক অমেধ্য পেঁয়াজ, রসুন, হাঁস-মুরগীর ডিম ও মাংস, চপ, কাটলেট প্রভৃতিকে পুষ্টিকর ও রুচিকর বলিয়া সমাদৃত হইতেছে, সামাজিক বিবাহাদি কার্য্যে শাস্ত্রীয় প্রথার বিলোপ করত রেজিষ্ট্রি ও অসবর্ণ-বিবাহ বিহিত হইতেছে, শিক্ষিত ও ধনবান্ সমাজে 'হনিমুন' প্রথাকে আবশ্যিক করিয়া তুলিয়াছেন, পৈত্রিক বা গোত্রীয় শ্রাদ্ধাদিতে অনাদর, তৎস্থলে 'ম্যারেজ এনিভারসারি'তে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ পাইয়াছে, আভিজাত্য-বিচারে দেবসেবা পরিত্যাগ করত "ফাংশন ও পার্টী" প্রভৃতি অনুষ্ঠান বিশেষরূপ সমাদরের বিষয় হইয়াছে। বেশভূষা ও

কেশবিন্যাসে দুশ্চরিত্র নট-নটীগণই আদর্শ ; রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি শাস্ত্রীয় মুনি-ঋষি ও সতী-সাবিত্রীতে অরুচি জন্মিয়াছে। পতিভক্তি ও অবগুণ্ঠনপ্রথা সমাধিলাভ করিয়াছে। পিতামাতার রুচি-বিচারে দেখা যায়—শিশুপুত্রকন্যাকে পাশ্চাত্ত্যপ্রথায় হাত নাড়িয়া 'টাটা' করিতে ও 'ডাডি', 'মাম্মি' বলিতে শিক্ষাদান এবং অতি শৈশব হইতে তাহাকে কোট, প্যাণ্ট, নেকটাই পোষাক-পরিচ্ছদে ভূষিত করিয়া নিজদের ধন্যজ্ঞান করিতেছেন। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়িয়া সাহেবী কায়দায় কথাবার্ত্তা না বলিতে পারিলে প্রকৃত মানুষ হওয়া যায় না বলিয়া তাঁহারা বিচার পোষণ করেন। 'একবার টাটা ক'রে দাও ত' বাবা' না শিখাইয়া "হরে কৃষ্ণ বলত' বাবা" শিক্ষা দিতে কোন পিতামাতাকে বর্ত্তমানকালে দেখা যায় না। "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"— এইটীকে মহামন্ত্র বলা হয় ; ইহাতে ঋষি ও ভগবানের অলৌকিক শক্তি সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। ইহা শব্দসামান্য নহে। ইহা কেবলমাত্র সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীর জন্য নহে, ইহা জীবমাত্রেরই সর্ব্বোত্তম মঙ্গলপ্রদ। ইহা সর্ব্বদেশীয়, সর্ব্বকালীয় ও সর্ব্বজাতীয় পরম কল্যাণপ্রদ আর্ষ-ব্যবস্থা। বর্ত্তমান ভারতীয় বিদ্যালয়গুলিতে ইহার প্রবর্ত্তন না করিয়া "জনগণমন অধিনায়ক হে" আবৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া ভারতীয় চরিত্রের দুর্ব্বলতা, ভীরুতা ও সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণের প্রতি অশ্রদ্ধার পরিচায়ক হয় নাই কি ?

বেদশাস্ত্রের সমকক্ষ কোন শাস্ত্র বিশ্বে নাই—ইহা পাশ্চাত্ত্য দেশে ও পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই স্বীকৃত ও আদৃত। ইহা অপৌরুষেয় বাণী, ঈশ্বরের নিঃশ্বাসস্বরূপ অপ্রাকৃত। এতৎসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান আবশ্যিক। বর্ত্তমান ভারতের এমনই দুর্ভাগ্য যে এই সংস্কৃত ভাষাকে অপ্রয়োজনীয় "ডেড ল্যাঙ্গুয়েজ" বলিয়া তাহার উৎসাদন করিয়া তৎস্থলে ইংরাজী বা অন্য কোনও ভাষা প্রবর্ত্তন করা চলিয়াছে ও চলিতেছে। এতদ্বারা আর্য্যঋষিগণের চিন্তাধারা ও পরমমঙ্গলপ্রদ শিক্ষা হইতে ভারতকে তথা সমগ্র বিশ্বকে বঞ্চিত করা হইতেছে না কি ? জার্ম্মান প্রভৃতি দেশ আজ ভারতীয় আর্য্যশাস্ত্রগুলিকে বহুযত্নে অনুশীলন করিতেছে এবং তদ্দ্বারা বৈজ্ঞানিক জগতে বহু আশ্চর্য্যজনক আবিষ্কার করিয়া গৌরবান্বিত হইতেছে। আর বর্ত্তমান ভারত তাহাদেরই উচ্ছিষ্টের দিকে তাকাইয়া আছে। এই শাস্ত্রসম্পদ্‌খানি বর্ত্তমানে ভারতে দুষ্প্রাপ্য ও বিলুপ্তপ্রায়। ম্যাক্সমূলার সাহেবের উচ্ছিষ্টই সম্বল মাত্র হইয়াছে। মহান্ কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয় তাঁহার অনুশোচনায় ইহাই সত্যরূপে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।—

"হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন, তা সবে অবোধ আমি অবহেলা করি।
পরধন লোভে মত্ত করিনু ভ্রমণ পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি॥"

তাঁহার এই মহামূল্য অভিজ্ঞতাও আমাদের নেশাঘোর ভঙ্গ করিতে সক্ষম নহে।

আর্য্যগণ দিয়াসলাই ব্যবহারে অতি সহজে অগ্ন্যুৎপাদন করিতে জানিতেন না, তাঁহারা কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ ও চক্‌মকি ব্যবহার করিতেন। আমরা দিয়াসলাই তৈয়ারী করিয়া কত উন্নত হইয়াছি। আর্য্যগণ প্রস্তরের ও মাটীর বাসনপত্র ব্যবহার করিতেন, তাঁহারা বস্ত্রশিল্প জানিতেন না বলিয়া বল্কলাদি পরিধান করিতেন—অতএব তাঁহারা অজ্ঞ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিলেন—ইহাই বর্ত্তমান বিদ্যালয়ের শিক্ষার বিষয়। ইহাদ্বারা শিশুমতিকে আর্য্যঋষিদের প্রতি অবজ্ঞাসূচক শিক্ষা প্রদত্ত হয় নাই কি? পরন্তু তাঁহারা মুখ হইতে অগ্ন্যুৎপাদন, আগ্নেয়াস্ত্রে খাণ্ডবদাহন, সুবর্ণপাত্রে ভোজন, কৌশেয়বাস পরিধান, বিমানযোগে আকাশমার্গে গমনাগমন, বাক্যোচ্চার হইতে তক্ষক দর্শন, নরদেহকে প্রস্তর পুনঃ তাহাকে সচেতনকরণ, সর্ব্বাঙ্গে ভগচিহ্নসৃজন, পুরুষকুক্ষি হইতে কুলনাশক মুষলসৃজন, মনুষ্যের মস্তকস্থলে ছাগ, অশ্ব, হস্তি প্রভৃতির মস্তক সংযোজন, মৃতের জীবনদান, জরাক্রান্ত শরীরে পুনর্যৌবন লাভ—প্রভৃতি বিদ্যায় বিদ্বান্ ছিলেন—এরূপ শিক্ষা প্রদান করিয়া ঋষিদের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা উৎপাদন ইচ্ছাকৃতভাবে পরিবর্জ্জন করা হইয়াছে ও হইতেছে। লুপ্ত যোগ্যতাকে পুনরায়ত্তের চেষ্টা পরিত্যাগ করত পরমুখাপেক্ষী হইয়া ভারত কিরূপ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে তাহা চিন্তার বিষয়। আর্য্য-ঋষিদের গুণাবলীদ্বারা পাশ্চাত্যজগৎ অনুপ্রেরিত হইয়া জড় বিজ্ঞানক্ষেত্রে উন্নতি প্রদর্শন করিতেছে—ইহা তাহাদেরই স্বীকৃতি রহিয়াছে। আর্য্যঋষিদের যোগ্যতার সহিত বর্ত্তমান বিজ্ঞানের তুলনা চলে না। রকেট—প্যাট্রিয়ট্, শব্দভেদী রকেট, রেডিও, টেলিভিশন প্রভৃতি আবিষ্কার আর্য্যঋষিদের অনুপ্রেরণামাত্র। তাঁহাদের ব্যবহৃত শব্দভেদী বাণ, বায়বাস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র, বরুণাস্ত্র, পাশুপতাস্ত্র, স্বাপনাস্ত্র, ব্রহ্মাস্ত্র প্রভৃতিই পাশ্চাত্য জগৎকে অনুপ্রেরণা প্রদান করিয়াছে। পাশ্চাত্যদেশ এইসব শাস্ত্রোক্তিকে কল্পনা বা মিথ্যা মনে করেন নাই। আমরা কিন্তু এই শাস্ত্রবাক্যকে মিথ্যা ও অলীক বলিয়া ধারণা করি। ব্যাসদেব মহাভারতের যুদ্ধচলাকালে সঞ্জয়কে গৃহাভ্যন্তর হইতে সুদূরবর্ত্তী কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ দর্শন করিতে ও কথোপকথন শ্রবণ করিতে যোগ্যতা প্রদান করিয়াছিলেন—ইহাই বর্ত্তমান টেলিভিশন আবিষ্কারের প্রেরণা জন্মাইয়াছে। প্রস্তরদ্বারা সমুদ্রোপরি ভাসমান সেতু নির্ম্মাণ আর্য্যদিগের অসাধারণ শক্তি-সামর্থ্যের পরিচয়। গ্রহ-নক্ষত্রাদির অবস্থান ও গতিবিধিজনিত ফলাফলের বর্ণনা এখনও জগদ্বাসীকে বিস্মিত করিয়া দিতেছে।

চিদ্বিজ্ঞান ক্ষেত্রে আর্য্যঋষিদের অবদান অদ্যাপিও কোন দেশ অধিগত করিতে সক্ষম হয় নাই। চিজ্জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান ইংরাজী বিদ্যালয় প্রভৃতি হইতে প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব হয় না। ইংরাজী বিদ্যালয়াদির শিক্ষক ও অধ্যাপকগণের এই যোগ্যতা নাই। পাশ্চাত্ত্যশিক্ষায় ভোগমার্গে অগ্রগতি প্রদান করিয়াছে। পরন্তু ইহা চিদ্বিজ্ঞানের অতীব পরিপন্থী, তাহা বর্ত্তমান ভারত বুঝিয়াও বুঝিতে সক্ষম নহে। ভক্ত কবি গাহিয়াছেন,—"জড়বিদ্যা যত, মায়ার বৈভব, তোমার ভজনে বাধা। মোহ জনমিয়া, অনিত্য সংসারে, জীবকে করয়ে গাধা॥' এই ভোগ-প্রবৃত্তিকে পরিহার করাই চিদনুশীলনের প্রাথমিক ও অপরিহার্য্য কার্য্য। জড়েন্দ্রিয়তর্পণ পরিত্যক্ত না হইলে চিদ্রাজ্যে অধিকার জন্মে না। কিন্তু ইহা বদ্ধজীবের পরম অরুচিকর ও আপত্তিকর। এই জড়েন্দ্রিয়তর্পণ-প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ না করিয়া তাহাকে নিয়ত বা সংযত করাই শাস্ত্রের আবশ্যিক কার্য্য। সেই কারণে এই শাসনবাক্যকে শাস্ত্র বলা হয়। শাসন স্বীকার করিতে অর্থাৎ ভোগপ্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে ভোগপরায়ণ জীব ইচ্ছুক নহে। ইহাতে নানা-প্রকার অভিযোগ ও প্রতিবাদ উত্থাপিত হইয়া থাকে। ক্রীড়োন্মত্ত বালক যেরূপ পিতামাতার হিতোপদেশকে অন্যায়জ্ঞানে তাহাকে সাদরে স্বীকার করে না, তদ্রূপ বদ্ধজীবের শাস্ত্রের প্রতি নানাপ্রকার আপত্তি। ইন্দ্রিয়তর্পণ-মধ্যে যৌনেন্দ্রিয়তর্পণই চিদনুশীলনে সর্ব্বাধিক ক্ষতিকারক বলিয়া চিদ্বিজ্ঞান শিক্ষালয়ে ব্রহ্মচর্য্য প্রশিক্ষণকে প্রাথমিক ও আবশ্যিকরূপে ব্যবস্থিত হয়। ব্রহ্মচর্য্য, গৃহস্থ, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—সকল আশ্রমকেই ইহা অবশ্য কর্ত্তব্যরূপে শাস্ত্রের নির্দ্দেশ। ব্রহ্মচর্য্য পালন না করিলে সকল আশ্রমীই পতিত জ্ঞান করা হয়। ব্রহ্মচারী, বাণপ্রস্থী এবং সন্ন্যাসিপক্ষে যৌনেন্দ্রিয়তর্পণের কোন ব্যবস্থা নাই। গৃহস্থদিগের মধ্যে কেবলমাত্র সন্তানকামীকে সন্তানোৎপাদনোপযোগী রেতঃস্খলনের ব্যবস্থা শাস্ত্রে প্রদত্ত হইয়াছে, রতিসুখ উপভোগের ব্যবস্থা প্রদত্ত হয় নাই।—

লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা নিত্যাস্তু জন্তোর্ন হি তত্র চোদনা।
ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞসুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা॥ (ভাঃ ১১।৫।১১)
যদ্‌ভ্রাণভক্ষো বিহিতঃ সুরায়াস্তথা পশোরালভনং ন হিংসা।
এবং ব্যবায় প্রজয়া ন রত্যা ইমং বিশুদ্ধং ন বিদুঃ স্বধর্ম্মম্॥ (ঐ ১৩)

উল্লিখিত শ্লোকদ্বয় হইতে স্পষ্টই জানা যায় যে,—স্ত্রীসঙ্গ আবশ্যিক নহে। ইহা বদ্ধজীবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। তজ্জন্য ইহাতে বিধির আবশ্যকতা নাই। এই প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্তিই জীবের মঙ্গলজনক হইলেও বদ্ধজীব পরিত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক বলিয়া শাস্ত্রে পরিত্যাগের বিধি প্রদত্ত হইয়াছে। চিদ্বিজ্ঞান লাভেচ্ছু-

গণের এই ব্রহ্মচর্য্য আবশ্যিক। ভারতীয় আর্য্যশাস্ত্র ব্যতীত বিশ্বের কোন দেশে ইহার সমাদর নাই। সর্ব্বত্রই যৌনসুখের অবাধ ব্যবস্থা। ঐরূপ দেশবাসীর সংস্পর্শ হইতে ভারত ব্রহ্মচর্য্যগুণ হারাইয়া ফেলিয়াছে এবং সঙ্গদোষে এই যৌনসুখই সমাজের চরমসুখ মনে করিয়া সমাজব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়াছে ও করিতেছে। স্ত্রীজাতি ও শূদ্র ব্যতীত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন বর্ণের প্রতি শাস্ত্রের ব্রহ্মচর্য্য পালন বিধি। স্ত্রীজাতির মধ্যেও অসাধারণরূপে কাহারও এই যোগ্যতা লাভ হইলে শাস্ত্র তাহাকে অধিকার দিতে কৃপণতা করে নাই। গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি নারীগণ ইহার প্রমাণ। সাধারণতঃ স্ত্রীজাতির কামাধিক্যতাহেতু তাহাদের ব্রহ্মচর্য্য বিধি নাই। আর্য্যঋষিগণ বহুযত্নে ও বহুচেষ্টায় ভারতে চিদ্বিজ্ঞান বা পারমার্থিক বিদ্যার অনুশীলন প্রসারিত করিয়াছিলেন। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ হইতে ইহাই ভারতের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক। কিন্তু হায়! পাশ্চাত্যমোহগ্রস্ত বর্ত্তমান ভারত আজ তাহা অনুধাবন করিতে অক্ষম। যৌনসুখোন্মত্ত পাশ্চাত্য দেশগুলিকে আদর্শ করিয়া ঋষিগণকে অবজ্ঞা করত উচ্চবর্ণের স্ত্রীবর্গের প্রতি সহানুভূতি ও মহত্ত্ব দেখাইতে গিয়া বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহের এবং অসবর্ণ বিবাহের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। ভ্রূণহত্যাদি শাস্ত্রনিষিদ্ধ পাপকর্ম্মকেও আইনসিদ্ধ করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। তথাকথিত পণ্ডিতাভিমানী ও উদার সংস্কারকগণ আর্য্যঋষিদের মহত্ত্ব ও উদারতা উপলব্ধি করিতে অক্ষম হইয়া তাঁহাদের বিচারের বিরোধিতা করিতেছেন। পরমার্থ বা চিদ্বিজ্ঞান এবং যৌনসুখের পরিণাম ধারণা করিতে তাঁহারা যে মোহগ্রস্ত হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহারা যৌনসুখের মোহে আচ্ছন্ন হইয়া স্ত্রীজাতির প্রতি অনুকম্পা করিতে গিয়া তাঁহাদিগকে পরমার্থ হইতে বঞ্চিত করিতেছেন—ইহা তাঁহারা বুঝিতে অক্ষম। চিদ্বিজ্ঞান বা পরমার্থ জগতে বিচরণকারীর নিম্নোদ্ধৃত উক্তিটী বিচার করিলে বিষয়টী কিছুটা অনুধাবন করা যায়।—

যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণপদারবিন্দে নবনব রসধামনি রন্তুমুদ্যতমাসীৎ।
তদবধি বত নারীসঙ্গমে স্মর্য্যমানে ভবতি মুখবিকারঃ সুষ্ঠু নিষ্ঠীবনঞ্চ।
(ভঃ রঃ সিঃ দঃ ৫।৩।৯)

শ্রীমদ্ভাগবতে প্রহ্লাদোক্তি,—

যন্মৈথুনাদি গৃহমেধিসুখং হি তুচ্ছং, কণ্ডূয়নেন করয়োরিব দুঃখ-দুঃখম্।
তৃপ্যন্তি নেহ কৃপণা বহুদুঃখভাজঃ, কণ্ডূতিবন্মনসিজং বিষহেত ধীরঃ॥
(ভাঃ ৭।৯।৪৫)

চিদ্বিজ্ঞান বা পরমার্থ লাভেচ্ছুর পক্ষে এই যৌনসুখ কি-প্রকার অনিষ্টজনক ও ভয়াবহ তাহার বর্ণনা।—

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িনাং অথ যোষিতাংশ্চ হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥

অর্থাৎ যাহাদের ভবসিন্ধুর পরপারে গমন করিতে ইচ্ছা এরূপ ভগবদ্ভজনোন্মুখ নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তির পক্ষে বিষয়ী ও স্ত্রীলোককে সন্দর্শন করা বিষভক্ষণ অপেক্ষাও অসাধু বা অমঙ্গলজনক।

পিতামাতার শাসনবাক্যকে কুপুত্র যেরূপ গ্রাহ্য করে না, তদ্রূপ বর্ত্তমান ভারত শাস্ত্রকে লঙ্ঘন করিয়া যৌনসুখকর প্রচেষ্টা চালাইতেছে। যৌনসুখেরই অনুকূল ব্যবস্থাকে সমাজের চরম সেবা বিচার করিতেছে। বহির্ভারতের সঙ্গফলে মোহাচ্ছন্ন হইয়া চিদ্বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা ও প্রসারে বিমুখ হইয়া মনুষ্যজন্মের পরম সুযোগকে হারাইতেছে। 'তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ', 'আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ', 'প্রাপ্য বরান্ নিবোধত', 'তস্মাৎ গুরুং প্রপদ্যেত', 'বিনা মহৎপাদরজোভিষেকম্' প্রভৃতি শাস্ত্রবাক্য কর্ণগোচর হইতেছে না। প্রকৃত সাধু ও গুরু-ব্যক্তিগণ সমাজের সর্ব্বোত্তম মঙ্গলকারী, তাহা বর্ত্তমান মোহাচ্ছন্ন ভারত বুঝিতে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছে। সাধুদিগের সমাজের প্রতি কি অবদান তাহা বুদ্ধি-দোষে গ্রাহ্য হইতেছে না। মূর্খজীব হস্তদ্বয়কেই অগ্রাধিকার প্রদান করে, কিন্তু যাঁহার অধিষ্ঠানহেতু হস্তদ্বয় কর্ম্মক্ষম তাঁহাকে দেখিতে ও মূল কারণস্বরূপে তাঁহাকে প্রাধান্য দিতে অক্ষম।

শাস্ত্র এবং সাধু এক তত্ত্ব। সাধুগণ শাস্ত্রের প্রতিমূর্ত্তি। সুষ্ঠুবিচারে শাস্ত্র অপেক্ষা সাধুর মাহাত্ম্য অধিক। কারণ শাস্ত্রপাঠ করিয়াও বিপরীত বা অযথার্থ ধারণা জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু সাধুসঙ্গফলে তাহার সম্ভাবনা নাই। পরন্তু সাধুর প্রভাব শাস্ত্রের প্রভাব অপেক্ষা অধিক কার্য্যকরী। তজ্জন্যই আচার্য্যশঙ্কর বলিয়াছেন,—'ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।'

বিদেহরাজ বলিয়াছেন,—

দুর্ল্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ।
তত্রাপি দুর্ল্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনম্॥ (ভাঃ ১১।২।২৯)

অন্যত্র প্রহ্লাদোক্তি,—

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥
(ভাঃ ৭।৫।৩২)

ভগবান্ নিজমুখে সাধুর মাহাত্ম্য বলিয়াছেন,—

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভিগ্রস্ত হৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥
নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা।
শ্রিয়ঞ্চাত্যন্তিকীং ব্রহ্মন্ যেষাং গতিরহং পরা॥
যে দারাগারপুত্রাপ্তপ্রাণান্ বিত্তমিমং পরম্।
হিত্বা মাং শরনং যাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্তুমুৎসহে॥
ময়ি নির্ব্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ।
বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা॥
মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদি চতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়াপূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎকালবিপ্লুতম্॥
সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥ (ভাঃ ৯।৪।৬৩-৬৮)

এ হেন সাধুগণ ভোগী সমাজের ভোগে ভাগ বসায় না। যাহারা ভোগী তাহারাই সমাজে কাড়াকাড়ি, মারামারি, যুদ্ধবিগ্রহ ও রক্তারক্তি করিয়া থাকে। সাধুগণ তাহাদের সুন্দরী, রূপসী স্ত্রী-কন্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না, তাহাদের বিত্ত-সম্পত্তি গ্রাস করিতে চাহেন না। 'ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।' শিক্ষায় তাঁহারা শিক্ষিত। সমাজের অশান্তির, যুদ্ধবিগ্রহের তাঁহারা কারণ নহেন। তাঁহাদের চিন্ময় সেব্যবিগ্রহ ও তন্মন্দির কালক্ষোভ্য ও ভগ্নদশা প্রাপ্ত হয় না। তাঁহাদের জীবনধারণের জন্য অন্যকে উদ্বেগ প্রদানও করেন না। "জীবন-নির্ব্বাহে আনে উদ্বেগ না দিবে। পর উপকারে নিজসুখ পাসরিবে॥"— মহাপ্রভুর তৃণাদপি-শিক্ষাই তাঁহাদের চরম শিক্ষা। এ হেন শাস্ত্রমূর্ত্তি সাধুতেও যাহারা বিরুদ্ধভাবাপন্ন তাহারা অবশ্যই ভগবন্মায়ামোহিত সন্দেহ নাই। তথাপি সাধুগণ প্রার্থনা জানাইতেছেন,—

"নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষ একো।
নান্যং ত্বদস্য শরণং ভ্রমতোঽনুপশ্যে॥"

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

দুনিয়ার দৌড়

পুরানো একটী গল্প মনে পড়ায় বলছি। গল্পটী সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের, যিনি ছেলের উপর তাঁহার যাহা কিছু ছিল সমস্তই ন্যস্ত করিয়া বার্দ্ধক্যের সুখ-শান্তি লাভের বাসনা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ একান্ত স্থবির হইয়া গিয়াছিলেন, সংসারের আর কোন সাহায্যে আসিবে না, তাহা ছাড়া বৃদ্ধজনোচিত বালক-স্বভাব পাইয়া বাড়ীর ছেলেমেয়েদের মত দিবারাত্র কিছু কিছু ভালমন্দ জিনিষ খাইয়া কালযাপন করিতে চাহেন। ইহাতে তাঁহার পুত্রবধূ তাঁহার উপর বড় বিরক্ত, স্বামীকে নানা কথা বলিয়া শ্বশুরের উপর তাঁহার বিরাগ উৎপাদন করেন। "আমার এমনই বরাত, বাবা আমাকে এমন হাতে দিয়েছেন যে, এদিকে খেটে খেটে প্রাণ বেরোয়, আর ছেলেপিলেকে পেট ভরে খেতে দিতে পাই না।" "কেন, কেন, কি হয়েছে?" "কি হয়েছে? যেন কিছুই জানেন না। বুড়ো বাবাকে বাড়ীর ভেতর রেখেছেন, তার খ্যাৎমৎ খাট্‌তে খাট্‌তেই জীবনটা যায়, তার ওপর ছেলেপিলেদের ভাল-মন্দ কিছু খেতে দিলেই অমনই বুড়োর চাই। তাদেরই আঁটে না, আবার বুড়োকে দাও। বুড়ো হয়ে ভীমরতি হয়েছে। সব জ্বালাতন আমাকে সইতে হবে। পোড়াকপাল! এমন ঘর কর্ত্তে আছে, আমি আজই বাপের বাড়ী চলে যাব, আমায় রেখে আসবে চল, আমি আর এক মুহূর্ত্তও এখানে থাকব না।" ইত্যাদি নানা তর্জ্জন-গর্জ্জন, তার সঙ্গে ফোঁপান, আঙ্গুল মট্‌কান, মাথা চালা এইরূপ সব উপকরণ দিয়ে বাবুর কাণে ত' মন্ত্র দিতে লাগলেন। তখন বাবু এই দীক্ষা পেয়ে তাঁর পত্নীরূপী গুরুর সেবায় ব্যাঘাত হয় দেখিয়া বাড়ীর বাহিরে বেরুবার পথের ধারে একটা কুঁড়ে বেঁধে বাপ্‌কে বাড়ীর বাহির করে তাইতে রাখলেন।

এদিকে বাবুর মাতা দেখে শুনে চালাক হয়ে ছেলেপিলেদের যত্ন নিয়েই থাকেন, সুতরাং শাশুড়ীর উপর আর বউ ঠাকুরুণের বিশেষ আক্রোশ হয় নাই। ক্রমে বউয়ের খোসামোদ কর্ত্তে কর্ত্তে স্বামীর উপর তাঁর যেটুকু আস্থা ছিল কমে গেল। এখন আর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে কেহ কিছুমাত্র যত্ন করে না। কখনও মনে পড়লে একমুঠো অন্ন সকলের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে বুড়োকে কেউবা দিলে, কোনদিন বা একেবারে ভুল হয়ে গেল।

বাবু কর্ম্মস্থানে বাহির হইতেছেন, বুড়োর ঘরের সম্মুখ দিয়া যাইবার পথ, বুড়ো চেঁচিয়ে বলে উঠল,—"ও বাবা ফণিভূষণ, আমার খাওয়া হয়নি, কেউ আমাকে

দেখে না।" ফণিভূষণ ত' রেগে অস্থির। "বেশ শ্রীহরি বলে বেরিয়েছি, অমনই পিছু ডাক। সকাল হতে না হতেই খাওয়া। আমি যাচ্ছি কাজের দায়ে। আমি দুটী খেয়ে নিলুম, ছেলেরাও সঙ্গে খেতে বসলে। আপনার কি, ঘরে বসে থাকবেন, এত তাড়া কিসের?" "ও বাবা কাল রাত্রি থেকে উপবাসী।" ছেলে যেতে যেতে দূর হতে বললেন,—"আচ্ছা দেখা যাবে, এসে শুন্‌ব। সময় বুঝে বল্‌বেন" খানিকপরে ঝি সামনে দিয়ে যাচ্ছে, তাকে ডেকে ব্রাহ্মণ বল্‌ছেন,—"ও ঝি, বাড়ীতে বলগে আমায় কিছু খেতে দেয়, কাল থেকে কিছু খাইনি।" যার উপর বাড়ীর কর্ত্তা-গৃহিণী বিরূপ, তাকে চাকর-বাকররা গ্রাহ্য করে না। যাঁহারা সেক্সপীয়রের লিয়াররাজের গল্প জানেন, তাঁহারা এ বিষয়ে বিলক্ষণ প্রমাণ পাইয়াছেন, তাহাতে আবার সন্তানের ইহা অপেক্ষাও ভয়ানক কৃতঘ্নতার চিত্র। ঝির জবাব,—"পোড়া দশা, কাজ ফেলে আমি ঐ তত্ত্বে ফিরি, আর বুড়ে হলে ভীমরতি হয় যে তা ঠিক। কাল খাওনি ত' বৈকালে পাথর নিয়ে গিয়ে আমায় আবার মাজতে হল কেন? এমন ধূয়ে রেখেছিলেম গো," ইত্যাদি বক্‌তে বক্‌তে ঝি ঠাক্‌রুণ ত' গণ্ডীপার। বুড়োকে খেয়ে পাশের ডোবায় পাথর ধুতে হত। খানিকপরে গিন্নী অর্থাৎ ফণিভূষণের মাতা কি এক কার্য্যোপলক্ষে বাইরের বাড়ীতে আসিয়াছেন, বুড়ো তাঁকে দেখ্‌তে একটু সাবধান হয়ে বলছেন,—"ও গিন্নী, কাল রাতে আমায় কিছু খেতে দাওনি, বড় খিদে পেয়েছে।" "তা কি হবে, মানুষের ভুল হয় না, তা দোয়া যাবে, সময় হলেই পাবে। বাপ্‌রে, তোমার ভাত বইতে বইতে আমি নাকাল।" "কি করব গিন্নী? বৌমা ত' আমাকে বাড়ী ঢুক্‌তে দিতে নারাজ, নইলে না হয় আমি কোন গতিকে বাড়ীতে যেতুম।" "না, না, অতয় কাজ কি? আমি ত' চাকরাণী আছিই, বওয়া ভাত পাবে, তোমার আর কষ্ট কি? সময় হলেই পাবে।" বলে তিনি সর্‌লেন। ক্রমে যত বেলা হতে লাগল ততই বৃদ্ধ ক্ষুধায় ব্যাকুল হতে লাগলেন। তখন দুঃখে ক্ষোভে অভিমানে বৃদ্ধের হৃদয় ফাট্‌বার উপক্রম হল। তখন বৃদ্ধ আকুল প্রাণে আর্ত্তিসহকারে "হা মধুসূদন" বলে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে অশ্রুপাত করতে লাগলেন।

বৃদ্ধের বোধ হয় কিছু সুকৃতি ছিল। ভগবান্ মধুসূদন নাকি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেষে যষ্টি হাতে ধীরে ধীরে বুড়োর ঘরের কাছে এসে "যদু ভায়া আছ হে, অনেকদিন পরে তোমাকে দেখতে এলাম। যদু ভায়া!" বলে ডাক দিলেন। যদু-ভায়া তখন রোদন কথঞ্চিৎ সংবরণ করে "এই যে ভায়া এস এস" বলিয়া বাহিরে আসিয়া আগন্তুক ব্রাহ্মণকে চিনিতে না পারিয়া মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া

তাকিয়ে রইলেন। নবাগত ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"কি হে তোমার চোখের জ্যোতিঃ যে একেবারে গিয়েছে। বল্‌লে চিনতে পারবে ত', না স্মৃতিও হারিয়েছ। আমি যে তোমার বাল্যবন্ধু মধুসূদন।" "তা ভাই বেশ, বেশ, আমার একেবারে মাথা খারাপ হয়ে গেছে।" "তুমি কাঁদ কেন, বল দেখি, আজ যেন উপবাসী। ব্যাপারটা কি?" তখন বিপ্র বন্ধুবরকে সকল ব্যাপার খুলিয়া বলিলেন। তখন বিপ্রবেশী ভগবান্ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে কয়েকটী স্বুবর্ণমুদ্রা দিয়া বলিয়া দিলেন,—"দেখ ভায়া, এর একটী যেন খরচ কোরো না, আমার দরকার হলে চেয়ে নিয়ে যাব। তুমি কিন্তু যখনই কাকেও ঢুকতে বেরুতে দেখবে তখনই জোরে জোরে গুণ্‌তে থাক্‌বে, আবার বেঁধে রাখ্‌বে। এতেই তোমার দুঃখ ঘুচবে। আমি এখন ব্যস্ত, এখন চললাম। দেশে ফিরেছি রোজ দেখা হবে।" প্রভু ত' অন্তর্দ্ধান।

ঝিকে আস্‌তে দেখে ব্রাহ্মণ গুণছেন 'এক দুই তিন চার···।" ঝি এসে টিপ করে একগড়, "বাবা ঠাকুর পেন্নাম গো, খেটে খেটে সারা, আপনাকে যে রোজ একটা করে পেন্নাম দোব, তাও পোড়া হয়ে ওঠে না। দেন একটু পায় ধূলো! ওমা নইলে যে আমরা জন্নামে যাব।" খানিক পরে স্বয়ং গিন্নী। "এক-দুই তিন চার···।" "ওমা কর্ত্তার টাকা আছে, টাকা নয় গো, মোহর! কর্ত্তাকে হতচ্ছেদা করে ভাল করিনি।" কিছু না বলে দৌড়ে গিয়ে তেলের বাটী এনে, "ও কর্ত্তা! আমারও মরণ হয় না। সংসার সংসার করে তোমার সেবা এক রকম উঠে গেছে। না, বাবু আমার তা করলে চল্‌বে না। আমার আবার পরকাল আছে। তোমাদের সংসারে আমার কি পরকাল হবে? বলি, ও কর্ত্তা, এস, এস, আহা কর্ত্তার চুলগুলি পাঁশমত হয়ে গেছে। এস, ভাল করে তেল মাখিয়ে দিই।" এই বলে পতিব্রতা স্বামিসেবা আরম্ভ করে দিলেন। তার পরই ব্রাহ্মণের স্নান হলেই অন্নের থালা, তাতে আবার ব্যঞ্জন। কর্ত্তার মনে আর হাসি ধরে না। "হায় রে মধুসূদন দা, তোমার বুদ্ধিকে বলিহারি।" তারপর বউ ঠাকুরুণের পালা। "ও ঝি, ঝি, না এসব লোকজন বড় বদ। ঠাকুর ঝামাল বড় ভালবাসেন না, তাই আলাদা থাকেন বলে তাঁকে দেখতে নেই? ওমা কোথায় যাব, ঘরে দোরে জঞ্জাল দেখ, না, এ বলে আর পারা গেল না।" নিজেই ঝাঁটা এনে দাওয়া পরিষ্কার করে ঝিকে ঘর সাফ্ করতে পাঠিয়ে দিলেন ও বৈকালে রেকাব করে ফল-মিষ্টি জলখাবার দিয়ে গিয়ে খোকাকে দিয়ে বলালেন,—"দাদামণি জল খান্।" দাদামণি মধু ভায়ার কেরামতি ভাবতে ভাবতে সেগুলি গলাধঃকরণ করিয়া আনন্দিত। সন্ধ্যায় গৃহিণী

ঘরে আলো জ্বালিয়া দিয়া পরে আহার্য্যদ্বারা ব্রাহ্মণের পরিতোষবিধান করিলেন।

প্রাতে ফণিভূষণ খেয়ে বেরুচ্ছেন। আবার সেই "এক দুই তিন চার…।" "ও, বাবা তাহলে হাতে কিছু রেখেছেন। সোনার মত নয়! অতগুলি মোহর! বাবা! আপনার খাওয়া হয়েছে ত'।" "না বাবা এরই মধ্যে আমার খাওয়া কি?" "সে কি আপনি প্রবীণ হয়েছেন। আপনার সকাল সকাল দরকার। একি অন্যায়! মাকে বলতে হবে। আমি ঘরে থেকে দেখতে পাচ্ছি না বলে বাবার বড় অযত্ন হচ্ছে। না, না, এসব আমি সইতে পারব না।"

উপাখ্যানে আরও আছে। এখন এই পর্য্যন্ত জেনে-বুঝে যদি দেখি তাহলে কি দেখি না যে, ধনই এই সংসারে আত্মীয়তার মূল। ধন না থাক্‌লে মা পর্য্যন্ত ছেলেকে যত্ন করে না। এই জগতে আমরা এই দেহটাকে আমি মনে করে নিয়ে এরই সম্পর্কে 'আমার ঘর', 'আমার স্ত্রী', 'আমার পুত্র' ইত্যাদি যে 'আমার' 'আমার' করি, তার পরিণাম ত' এই। দুরবস্থা হলে আর কেউ 'আমার' বল্‌তে চায় না, কেন না তাহাদ্বারা কাহারও দেহের কোন সেবা হবে না। তাই লোকে চটে। "দুনিয়াটা কার বশ?" উত্তর—"দুনিয়া টাকার বশ।" এই সম্পর্কে যে "আমি আমার" করে আমার দিনটি কাটাচ্ছি, এর চেয়ে আর বোকামি হতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবত আমাদিগকে "গোখর" অর্থাৎ পশুর মধ্যে মূর্খতম গর্দ্দভ বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন।

"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধী।
যত্তীর্থবুদ্ধি সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥"

আমরা সর্ব্বদা ভুলিয়া যাই যে, এই দেহ চিরকাল থাকিবে না এবং তাহার সহিত তৎসম্পৃক্ত সকল বস্তুতেই আমার মমত্ব ঘুচিয়া যাইবে। সুতরাং নিত্য বস্তুর সন্ধান না করিয়া যদি অনিত্যের সংগ্রহে যত্নবান্ হই, তাহা হইলে আমার বুদ্ধির পরিচয় কোথায়? যে বুদ্ধির গর্ব্বে স্ফীত হইয়া আমরা ঈশ্বরের ঈশত্ববিষয়ে সন্দিহান হইবার স্পর্দ্ধা করি, পীড়াদিজনিত মস্তিষ্কের একটু বিকৃতি ঘটিলে সে বুদ্ধি কোথায় থাকিবে? নিত্যবস্তু ভগবান্ ও নিত্যবস্তু ভগবদ্দাস জীব। জীবের নিত্যধর্ম্ম ভগবৎসেবা বা ভক্তি। যদি অনিত্যবুদ্ধিদর্পে দৃপ্ত হইয়া নিত্যধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হই, তাহা হইলে সমাজে আমাদের আদর কোথায়? "ধীরঃ তূর্ণং যতেত নিঃশ্রেয়সায়।" মুহূর্ত্তমাত্র কালক্ষেপ না করিয়া ধীরচেতাঃ নিঃশ্রেয়ঃ বা চরম কল্যাণের উপায় ভগবানে ঐকান্তিকী ভক্তি অবলম্বন করেন। অনিত্য জড়মঙ্গলপ্রদ আধিকারিক দেবতার পূজায় সময়ক্ষেপ করেন না।

যথার্থ পরমার্থবিৎ কখনও বহ্বীশ্বরবাদী নহেন। কেন না বহ্বীশ্বরপূজা এই জড়দেহের ও তদ্ঘটিত মঙ্গলামঙ্গলের উদ্দেশ্যেই কৃত হইয়া থাকে। উহা পরমার্থ নহে। ঐ সকল পূজার্চ্চনাদি কর্ম্ম, সে কর্ম্মে আমাদের বন্ধনযোগ্যতাই অর্জ্জিত হয়। কর্ম্ম শুভই হউক, আর অশুভই হউক, কর্ম্মদ্বারা কখনও পরমার্থলাভ ঘটে না,—এই কথাটী আমরা পাঠকগণকে সর্ব্বদা স্মৃতিপটে জাগরূক রাখিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করি।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজের শিরোমণি পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী ঠাকুর গ্রন্থরাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে স্পষ্টই দেখাইয়া দিয়াছেন,—"কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।" কথাটা শুনিয়াই যেন আকাশ হইতে পড়িতে হয়। শুভকর্ম্ম কৃষ্ণভক্তির বাধক কিরূপে হয়? এ যে এক নূতন তত্ত্ব! জাগতিক সমাজমাত্রেই কর্ম্মিসমাজের অন্তর্ভুক্ত। সকলেরই কর্ম্মিসমাজে জন্ম ও তদনুগ শিক্ষা আমাদের মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে। সুতরাং তাহার বিপরীত কোন কথা শুনিলেই আমরা স্তম্ভিত হইয়া যাই। কর্ম্মিসমাজে ভক্তির অভিনয় থাকিলেও শ্রদ্ধা-ভক্তি তাহাদের নিকট অজ্ঞাত। সুতরাং পরমার্থ-কথা তাহার নিকট সম্পূর্ণ নূতন। নূতন হইলেও যিনি স্বীয় চরমকল্যাণপ্রার্থী তাঁহাকে অল্পে অল্পে পরমার্থ শিক্ষা করিতে হইবে—কর্ম্মীর চিন্তাস্রোত হইতে অব্যাহতি লইতে হইবে।

পুরুষোত্তম কে?

যেই কথাতে লোকের বাস্তবিক মঙ্গল হয়, তাহাই উচিত কথা। সাধুগণ উচিত কথাতেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, কিন্তু অবিবেকিগণকে উচিত কথা বলিলে তাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া থাকে। কলিকাল বলিয়া বোধহয় আজকাল যত্রতত্র (অস্থানে-কুস্থানে) বিবিধ বিশেষণের ফুলঝুরি ছড়াইতে দেখা যায়। দুর্ভিক্ষের সময় লোকে যেরূপ সবকিছু ভক্ষণ করিয়া থাকে, খাদ্যাখাদ্য বিচার করে না; তদ্রূপ অধর্ম্মের প্রাবল্যের সময় অজ্ঞ ও অবিবেচকগণ ভাল-মন্দের বিচার না করিয়া ভিখারিণীকে লক্ষ্মী, কানা ছেলেকে পদ্মলোচন, সর্ব্বাপেক্ষা পুরুষাধমকে পুরুষোত্তম এবং অসত্যকে সত্য বলিয়া চালাইবার অপচেষ্টা করিতে গিয়া নিজেদের হাস্যাস্পদ করিয়া তোলে। ধর্ম্মপথে চলিতে গেলে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হয় বলিয়া লোকে সেইপথে সহজে চলিতে চাহে না, কিন্তু আপাতমনোরম অধর্ম্মপথে

সহজ চলা যায় বলিয়া বেশীর ভাগ লোকই সেইপথে চলিতে আনন্দ প্রকাশ করে। ক্রোড়ে শয়ন করিয়া যে ব্যক্তি নিদ্রিত আছে, তাহাকে হত্যা করায় যেরূপ পৌরুষ নাই, তদ্রূপ যে ব্যক্তি মায়াদেবীর কোলে নিদ্রামগ্ন, সেই পুরুষাধমকে 'পুরুষোত্তম' সম্বোধন করিবার মধ্যে গৌরবের কোন কিছুই নাই। যদি শতভার চিনি দিয়া নিমগাছ উৎপন্ন করা হয় এবং তাহার মূলে প্রত্যহ দুগ্ধ সেচন করা হয়, তাহা হইলেও নিম্ব যেরূপ কখনও মধুর হয় না; তদ্রূপ স্তাবকগণ পুরুষাধমকে যতই 'পুরুষোত্তম' বলিয়া স্তব-স্তুতি করুক না কেন, পুরুষাধম কখনও পুরুষোত্তম হইতে পারে না। অগ্নি তৃণশূন্য স্থলে পতিত হইলে নিজেই যেরূপ নিষ্কিরণ হইয়া যায়, তদ্রূপ মনঃকল্পিত পুরুষোত্তমের উপাসকগণ কৃষ্ণভক্তিশূন্য হইবার ফলে মায়ার গর্ত্তে অবশ্যই পতিত হইবে।

পরমেশ্বর ভগবান্ এবং জীবকে সমপর্য্যায়ভুক্ত বা সর্ব্বতোভাবে সমান বলিয়া মনে করা ভুল। তাঁহাদের ব্যক্তিত্বে সর্ব্বদাই উর্দ্ধতন এবং অধস্তনের প্রশ্ন থাকিয়া যায়। উত্তম-শব্দটি খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ। **জীব সর্ব্বদাই পুরুষোত্তম ভগবানের অধীন তত্ত্ব**। পরমেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। তাই তিনি হইতেছেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বা উত্তম পুরুষ। পুরুষোত্তম—চিন্ময়ভোক্তা, তৎপ্রকটিত জীবগণ জড়ের ভোক্তা মাত্র। পুরুষোত্তমের পুরী—গোলোক বা বৈকুণ্ঠধাম, তাঁহা হইতে বিক্ষিপ্ত বদ্ধজীবগণের পুরী—দেবীধাম ব্রহ্মাণ্ড। মহাভারতের নারায়ণীয় পর্ব্বাধ্যায়ে 'পুরুষোত্তম'-শব্দ পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে এবং তিনি নির্গুণ হইয়াও অনন্ত সদ্‌গুণের আধার, অব্যয়, পরমাত্মা, পরমেশ্বর—ইহা স্পষ্টই বলা হইয়াছে। পুরাণাদিতে ভগবান্ পুরুষোত্তমই পরতত্ত্ব ও পরব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তিত। ব্রহ্মসূত্র ও উপনিষদে ব্রহ্মই অদ্বয় পরতত্ত্ব পুরুষোত্তম। ভাগবত-শাস্ত্রে উপনিষদের ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্মই পুরুষোত্তম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ "গোবিন্দভাষ্যের" (১।১।১১) মধ্যে বলিয়াছেন,—"শ্রীকৃষ্ণ বিশুদ্ধানন্তগুণ অচিন্ত্যানন্তশক্তি সচ্চিদানন্দ পুরুষোত্তম।" "বেদান্তস্যমকের" মধ্যেও পাওয়া যায়,—"বিভু বিজ্ঞানানন্দ সার্ব্বজ্ঞ্যাদিগুণবান্ পুরুষোত্তম ঈশ্বর।" শ্রীবল্লভাচার্য্য-কৃত 'অনুভাষ্যে'ও উক্ত রহিয়াছে,—"অনন্তগুণপরিপূর্ণ সাকার পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ।" ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজকে 'পুরুষোত্তম' সম্বোধন করিতে গিয়া অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ব্ববিদ্ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত॥ (গীতা ১৫।১৯)

"হে অর্জ্জুন! যিনি নানামতবাদদ্বারা মোহপ্রাপ্ত না হইয়া আমার এই

সচ্চিদানন্দস্বরূপকে 'পুরুষোত্তমতত্ত্ব' বলিয়া জানেন, তিনি সর্ব্ববিৎ এবং তিনি সর্ব্বভাবে আমাকে ভজন করিতে সমর্থ।" 'পুরুষাধমের' সংজ্ঞা দিতে গিয়া গরুড়পুরাণ বলিয়াছেন,—"বেদসমূহে পারঙ্গত ও সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ হইয়াও যে ব্যক্তি সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুর ভক্ত নহে, তাহাকে 'পুরুষাধম' বলিয়া জানিবে।"

দুইটী পুরুষ—ক্ষর ও অক্ষর। ভূতসমূহ ক্ষর, কূটস্থ অক্ষর। বদ্ধ ও মুক্ত উভয় পুরুষ হইতে ভিন্ন, যিনি সেই উভয়কে ভরণ করিতেছেন, তিনি উত্তম পুরুষ, সেই উত্তম পুরুষ শ্রীহরিই—ইহা গীতার পঞ্চদশ অধ্যায় হইতে পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥ (গীতা ১৫।১৮)

"তৃতীয় ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট অক্ষর পুরুষের নাম 'ভগবান্'। আমিই সেই ভগবত্তত্ত্ব, আমি—ক্ষর-পুরুষ জীবের অতীত এবং অক্ষর পুরুষ 'ব্রহ্ম' ও 'পরমাত্মা' হইতে উত্তম। অতএব লোকে ও বেদে আমাকে 'পুরুষোত্তম' বলিয়া উক্তি করে।" উপরোক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন,—"যোগিগণের উপাস্য পরমাত্মার কথা বলিয়া ভক্তগণের উপাস্য ভগবানের তত্ত্ব বলিতে গিয়া ভগবত্তায়ও স্বীয় কৃষ্ণ স্বরূপেরই পুরুষোত্তম নাম ব্যাখ্যাপূর্ব্বক তাঁহার সর্ব্বোৎকর্ষ বলিতেছেন,—'যস্মাৎ' ইত্যাদি। 'ক্ষরং'—ক্ষর পুরুষ অর্থাৎ জীবাত্মার অতীত, 'অক্ষরাৎ' অক্ষর পুরুষ অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে উত্তম। 'উত্তমাৎ'—অবিকার পরমাত্ম পুরুষ হইতে উত্তম।" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামীও লিখিয়াছেন,—"এইপ্রকার নিজের নাম পুরুষোত্তম—ইহা বিশেষরূপে নির্ণয়পূর্ব্বক দেখাইতেছেন। যেহেতু আমি নিত্যমুক্ত বলিয়া ক্ষর-জড়বর্গকে অতিক্রমপূর্ব্বক অবস্থিত এবং নিয়ন্তা বলিয়া অক্ষর—চেতনবর্গ হইতেও উত্তম। অতএব লোকে অর্থাৎ জগতে ও বেদে আমি পুরুষোত্তম নামেই বিখ্যাত।" শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী অন্যত্রও লিখিয়াছেন,—"উপাসক-বৈশিষ্ট্যেই উপাস্যের বৈশিষ্ট্য লাভ 'চ'কার প্রয়োগে ভগবান্ বৈকুণ্ঠনাথাদি হইতেও 'ইহারা পুরুষের অংশ, কলা, কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্'—এই স্তুতোক্তি হইতে আমি উত্তম।" বৈষ্ণব ভগীরথ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর টীকায় লিখিয়াছেন,—"অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত বলিয়া জানিবে যে, ক্ষর ও অক্ষর—এই দুইটী পুরুষ এবং অক্ষর পুরুষের তিনটী প্রকাশ—সামান্য প্রকাশ—'ব্রহ্ম' (জগৎ সৃষ্ট হইলে তাহাতে সর্ব্ব-ব্যাপি-সত্তা-স্বরূপে এবং তাহার সমস্ত ধর্ম্মের বিপরীত অবস্থায় লক্ষিত অক্ষর-পুরুষ), উত্তম প্রকাশ—'পরমাত্মা' এবং সর্ব্বোত্তম প্রকাশ—'ভগবান্'।"

ক্ষর অর্থাৎ স্ব-স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হয় বলিয়া ক্ষর—জীব, স্ব-স্বরূপ বিচ্যুত হয়

না—অক্ষর ব্রহ্মই। পরমাত্মরূপ দ্বিতীয় অক্ষর পুরুষ—সামান্যতঃ অক্ষর-পুরুষরূপ ব্রহ্ম হইতে উত্তম, তিনিই ঈশ্বর এবং লোকত্রয়ে প্রবিষ্ট হইয়া ভর্তৃস্বরূপে বিরাজমান। উপাধি-ধর্ম্মের সংস্পর্শ না থাকা হেতু ভগবানই পুরুষোত্তম। মহৎস্রষ্টা কারণার্ণবশায়ী, সমষ্টি জীবান্তর্য্যামী গর্ভোদকশায়ী এবং ব্যষ্টি জীবান্তর্য্যামী পুরুষত্রয় হইতেও উত্তম বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই পুরুষোত্তম। শ্রীভগবান্ সর্ব্বদাই পুরুষতত্ত্ব, তিনি স্ত্রী বা ক্লীব নহেন। তাঁহার পুরুষতত্ত্বের বিচার অবগত হইলেই তাঁহাতে স্ত্রী বা ক্লীবত্বের বিচার-ভ্রম দূরীভূত হয়। যাবতীয় বিষ্ণুতত্ত্বই পুরুষ, সেই বিষ্ণুতত্ত্বগণের মধ্যে যিনি উত্তম অর্থাৎ উৎকৃষ্টতম বা পরম, তিনিই—পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ।

পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মমর্য্যাদা রক্ষণের নিমিত্ত দেব-নরাদি বিভিন্ন যোনিতে নিত্যমূর্ত্তি প্রকট করিয়া থাকেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীভাগবতে (ভাঃ ৩।৯।১৯) সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা ভগবানের স্তব করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—"হে ভগবন্! আপনি স্বেচ্ছাক্রমে তির্য্যক্, দেব, নরাদি জীবযোনিতে স্বীয় নিত্যমূর্ত্তি প্রকট করিয়া এবং আত্মারামতাহেতু বিষয়সুখ হইতে নিরস্ত হইয়াও নিজকৃত ধর্ম্মমর্য্যাদা পালনের জন্য ক্রীড়া করিয়া থাকেন। অতএব আপনিই পুরুষোত্তম।" 'পুরুষোত্তম'ই বেগশালী কালস্বরূপ অর্থাৎ এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের কারণস্বরূপ। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের সহিত মনঃকল্পিত পুরুষোত্তমের কোনপ্রকারে তুলনা হইতে পারে কি ? শ্রীভাগবতে (ভাঃ ১১।৬।১৫) সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার ভগবানের প্রতি স্তব হইতে পাওয়া যায়,—"হে দেব! শ্রুতিগণ প্রকৃতি, পুরুষ ও মহত্তত্ত্বেরও নিয়ন্তৃরূপে বর্ণন করিয়া থাকেন, সুতরাং আপনিই এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের কারণস্বরূপ। হে নাথ! আপনিই ভুবনের সংহারার্থে প্রবৃত্ত চাতুর্ম্মাস্যত্রয়রূপ ত্রিনাভিযুক্ত সংবৎসরাত্মক অতীব বেগশালী কালস্বরূপ, অতএব আপনিই পুরুষোত্তম।"

সত্ত্বরজোতমো গুণাধীন মায়াবদ্ধ জীবের ঈশ্বরাভিমান বা পুরুষোত্তমাভিমান করা অনুচিত। নাসাবদ্ধ বলীবর্দ্দের ন্যায় যাহাকে কাল সর্ব্বদাই ভবচক্রে ঘুরপাক খাওয়াইতেছে, তাহার 'পুরুষোত্তম' অভিমান সাজে কি ? এই প্রসঙ্গে ব্রহ্মাদি দেবগণ শ্রীভাগবতে (ভাঃ ১১।৬।১৪) ভগবানের স্তব করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—"হে প্রভো! নাসাবদ্ধ বলীবর্দ্দকে তাহার চালক যে কার্য্যে নিযুক্ত করেন, সে যেমন সেই কার্য্যই করিতে বাধ্য হয়, আমরাও তেমন আপনার ইচ্ছাধীনে থাকিয়া স্ব-স্ব নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য পালন করিতেছি। আমরা ঈশ্বরাভিমানী হইলেও প্রকৃতপক্ষে আমরা ঈশ্বর নহি। কেন না, যে রজোতমো গুণের ক্রিয়া—মৎসরাদি দোষ, আমরা সেই রজোতমো গুণাধীন। আমরা কালভয়ে ভীত, কাল আমাদের নিয়ন্তা, কিন্তু আপনার কোন নিয়ন্তা নাই। আপনি প্রকৃতি পুরুষ হইতেও শ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তম। আপনার চরণ আমাদিগের সুখবিস্তার করুন।" অতএব পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের সাধন-ভজনে নিযুক্ত হইলেই 'পুরুষোত্তমাভিমানীর' অথবা তাহার অনুগামিগণের প্রকৃত কল্যাণ হইবে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা-জয়ন্তী

মঙ্গলাচরণ

অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুররে নমঃ॥
অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥
নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥
নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥
হে কৃষ্ণ! করুণাসিন্ধো! দীনবন্ধো! জগৎপতে!
গোপেশ! গোপিকাকান্ত! রাধাকান্ত! নমোঽস্তু তে॥
তপ্ত-কাঞ্চন গৌরাঙ্গি রাধে! বৃন্দাবনেশ্বরী!
বৃষভানুসুতে দেবি! প্রণমামি হরিপ্রিয়ে॥
বৃন্দায়ৈ তুলসীদেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ।
কৃষ্ণভক্তি-প্রদে দেবি! সত্যবত্যৈ নমো নমঃ॥
নারায়ণং নমস্কৃত্যঃ নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

অবতার বন্দনা

এবে বন্দি অবতার শ্রীহরির পায়।
যাহার শ্রবণে পাপ অজ্ঞানতম যায়॥
"নমো নমো মৎস্যরূপ আদ্য অবতার।
প্রলয় সাগর জলে বিচিত্র বিহার॥
হয়গ্রীবরূপে মধু কৈটভ মর্দ্দন।
নমো নমো হয়গ্রীব বেদ-বিচারণ॥

নমো নমো কূর্ম্মরূপ দিব্য অবতার।
অমৃত মথনে ক্ষীরসমুদ্র বিহার॥
নমো যজ্ঞ কলেবর বরাহ মূরতি।
দশন শিখরে ধরি উদ্ধারিলে ক্ষিতি॥
নমো নরসিংহ মহাদৈত্য বিদারণ।
ত্রিভুবনে সাধুজনের ভয় নিবারণ॥
নমো নমো অদ্ভুত বিক্রম বামন।
বলী ছলি পুরন্দরে দিলা ত্রিভুবন॥
নমো রাম ভৃগুপতি দ্বিজ অবতার।
হরিলে ক্ষত্রিয় বধি পৃথিবীর ভার॥
নমো রাম রঘুবর রাবণ-মর্দ্দন।
নমো বাসুদেবকৃষ্ণ দৈবকী নন্দন॥
নমঃ সঙ্কর্ষণ নমঃ প্রদ্যুম্ন চরণে।
অনিরুদ্ধ পদযুগ করিয়ে বন্দনে॥
নমো বুদ্ধরূপ দৈত্য-দানব মোহন।
কল্কিরূপে করিবে ম্লেচ্ছ বিনাশন॥"
ভক্তবাৎসল্য হেতু ধরি এত রূপ।
জগদ্বন্ধু কহে কথা শুনিতে অদ্ভুত॥

সূচনা

প্রথমে বন্দিব গুরু করিয়া ভকতি।
প্রভু শ্রীমৎ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী॥
'গীতা-জয়ন্তী' নামে অপূর্ব্ব গ্রন্থ।
হরি বলি শুন সবে হইয়া একান্ত॥
প্রত্যক্ষ পরোক্ষ আর অপরোক্ষ জ্ঞানে।
পরাৎপর তত্ত্ব হরি না পাই সন্ধানে॥
অধোক্ষজ জ্ঞান আর অপ্রাকৃত জ্ঞানে।
শ্রীহরির লীলাতত্ত্ব জানে বুধজনে॥

নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকর-চয়।
'নিত্য নিত্যানাং' তাহা সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
ভক্তবাৎসল্য তাঁর দেখাইতে জগজন।
নিত্যধাম হৈতে হরি বিশ্বে আগমন॥
দুষ্ট দমি' শিষ্ট পালি' ধর্ম্মের স্থাপন।
এতদর্থে অবতার করেন নারায়ণ॥
জীবের মতন তাঁ'র জন্ম-কর্ম্ম নয়।
'জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যম্' গীতাশাস্ত্র কয়।
অবতার করে হরি নানা রূপ ধরি।
বিশ্বমাঝে ভারতবর্ষে বহু লীলা করি॥
ধন্য মান্য ভারতবর্ষ বহু পুণ্য দেশ।
কত রূপে কত লীলা কৈলা হৃষীকেশ॥
সর্ব্বশাস্ত্র সারতত্ত্ব 'গীতামৃত' দান।
কৃপা করি বিশ্বে দিল কৃষ্ণ-ভগবান্॥
শ্রীহরির করুণামৃত শুন ভাই সব।
জগদ্বন্ধু কহে কথা অমৃত বৈভব॥

ফলশ্রুতি

ধর্ম্মময়ী গীতা-শাস্ত্র শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ।
সর্ব্বশাস্ত্র সারতত্ত্ব কহে মুনিবৃন্দ॥
গীতার পূজা করিলে কৃষ্ণপূজা হয়।
পঠন শ্রবণে কৃষ্ণভক্তি লভ্য হয়॥
গীতাশাস্ত্র সমাদরে থাকে যার ঘরে।
কোন অমঙ্গল নাহি হয় তথাকারে॥
অভিচার ব্রহ্মশাপ চোর দস্যুভয়।
রোগ-শোক গ্রহপীড়া না থাকে তথায়॥
সর্ব্ববেদ সর্ব্বযজ্ঞসম ফল লভে।
শ্রদ্ধা করি' দ্বিজ যদি শুনে ভক্তিভাবে॥
ব্রাহ্মণ শুনিলে মাত্র লভে দিব্যজ্ঞান।
ক্ষত্রিয় পৃথিবীপতি, বৈশ্য ধনবান্॥

শূদ্রে যদি শুনে তার পাপ বিমোচন।
শুনিলেই গীতাশাস্ত্র তরে সর্ব্বজন॥
কলিমল হরহরি সর্ব্বগুণনিধি।
পদে পদে গীতাশাস্ত্র কহে নিরবধি॥
স্ত্রী-জাতি শুনিলে হয় লক্ষ্মী অধিষ্ঠান।
আরোগ্য সৌভাগ্য লভে ধনধান্যবান্॥
যে গৃহেতে গীতাশাস্ত্র পূজা-পাঠ হয়।
গোপ-গোপীসহ কৃষ্ণ তথা বিরাজয়॥
যেই গৃহমাঝে হয় গীতাশাস্ত্র কথা।
লক্ষ্মীসহ নারায়ণ বাস করেন তথা॥
গয়া-গঙ্গা-প্রয়াগাদি সর্ব্বতীর্থগণে।
রহে তথা দেব-ঋষি-মুনিবৃন্দ সনে॥
শ্রীহরিবাসরে আর শ্রাদ্ধ পর্ব্বদিনে।
গীতাশাস্ত্র শুনিলে যায় বৈকুণ্ঠভবনে॥
মৃত্যুকালে গীতাপাঠ করিলে শ্রবণ।
মহাপাতকীও যায় বৈকুণ্ঠভবন॥
সর্ব্ব মহাপ্রায়শ্চিত্ত শ্রবণেতে হয়।
সর্ব্বপাপ মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠেতে যায়॥
গীতা-ভাগবতে হিংসা অনাদর যার।
গুরু হোক শিষ্য হোক নরক তাহার॥
অহঙ্কার দম্ভ ছাড়ি' গীতাপাঠ শুনে।
সভক্তি প্রণাম করে বৈষ্ণব-চরণে॥
সু-পুত্র সৌভাগ্য যশ আরোগ্য লভয়।
সকলের প্রিয় হয় নাহিক সংশয়॥
সর্ব্ববাঞ্ছা সিদ্ধি হয় করিলে শ্রবণ।
"গীতা-জয়ন্তী" জয় বল সর্ব্বজন॥
মুনি বলে—ওহে রাজা! কর অবধান।*
গীতাশাস্ত্র শ্রবণেতে অশেষ কল্যাণ॥

---

* মুনি—বৈশম্পায়ণ, রাজা—জনমেজয়।

দিনেকে শুনিলে সর্ব্বপাপ বিমোচন।
দ্বিতীয় দিবসে সকল বাসনা পূরণ॥
তৃতীয় দিবসে সর্ব্ব মায়াবন্ধ নাশ।
চতুর্থ দিবসে কৃষ্ণে সুদৃঢ় বিশ্বাস॥
পঞ্চম দিবসে কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ পায়।
ষষ্ঠ দিনে হয় তার সদ্‌গুরু আশ্রয়॥
সপ্তাহ শ্রবণে নর যায় কৃষ্ণধামে।
নিরন্তর শ্রবণের মহিমা কে জানে ?? (ক্রমশঃ)

—শ্রীজগদ্বন্ধু দাস ব্রহ্মচারী

———

শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী-তিথিতে

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ, শিলিগুড়ি (দার্জ্জিলিং), তাং—৪।৯।১৯৯২]

সর্ব্বাগ্রে অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামিচরণে অনন্তকোটী সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ-প্রণতি জ্ঞাপন করি। তদনন্তর পূজনীয় বৈষ্ণববৃন্দ, সুধী সজ্জনবৃন্দ, মাতৃমণ্ডলী-চরণেও আমার অসংখ্য দণ্ডবৎ। আজ শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী-তিথি। শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমীর ১৫ দিন পরে এই রাধাষ্টমী-তিথি সমাগতা। প্রাকৃত কাল-গণনায় দুজনের আবির্ভাবের মধ্যে যেন ১৫ দিনের ব্যবধান আমরা লক্ষ্য করছি। কিন্তু ভগবানের অপ্রাকৃত লীলার ক্ষেত্রে পার্থিব জগতের প্রাকৃত কাল-গণনার বিচার ঠিক নয়।

শ্রীরাধাষ্টমী-তিথি বলতে গেলে সাধারণভাবে আমরা রাধারাণীর আবির্ভাব-তিথিকে লক্ষ্য করি। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব—ভগবানের আবির্ভাব যেমন জীবহৃদয়ে, ভক্তহৃদয়ে, বৈষ্ণবহৃদয়ে প্রতিক্ষণে ক্ষণে সম্ভব হয়, শ্রীরাধাদেবীর আবির্ভাবও তদ্রূপ। ভগবানের আবির্ভাব যেখানে সম্ভব, সেখানে তাঁর নিজস্ব শক্তি—চিচ্ছক্তি, স্বরূপশক্তি বা অন্তরঙ্গা শক্তি বা হ্লাদিনী শক্তির প্রাকট্য বা আবির্ভাবও সম্ভব। সনাতন শাস্ত্র আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই—

শক্তিছাড়া শক্তিমানের কোন পরিচয় নাই, শক্তিমান্ ছাড়াও শক্তির কোন পরিচয় নাই। শক্তি-শক্তিমান্ তত্ত্ব অভেদ। "শক্তিশক্তিমতোরভেদঃ"—বেদান্তদর্শনের এই সূত্রটীতে এই তত্ত্বদর্শনটা প্রমাণ করছেন। শক্তি এবং শক্তিমান্ অভেদ অর্থাৎ একই বস্তু। তথাপি যদি জিজ্ঞাসা হয়,—তত্ত্বসিদ্ধান্ত ক্ষেত্রে আমাদের আরাধ্যদেবতা কে? আমাদের আরাধ্যদেব পুরুষ, না স্ত্রী; তিনি শক্তিমান্ তত্ত্ব, না শক্তিতত্ত্ব? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে,—তিনি এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম ভগবান্, পরমপুরুষ, পুরুষোত্তম, লীলাপুরুষোত্তম। 'লীলাপুরুষোত্তম' বললে কি তাঁর নিজস্ব প্রকৃতিকে অস্বীকার করা হল? নিশ্চয় নয়, যেহেতু 'শক্তিশক্তিমতোরভেদঃ'—শক্তি-শক্তিমান্ একই বস্তু। শক্তিমান্ মানে সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত তত্ত্ব তিনি। শক্তিমান্ মানে নিখিল শক্তির আশ্রয় তিনি। শক্তিমান্ যিনি, তিনি কি শক্তির অধীন? শক্তিমান্ যিনি, শক্তির বশীভূত কি তিনি? —শাস্ত্র আলোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায়, তিনি শক্তিকে নিয়েই সম্পূর্ণ বা পরিপূর্ণ। তথাপি তত্ত্ব-সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে উপাস্যতত্ত্ব নির্ণীত হয়েছে যেখানে, সেখানে বলছেন,—সেই পরমারাধ্য বাস্তববস্তু পুরুষোত্তম, লীলাপুরুষোত্তম।

আমরা যদি কেবল পরমপুরুষকে মানি, যদি তাঁর শক্তিকে না মানি, তাহলে তত্ত্ববস্তু স্বীকৃত হয় না। আবার যদি বলি,—আমরা শক্তিকে মানব, শক্তিমান্‌কে মানব না, তাহলেও তত্ত্ববস্তু স্বীকৃত হল না। কিন্তু তত্ত্বসিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে শক্তিমান্ তত্ত্বেরই উপাসনার কথা শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। যদি বলেন এ আলোচনা কেন?—এ আলোচনার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বেদে, বেদান্তে, উপনিষদে, গীতা, ভাগবতে এ আলোচনা করা আছে। আমাদের আরাধ্যবস্তু কে? "অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥"—কথাটা বলা হয়েছে। অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব হচ্ছেন—আরাধ্যদেব শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন। সেখানে তাঁর শক্তির কথাও আলোচনার ক্ষেত্রে এসেছে। শাস্ত্র আলোচনা করলে আমাদের কাছে এটা পরিস্ফুট যে, শক্তি—শক্তিমানেরই আশ্রিতা। কৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিমান্, নিখিল শক্তির মূলাধার, তাহলে শক্তি তাঁর অধীন। এটা অস্বীকার করবার উপায় নাই। তথাপি শক্তি-শক্তিমানের ক্ষেত্রে যদি পৃথক্ পৃথক্ বিচার করা যায়, তাহলে দেখা যাবে কেউ কারও ছাড়া নন।

শক্তি-শক্তিমানের যখনই আমি একটা দিক্ বাদ দিচ্ছি, তখন তত্ত্বসিদ্ধান্ত ফেল করল। এ কেমন বিচার! এই একদেশদর্শী হয়েই পঞ্চোপাসনার সৃষ্টি হয়েছে। একদেশদর্শী বিচারের জন্য বহুঈশ্বরবাদের কল্পনা এসেছে। যখন আমরা তত্ত্ববস্তুকে

কেবলমাত্র শক্তি বলেই মনে করছি, তার থেকে এল—জড় শাক্তেয় মতবাদ। তত্ত্ববস্তুকে যখন আমরা কেবল জ্যোতিঃ বলে মনে করছি, জ্যোতির্ম্ময়ের চিন্তা বাদ দিয়ে কেবল জ্যোতিকে নিয়ে চলতে চাচ্ছি, তখন এল সৌরবাদ। তত্ত্ববস্তুকে যখন আমরা কেবল মনুষ্য সংজ্ঞা দিচ্ছি, তার থেকে এল গাণপত্যবাদ। তত্ত্ব-বস্তুকে যখন একটা নীতি-আদর্শপরায়ণ ব্যক্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত করছি, তার থেকে এল জড় শৈববাদ। তত্ত্ববস্তুকে যখন আমি বৈষ্ণবত্বে স্থাপন করছি, কিন্তু সেই আরাধ্য বিষ্ণু প্রাকৃত গুণাধীন—অথচ যাঁকে শাস্ত্রের সব জায়গায় বলা হয়েছে তিনি গুণাতীত। এই পঞ্চোপাসনার মধ্যে যে বৈষ্ণব-দর্শন এটা কিন্তু প্রাকৃত। এই বিষ্ণুকে কর্ম্মফলাধীন বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। পাঁচটা জিনিসই তাহলে ভুলের মধ্যে আছে, সঠিক শাস্ত্রীয় তত্ত্বদর্শনের মধ্যে নাই। অথচ এই পাঁচটা বিষয় খুব সুন্দরভাবে আজ চালু হয়েছে সমাজে। মালিকের মালিকানা অস্বীকার করা, যাকে বলে বাহাদুরি, সেই জিনিসটা এই পাঁচটার বিচারের মধ্যে রয়েছে।

বিশুদ্ধভাবে নারায়ণ, বিষ্ণুর উপাসনা বা কৃষ্ণের উপাসনার মধ্যে প্রাকৃত কোন জড়ীয় বিচার নাই। ভগবান্ হরি যাঁকে বলা হচ্ছে, তিনি হচ্ছেন নির্গুণ—গুণাতীত। 'নির্গুণ' মানে তাঁর কোন গুণ নাই তা নয়, তিনি সর্ব্বগুণে গুণান্বিত তত্ত্ব; কিন্তু প্রাকৃত গুণের অতীত—এই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ভাগবতের মধ্যেও সেরূপ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।—"হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।" ভগবান্ শ্রীহরি নির্গুণ, গুণাতীত, লোকাতীত, মায়াতীত—এসব অপ্রাকৃত বিশেষণগুলো দেওয়া হয়েছে। সুতরাং সেই যে প্রেমময় ভগবান্ তিনি গুণাতীত, তিনি শক্তিমান্। শক্তিকে সেখানে অস্বীকার করা হয় নাই। কিন্তু তত্ত্ববস্তু—উপাস্যবস্তু হচ্ছেন শক্তিমান্তত্ত্ব। এখন এই 'শক্তিশক্তিমতোরভেদঃ' বিচারটা যখন আর একটা সূত্রের মধ্যে এসেছে, যাঁকে বলছেন উপাস্যদেব পুরুষোত্তম, লীলাপুরুষোত্তম, সেক্ষেত্রে ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন নাই। "একমেব সচ্চিদানন্দরসাদিরূপং তত্ত্বং দ্বিধাবিভূতম্॥" এর দুটো অর্থ করেছেন। এক অর্থ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী করেছেন,—"রাধাকৃষ্ণ ঐছে দুই একই স্বরূপ। লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥" এক কৃষ্ণমূর্ত্তি দ্বিধাবিভক্ত হলেন—শক্তি এবং শক্তিমান্রূপে। অপর একটী ব্যাখ্যা দিচ্ছেন,—সেই পরতত্ত্ব ভগবান্ তিনি শ্রীবিগ্রহরূপে এবং শ্রীনামরূপে জগতে প্রকটিত, আবির্ভূত হয়ে ভক্তকে কৃপা করে যাচ্ছেন। এই দুটো ব্যাখ্যাই দেওয়া আছে।

যিনি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি—হ্লাদিনীশক্তি শ্রীরাধাদেবী, যাঁর আজ আবির্ভাব-

তিথি, তিনি ভগবানের সঙ্গে কিরূপ সম্পর্কযুক্ত ?—এটা আলোচ্য বিষয়। ভগবান্ অনন্তশক্তিমান্, অনন্ত শক্তির মূলাধার। অনন্তশক্তির কথা শাস্ত্রে উল্লেখ করলেও সব শাস্ত্রে—বেদে, বেদান্তে, উপনিষদে প্রধানতঃ তিনটী শক্তি—স্বরূপশক্তি বা অন্তরঙ্গা শক্তি বা হ্লাদিনী শক্তি, মায়াশক্তি ও জীবশক্তি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিষ্ণুপুরাণের মধ্যে একটী শ্লোক আছে,—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথা পরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥

এই তিন শক্তির ভিতরে সব শক্তি এসে গেছে মোটামুটি। অনন্ত শক্তির সব শক্তি ধরা পড়েছে এই তিন শক্তির মধ্যে। যদি জিজ্ঞাসা করা হয়,—রাধাদেবী কি শক্তি ?—তখন প্রথমমুখে উত্তর এসেছে তিনি চিচ্ছক্তি। তারই ব্যাখ্যা দিয়েছেন—স্বরূপশক্তি, অন্তরঙ্গা শক্তি, হ্লাদিনী শক্তি, পরাশক্তি। শাস্ত্রান্তরে এ সব শব্দ ব্যবহার হয়েছে। রাধা-শব্দটা এসেছে—'তৎ রাসে ধারণাৎ রাধা বিদ্বদ্ভিঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।' রাসস্থলীতে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক আলিঙ্গিতা যে বিগ্রহ, তিনি হলেন রাধা। আবার শ্রীমদ্ভাগবতের ভিতরে আমরা অনেক তত্ত্বসিদ্ধান্ত পাচ্ছি। অনেকে কিছু বাহাদুরি করে প্রশ্ন করেন আমাদের কাছে, মশায়! ভাগবত ত' আপনাদের বিশেষ আলোচ্য গ্রন্থ। কিন্তু এর ভিতরে ত' রাধার নাম পাওয়া যায় না! আসলে তাঁরা ভাগবত পড়েন নাই ত'! শ্রীমদ্ভাগবত যেভাবে আলোচনা করার কথা, সেভাবে তাঁদের আলোচনা হয় নাই, অনুশীলন হয় নাই। সুতরাং তাঁরা ভাগবতের ভিতরে রাধা-নাম খুঁজে পান নাই। কিন্তু যাঁরা বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন, তাঁরা রাধার নামও পেয়েছেন, আর রাধার গণের নামও পেয়েছেন।

অক্রূর যখন কৃষ্ণ-বলরামকে নিয়ে আসছেন মথুরায়, যখন রথে উঠেছেন কৃষ্ণ-বলরাম, অক্রূর যখন রথ হাঁকিয়েছেন, সেইসময় গোপীগণ সব বাধা দিচ্ছিলেন। কেউ রথের চাকা ধরে টানছেন, কেউ রথের চাকার তলে শুয়ে পড়েছেন, কেউ ঘোড়াগুলোকে টেনে ধরেছেন এগিয়ে যেতে দেবেন না। সেখানে যে বর্ণনা আছে, ঠিক ঐ ভাবটা নিয়ে বিল্বমঙ্গল ঠাকুর 'শ্রীগোবিন্দ-দামোদর-স্তোত্রম্' লিপিবদ্ধ করেছিলেন। ওখানে যে শ্লোক আছে সেইরকম শ্লোক এর ভিতরে অধিকাংশগুলো।

এবং ব্রুবাণা বিরহাতুরা ভৃশং, ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণ-বিষক্তমানসাঃ।
বিসৃজ্য লজ্জাং রুরুদুঃ স্ম সুস্বরং, গোবিন্দ! দামোদর! মাধবেতি ॥

চিৎকার করছেন তাঁরা, কাঁদছেন তাঁরা। তাঁদের ভাবটা কি ?—বিরহাতুর,

কৃষ্ণবিরহকাতর সেই গোপীগণ। 'ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণ-বিষক্তমানসাঃ' অর্থাৎ কৃষ্ণ ছাড়া অন্য কাউকে তাঁরা জানেন না। "লজ্জা, ঘৃণা, ভয়—তিন থাকতে নয়।" এখানে লজ্জা, ঘৃণা, ভয় সব চলে গেছে। লজ্জা ছেড়ে দিয়ে তাঁরা চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করেছেন। 'রুরুদুঃ স্ম সুস্বরং, গোবিন্দ! দামোদর! মাধবেতি॥' কাঁদবার ভাষাটা কি?—হে গোবিন্দ! হে দামোদর। হে মাধব! তুমি আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছ! তুমি এত নিষ্ঠুর! এই যে ভাবটা, এবং এর সঙ্গে রাধারাণীও আছেন, সে ভাবটা ব্যক্ত হয়েছে আরও পরে। সে শ্লোকও রয়েছে,—

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥

'অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।'—ঈশ্বর হরি রাধা-কর্ত্তৃক অধিকভাবে আরাধিত হয়েছেন। যিনি ভগবানকে সব থেকে অধিক আরাধনা করেছেন—উপাসনা করেছেন, যাঁর থেকে অধিক আরাধনা জগতের কোন শক্তিই করতে পারেন নাই, তিনি হলেন শ্রীরাধা। এখানে একটু চেপেচুপে বলা হয়েছে। কেন?—কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস এত গূঢ় রহস্যযুক্ত তত্ত্বটাকে সকলের সামনে প্রকাশ করতে চান নাই। সেই ব্যাখ্যাকে পরিস্ফুট করেছেন কবি জয়দেব তাঁর পদাবলী আলোচনার ক্ষেত্রে। তিনি নিজেই বলেছেন শ্রোতাদের, কীর্ত্তনীয়াদের। কি বলেছেন?—

যদি হরিস্মরণে সরসং মনঃ, যদি বিলাস-কলাসু কুতূহলম্।
মধুর-কোমল-কান্ত-পদাবলীং, শৃণু তদা জয়দেব-সরস্বতীম্॥

যদি শ্রীকৃষ্ণস্মরণে চিত্ত রসপূর্ণ হয়ে থাকে, যদি রাধাকৃষ্ণের রাসকুঞ্জ প্রভৃতি বিবিধ রাসলীলায় প্রবেশ করবার জন্য কৌতূহল হয়ে থাকে, এরূপ ধরণের আলোচনা যদি তোমাদের বিষয়ীভূত হয়, তাহলে জয়দেব-সরস্বতীর মধুর, কোমল ও রমণীয় পদাবলী আলোচনা কর। অপ্রাকৃত কবি শ্রীজয়দেব গোস্বামী নিজেই বলে দিলেন 'অনয়ারাধিতো নূনং' শ্লোকের ব্যাখ্যা। কি শ্লোকটা?—

কংসারিরপি সংসার-বাসনাবন্ধ-শৃঙ্খলাম্।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ॥

এখানে শ্রীজয়দেব পরিষ্কার করে বলে দিলেন এই শ্লোকে। তাঁর বিভিন্ন পদাবলীতে আছে ওটা। "ধীর-সমীরে, যমুনা-তীরে, বসতী বনে বনমালী।" —এই পদের মধ্যেও ব্যাখ্যা করা হয়েছে ভাবটা। তাহলে একজন জিনিসটা চেপেচুপে রাখছেন, আর একজন জিনিসটা পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা দিয়ে যাচ্ছেন,

ব্যাপারটা কি?—একজন ভাবছেন এটা সকলের কাছে দেওয়া যাবে না, এটা অপাত্রে দান করা যাবে না, বুঝে-সুঝে বিলোতে হবে। আবার আর একজন পরম উদারনৈতিক মনোভাব নিয়ে দিয়ে দিচ্ছেন সকলকে,—তোমাদের যার যার অধিকার আছে, তোমরা বুঝে নাও। এই দুইয়ের ভিতরে কিন্তু সামঞ্জস্য আছে। যিনি দিতে চাচ্ছেন না, এবং যিনি দিয়ে দিলেন—তোমাদের অধিকার অনুসারে তোমরা গ্রহণ কর, এই দুইয়ের মধ্যে কিন্তু কারও উদারতা কম নাই। যিনি একটু চেপেচুপে রেখে দিতে চাচ্ছেন, তাঁর ভিতরেও উদারতার অভাব নাই। তিনি ত' অধিকার বিচারে টেনে রেখে দিয়েছেন। আর একজন বলছেন,—তোমাদের পরে ছেড়ে দিলাম, তোমরা নিজেরা তোমাদের অধিকার বিচার করে আলোচনা কর, অনুশীলন কর। অতএব সবটার মধ্যে সামঞ্জস্য আছে।

রাধাতত্ত্ব খুব গম্ভীর তত্ত্ব, অত্যন্ত গোপনীয় তত্ত্ব। সেইজন্য কিছু লুকোচুরি করতে হচ্ছে পদকর্ত্তাদের ক্ষেত্রে, যাঁরা পদ প্রকাশ করছেন তাঁদের ক্ষেত্রে। রাধাতত্ত্ব বিশেষভাবে বিবৃত হয়েছে গোস্বামী-গ্রন্থে। তারও অনেক পূর্ব্বে রাধাতত্ত্ব বিবৃত হয়েছে 'গর্গসংহিতা'র মধ্যে। আরও কবি জয়দেবের গ্রন্থের মধ্যেও রয়েছে। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের 'রাধারস-সুধানিধিঃ' গ্রন্থখানা শুধু শ্রীরাধামাধবের নিগূঢ় তত্ত্বে—লীলা-রহস্যে পরিপূর্ণ। (ক্রমশঃ)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাসার

কৃষ্ণপ্রেমই জীবের নিত্যধর্ম্ম-ধন। সেই ধর্ম্মধন হইতে জীব কখনই বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। কিন্তু কৃষ্ণবিস্মৃতিক্রমে মায়ামোহিত হইয়া অন্য বিষয়ে অনুরাগ হওয়ায় ক্রমশঃ সেই ধর্ম্ম গুপ্তপ্রায় হইয়া জীবাত্মা অন্তঃকোষে লুক্কায়িত হইয়াছে। তাহাতেই জীবের সংসার-দুঃখ। পুনরায় সৌভাগ্য-ঘটনাক্রমে জীব যদি 'আমি নিত্য কৃষ্ণদাস' এই কথাটি স্মরণ করেন, তবে উক্ত ধর্ম্ম পুনরুদিত হইয়া জীবের স্বাস্থ্যবিধান অবশ্যই করিবে।

ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং তদ্রূপ-বৈভব শ্রীধাম-বৃন্দাবনই আরাধ্যবস্তু। ব্রজবধূগণ যেভাবে কৃষ্ণের উপাসনা করিয়াছিলেন, সেই উপাসনাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থই নির্ম্মল শব্দপ্রমাণ এবং প্রেমই পরম পুরুষার্থ—ইহাই শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর মত।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন। কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনে চিত্তদর্পণ পরিপূর্ণভাবে মার্জ্জিত হয়, ভীষণ সংসার-দাবানল হেলায় সর্ব্বতোভাবে নির্ব্বাপিত হয়, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আত্মমঙ্গল পূর্ণবিকসিত হয়। কৃষ্ণ-কীর্ত্তন—পরাবিদ্যা বা ভক্তির জীবন-স্বরূপ। কৃষ্ণ-কীর্ত্তন

প্রেমানন্দের সংবর্দ্ধনকারী; কৃষ্ণকীর্ত্তন—পদে পদেই পরিপূর্ণ অমৃত আস্বাদন করাইয়া থাকে এবং কৃষ্ণকীর্ত্তন-প্রভাবেই জীবগণ সুশীতল কৃষ্ণপাদপদ্মসেবা-সমুদ্রে অবগাহন করিতে পারে।

নাম ও নামীতে কোন ভেদ নাই। নামী ভগবান্ নিজনামে সর্ব্বশক্তি অর্পণ করিয়া তাহা জগতে অবতীর্ণ করাইয়াছেন। নাম-কীর্ত্তনে কালাকাল, স্থানাস্থান বা পাত্রাপাত্র-বিচার নাই। কিন্তু দুর্দ্দৈব অর্থাৎ অপরাধ থাকিলে নামে রুচি হয় না। সেই অপরাধ দশপ্রকার; তন্মধ্যে শুদ্ধভক্তের নিন্দাই প্রথম অপরাধ।

তৃণ হইতে সুনীচ, তরু হইতেও সহিষ্ণু, নীজে অমানী ও অপরকে মানদানকারী হইয়া সর্ব্বক্ষণ হরিনাম কীর্ত্তন করিতে হইবে। "তৃণাদপি সুনীচেন"-বাক্যের অর্থ এই যে,—জীব এই জড়জগতের অন্তর্গত কোন বস্তু নহে, বস্তুতঃ জীব—অপ্রাকৃত, অণুচৈতন্য, শ্রীগুরুপাদপদ্মের রেণু।

হরিকীর্ত্তনকারী হরিনামের নিকট ধন, জন, কামিনী, জাগতিক কবিত্ব বা বিদ্যা অর্থাৎ কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা প্রার্থনা করিবেন না। অধিক কি, পুনর্জ্জন্ম হইতেও মুক্তি চাহিবে না। প্রতি জন্মে কৃষ্ণপাদপদ্মে অহৈতুকী ভক্তি অর্থাৎ কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ব্যতীত অন্যকামনা করিলে কখনও কৃষ্ণপ্রেম লাভ হইবে না।

জীব নিজ স্বরূপকে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের ধূলিকণা-সদৃশ জানিয়া সর্ব্বদা উৎকণ্ঠার সহিত শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিবে।

নাম গ্রহণ করিতে করিতে সিদ্ধির বাহ্য-লক্ষণে অষ্টসাত্ত্বিক বিকারসমূহ স্বতঃই অঙ্গে প্রকাশিত হইবে।

সিদ্ধির অন্তর্লক্ষণে কৃষ্ণসেবা ব্যতীত নিমেষকালও যুগের ন্যায় মনে হইবে। অন্তরের অকৃত্রিম সেবাব্যাকুলতাজনিত অশ্রু বর্ষাকালের বারিধারার ন্যায় প্রবাহিত হইবে অর্থাৎ জগদ্‌ভোগের পিপাসার পরিবর্ত্তে সকল বস্তুর দ্বারা কেবল কৃষ্ণসেবার জন্য ব্যাকুলতা হইবে।

কৃষ্ণ তাঁহার নিরঙ্কুশ ইচ্ছায় যদি দেখা দেন—ভাল, আর যদি না দেখা দিয়া মর্ম্মাহত করেন, তথাপি সেই স্বতন্ত্র পরমপুরুষের অব্যভিচারিণী সেবা-লাভের আশাতেই পড়িয়া থাকিতে হইবে; একমাত্র কৃষ্ণই যথাসর্ব্বস্ব।

(১) আম্নায়-(বেদ) বাক্যই প্রধান প্রমাণ। শ্রীমদ্ভাগবত সেই বেদ-কল্পতরুর প্রপক্ক ফল এবং ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিক ভাষ্য, (২) কৃষ্ণই পরমতত্ত্ব, (৩) তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, (৪) তিনি সমস্ত রসামৃতের সমুদ্র, (৫) জীবসকল শ্রীহরির বিভিন্ন অণুঅংশ, (৬) জীব তটস্থশক্তি হইতে প্রকাশিত বলিয়া মায়াদ্বারা বশীভূত হইবার যোগ্য, (৭) তটস্থধর্ম্মবশতঃই জীব আবার মায়া হইতে মুক্ত হইবারও যোগ্য, (৮) জীব ও জড়—সমস্ত বিশ্বই শ্রীহরি হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ, (৯) শুদ্ধভক্তিই জীবের সাধন ও (১০) কৃষ্ণপ্রেমই জীবের একমাত্র প্রয়োজন বা সাধ্য।

———

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।



ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্‌॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪৫শ বর্ষ | ১৫ হৃষীকেশ, প্রত্যূষ, ৫০৭ শ্রীগৌরাব্দ
৩২ শ্রাবণ, মঙ্গলবার, ১৪০০, ইং ১৭/৮/৯৩ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সানুবাদং শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস-বিলিখিতম্

শ্রীশিব-কৃতম্‌ শ্রীশ্রীবদরীনারায়ণ-স্তোত্রম্‌

[শ্রীস্কান্দে বিষ্ণুখণ্ডে বদরীমাহাত্ম্যে পঞ্চমেঽধ্যায়ে]

শিব উবাচ,—

১। যস্য দর্শন-মাত্রেণ পাতকানি মহান্ত্যপি।
বিলীয়ন্তে ক্ষণানেব সিংহং দৃষ্ট্বা মৃগা ইব॥ ২৫॥

শিব বলিলেন,—যাঁহার দর্শনমাত্র মহাপাপসকলও সিংহ-দর্শনে মৃগের ন্যায় ক্ষণ-কালমধ্যে বিলীন হয়॥ ১॥

২। ধর্ম্মাধর্ম্মান্‌ বিজিত্যাথ বদরীশং বিভুং হরিম্‌।
দৃষ্ট্বা মুক্তিমুপায়ান্তি বিনায়াসং ষড়ানন॥ ২৬॥

হে ষড়ানন! যিনি নিখিল ধর্ম্ম ও অধর্ম্মকে জয় করিয়া **বদরীর** ঈশরূপে বিরাজিত, যে বিভু হরিকে দর্শন করিয়া বিনা আয়াসে মানবগণ মুক্তিলাভ করে ॥২॥

৩। ত্যক্ত-প্রায়াণি তীর্থানি হরিণা কলিকালতঃ।
বদরীং সমনুপ্রাপ্য সাক্ষাদেবাবতিষ্ঠতে ॥ ২৭ ॥

কলিকাল সমাগত দেখিয়া যিনি প্রায় সকল-তীর্থ পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই সাক্ষাৎ বিভু হরি সম্প্রতি **বদরী-ক্ষেত্রে** অবস্থান করিতেছেন ॥ ৩ ॥

৪। কলিকালমনুপ্রাপ্য মুক্তির্যেষামভীপ্সিতা।
দ্রষ্টব্যা বদরী তৈস্তু হিত্বা তীর্থানশেষতঃ ॥ ২৮ ॥

কলিকালে যে-সকল লোক মুক্তি অভিলাষ করে, অন্যান্য তীর্থ-সকল পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তাহারা **বদরীক্ষেত্র** দর্শন করুক ॥ ৪ ॥

৫। বিনা জ্ঞানেন যোগেন তীর্থাটন-পরিশ্রমৈঃ।
একেন জন্মনা জন্তুঃ কৈবল্যং পরমশ্নুতে ॥ ২৯ ॥

জীব জ্ঞান, যোগ ও তীর্থ-পর্য্যটন-ক্লেশ ব্যতীতই **বদরী-তীর্থ**-দর্শনে একজন্মেই কেবলা ভক্তি-স্বরূপা মুক্তি লাভ করিবে ॥ ৫ ॥

৬। জন্মান্তর-সহস্রৈস্তু যেন চারাধিতো হরিঃ।
স গচ্ছেদ্-বদরীং দ্রষ্টুং যত্র জন্তুর্ন শোচতি ॥ ৩০ ॥

যাহারা সহস্র জন্মান্তরে হরির আরাধনা করিয়াছে, তাহারাই বদরীতীর্থ-দর্শনের জন্য গমন করিতে সক্ষম। এই তীর্থ-দর্শনে জীবের কোন শোকই থাকে না ॥ ৬ ॥

৭। **'বদরী' 'বদরী'**ত্যুক্ত্বা প্রসঙ্গান্মনুজোত্তমঃ।
সংসার-তিমিরাবাধে দীপমুজ্জ্বালয়ত্যসৌ ॥ ৩১ ॥

যে মনুজোত্তম প্রসঙ্গক্রমে **'বদরী বদরী'** এইরূপ নামোচ্চারণ করে, ভীষণ বাধাযুক্ত সংসার-তিমিরে তাহার উজ্জ্বল দীপ দর্শন হয় ॥ ৭ ॥

৮। যথা দীপাবলোকেন তমোবাধা ন জায়তে।
তথৈব বদরীং দৃষ্ট্বা পুংসো মৃত্যু-ভয়ং কুতঃ ॥ ৩২ ॥

দীপ-দর্শনে যেরূপ অন্ধকারের বাধা বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ **বদরী**-দর্শনে মানবের মৃত্যুবাধা কোথায়? ৮ ॥

৯। দর্শনাদ্-যস্য পানানি রুদন্ত্যব্যাহতানি চ।
মুক্তি-মার্গমুপালক্ষ্য তং বন্দে বদরীপতিম্ ॥ ৩৩ ॥

যাঁহার দর্শনে অব্যাহিত পাপসকলও রোদন করে, মুক্তি-মার্গ উপলক্ষ্য করিয়া আমি সেই **বদরীশ্বরকে** বন্দনা করি ॥ ৯ ॥

প্রশ্নোত্তর

অবতার-তত্ত্ব

১। অবতার-তত্ত্ব কি? ভগবান্ কেন জগতে অবতীর্ণ হন?

"মায়াবদ্ধ জীব যে যে ভাব প্রাপ্ত হইয়া যে যে স্বরূপ পাইতেছেন, শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার প্রাপ্তভাব স্বীকার করত নিজ-অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা তাঁহার সহিত আধ্যাত্মিক রূপে অবতীর্ণ হইয়া লীলা করেন। জীব যখন মৎস্যাবস্থা প্রাপ্ত, ভগবান্ও তখন মৎস্যাবতার। মৎস্য—নির্দ্দণ্ড, নির্দ্দণ্ডতা ক্রমশঃ বজ্রদণ্ডাবস্থা হইলে কূর্ম্মাবতার, বজ্রদণ্ড ক্রমশঃ মেরুদণ্ড হইলে বরাহাবতার হন। নর-পশুভাব-গত জীবে নৃসিংহাবতার, ক্ষুদ্র-মানবে বামনাবতার, মানবের অসভ্যাবস্থায়—পরশুরাম এবং সভ্যাবস্থায়—রামচন্দ্র। মানবের সর্ব্ববিজ্ঞানসম্পত্তি হইলে স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র আবির্ভূত হন। মানব তর্কনিষ্ঠ হইলে ভগবদ্ভাব বুদ্ধ এবং নাস্তিক হইলে কল্কি—এইরূপ প্রসিদ্ধ আছে। জীবের ক্রমোন্নত-হৃদয়ে যে-সকল ভগবদ্ভাবের উদয় কালে-কালে দৃষ্ট হইয়াছে, সে-সকলই 'অবতার'। সেই সকল ভাবের উৎপত্তি ও কার্য্যসকলে প্রাপঞ্চিকত্ব নাই। ঋষিরা জীবগণের উন্নতির ইতিহাস আলোচনা করত ঐতিহাসিক কালকে দশ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যে-যে সময়ে একটী একটী অবস্থান্তর লক্ষণ রূঢ়রূপে লক্ষিত হইয়াছে, সেই সেই কালের উন্নত ভাবকে 'অবতার' বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। কোন কোন পণ্ডিতেরা কালকে চব্বিশ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—কেহ কেহ অষ্টাদশ ভাগ করিয়া তৎসংখ্যক অবতার নিরূপণ করিয়াছেন।"

—কৃঃ সং ৩।৫-১১ অনুবাদ

২। অবতার-তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক বিচার কি?

"অদণ্ডাবস্থা হইতে মনুষ্যের পূর্ণাবস্থা পর্য্যন্ত কোন কোন মহর্ষি অষ্ট, কেহ কেহ অষ্টাদশ এবং কেহ কেহ চতুর্ব্বিংশতি অবতার লক্ষ্য করেন। দশটী অবতারই প্রায় অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক ঋষিদিগের প্রসিদ্ধ মত। ঐ সকল ঋষি জীবের প্রথম বদ্ধাবস্থার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত দশটী বিশেষ বিশেষ অবস্থার কল্পনা করেন। প্রথমে—অদণ্ডাবস্থা, দ্বিতীয়ে—বজ্রদণ্ডাবস্থা, তৃতীয়ে—মেরুদণ্ডাবস্থা, চতুর্থে—উত্থিত-মেরুদণ্ডাবস্থা অর্থাৎ নর-পশু-অবস্থা, পঞ্চমে—ক্ষুদ্র নরাবস্থা, ষষ্ঠে—অসভ্য নরাবস্থা, সপ্তমে—সভ্য নরাবস্থা, অষ্টমে—জ্ঞানাবস্থা, নবমে—অতিজ্ঞানাবস্থা এবং দশমে—প্রলয়াবস্থা। জীবের এই প্রকার ঐতিহাসিক

অবস্থাক্রমে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কি – এই দশটী অবতার অপ্রাকৃত-লীলারূপে লক্ষিত হয়।" —তঃ সূঃ, ৬ সূঃ

৩। আদ্যাবতারের লীলা কি ?

"সৃষ্টিকামযুক্ত সঙ্কর্ষণই প্রপঞ্চোৎপাদনোন্মুখ কৃষ্ণাংশ ; তিনি কারণ-বারিতে আদ্যাবতার-পুরুষরূপে শয়ন করত মায়ার প্রতি ঈক্ষণ করেন। সেই ঈক্ষণই সৃষ্টির নিমিত্ত-কারণ।" —ব্রঃ সং ৫।৮

৪। ভগবদাবির্ভাবের কারণ কি ?

"ঈশ্বরের বিলাস দুই প্রকার, * * * চিদচিদাত্মক ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টি ও অলঙ্ঘ্য-নিয়ম-সকলের দ্বারা জগতের ব্যবস্থা-করণই তাঁহার একপ্রকার বিলাস। শুষ্ক-জ্ঞানীরা এই প্রকার বিলাস যৎকিঞ্চিৎ অনুভব করিতে পারেন। এই রচিত ব্রহ্মাণ্ডে ভগবানের যে লীলা, তাহাই অন্যপ্রকার বিলাস। জীবই ভগবানের লীলার সহচর। জীব ভোগেচ্ছা-পূর্ব্বক নিজ-স্বরূপ হইতে চ্যুত হইয়া জড়সঙ্গ-বশতঃ যে-যে অবস্থা প্রাপ্ত হন, সেই সেই অবস্থায় তদনুরূপ ভগবদাবির্ভাবও দৃষ্টি করেন। জীবের প্রতি অপার কারুণ্যই ভগবদাবির্ভাবের একমাত্র কারণ।"

—তঃ সূঃ, ৬ সূঃ

৫। শ্রীমূর্ত্তি বা অর্চ্চাবতারের প্রয়োজনীয়তা কি ?

"সমস্ত নিরাকার তত্ত্বেরই নিদর্শন আছে। নিদর্শন যদিও লক্ষিত বস্তু হইতে ভিন্ন বটে, তথাপি তদ্দ্বারা তদ্বস্তুর ভাব উপস্থিত হয়। ঘটিকা-যন্ত্রদ্বারা নিরাকার কাল, প্রবন্ধদ্বারা অতি সূক্ষ্ম জ্ঞান এবং প্রতিকৃতিদ্বারা দয়া-ধর্ম্মাদি নিরাকার বিষয়-সকল যখন পরিজ্ঞাত হইতেছে, তখন ভক্তি-সাধনে আলোচ্যগত লিঙ্গরূপ শ্রীবিগ্রহ-দ্বারা যে উপকার হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

—প্রেঃ প্রঃ ৫ম প্রঃ

৬। বৈষ্ণবের শ্রীমূর্ত্তি-সেবা কি পৌত্তলিকতা ?

"বৈষ্ণবেরা যে শ্রীবিগ্রহ পূজা করেন, সে ঈশ্বরাতিরিক্ত একটী পুত্তলিকা নয়, কিন্তু ঈশ্বর-ভক্তির উদ্দীপক ও নিদর্শন-মাত্র।"

—প্রেঃ প্রঃ ৫ম প্রঃ

৭। শ্রীবিগ্রহ ভগবৎস্বরূপের সাক্ষাৎ নিদর্শন কিরূপে ?

"শ্রীবিগ্রহ ভগবৎস্বরূপের সাক্ষাৎ নিদর্শন বই স্বরূপেতর বস্তু হইতে পারেন না। সমস্ত শিল্প ও বিজ্ঞানে যেরূপ অলক্ষিত তত্ত্বের স্থূল প্রতিভূ আছে, শ্রীবিগ্রহও সেইরূপ জড়চক্ষের অলক্ষিত ভগবৎস্বরূপের প্রতিভূ-স্বরূপ। ভক্তদিগের ভগবৎস্বরূপ-প্রতিভূ যে যথাযথ, তাহা ভক্তগণ বিশুদ্ধ ভক্তিবৃদ্ধিরূপ ফল-দ্বারা

অনুক্ষণ পরীক্ষা করিতেছেন। বিদ্যুৎ পদার্থের সহিত বিদ্যুদ্‌যন্ত্রের যে প্রকৃত সম্বন্ধ, তাহা কেবল বিদ্যুৎ-ফলকোৎপত্তিরূপ ফলের দ্বারাই লক্ষিত হয়। তদ্বিষয়ে যাহারা অনভিজ্ঞ, তাহারা বিদ্যুদ্‌যন্ত্র দেখিলে কি বুঝিবে? যাহাদের হৃদয়ে ভক্তি নাই, তাহারা শ্রীবিগ্রহকে পুত্তলিকা বই আর কি বলিতে পারে!"

—চৈঃ শিঃ ৫।৩

৮। ভক্তগণের অর্চ্চাবতারে ও জ্ঞানিগণের প্রতীকে পার্থক্য কি?

"শ্রীমূর্ত্তি প্রথমে জীবের চিদ্বিভাগে প্রতিভাত হইয়া মনে উদিত হন। মন হইতে নির্ম্মিত শ্রীমূর্ত্তিতে ভক্তিযোগে তাহা আবির্ভূত হইয়া পড়েন। তখন ভক্ত তদ্দর্শনে হৃদয়ে যে চিন্ময়-মূর্ত্তি দেখেন, তাঁহার সহিত শ্রীমূর্ত্তির একত্ব করিয়া থাকেন। জ্ঞানবাদীদিগের পূজিত বিগ্রহ সেরূপ নয়; তাহাদের মতে—একটী পার্থিব-তত্ত্বে ব্রহ্মতা কল্পিত হইয়া পূজাকাল পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকে; পরে সেই মূর্ত্তি পার্থিব বস্তু বই আর কিছু নয়।"

—জৈঃ ধঃ ৫ম অঃ

৯। সকল অধিকারীই কি শ্রীবিগ্রহের সেবা করেন?

"প্রতিমা-পূজা মানব-ধর্ম্মের ভিত্তিমূল। মহাজনগণ বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগে পরমেশ্বরের যে মূর্ত্তি দেখিয়াছেন, তাঁহারা ভক্তিপূত চিত্তে সেই শুদ্ধ চিন্ময়-মূর্ত্তির ভাবনা করেন। এইরূপে ভাবিতে ভাবিতে যখন ভক্ত-চিত্ত জড়জগতের প্রতি প্রসারিত হয়, তখনই জড়জগতে সেই চিৎস্বরূপের প্রতিফলন অঙ্কিত হয়। **ভগবৎ-শ্রীমূর্ত্তি এইরূপে মহাজন-কর্ত্তৃক প্রতিফলিত হইয়া প্রতিমা হইয়াছেন। সেই প্রতিমাই উচ্চাধিকারীর পক্ষে সর্ব্বদাই চিন্ময়-বিগ্রহ, মধ্যমাধিকারীর পক্ষে মনোময় বিগ্রহ এবং নিম্নাধিকারীর পক্ষে প্রথমতঃ জড়ময় বিগ্রহ হইলেও ক্রমশঃ ভাবশোধিত-বুদ্ধিতে চিন্ময়-বিগ্রহের উদয় হয়। অতএব সকল অধিকারীর পক্ষেই শ্রীবিগ্রহের প্রতিমা ভজনীয়। কল্পিত মূর্ত্তির পূজার কোন আবশ্যকতা নাই, কিন্তু নিত্য মূর্ত্তির প্রতিমা বিশেষ মঙ্গলময়।"**

—জৈঃ ধঃ ১১শ অঃ

১০। প্রতীক-বিরোধী যুক্তিবাদিগণ মূর্ত্তি-পূজক কিরূপে?

"কেহ কেহ চিত্তে ভক্তি-পরিপ্লুত হইয়া আত্মায়, মনে ও জগতে পরমেশ্বরের প্রতিচ্ছবিরূপ শ্রীমূর্ত্তি সংস্থাপন করেন। তাহাতে তাদাত্ম্যবোধে অর্চ্চন সম্পন্ন করেন। কোন কোন ধর্ম্মে অধিকতর তর্কপ্রিয়তা-নিবন্ধন মনে মনেই একটী ঈশ্বর-ভাব গঠিত করিয়া তাহাতেই উপাসনা করেন, প্রতিমূর্ত্তির স্বীকার নাই। কিন্তু বস্তুতঃ সকলই প্রতিমূর্ত্তি।"

—চৈঃ শিঃ ১।১

১১। সারগ্রাহী বৈষ্ণবগণ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে কি বিচারে দর্শন করেন?

"The system of Jagannath is viewed in two different ways. The superstitious and the ignorant take it as a system of idolatry by worshipping the idols in the temple as God Almighty appearing in the shape of a carved wood for the salvation of the Orias. But the Saragrahi Vaishnavas find the idols as emblems of some eternal truth which has been explained in the Vedanta Sutras of Vyasa."

—*The Temple of Jagannath at Puri.*

(ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

বিষ্ণুর কথা শ্রবণ করিতে হইবে, বিষ্ণু কি জিনিষ জানিতে হইবে। শ্রুতবিষয় কীর্ত্তন করিতে হইবে। কীর্ত্তন-প্রভাবে স্মরণ হইবে। নিরন্তর বিষ্ণুর অনুশীলন করিতে হইবে।

শতকরা শতভাগ দিলে ভগবান্ উদ্ধার করেন। ভগবানের কথাতে আমাদের কর্ণ পরিপূর্ণ থাকুক। শ্রীচৈতন্যমঠের অণুপরমাণু আমাদের চেতনতা সম্পাদন করুন। যাঁহারা মঠসেবক, তাঁহারা এক সেকেণ্ডও অন্যকার্য্যে নিযুক্ত নাই। সর্ব্বক্ষণ চৈতন্যকথাতে আমাদের চিত্তবৃত্তি যেন ধাবিত হয়। জগতের সকল ব্যক্তিই যে হরির সেবক, তাহা জানিতে চেষ্টা করুন।

যদি হরিভজন করিতে হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক জিনিষের দ্বারা তাঁহার ভজন করিতে হইবে। তাঁহার সেবায় যে বস্তুটী বাদ পড়িবে, তাহার দ্বারাই জীবের ভোগ হইয়া যাইবে। আমাদের যেরূপ বহুদিনের বহির্ম্মুখতা ও চিত্তের মলিনতা, তাহাতে প্রকৃত নামপরায়ণ সাধুর শ্রীমুখ হইতে সর্ব্বক্ষণ শুভদ শিবদ মর্ম্মস্পর্শী কথা শ্রবণ করা দরকার। আমরা এমন অপদার্থের সন্তান হইয়াছি যে ভোগ ব্যতীত আর কোন কথা আমাদের বিচারের আমলেই আসিতেছে না। নিজের ভোগত্যাগ-চালনাই মায়া। সেব্য-বস্তুর পরিপূর্ণ ইন্দ্রিয়তর্পণ করাই ভজন বা আরাধন। বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে আমাদের স্বরূপ উদ্বুদ্ধ হওয়া আবশ্যক এবং কৃষ্ণেতর বাসনাও ধ্বংস হওয়া আবশ্যক।

সর্ব্বক্ষণ হরিকথা আলোচিত হউক, সর্ব্বত্র হরিকীর্ত্তনে মুখরিত হউক। যে সে স্থানে বা যে কোন ব্যক্তির নিকট হইতে হরিকথা শ্রবণ করিলে মঙ্গল হইবে না। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে নাম গ্রহণ করিতে হইবে। এই মনুষ্যজন্ম হারাইলে পুনরায় যে মনুষ্যজন্ম পাইব, তাহার নিশ্চয়তা নাই।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের সন্ধান পাইলে তাঁহাকে সর্ব্বস্ব দিতে হইবে। শ্রীগুরুদেব নিজে শিষ্যের এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন না। তিনি শিষ্যকে দিয়া কৃষ্ণের সেবা করাইয়া থাকেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইতে অভিন্ন। শ্রীগুরুদেবের নিত্যবসতিই গোলোক-বৃন্দাবন। জড়জগতে তিনি বিপ্রলম্ভ-বিচারে প্রতিষ্ঠিত। শ্রীগুরুদেবকে দ্বিপদ মনুষ্যমাত্র মনে করিলে কোন সুবিধা হইবে না, কেবল অমঙ্গল হইবে। শ্রীগুরুদেব পরম সম্ভ্রমের বস্তু। আচার্য্যকে মর্ত্ত্যবুদ্ধিতে হিংসা বা অবজ্ঞা করিতে নাই।

যিনি সর্ব্বদা হরিসেবা-তৎপর, তাঁহার সঙ্গছাড়া অন্য কিছু করিব না। হরিভজনই মনুষ্যজীবনের সার্থকতা এবং কালবিলম্ব না করিয়া এই মুহূর্ত্ত হইতেই হরিভজন আরম্ভ করিব, এইরূপ দৃঢ় উৎসাহনিশ্চয়তা লইয়া আমাদিগকে মনুষ্য জীবনের সর্ব্বকল্যাণসাধনে ব্রতী হওয়া আবশ্যক। আমরা যদি কালবিলম্ব করি, তবে অন্য লোক আমাদের নিকট আসিয়া দুষ্ট পরামর্শ দিবার সুযোগ ও সময় পাইবে।

চৈতন্যচন্দ্রের কৃপার কথা যে পরিমাণে যাহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তিনি সেই পরিমাণে চৈতন্যের সেবায় লুব্ধ হইয়াছেন, যিনি পূর্ণভাবে সেই চেতনবিগ্রহের কথা শুনিয়াছেন, তিনি তাঁহার সেবায় পূর্ণভাবে নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের চেতনাময়ী কথা জীবের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে জীবকে ষোলআনা তাঁহার পাদপদ্মে আকৃষ্ট করিবেই করিবে। যিনি আংশিকভাবে তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি শ্রীচৈতন্যের পাদপদ্মে আংশিকভাবে নিজেকে প্রদান করিয়াছেন। যতদিন পর্য্যন্ত না জীব দেহ-গেহ-পুত্র-কলত্র, কায়মনোবাক্য যথাসর্ব্বস্বদ্বারা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের সেবায় উন্মত্ত হইয়াছেন, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহার ষোলআনা শ্রীচৈতন্যের কথা শ্রবণ করা হয় নাই।

যে কয়দিন বাঁচিয়া থাকিবে, প্রত্যেক নিঃশ্বাসে, প্রত্যেক প্রশ্বাসে, প্রত্যেক হস্ত-সঞ্চালনে, প্রত্যেক কথায় যেন কৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলন করিতে পারি। অনুশীলনটা সেব্য-পুরুষের সেবার জন্য করিতেছি, না নিজের দেহ-মনের খানিকটা ভাগ সেখানে বসাইবার চেষ্টা করিতেছি,—এ বিষয়ে সাবহিত হওয়া আবশ্যক। সাধুর প্রসঙ্গ হইতে একমুহূর্ত্ত অন্য বিষয়ে ধাবিত হইলে অনুশীলন হইবে না।

মর্য্যাদাপথে যে বৈধ উপাসনা প্রতিষ্ঠাযুক্ত ভক্তগণের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, তাহা পরতত্ত্বপর। জড় প্রতিষ্ঠার সহিত বৈধী উপাসনা কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের জ্ঞাপক হইলেও উহা স্বয়ংরূপের গৌণী উপাসনামাত্র। মর্য্যাদাময়ী উপাসনায় পূজ্যবস্তু শ্রীকৃষ্ণ হইলেও উহা জীবের বিশ্রম্ভযুক্ত মাধুর্য্যময়ী উপাসনার সহিত এক নহে। উপাসনা বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে উপাসকের সাধ্য প্রতীতি, সাধ্য অনুভব ও সাধ্য অস্তিত্বের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য অবস্থিত, তাহা তারতম্য-বিচারে উপেক্ষণীয় নহে।

স্বয়ংরূপ পরতত্ত্ব হইলেও স্বয়ংরূপ-প্রতীতি বৈধ পরতত্ত্ব নির্দ্দেশকারী ব্যক্তিগণের উৎক্রান্ত ধারণায় অবস্থিত। বৈধভক্তগণের বাহ্যজগতের গুণত্রয় সম্বন্ধ পরতত্ত্ব-বিচারে কিঞ্চিৎ শ্লথ হইলেও শুদ্ধভক্তিপথে অবস্থিত জনগণ পরতত্ত্বসহ স্বয়ংরূপের সর্ব্বদা নিত্যবৈশিষ্ট সংস্থাপন করেন। স্বয়ংরূপ হইতে যে পরতত্ত্ব-বৈভব প্রকটিত, তাহা মর্য্যাদাপর বিচার ও মর্য্যাদাপর বৈধভক্তগণ উপলব্ধি করিতে না পারিয়াই মাধুর্য্যময় অনুরাগপথে প্রবেশ করিতে অসমর্থ হন। এই অসমর্থতা-নিবন্ধন তাঁহারা কেহ কেহ সর্ব্বকারণ-কারণ আকর-বিগ্রহ স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দনকে স্বয়ংপ্রকাশতত্ত্বের একমাত্র উৎপত্তিস্থান বলিয়া ধারণা করিতে অক্ষম হন। তাঁহাদের বিচারে শ্রৌতপন্থা কিয়ৎ-পরিমাণে উপেক্ষিত হওয়ায় কৃষ্ণের বৈভব-প্রকাশ-বস্তুকে তাঁহারা পরতত্ত্বজ্ঞানে স্থাপন করিয়া স্বয়ংরূপ ভূমিকাকে বৈভবপ্রকাশরূপ বিচারে আবদ্ধ করেন। শ্রীবার্ষভানবীর অনুগ্রহ ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণলীলার রসসমুদ্রের অমৃতবিন্দুপানে কাহারও অধিকার নাই। তজ্জন্য গোপীর কৈঙ্কর্য্যাভাবে শ্রী ও তদনুগত শ্রীসম্প্রদায়ের শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবাসৌন্দর্য্য-দর্শনে অধিকার নাই।

অনুজ্জ্বল-মধুর-রস স্বকীয় বিচারে অবস্থিত, সুতরাং উহা দাস্যরসেরই প্রকার-ভেদ মাত্র। অনেকে নারায়ণের স্বকীয় বৈধ পতি-পত্নীগত রসকে মধুররস বলিয়া ভ্রান্ত হন। যাহারা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রকৃতপ্রস্তাবে কৈঙ্কর্য্য করিয়াছেন, তাহারা এইরূপ ভ্রান্তি হইতে শতযোজন দূরে উজ্জ্বলরসে মাধুর্য্যময় বিগ্রহাভিন্ন ঔদার্য্যলীলা-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্য চিদানন্দ স্বরূপাবস্থিত ভক্তগণের হৃদয়ে তাদৃশ ভাব প্রবল হইবার পরিবর্ত্তে অত্যন্ত বিশ্রম্ভময় অনুরাগপরতা লক্ষিত হয়। বৈধহৃদয় ভক্তাভিমানী বৈষ্ণব ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বা উজ্জ্বলনীলমণি-গ্রন্থপাঠে যে মধুর-রসপর্য্যায়ে স্বকীয় বিচারের ধারণা করেন, তাহা তাঁহাদের অপ্রাকৃত-রাজ্যে শ্রীরূপানুগত্যের অভাবমাত্র। তাঁহারা বলেন যে, স্বকীয়-বিচারে লক্ষ্মীর বা লক্ষ্মীপ্রিয়া ও বিষ্ণুপ্রিয়া মাতার শ্রীগৌরানুরাগ শ্রীসত্যভামার বা শ্রীকমলার

দ্বারকাপতি বা পরব্যোমপতির প্রতি মর্য্যাদা-সদৃশ হওয়ায় উহাই উজ্জ্বলরসের বিষয়াশ্রয়ের মধুর-রস-জাতীয়। সুতরাং গৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার স্বকীয় বিচারেই উজ্জ্বলরস। কিন্তু রুচিপ্রধান পথে অনুন্নত অনুজ্জ্বল দাসরসে মধুর-রসভ্রান্তি মধুররস বলিয়া স্বীকৃত হয় না।

চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত

চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত-পালনে শিথিলতা প্রদর্শন

চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত চারিবর্ণাশ্রমী সকলেরই অবশ্য পালনীয়। কষ্টসাধ্য বলিয়া এই প্রাচীন শাস্ত্রীয় ব্রতবিধি ক্রমশঃ বিলাসপ্রিয় সমাজ-বক্ষ হইতে অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে। আজকাল সকলেই অসমর্থ সাজিয়া, নিয়মের অধীন হওয়া সুবিধাজনক মনে না করায় এইসকল ব্রতাদি পালনে শিথিলতা প্রদর্শন করিতেছেন, ইহা বিশেষ দুঃখের বিষয়। ব্রতপালনকারীর অধিকাংশই চাতুর্ম্মাস্যের মধ্যে 'অসমর্থের অনুকল্প বিধি'রূপ দামোদর-ব্রত বা কার্ত্তিক-ব্রত পালন করিয়াই তাঁহাদের ব্রতাদি-পালনে নিষ্ঠা ও কর্ত্তব্য প্রদর্শন করিতেছেন! আজকাল শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ব্যতীত চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালনের সুষ্ঠ ব্যবস্থা খুব কম স্থানেই পরিলক্ষিত হয়। সমর্থপক্ষেও হরিসেবায় আলস্যপরায়ণ হইয়া চাতুর্ম্মাস্যাদি হরিসেবানুকূল ব্রতের প্রতি অনাদর করিলে শ্রীহরির প্রীতিলাভ সম্ভব হয় না—ইহাই নিখিল সাত্বত-স্মৃতির বিশেষ নির্দ্দেশ।

সর্ব্বশাস্ত্রেই চাতুর্ম্মাস্যের উল্লেখ

বেদশাস্ত্রের বহুস্থলে চাতুর্ম্মাস্যযাজী ও চাতুর্ম্মাস্যের কর্ম্মাঙ্গত্বের কথা উক্ত হইয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্রেও সৎকর্ম্মিগণের জন্য চাতুর্ম্মাস্যের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাণাদিতে ও চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের উল্লেখ আছে। পরবর্ত্তী-কালের স্মৃতিনিবন্ধ-গ্রন্থে চাতুর্ম্মাস্য-বিধান স্মার্ত্ত ও পরমার্থী উভয়ের জন্যই ব্যবস্থাপিত রহিয়াছে। সাত্বত-স্মৃতি "শ্রীহরিভক্তিবিলাস" এবং রঘুনন্দনীয় স্মৃতি-নিবন্ধেও চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। কাঠক গৃহ্যসূত্রে যতিধর্ম্ম নিরূপণ-প্রসঙ্গেও চাতুর্ম্মাস্যের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে।

ব্যবহারিক ও পারমার্থিকের ব্রতাচরণে ফল-বৈষম্য

কিন্তু পারমার্থিক ও ব্যবহারিকের চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত-যাজনে আকাশ-পাতাল ভেদ বর্ত্তমান। ব্যবহারিকগণ যেরূপ ফলশ্রুতিতে লুব্ধ হইয়া নিজেকে ফলভোগী-

জ্ঞানে বিদ্ধা একাদশী-ব্রতাতির অনুষ্ঠান করেন অথবা আরোহবাদী মোক্ষকামিগণ ফলত্যাগ বা চিত্তশুদ্ধির জন্য নানাবিধ ক্রিয়ার আবাহন করিয়া থাকেন, পারমার্থিকের চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত সেরূপ নহে। পারমার্থিকের চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত যাজনের উদ্দেশ্য—হরিপ্রীতি। আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্রে "অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্ম্মাস্যযাজিনঃ"—অক্ষয় স্বর্গকামী হইয়া চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত যাজন করিবে—প্রভৃতি বাক্য দেখা যায়, তাহা ফলভোগকামী কর্ম্মিগণের জন্য ব্যবস্থাপিত হইলেও বেদান্তাদি শাস্ত্রে সেরূপ কর্ম্মের আদর দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রীমন্মহাপ্রভু তত্ত্ববাদিগণকে বলিয়াছিলেন,—

কর্ম্মনিন্দা, কর্ম্মত্যাগ—সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
কর্ম্ম হইতে প্রেমভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে॥ (চৈঃ চঃ মঃ ৯।২৬৩)

সহজিয়াগণের চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতাদিকে কর্ম্মাঙ্গজ্ঞানে ভ্রম

ফলভোগকামী কর্ম্মী ও নির্ভেদ-জ্ঞানীর চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত যাজন কর্ম্মাঙ্গ মাত্র। ঐরূপ কর্ম্মাঙ্গ কখনও প্রেম-ভক্তির জনক হইতে পারে না। অখিললোকশিক্ষক শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং অপরাপর আচার্য্যগণও চাতুর্ম্মাস্য-যাজন-লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহাদের চাতুর্ম্মাস্য-যাজন কি কর্ম্মাঙ্গ? শ্রীগৌরসুন্দর ও মাধবেন্দ্রপুরীপাদ লোক-শিক্ষাকল্পে যাহা আচরণ করিয়াছেন, তাহা কখনও 'কর্ম্মাঙ্গ' হইতে পারে না। ব্যভিচার-পঙ্কে নিমজ্জিত প্রাকৃত-সহজিয়াগণের মধ্যে অনেকে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতকে 'কর্ম্মাঙ্গ' জ্ঞানে পরিত্যাগপূর্ব্বক গৃহব্রতধর্ম্ম-যাজন, স্ত্রী-পুত্রাদির নিরন্তর সঙ্গ, পান, তামাক প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সেবন ও প্রসাদ সেবার ছলে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর ভোগ্যবস্তু গ্রহণে অনুরক্ত থাকাকেই 'ভক্ত্যঙ্গ' বলিয়া মনে করেন। প্রাকৃত-সহজিয়াগণ সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয়াভাবে কর্ম্মাঙ্গ ও ভক্ত্যঙ্গ, নামাপরাধ ও নাম, হরিসেবা ও ইন্দ্রিয়তর্পণের পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারেন না। তাঁহারা ব্যবহারতঃ কর্ম্মাঙ্গকে গর্হণ করিলেও তাঁহাদের হৃদয়ে অন্যাভিলাষ লুক্কায়িত থাকায় ও সদ্‌গুরুর নিকট হইতে দিব্যজ্ঞান লাভের অভাবে অপ্রাকৃতানুভূতি হইতে বঞ্চিত হওয়ায়, তাঁহাদের ভক্তঙ্গ-যাজনের নামে কপটতা ও কুকর্ম্মেরই অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। কর্ম্ম ও ভক্তির পার্থক্য বুঝিতে না পারিয়া তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভু-কথিত "অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্" প্রভৃতি স্মৃতিবাক্যের মর্ম্মার্থ অনুভব করিতে পারেন না। তাঁহারা কর্ম্মকাণ্ডীয় সন্ন্যাস ও ঐকান্তিক ভক্তের ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসকে একই শ্রেণীর মনে করিয়া 'কলিকালে সন্ন্যাস নাই' বলিতে উদ্যত হন। কলিকালে কর্ম্মসন্ন্যাস নিবারিত হইয়াছে, কিন্তু 'পরাত্ম-নিষ্ঠামাত্র বেশধারণ'

বা ত্রিদণ্ডিভিক্ষুগণের ভাগবতানুমোদিত "মুকুন্দসেবার্থে কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডরূপ দুঃসঙ্গের পরিবর্জ্জনরূপ সন্ন্যাস" কখনও নিষিদ্ধ হয় নাই।

ভগবৎ-প্রীতি কামনাই ব্রত-পর্ব্বাদি পালনের উদ্দেশ্য

গৃহস্থের মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন যে, চাতুর্ম্মাস্যের ন্যায় কষ্টসাধ্য ব্রত ত্যক্তাশ্রমীর জন্যই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, উহাতে তাহাদের কোন কিছু করণীয় নাই। কিন্তু এ ধারণা ভ্রমাত্মক, কারণ শাস্ত্র জানাইয়াছেন,—"এই চারিমাস কালব্যাপী ব্রত—চারি আশ্রম সকলেরই পাল্য; উদ্দেশ্য সর্ব্বভোগত্যাগ। জড়ভোগযোগ্য বিষয়-ত্যাগই এই চাতুর্ম্মাস্যের শিক্ষা-তাৎপর্য্য।" সুতরাং গৃহী ও ত্যাগী নির্ব্বিশেষে ভগবৎ-সেবার অনুকূল-বিচারে বা ভগবৎপ্রীত্যর্থে ভক্তগণ এই ব্রত অবশ্যই পালন করিবেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু গৃহী ও ত্যাগী উভয়কে সাধন-ভজনের একইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন—"গৃহস্থ-বৈরাগী দুঁহে বলে গোরারায়। দেখ, নাম-বিনা যেন দিন নাহি যায়।" গৃহস্থগণের পক্ষে প্রবৃত্তিমার্গীয় ভোগের অনুকূল যে-সকল শাস্ত্রীয় বাক্য দেখা যায়, তাহা ভোগ-ত্যাগেরই উদ্দেশ্যে বুঝিতে হইবে। অখণ্ড ভগবৎ-স্মৃতি ও সেবার নৈরন্তর্য্য লাভই ভক্তের একমাত্র কাম্য হওয়ায় তাঁহারা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিমার্গীয় বিধি-নিষেধের অতীত। তাই বর্ণাশ্রমীর স্থূল গণ্ডীতে তাঁহারা আবদ্ধ থাকিবেন কেন?

চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত-পালনে মতভেদ

অনেকে ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে "চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত" উল্লিখিত না হওয়ায় "উর্জ্জাদরঃ" বিচার গ্রহণপূর্ব্বক কেবল কার্ত্তিক-ব্রত বা দামোদর-ব্রত পালন করেন। অনেকে 'অসমর্থপক্ষে' উক্ত কার্ত্তিক-ব্রত মাত্র পালন করেন দেখিয়া চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত-পালনের আদৌ আবশ্যকতা নাই, কেহ যেন এইরূপ মনে না করেন। কেহ সমর্থবান্ হইয়াও অসমর্থের ভাণ করিলে ব্রতাদি-পালনের মূল উদ্দেশ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া 'অকর্ম্ম'-দোষে দুষ্ট হইবেন। চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতারম্ভ ও ব্রত-সমাপ্তি সম্বন্ধে অনেকে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। কেহ কেহ বলেন,—এই ব্রত শয়নৈকাদশী, অথবা পূর্ণিমা বা কর্কট-সংক্রান্তিতে আরম্ভ হউক না কেন, উত্থানৈকাদশীতে অবশ্যই ব্রত সমাপ্তি করিতে হইবে। এই বিচার শাস্ত্রীয় যুক্তিও বিচারসঙ্গত নহে, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ বিদ্যমান। এ বিষয়ে পরে আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

HIS MASTER'S VOICE

কুকুরটী অত্যাগ্রহে প্রভুকে দর্শন করিবার এবং তাঁহার আদর পাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াও সকলকাম হইতে পারিতেছে না। কিন্তু তাহার প্রভুরই কণ্ঠস্বর, অন্যের নহে—ইহা বুঝিতে অসুবিধা হয় নাই। সে গ্রামোফোনের চোঙ্গার অভ্যন্তর পর্য্যন্ত দৃষ্টি প্রসারিত করিতে চেষ্টা করিতেছে ও গ্রামোফোনের চতুর্দ্দিকে অতি যত্নে ঘুরিতেছে, তথাপি হতাশাই ফলস্বরূপ প্রকাশ পাইতেছে। ইহাপেক্ষাও উন্নতভাবে ছায়াচিত্রের বা সিনেমার পর্দ্দায় প্রিয়জনকে দর্শন করিয়া ও তাহার কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়াও স্পর্শানুভব ও তজ্জনিত সুখপ্রাপ্তি ঘটে না। টেপরেকর্ড যন্ত্রদ্বারা বক্তৃতাদি হুবহু আয়ত্ত করা সম্ভব হইলেও অপ্রাকৃত তত্ত্বকে লাভ করা সম্ভব হয় না। শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীবিগ্রহ সাক্ষাদ্ চিন্ময় বস্তু বলিয়া উক্ত হইলেও তাহা পাঠ ও সেবাদ্বারা বদ্ধজীবের নিকট চিন্ময়ত্বের পূর্ণ অনুভব-জনিত প্রেমানন্দ লাভ হইতেছে না। অতএব ত্রুটী কোথায় তাহার অনুসন্ধান করিতে সাধকের প্রয়াস হইয়া থাকে। সাধকের বিচার—এত যত্নসহকারে, স্পষ্টভাবে, উচ্চ করিয়া ভগবন্নাম কীর্ত্তন করিতেছি, তথাপি রসবস্তুর অনুভব হইতেছে না কেন? "তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে···" বাক্যটী পরম সত্য, কিন্তু আমার নিকট প্রকাশ নাই কেন? পণ্ডিতগণ অথবা অধিকারী বৈষ্ণবদিগের ব্যাখ্যা ও উক্তিকে টেপযন্ত্রদ্বারা সংগ্রহ করত সুষ্ঠুভাবে অভ্যাস ও আয়ত্ত করিব, তাহা হইলেই সার্থক হইব। শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া, টীকা-টিপ্পনী মুখস্থ করিয়া, ভক্তগণের ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভাবাবস্থায় যে-প্রকার মহাভাবজনিত অশ্রু-কম্প-পুলকাদি অষ্ট-সাত্ত্বিক চিন্ময় বিকার প্রকাশ পাইত, তদ্বিষয়ে ট্রেনিং ও Practice করিয়া সফলতা লাভ করিব। এইজন্য class করিয়া ভক্তগণের নৃত্য, কীর্ত্তন ও হাবভাব আয়ত্তের প্রশিক্ষণ চলে, যাহাতে প্রচারক্ষেত্রে সিদ্ধকাম হওয়া যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রসমূহও tape record স্বরূপে বদ্ধজীবের অনুভব। শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিত মহারাজকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই গ্রন্থরূপ tape। শ্রীমূর্ত্তি বা শ্রীবিগ্রহও তদ্রূপ একপ্রকার tape বা photo। "শৈলী, দারুময়ী, লৌহী, লেপ্যা, লেখ্যা চ সৈকতী। মনোময়ী, মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা॥"—প্রভৃতি শাস্ত্রবাক্যের অর্থকেও tape পর্য্যায়ে গৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু 'প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাদ্ ব্রজেন্দ্রনন্দন' বাক্যের তাৎপর্য্য উপলব্ধির বিষয় হয় না। "তমাদিদেবং করুণানিধানং তমালবর্ণং সুহিতাবতারম্" —প্রভৃতি বাক্যোক্ত চিন্ময়ত্ব অনুভব করিতে পারে না। পরন্তু জড়েন্দ্রিয়-

দ্বারা ইহাদের কেবলমাত্র অক্ষর, ভাষা ও রূপগত বৈশিষ্ট্যকে আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করে। এবং তাহাই প্রচার্য্য বিষয়জ্ঞানে সাত্ত্বিক প্রচেষ্টা চালায়। ভঙ্কের কীর্ত্তনে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের নৃত্য দর্শন করত প্রতিষ্ঠাকামী অভক্ত ব্রাহ্মণও নৃত্য করিয়াছিল। কিন্তু ভঙ্ক তাহাকে নকল বা imitation বলিয়া বুঝিয়া লইয়া তাহাকে প্রচণ্ড প্রহার করিয়াছিল। ভঙ্ক হরিদাস ঠাকুরের ও কপটী ব্রাহ্মণের ঐ নৃত্যদ্বয়কে সমমর্য্যাদা প্রদান করে নাই। চিদনুশীলন ক্ষেত্রে এরূপ আধ্যক্ষিকতার মূল্য নাই, স্ব-পর-বঞ্চনারূপেই কার্য্যকরী হয়। নিষ্কপট সেবোন্মুখ-বৃত্তিই সার্থকতা প্রদান করে :—

'অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥'
'ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া।'
'তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে।'

শ্রীমন্মহাপ্রভুর রুক্মিণীবেশে নৃত্য ও শ্রীরূপাদি পার্ষদগণের নাটক রচনা হইতে বদ্ধাবস্থার সাধক যাত্রা-নাটকাদিতে প্রেরণা সংগ্রহ করে। কিন্তু অধিকারীর অভিনয় ও বদ্ধসাধকের অভিনয় অধিকারভেদে সুফল ও কুফল প্রদান করে। এইজন্য সাধনক্ষেত্রে সর্ব্বদা সাবধানের বিধি লক্ষিত হয়।—

"কিন্তু যদি লতার সঙ্গে উঠে 'উপশাখা'।
ভুক্তি-মুক্তি বাঞ্ছা যত অসংখ্য তার লেখা॥
নিষিদ্ধাচার কুটীনাটী জীব-হিংসন।
লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ॥
সেকজল পাইয়া উপশাখা বাড়ি' যায়।
স্তব্ধ হইয়া মূলশাখা বাড়িতে না পায়॥
প্রথমেই উপশাখার করয়ে ছেদন।
তবে মূলশাখা বাড়ি' যায় বৃন্দাবন॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৫৮-১৬১)

সাধক বদ্ধাবস্থায় সিদ্ধের আচরণকেই সাধনরূপে গ্রহণ করে। ইহা ব্যতীত সাধন বলিয়া কিছু নাই। সাধক হরিনাম শ্রবণ-কীর্ত্তন করেন, শ্রীবিগ্রহের সেবা করেন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ-কীর্ত্তন করেন, ভিক্ষাদি সংগ্রহ করেন, মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা করেন এবং ধর্ম্মগ্রন্থ প্রকাশ ও প্রচারাদি কার্য্য করিয়া থাকেন। সিদ্ধের আচরণ-গুলিই সাধন—ইহাতে সন্দেহ নাই। পরন্তু সাধকের অধিকারভেদে যোগ্য অনুশীলন না হইলে অনুকরণে পর্য্যবসিত হইয়া সুফল প্রদান করে না। অনুকরণ হইতে সাধককে রক্ষা করিবার জন্য শাস্ত্রাদিতে বহুবিধ নিষেধ প্রদত্ত হইয়াছে।

Parasite বা পরগাছা হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই সর্ব্বপ্রকার সাধনে বিশেষ সাবধানতা আবশ্যক। ভক্তিবিভাবিত প্রকৃত ভক্তের অষ্টসাত্ত্বিক বিকার ও গমনভঙ্গীকে অভিনেতাগণ হুবহু আয়ত্ত করিলেও তাহাকে ভক্তি বলা হয় না। ভাবভরে ভক্তের পদস্খলন ও অশ্রুকম্পাদির অনুকরণ ভক্তিসাধক নহে, তাহা সযত্নে পরিত্যজ্য। এই বিকারগুলির অভ্যাসদ্বারাই ভক্তিলাভ হয় না। এইগুলি সযত্নে পরিত্যাগ করত সেবোন্মুখবৃত্তির অনুশীলন আবশ্যক। "নিসর্গ-পিচ্ছিল স্বান্তে তদভ্যাস পরেপি চ, সত্ত্বাভ্যাস বিনাপি স্যু কম্পাশ্রুপুলকাদয়ঃ"—শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর এই বাক্যটী বিস্মৃত হইলে চলিবে না।

মহাপুরুষদিগের উপদেশ—'শ্রীহরিসেবার যাহা অনুকূল বিষয় বলিয়া তাহা ত্যাগে হয় ভুল'—বাক্যকে শিরোধার্য্য করিয়া বিষয় ও ধনাঢ্য ব্যক্তি হইতে নানা-ভাবে অর্থাদি সংগ্রহ সাধকভক্তের কৃত্য। সেবার অনুকূল আকর্ষণীয় বেশভূষা, বিলাসবহুল বাসভবন, শয্যাসন ও যানবাহনও শ্রীহরিসেবার অনুকূলজ্ঞানে ব্যবহৃত হয়। ইহাতে অনেকক্ষেত্রে আশ্রমোচিত বিধি-ব্যবস্থা লঙ্ঘিত হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু উপযুক্ত অধিকারীর শ্রীহস্তে ঐ সকল সংগৃহীত অর্থাদি সম্যক্‌রূপ সমর্পিত হওয়ায় সেবকের অধিকারলঙ্ঘন কার্য্যও সেবায় পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। নতুবা ইহা দোষাবহ ও অমঙ্গলজনক। অনধিকারী উন্নতাধিকারীর আচরণ করিলে পতন অবশ্যম্ভাবী ও বিপত্তিকারক। রায়রামানন্দের অধিকার লাভ না করিয়া দেবদাসীদিগের অঙ্গমার্জ্জনাদি সেবা মৃত্যুতুল্য; ছোট হরিদাসের ন্যায় ভিক্ষা সংগ্রহ মারাত্মক। যথাযোগ্য আনুগত্যবিহীন ভিক্ষাদি সংগ্রহ ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ও মহাজন পদাবলীর কীর্ত্তনও বাহ্যতঃ ভক্ত্যঙ্গযাজনরূপে দেখা গেলেও তাহা উপশাখাস্বরূপ অনাদরণীয় ও সর্ব্বনাশা। "ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত নারম্ভারম্ভেৎ ক্বচিৎ"—ইহাই ভাগবতের উপদেশ। অনধিকারী এবম্বিধ আচরণফলে ভোগহিগ্রস্ত হইয়া ক্রমশঃ সংসারে প্রবেশ করিয়া থাকে—ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। শ্রীরঙ্গনাথ মন্দিরের সংস্কারার্থে সাধুজীর শিষ্যগণদ্বারা অর্থসংগ্রহ ক্রিয়াটী আলোচ্য। পরবর্ত্তিকালে শিষ্যগণকে অমঙ্গল হইতে রক্ষার জন্য গুরুদেব-কর্ত্তৃক কাবেরী নদীতে তাহাদের নিমজ্জন বিশেষভাবে বিচারণীয়। পক্ষান্তরে সম্পূর্ণ ও নির্দ্দোষ আনুগত্য সত্ত্বেও নকল মহাপুরুষের আনুগত্যে সেবা বা সিদ্ধিলাভ হয় না; তাহাও অমঙ্গলজনক। যথা—

"অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ, স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥

শ্রীগুরুদেবের মনোভীষ্ট-প্রচার সৎশিষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য ও প্রশংসনীয়। তজ্জন্য

সভা-সমিতি, সম্মেলন, গ্রন্থ-প্রকাশন ও প্রচারন ও মঠ-মন্দিরাদি-নির্ম্মাণ প্রভৃতি গুরুসেবা। পরন্তু অনধিকারহেতু উপশাখার রূপ ধারণ করিয়া তাহাকে শ্যামাবাসে পরিণত করে এবং পরমার্থভ্রষ্ট করিয়া তোলে। এইজন্য 'প্রথমেই উপশাখার করয়ে ছেদন' বাক্যের উল্লেখ। নতুবা অনর্থগ্রস্ত হইয়া পরমার্থচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী। নানারূপ বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা, ঝগড়া-গালাগালি, মারামারি, মামলা-মোকর্দ্দমার উদ্ভব হয়। সেবার নামে ভোগ বাঞ্ছনীয় নহে। ভগবৎপ্রীতিই প্রচারের উদ্দেশ্য। দলীয় বা ব্যক্তিগত সুখভোগ ও প্রতিষ্ঠা পারমার্থিকতা নহে; ইহাকে পারমার্থিকতার পরিবর্ত্তে ধর্ম্মব্যবসা বলিতে হইবে। প্রতিষ্ঠানের বিরাটত্ব, ব্যাপকত্ব ও ধনাঢ্যতাই প্রকৃত উন্নত ভক্ত্যধিকার নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজ ভক্তের পরিচয় দিয়াছেন,—'কাথা করঙ্গীয়া মোর কাঙ্গাল ভক্তগণ।' "মহাপ্রভুর ভক্তগণ বৈরাগ্য প্রধান। যাহা দেখি প্রীত হন গৌর ভগবান্॥" "জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রী-ভিরেধমানমদঃ পুমান্। নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্॥" (ভাঃ ১।৮। ২৬)—বাক্যটী সর্ব্বদাই সাধকভক্তের রক্ষাকবচ। পরমমুক্ত মহাপুরুষের ইহার ব্যতিক্রম দোষাবহ নহে। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, রায়রামানন্দ, শ্রীমহাদেব প্রভৃতির আচরণ কখনই বদ্ধজীবের আচরণীয় নহে। মুক্তাভিমানী ও প্রকৃত মুক্ত একবস্তু হইতে পারে না। "ফল্গু আর যুক্ত, বন্ধ আর মুক্ত, কভু না ভাবিহ একাকার সব।"

বর্ত্তমানকালে বাহ্যিক training-দ্বারা প্রচারক সৃষ্টি করিতে দেখা যায়। চম্পকপুষ্প প্রস্ফুটিত হইলে স্বতঃই সুগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত করে; চম্পকের গন্ধ গাত্রে লেপন করিয়া চম্পকপুষ্প হইতে হয় না। Fine plumes do not make a fine bird, ময়ূরপুচ্ছ ধারণদ্বারা ময়ূর হওয়া যায় না। শ্রীভগবানে ভক্তির উদয় হইলে সিদ্ধান্তবিদ্ ও ভক্তিতত্ত্বের বক্তা করিয়া তোলে। বস্তুতঃ ভক্তিহীন বক্তার বক্তৃতা বাগাড়ম্বর ও বাক্‌চাতুরীমাত্র। তাহা নিজের ও অন্যের ভক্তিজনক হয় না। প্রকৃতপক্ষে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-কৃপায় ভক্তিলাভ হইলে ভক্তি, ভক্ত ও ভগবান্-বিষয়ক বর্ণনার যোগ্যতা স্বতঃই উদিত হয়। অবরোহপন্থা ব্যতীত আরোহপন্থায় ভক্তিলাভ করা যায় না।—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥"
"ঈশ্বরের কৃপালেশ হয়ত' যাহারে।
সেইত' ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে॥
স্বরূপে পুছেন প্রভু হইয়া বিস্মিতে।
মোর মনের কথা রূপ জানিল কেমতে॥

স্বরূপ কহে—যাহে জানিল তোমার মন।
তাহে জানি—হয় তোমার কৃপার ভাজন॥"

মা যশোদার আহ্বানে কৃষ্ণ ক্রীড়া পরিত্যাগ করত মাতৃক্রোড়ে আরোহণ করেন। যশোদা মাতার ঐ আহ্বান বাক্যগুলি টেপযন্ত্রে ধরিয়া লইয়া বাজাইতে থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণ আসিবেন না; কারণ যশোদা মাতার বাক্যে যে মমতা, স্নেহ ও প্রেম থাকে, তাহা টেপযন্ত্র হইতে নির্গত বাক্যে থাকিতে পারে না। টেপধৃত বাক্যগুলি হুবহু একরূপ ধ্বনিত হইলেও প্রেমগন্ধহীন বলিয়াই কৃষ্ণ উহাতে কর্ণপাত করেন না।

নানোপচারকৃতপূজনমার্ত্তবন্ধোঃ
প্রেম্নৈব ভক্তহৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ।
যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জরঠা পিপাসা
তাবৎ সুখায় ভবতো নমু ভক্ষ্যপেয়ে॥
কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে॥

—প্রভৃতি বাক্যগুলি একতাৎপর্য্যপর। জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের 'মনঃশিক্ষা' নামক উপদেশবাক্য নিষ্কপটভাবে আচরণ করাই ভক্তিপিপাসুর কর্ত্তব্য।—

দুষ্টমন, তুমি কিসের বৈষ্ণব?……
কীর্ত্তনপ্রভাবে, স্মরণ হইবে, সেকালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

"শ্রীগুরুপাদপদ্ম মৃত নহেন, প্রকটে-অপ্রকটে তাঁহার সমান অস্তিত্ব প্রমাণিত। তাঁহার আবির্ভাব-তিরোভাব একতাৎপর্য্যপর; সুতরাং আবির্ভাবে বিরহ-স্মৃতি ও তিরোভাবে মিলন-মহোৎসব যুগপৎ সম্ভব।"

"যাঁহারা চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালন না করিয়া, কেবলমাত্র 'উর্জ্জোদর' করিয়া থাকেন, তাঁহারা চাতুর্ম্মাস্যের ভক্তিফল সম্পূর্ণরূপে লাভ করিতে পারেন না। ইহার দ্বারা চাতুর্ম্মাস্যের প্রতি অনাদরই প্রকাশ পায়।"

—শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

প্রকৃত বৈরাগ্য

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

প্রভু বলে,—বৈরাগ্য হয় দুই ত' প্রকার।
'ফল্গু' 'যুক্ত'—ভেদে আমি শিখাইনু বার বার॥ (প্রেমবিবর্ত্ত)

ফল্গু আর যুক্তভেদে বৈরাগ্য দুইপ্রকার হইবার ফলে ইহজগতে ফল্গু তথা শুষ্কবৈরাগী এবং যুক্ত তথা প্রকৃত বৈরাগী—এই দুই প্রকারের বৈরাগী পরিদৃষ্ট হয়। 'মর্কট বৈরাগ্য', 'শ্মশান বৈরাগ্য', 'অস্থির বৈরাগ্য' প্রভৃতি ফল্গু বৈরাগ্যেরই অন্তর্ভুক্ত। কাক ও কোকিল একই বর্ণ হওয়ায় যেরূপ স্বরের দ্বারা তাহাদের পার্থক্য নিরূপন করিতে হয়, তদ্রূপ শুষ্কবৈরাগী ও প্রকৃত বৈরাগীর পার্থক্য বাহ্য বেশভূষার দ্বারা নিরূপিত না হইয়া তাঁহাদের আচার-আচরণের দ্বারা নিরূপিত হয়। ফল্গুবৈরাগ্য ও যুক্তবৈরাগ্য দুইটী বিপরীত মেরুতে অবস্থিত। স্বয়ং মহাপ্রভু ফল্গুবৈরাগ্যের প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণনিষ্ঠাই অর্থাৎ কৃষ্ণেতর বস্তুর কামনা বা তৃষ্ণা ত্যাগ করিয়া অহৈতুক-কৃষ্ণানুশীলনে নিশ্চয়যুক্ত অবস্থানই প্রকৃত বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা। দেহ বিনা কৃষ্ণভজন হয় না, অতএব ভজনানুকূল দেহের সংরক্ষণে বিশেষ আদর করিয়াও ভজন প্রতিকূল সমস্ত দেহগেহাদিকে তুচ্ছজ্ঞান করিবার ভাবই হইতেছে যুক্তবৈরাগ্যের লক্ষণ। প্রত্যাহারক্রমে ইন্দ্রিয়সংযম সাধিত হইলেও যদি কৃষ্ণে অনুরাগের অভাব হয়, তাহলে তাহাকে শুষ্ক বা ফল্গুবৈরাগ্য বলা হয়, যেহেতু পরমার্থের জন্য ত্যাগ বা গ্রহণ, উভয়ই তুল্যফলপ্রদ। নিরর্থক ত্যাগ জীবকে কেবল পাষাণবৎ করিয়া তোলে। যাহারা বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া কেবলমাত্র বিষয়রাগকে দমন করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু ভগবৎ-রাগের সম্বর্দ্ধনের চেষ্টা করেন না, তাহাতে পরিণামে অমঙ্গলই লাভ ঘটে।

জগৎকে কৃষ্ণসম্বন্ধে ব্যবহার করিলেই 'যুক্তবৈরাগ্য' হয় জগৎকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া সন্ন্যাস করিলেই 'শুষ্কবৈরাগ্য' হয়। এতৎ প্রসঙ্গে জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ ভাঃ ১১।২০।৩৩ শ্লোকের বিবৃতিতে বলিয়াছেন,—"কেবল জ্ঞান ও ভগবৎসেবোন্মুখতায় বিরাগ প্রদর্শন করিলে কখনও জীবের মঙ্গললাভ ঘটে না। ভগবৎসেবাপর হইলেই সর্ব্বতোভাবে মঙ্গললাভ ঘটে। কেবল নির্ব্বিশেষজ্ঞান প্রবল হইলে জীবের মঙ্গললাভের সম্ভাবনা নাই, পরন্তু শুদ্ধ ভক্তিপ্রভাবেই প্রকৃত জ্ঞান ও বৈরাগ্যের সুষ্ঠুতালাভের সম্ভাবনা। আত্মধর্ম্মই—ভগবৎসেবা, তাহাতে জনগণের সংযত জ্ঞান ও যুক্তবৈরাগ্য পূর্ণমাত্রায়

প্রকটিত।" আকাশে ফাঁদ পাতিয়া বনের পাখী ধরিবার চেষ্টার ন্যায়ই 'ফল্গু-বৈরাগ্য', আর বনে ফাঁদ পাতিয়া বনের পাখী ধরিবার চেষ্টার ন্যায়ই 'যুক্তবৈরাগ্য'। আমের আঁটি চোষা ও আমের রসাল অংশ খাওয়া যেরূপ একই নহে, তদ্রূপ 'ফল্গুবৈরাগ্য' ও 'যুক্তবৈরাগ্য' কখন সমপর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারে না। যেরূপ বর্ণচোরা আম কেবল বর্ণ চুরি করিতেই জানে, তদ্রূপ ফল্গুবৈরাগ্য কেবল নিজের ও অপরের ক্ষতি ভিন্ন উপকার করিতে জানে না।

ফল্গুবৈরাগ্য—ভক্তির পরিপন্থী

শাস্ত্রে উল্লেখ রহিয়াছে,—

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ববিভাগ ২।১২৬)

"মুমুক্ষুগণ শাস্ত্র, শ্রীমূর্ত্তি, নাম, মহাপ্রসাদ, গুরু প্রভৃতি হরিসম্বন্ধি-বস্তুকেও প্রাকৃতজ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, ইহাই 'ফল্গুবৈরাগ্য' নামে অভিহিত হয়।" ভক্তিবিরোধী সম্প্রদায় ভক্ত ও ভগবৎসেবার কোন গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিয়া বৃথা শুষ্কবৈরাগ্যের জালে জড়াইয়া পড়ে। খটরা ভাঙ্গিয়া যাইবার ফলে ভূমিতে শয়ন করিলেও যেরূপ খটরাতে শয়ন করিবার আকাঙ্ক্ষা দূরীভূত হয় না, তদ্রূপ ফল্গুবৈরাগী রোগাদিভয়ে আহারাদি বর্জ্জন করিয়া বিষয় নিবৃত্তি করিলেও তাহাতে বিষয়তৃষ্ণা নষ্ট হয় না। ফল্গুবৈরাগীর অন্তরে ইতর তৃষ্ণা গোপন রাখিবার চেষ্টা 'আগুনে কাপড় ঢাকিবার' ন্যায় নিরর্থক ও হাস্যাস্পদ। 'হাম ছোড়া, লেকিন্ কম্‌লি নেই ছোড়তা'র ন্যায় বিষয়তৃষ্ণা ফল্গুবৈরাগীকে কিছুতেই ছাড়ে না।

ফল্গুবৈরাগ্যের অন্তর্ভুক্ত মর্কটবৈরাগ্য জীবের একটী প্রধান হৃদয়দৌর্ব্বল্য-বিশেষ। ইহাতে শুদ্ধভক্তি উদিত না হইয়া কেবল জীবের কাপট্য, শাঠ্য, প্রতিষ্ঠাশা প্রভৃতি বর্দ্ধিত হয়। এই প্রসঙ্গে জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন, "বাহ্যদর্শনে ভোগবুদ্ধি-বিশিষ্ট বানরগণ যেরূপ গৃহাদি অথবা বস্ত্রাদি বর্জ্জিত হইয়া বিরাগবিশিষ্ট পুরুষের সহিত সমান বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, অথচ ইন্দ্রিয়তর্পণ হইতে নিবৃত্ত হয় না, তাদৃশ 'লোক দেখান' বৈরাগ্যকেই 'মর্কটবৈরাগ্য' বলে। যে বৈরাগ্য শুদ্ধভক্তি হইতে উৎপন্ন না হইয়া কৃষ্ণেতর বস্তুর প্রতি কামনার বা বাসনার ব্যাঘাত হইতে জাত, যাহা শুদ্ধভক্তির অনুকূলরূপে যাবজ্জীবন স্থায়ী না থাকিয়া 'ক্ষণিক' বা 'ফল্গু' তাহাই

'শ্মশান বৈরাগ্য' বা 'মর্কট-বৈরাগ্য।" মর্কটবৈরাগ্যে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা ব্যতীত কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছার লেশমাত্র থাকিতে পারে না।

ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥ (চৈঃ চঃ অন্ত্য ২।১২০)
এই জড়দেহে রাধাকৃষ্ণ-বুদ্ধ্যারোপ।
মর্কট বৈরাগী করে সর্ব্বধর্ম্ম লোপ॥
প্রভু বলিয়াছেন,—"মর্কট বৈরাগী সে জন।
বৈরাগীর প্রায় থাকি' করে প্রকৃতি সম্ভাষণ॥ (প্রেমবিবর্ত্ত)

কর্ম্মী, জ্ঞানী প্রভৃতির নির্ব্বেদ আশ্রয়কালে হৃদয়ে ফল্গুবৈরাগ্য আসিয়া বাসা তৈরি করে এবং ফলে তাহাদের হৃদয় পাষাণবৎ কঠিন হইয়া যায়। তাহারা কখনও ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলার প্রতি অনুরাগবিশিষ্ট হন না। তাই শাস্ত্রে পাওয়া যায়,—

কর্ম্মী, জ্ঞানী যবে করে নির্ব্বেদ আশ্রয়।
তার চিত্তে ফল্গুবৈরাগ্য পায় দুষ্টাশয়॥
সংসারেতে তুচ্ছবুদ্ধি আসিয়া তখন।
জড়-বিপরীত ধর্ম্মে করে প্রবর্ত্তন॥
কৃষ্ণসেবা সাধুসেবা আত্মরসাস্বাদ।
জড় বিপরীত ধর্ম্মে পায় নিতান্ত অবসাদ॥
ফল্গুবৈরাগীর মন সদা শুষ্ক রসহীন।
নাম-রূপ-গুণ-লীলা না হয় সমীচীন॥ (প্রেমবিবর্ত্ত)

যিনি বৈরাগীর বেশভূষা ধারণ করিয়া নাট্যশালায় স্ত্রীলোকের ভাবভঙ্গী দর্শন করেন, তিনি যে মর্কট-বৈরাগ্য আচরণ করেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যে বৈরাগী যাত্রা শুনিতে বা থিয়েটার দেখিতে প্রবৃত্ত হন, তিনি দোষী—ইহা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর (সঃ তোঃ ৮।১০) 'মর্কট বৈরাগী' প্রবন্ধে পরিষ্কারভাবে জানাইয়াছেন। এদিকে আবার অস্থির বৈরাগ্যও প্রকৃত বৈরাগ্য নহে। এই প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃতে (৫।২) বলিয়াছেন,—"কলহ, ক্লেশ, অর্থাভাব, পীড়া ও বিবাহের অঘটনবশতঃ ক্ষণিক বৈরাগ্যের উদয় হয়, তদ্দ্বারা চালিত হইয়া যাহারা ভেক নেয়, তাহারাই অস্থির বৈরাগী। তাহাদের বৈরাগ্য থাকে না, তাহারা অতি শীঘ্রই কপট বৈরাগী হইয়া পড়ে।"

যুক্তবৈরাগ্যের দ্বারাই ভগবৎ-প্রীতি লাভ

শাস্ত্রে যুক্তবৈরাগ্যের সংজ্ঞায় পাওয়া যায়,—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ববিভাগ ২।১২৫)

"কৃষ্ণেতর বিষয়াসক্তিশূন্য হইয়া এবং কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ করিয়া তদীয় সেবানুকূল গ্রহণ করিলে তাহাকে 'যুক্তবৈরাগ্য' বলে।" যুক্তবৈরাগী ইন্দ্রিয়তর্পণ ও সুখভোগাদি-লাভ ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণসেবার্থে কৃষ্ণেতর-বিষয়মাত্রেই উদাসীন থাকেন। তাঁহাদের বিষয়ত্যাগপূর্ব্বক অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা অলৌকিকী কৃষ্ণসেবা—সাধারণ লৌকিকী দৃষ্টির বোধগম্য নহে, ভগবান্ গৌরসুন্দর কৃষ্ণেতর বিষয়ে বিরক্ত ব্যক্তির শুদ্ধভজন-চতুরতা সন্দর্শনে পরমপ্রীতি লাভ করেন।

মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান।
যাহা দেখি' প্রীত হন গৌর-ভগবান্ ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৬।২২০)
যুক্তবৈরাগীর ভক্তি হয় ত' সুলভ।
কৃষ্ণভক্তি-পূত বিষয় তার ঘটে সব ॥
প্রকৃতির জড়ধর্ম্ম তাঁর চিত্ত ছাড়ে অনায়াসে।
চিৎ-আশ্রয়ে মজে শীঘ্র অপ্রাকৃত ভক্তিরসে ॥
ভক্তিযোগে শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা পায়।
'ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি' প্রতিজ্ঞা জানায় ॥ (প্রেমবিবর্ত্ত)

বৈরাগ্য লোক দেখাইবার জিনিষ নহে। অন্তঃসারশূন্য লোকের বৈরাগী হইবার কোন অধিকার নাই। অনাসক্তভাবে বিষয় ভোগ করিতে করিতে কৃষ্ণভজন করিয়া যাইলে শ্রীকৃষ্ণ জীবকে ভব-সংসার হইতে উদ্ধার করেন। এতৎ-প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু রঘুনাথদাস গোস্বামীকে বলিয়াছেন,—

স্থির হঞা ঘরে যাও, না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু কুল ॥
মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা ॥
অন্তরে নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোক ব্যবহার।
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৬।২৩৭-২৩৯)

গৃহী হউক বা গৃহত্যাগী হউক উভয়েরই যুক্ত-বৈরাগ্য অবলম্বন করা অবশ্যই কর্ত্তব্য। ইহাতে তাঁহাদের কৃষ্ণের অপ্রাকৃত বৈভব লাভ হয়।

গৃহী গৃহত্যাগী-ভেদে বৈষ্ণব-বিচার।
দুঁহে ভক্তি-অধিকারী পৃথক্ আচার॥
দুঁহার চাহিয়ে যুক্ত-বৈরাগ্য-বিধান।
সুজ্ঞান, সুভক্তি দুঁহার সমপরিমাণ॥

*　　*　　*

বৈরাগী বৈষ্ণব প্রাণবৃত্তি অঙ্গীকরি'।
অসঞ্চয় স্ত্রীসম্ভাষণশূন্য, ভজে হরি॥
এইরূপ আচারভেদে সকল বৈষ্ণব।
কৃষ্ণ ভজি' পায় কৃষ্ণের অপ্রাকৃত বৈভব॥ (প্রেমবিবর্ত্ত)

প্রকৃত বৈরাগী কৃষ্ণভজনের অনুকূল বৈধ আচারগুলির সম্মান এবং ভজনের প্রতিকূল অবৈধ আচারগুলি বর্জ্জন করেন। যে ব্যক্তি বৈরাগ্যের বেশভূষা ধারণ করিয়াও বিধি-নিষেধের ধার ধারেন না, তাহার অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। 'বৈরাগীর কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

বৈরাগী করিবে সদা নাম সংকীর্ত্তন।
মাগিয়া খাঞা করে জীবন রক্ষণ॥
বৈরাগী হঞা যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥
বৈরাগী হঞা করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায়, আর হয় রসের বশ॥
বৈরাগীর কৃত্য—সদা নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
শাক-পত্র-ফল-মূলে উদর-ভরণ॥
জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায়।
শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৬।২২৩-২২৭)
বৈরাগী ভাই গ্রাম্যকথা না শুনিবে কানে।
গ্রাম্য-বার্ত্তা না কহিবে যবে মিলিবে আনে॥
স্বপনেও না কর ভাই স্ত্রী-সম্ভাষণ।
গৃহে স্ত্রী ছাড়িয়া ভাই আসিয়াছ বন॥
যদি চাহ প্রণয় রাখিতে গৌরাঙ্গের সনে।
ছোট হরিদাসের কথা থাকে যেন মনে॥

ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে।
হৃদয়েতে রাধাকৃষ্ণ সর্ব্বদা সেবিবে॥
বড় হরিদাসের ন্যায় কৃষ্ণনাম বলিবে বদনে।
অষ্টকাল রাধাকৃষ্ণ সেবিবে কুঞ্জবনে॥ (প্রেমবিবর্ত্ত)

ভাল খাওয়া, ভাল পরা এবং 'গ্রাম্যকথা' শুনা বা বলা বৈরাগী বা বৈষ্ণবের একেবারেই কর্ত্তব্য নহে। পরের প্রতি সম্মান ও স্বয়ং অমানী হইয়া সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম করিবেন এবং মানসে ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা করিবেন—ইহাই প্রকৃত বৈরাগীর প্রধান কৃত্য।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

শ্রীজন্মাষ্টমী

প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি, যমুনাতে তুফান।
বিদ্যুৎ ও বজ্রপাত ওষ্ঠাগত প্রাণ॥
জনপদ জলাকীর্ণ, পথ-ঘাট নাই।
ঘরবন্দী, জলবন্দী হ'য়েছে সবাই॥
চারিদিকে সূচীভেদ্য ঘন অন্ধকার।
দুর্যোগের ঘনঘটা তোলে হাহাকার॥
বসুদেব, দেবকী কংস-কারাগারে।
বন্ধনের মুক্তি চান নিত্য বারে বারে॥
কৃপা করি' নবজাত আবির্ভূত হন।
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ধরেন তখন॥
বসুদেব শিশু ল'য়ে নদীতটে যান।
উত্তাল তরঙ্গ দেখে চিন্তিত পরাণ॥
সহসা নদীর বক্ষে পথ দেখা যায়।
ভাবেন—এবার বুঝি হ'য়েছে উপায়॥
পারাপারে হ'য়ে কৃষ্ণ নন্দগৃহে যায়।
মহানন্দে সকলেই মাতে মথুরায়॥

—শ্রীবলাই চাঁদ ঘোষ, সেবানুরাগ
সাংবাদিক পি. টি. আই.

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা-জয়ন্তী

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৫শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৯৪ পৃষ্ঠার পর]

জয়ন্তী কাহাকে বলে ?

বসুদেবসুতং দেবং কংস-চানূরমর্দ্দনম্।
দেবকীপরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্‌গুরুম্॥

কংস-চানূর মর্দ্দনকারী বসুদেব দেবকীর পরমানন্দ বর্দ্ধনকারী, জগদ্‌গুরু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আমরা বন্দনা করি। "জয়ন্তী"—ভাদ্রমাসে কৃষ্ণপক্ষে অষ্টমী-তিথিতে রোহিণী নক্ষত্র যোগ হইলে, তাহাকে 'জয়ন্তী' বলে। ঐদিনে ঐ সময়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম চতুর্ভুজে ধারণ করিয়া কিরীট-কুণ্ডল-হার-বৈজয়ন্তীমালা-কৌস্তুভমণি-পীতবসন এবং বিবিধ রত্নালঙ্কারে সুশোভিত হইয়া, বসুদেব দেবকীকে পিতামাতা স্বীকার করিয়া, দুষ্টদমন-শিষ্টপালন এবং ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য মথুরায় কংসের কারাগারে, বুধবারে রাত্রি বারটার সময় দুর্যোগপূর্ণ ঘোর রজনীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সেইজন্য কৃষ্ণজন্ম-তিথিকেই 'জয়ন্তী' বলিয়া অভিহিত করা হয়। শ্রীভগবান্ এবং তাঁহার বাণী অভিন্ন, এইজন্য গীতাবির্ভাবকেও 'জয়ন্তী' বলা হয়।

শ্রীভগবানের রক্ত-মাংসের শরীর নাই এবং গর্ভযন্ত্রণাদি দুঃখ নাই বা গর্ভবাস বলিয়া কোন কথাই নাই, তাহা জানাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ নারায়ণ-রূপ ধারণ করিয়া আবির্ভূত হইলেন। কারণ জগতের মানুষ তাঁহাকে রক্ত-মাংসের শরীর-বিশিষ্ট মনুষ্যজ্ঞান করিয়া অপরাধ করতঃ যাহাতে নরকগামী না হয়, সেইজন্য তিনি ঐরূপে আবির্ভূত হইলেন। জগতের মঙ্গলের জন্য যেমন ভগবান্ শ্রীহরি আবির্ভূত হন, তাঁহার বাণীও তেমনই জগতের মঙ্গলের জন্য আবির্ভূতা হইয়া থাকেন।

গীতাবির্ভাব

"মার্গশীর্ষস্য শুক্ল একাদশ্যাং ভরণী নক্ষত্রে কুরুক্ষেত্রে কুরুপাণ্ডবয়োর্যুদ্ধারম্ভ।" অগ্রহায়ণ মাসে, শুক্লা-একাদশীতে, ভরণী-নক্ষত্রে কুরুক্ষেত্রে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। ঐদিন গীতার আবির্ভাব, ঐদিনকে 'গীতা-জয়ন্তী'-নামে অভিহিত করা হয়। ঐদিনে গীতার পূজার্চ্চন, পঠন-পাঠন উৎসব করিতে হয়। যুদ্ধ ১৮ দিন হইয়াছিল। ঐদিন সারথীরূপী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিষাদগ্রস্ত দুঃখ-সমুদ্রে নিমজ্জিত ধর্ম্ম বা ন্যায় যুদ্ধ হইতে বিরত অর্জ্জুনকে গীতামৃত-বাণী-সমুদ্রে অবগাহন করাইয়া সুস্থির ও শান্তিপ্রদান করিয়াছিলেন। তখন অর্জ্জুন বলিয়াছিলেন,—

নষ্টোমোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ (গীঃ ১৮।৭৩)

সেইহেতু ঐ দিনটিকে "গীতা-জয়ন্তী"-নামে অভিহিত করা হয় এবং উৎসবরূপে পালিত হইতেছে।

সারথ্যমর্জ্জুনস্যাদৌ কুর্ব্বন্ গীতামৃতং দদৌ।
লোকত্রয়োপকারায় তস্মৈ কৃষ্ণাত্মনে নমঃ ॥ (গীঃ মাঃ ৬)

যিনি অর্জ্জুনের সারথ্যকার্য্যে ব্রতী হইয়া, লোকত্রয়ের উপকারার্থ গীতারূপ অমৃতদান করিয়াছিলেন, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আমরা বার বার প্রণাম করি।

ভদ্রং ভগবতা পৃষ্টং যদ্ধি গুপ্ততমং পরম্।
শক্যতে কেন তদ্বক্তুং গীতামাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥ (গীঃ মাঃ ২)

সূত কহিলেন,—ভগবন্! উত্তম বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। যাহা পরম গোপনীয়-সমূহের মধ্যে গোপনীয়, সেই অত্যুত্তম গীতা-মাহাত্ম্য কে বর্ণন করিতে পারে?

কৃষ্ণো জানাতি বৈ সম্যক্ কিঞ্চিৎ কুন্তীসুতঃ ফলম্।
ব্যাসো বা ব্যাসপুত্রো বা যাজ্ঞবল্ক্যোঽথ মৈথিলঃ ॥ (গীঃ মাঃ ৩)

একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই ইহা সম্যক্ অবগত আছেন; কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন ইহার কিঞ্চিৎ ফলঃজানেন এবং ব্যাস, ব্যাসপুত্র শুকদেব, যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য ও রাজর্ষি জনক কিছু কিছু অবগত আছেন।

অন্যে শ্রবণতঃ শ্রুত্বা লেশং সংকীর্ত্তয়ন্তি চ।
তস্মাৎ কিঞ্চিদ্বদাম্যত্র ব্যাসস্যাস্যান্ময়া শ্রুতম্ ॥ (গীঃ মাঃ ৪)

অন্যান্য লোকে পরস্পরের মুখে শ্রবণ করিয়া ইহার লেশমাত্র কীর্ত্তন করেন। অতএব আমি ব্যাসমুখে যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, তাহা কিঞ্চিৎ কীর্ত্তন করিতেছি।

যে শৃণ্বন্তি পঠন্ত্যেব গীতাশাস্ত্রমহর্নিশম্।
ন তে বৈ মানুষা জ্ঞেয়া দেবরূপা ন সংশয়ঃ ॥ (গীঃ মাঃ ৯)

যাঁহারা অহর্নিশ গীতাশাস্ত্র পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাঁহারা মনুষ্য নহেন, নিশ্চয়ই দেবতুল্য।

ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥ (গীঃ ১৮।৬৯)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখেও বলিয়াছেন যে,—যাঁহারা আমার গীতা (জয়ন্তী উৎসব করে) প্রকাশ করে, প্রচার করে, পাঠ করে, কীর্ত্তন করে বা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করে, তাঁহাদের অপেক্ষা আমার প্রিয় আর কেহ নাই, কেহ হইবেও না।

গীতায়াশ্চ ন জানাতি পঠনং নৈব পাঠনম্।
স এব মানুষে লোকে মোঘকর্ম্মকরো ভবেৎ॥ (গীঃ মাঃ ১৩)

যে ব্যক্তি গীতাশাস্ত্রের পাঠ অধ্যয়ণ ও অধ্যাপন অবগত নহে, মনুষ্যলোকে তাদৃশব্যক্তি বৃথা কর্ম্মকারী অর্থাৎ তাঁহাদের সকল কর্ম্মই বিফল হইয়া থাকে।

তস্মাদ্ গীতাং ন জানাতি নাধমস্তৎপরো জনঃ।
ধিক্ তস্য মানুষং দেহং বিজ্ঞানং কুলশীলতাম্॥ (গীঃ মাঃ ১৪)

যে ব্যক্তি গীতা অবগত নহে, তদপেক্ষা অধম আর নাই। তাহার মানুষ দেহে ধিক্, তাহার শাস্ত্রপাঠজনিত বিজ্ঞানে ধিক্ এবং কুল-শীলতাতেও ধিক্।

গীতার্থং ন বিজানাতি নামধস্তৎপরো জনঃ।
ধিক্ শরীরং শুভং শীলং বিভবং তদ্গৃহাশ্রমম্॥ (গীঃ মাঃ ১৫)

যে ব্যক্তি গীতার অর্থ অবগত নহে, তাহার অপেক্ষা অধম আর নাই। তাহার মনোহর দেহে ধিক্, তাহার উৎকৃষ্ট চরিত্রে ধিক্, তাহার উত্তম বিভবে ধিক্ এবং তাহার সুখময় গৃহাশ্রমেও ধিক্।

গীতাশাস্ত্রং ন জানাতি নাধমস্তৎপরো জনঃ।
ধিক্ প্রারব্ধং প্রতিষ্ঠাঞ্চ পূজাং দানং মহত্তমম্॥ (গীঃ মাঃ ১৬)

যে ব্যক্তি গীতাশাস্ত্র অবগত নহে তদপেক্ষা অধম আর নাই। তাহার প্রারব্ধে ধিক্, প্রতিষ্ঠায় ধিক্, পূজায় ধিক্ ও মহত্ত্বে ধিক্।

গীতাশাস্ত্রে মতির্নাস্তি সর্ব্বং তন্নিষ্ফলং জগুঃ।
ধিক্ তস্য জ্ঞানদাতারং ব্রতং নিষ্ঠাং তপো যশঃ॥ (গীঃ মাঃ ১৭)

গীতাশাস্ত্রে যাহার মতি নাই, তাহার সমস্তই নিষ্ফল বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। তাহার জ্ঞানদাতাকে ধিক্, তাহার ব্রতে ধিক্, তাহার নিষ্ঠায় ধিক্, তাহার তপস্যায় ধিক্ এবং তাহার যশেও ধিক্।

গীতার্থপঠনং নাস্তি নাধমস্তৎপরো জনঃ।
গীতাগীতং ন যজ্ জ্ঞানং তদ্বিদ্ধ্যাসুরসম্মতম্।
তন্মোঘং ধর্ম্মরহিতং বেদবেদান্তগর্হিতম্॥ (গীঃ মাঃ ১৮)

যে ব্যক্তি গীতার অর্থসহ পাঠ না জানে, তদপেক্ষা অধম আর নাই। যে জ্ঞান গীতায় উক্ত হয় নাই তাহা আসুর জ্ঞান বলিয়া জানিবে। তাহা বিফল ধর্ম্মহীন এবং বেদ বেদান্তে নিন্দিত।

তস্মাদ্ধর্ম্মময়ী গীতা সর্ব্বজ্ঞানপ্রযোজিকা।
সর্ব্বশাস্ত্রসারভূতা বিশুদ্ধা সা বিশিষ্যতে॥ (গীঃ মাঃ ১৯)

অতএব ধর্ম্মময়ী গীতা সর্ব্বজ্ঞান যোগকারিণী, ইহা সর্ব্বশাস্ত্রের সারভূতা ও বিশুদ্ধা বলিয়া প্রশংসিতা।

সংসারসাগরং ঘোরং তর্ত্তুমিচ্ছতি যো নরঃ।
গীতানাবং সমাসাদ্য পারং যাতি সুখেন সঃ॥ (গীঃ মাঃ ৭)

যিনি ঘোর সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি গীতারূপ নৌকা পাইলে অনায়াসে উহার পারপ্রাপ্ত হইতে পারেন।

অনাচারোদ্ভবং পাপমবাচ্যাদিকৃতঞ্চ যৎ।
অভক্ষ্যভক্ষজং দোষমস্পর্শস্পর্শজং তথা॥
জ্ঞানাজ্ঞানকৃতং নিত্যমিন্দ্রিয়ৈর্জনিতঞ্চ যৎ।
তৎ সর্ব্বং নাশমায়াতি গীতাপাঠেন তৎক্ষণাৎ॥ (গীঃ মাঃ ৩৪-৩৫)

অনাচারজনিত, অবাচ্য বাক্য প্রয়োগজাত, অভক্ষ ভক্ষণজাত, অস্পৃশ্য স্পর্শ-জন্য জ্ঞানাজ্ঞানকৃত এবং প্রাত্যহিক ইন্দ্রিয়-সম্ভোগজ সর্ব্ববিধ পাপই গীতাপাঠে বা শ্রবণে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়।

অভিচারোদ্ভবং দুঃখং বরশাপাগতঞ্চ যৎ।
নোপসর্পতি তত্রৈব যত্র গীতার্চ্চনং গৃহে॥ (গীঃ মাঃ ২৯)

যে গৃহে প্রতিনিয়ত গীতার অর্চ্চনা হয়, তথায় অভিচারজাত দুঃখ অথবা কঠোর শাপজাত ক্লেশ উপস্থিত হয় না।

তাপত্রয়োদ্ভবাপীড়া নৈব ব্যাধির্ভবেৎ ক্বচিৎ।
ন শাপো নৈব পাপঞ্চ দুর্গতির্নরকং ন চ॥ (গীঃ মাঃ ৩০)

তথায় আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ তাপজাত পীড়া হয় না। শাপ, পাপ, দুর্গতি বা নরকের সম্ভাবনা থাকে না।

যশঃ সৌভাগ্যমারোগ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ।
দয়িতানাং প্রিয়ো ভূত্বা পরমং সুখমশ্নুতে॥ (গীঃ মাঃ ২৮)

তিনি যশ, সৌভাগ্য ও আরোগ্য লাভ করেন, ইহাতে সন্দেহ নাই এবং পত্নীর প্রিয়তম হইয়া পরমসুখ লাভ করেন।

গীতায়াঃ পুস্তকং যত্র নিত্যপাঠশ্চ বর্ত্ততে।
তত্র সর্ব্বাণি তীর্থানি প্রয়াগাদীনি ভূতলে॥ (গীঃ মাঃ ৪০)

যেস্থানে প্রত্যহ গীতা পুস্তক থাকে এবং অধীত হয়, ভূতলে সেই স্থানেই প্রয়াগাদি সকলতীর্থই সর্ব্বদা বিরাজিত থাকে।

নিবসন্তি সদা দেহে দেহশেষেঽপি সর্ব্বদা।
সর্ব্বে দেবাশ্চ ঋষয়ো যোগিনো দেহরক্ষকাঃ॥ (গীঃ মাঃ ৪১)

গীতা পাঠকের দেহে এবং দেহশেষে সর্ব্বদেবতা ও যোগিগণ দেহ-রক্ষকরূপে বাস করেন।

গোপালো বালকৃষ্ণোঽপি নারদধ্রুবপার্ষদৈঃ।
সহায়ো জায়তে শীঘ্রং যত্র গীতা প্রবর্ত্ততে॥ (গীঃ মাঃ ৪২)

যেস্থানে গীতা পাঠ হয়, তথায় বালকৃষ্ণবেশী শ্রীগোপাল তৎক্ষণাৎ নারদাদি পার্ষদগণের সহিত সহায়রূপে উপস্থিত হন।

যত্র গীতা বিচারশ্চ পঠনং পাঠনং তথা।
মোদতে তত্র শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ রাধয়া সহ॥ (গীঃ মাঃ ৪৩)

যেখানে গীতার বিচার, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হয়, তথায় শ্রীরাধিকার সহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিরতিশয় আনন্দ লাভ করেন।

দেবকীনন্দনঃ কৃষ্ণো গীতাপাঠেন তুষ্যতি।
যথা ন বেদৈর্দানেন যজ্ঞতীর্থব্রতাদিভিঃ॥ (গীঃ মাঃ ২২)

দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ গীতাপাঠে যেরূপ সন্তোষ লাভ করেন, বেদপাঠ, দান, যজ্ঞানুষ্ঠান, তীর্থপর্য্যটন ও ব্রত প্রভৃতিদ্বারা সেরূপ সন্তুষ্ট হন না।

লভেৎ কৃষ্ণপদে দাস্যং ভক্তিঞ্চাব্যভিচারিণীম্॥ (গীঃ মাঃ ৩১)

সেই গৃহস্থিত জনগণ কৃষ্ণপদে দাস্যা ও অব্যাভিচারিণী ভক্তি লাভ করেন।

গীতা মে হৃদয়ং পার্থ! গীতা মে সারমুত্তমম্।
গীতা মে জ্ঞানমত্যুগ্রং গীতা মে জ্ঞানমব্যয়ম্॥ (গীঃ মাঃ ৪৪)

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—"হে পার্থ! গীতাই আমার হৃদয়, গীতাই আমার উত্তম সারস্বরূপ, গীতাই আমার অত্যুগ্র জ্ঞান এবং গীতাই আমার অক্ষয় জ্ঞান।"

ভারতামৃত সর্ব্বস্বং বিষ্ণোর্ব্বক্ত্রাদ্বিনিঃসৃতম্।
গীতা গঙ্গোদকং পীত্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥ (গীঃ মাঃ)

অমৃতস্বরূপ মহাভারতের সারসর্ব্বস্ব এবং সাক্ষাৎ পদ্মনাভ শ্রীকৃষ্ণের মুখবিনিঃসৃত এই গীতামৃত গঙ্গাজল যাঁহারা ভক্তিপূর্ব্বক পান করেন (পাঠ, কীর্ত্তন ও শ্রবণ), তাঁহাদের আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।

"যতোঽভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স্ সিদ্ধির্ভবত্যেব স ধর্ম্মঃ।" (বৈঃ দর্শন ১।)

যাহার উন্নতবস্থায় পরম মঙ্গল লাভ হয়, তাহাকে ধর্ম্ম বলে।

ধর্ম্ম—ধৃঃ-ধাতুতে মন্ প্রত্যয় করিলে ধর্ম্ম-শব্দ নিষ্পন্ন হয়।

ধৃঃ—অবধারণে অর্থাৎ বস্তু যাহা ধারণ করে।

ধারণাদ্ধর্ম্মমিত্যাহুঃ ধর্ম্মো ধারয়তে প্রজাঃ।
যৎস্যাদ্ধারণ সংযুক্তং স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়॥ (মঃ ভাঃ)
ধর্ম্মেনৈব জগৎ সুরক্ষিতমিদং ধর্ম্মো ধরাধারকঃ।
ধর্ম্মদ্বস্তু ন কিঞ্চিদস্তি ভুবনে ধর্ম্মায় তস্মৈ নমঃ॥
শর্ব্বরী দ্বীপকশ্চন্দ্র প্রভাতে দ্বীপকোঃ রবিঃ।
সৎপুত্র কুলদ্বীপকঃ ত্রৈলোক্যদ্বীপকোঃ ধর্ম্মঃ॥ (নীঃ শাঃ)

শর্ব্বরী (রাত্রি) প্রদীপ চন্দ্র, প্রভাতে প্রদীপ রবি (সূর্য্য), সৎপুত্র কুলের (বংশের) প্রদীপ এবং ত্রিলোকের প্রদীপ একমাত্র ধর্ম্ম।

রাত্রার্থমর্দ্ধং দিবসং যতেত বর্ষার্থমষ্টপ্রযতেত মাসাম্।
বার্দ্ধক্য হেতো বয়স নবীনা পরত্র হেতোরিহ জন্মনা চ॥ (নীঃ শাঃ)

যে-প্রকার রাত্রিতে সুখে নিদ্রা যাইবার জন্য দিবসে যত্ন করা উচিত, বর্ষার চারি-মাস সুখে অতিবাহিত করিবার জন্য আট মাস যত্ন করা উচিত, বার্দ্ধক্যকাল সুখে অতিবাহিত করিবার জন্য নবীন বয়সে অর্থ সংগ্রহ করা উচিত, সেই প্রকার পরকাল সুখের জন্য ইহজন্মে যত্নপূর্ব্বক ধর্ম্মাচরণ, ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ধর্ম্মানুশীলন করা সকলের উচিত।

প্রাণিনামুপকারায় যদেবেই পরত্র চ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা তদেব মতিমান্ ভজেৎ॥ (বিঃ পুঃ ৩।৪২)

যাহার দ্বারা প্রাণিগণের ইহকাল ও পরকাল উপকার হয়, কায়-মন ও বাক্যের দ্বারা তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
ধর্ম্মোহি তেষামধিকো বিশেষো ধর্ম্মেণহীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥
(নীঃ শাঃ)

আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন মানুষে ও পশুতে প্রভেদ নাই। মানুষে ধর্ম্ম-জ্ঞান আছে বলিয়া অধিক অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, ধর্ম্মহীন নর পশুর সমান। (ক্রমশঃ)

—শ্রীজগদ্বন্ধুদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত

মায়াবাদ-নিরাসপর শ্রীমদানন্দতীর্থ পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্বাচার্য্য-বিরচিত

তত্ত্বমুক্তাবলী

[পরিশিষ্টে শ্রীমদ্‌বাদিরাজ স্বামিপাদ-কৃত

যুক্তিমল্লিকা-সহ]

আগ্রহী ব্যক্তিগণ শীঘ্রই সংগ্রহ করুন।

শ্রীপুরুষোত্তম মাস

জয় জয় শ্রীপুরুষোত্তম—জয় রাধানাথ।
জীব-প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত॥
জয় জয় শ্রীপুরুষোত্তম—ভক্তপ্রিয়-নাথ।
জীব-প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত॥
জয় জয় শ্রীপুরুষোত্তম—বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রাণ।
জীব-প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিদান॥
জয় জয় শ্রীপুরুষোত্তম—নরহরির প্রাণ।
জীব-প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিদান॥
জয় জয় শ্রীপুরুষোত্তম—লক্ষ্মীপ্রিয়া-নাথ।
বিশ্ববাসী ভক্তগণে কৈলা আত্মসাৎ॥
জয় জয় শ্রীপুরুষোত্তম—ভক্তগণ-প্রাণ।
কৃপাদৃষ্টি কর প্রভু সর্ব্বজীবে ত্রাণ॥
জয় জয় শ্রীপুরুষোত্তম—স্বয়ং ভগবান্।
সর্ব্বজীবে কর প্রভু শুভ দৃষ্টিদান॥
জয় জয় শ্রীপুরুষোত্তম—স্বয়ং ভগবান্।
সর্ব্বজীবে কর প্রভু প্রেমভক্তি দান॥
জয় জয় শ্রীপুরুষোত্তম—স্বয়ং ভগবান্।
প্রেমভক্তি দিয়া কর পরম কল্যাণ॥
জয় জয় শ্রীপুরুষোত্তম—স্বয়ং ভগবান্।
শ্রীচরণে ভক্তি দিয়া কর ভাগ্যবান্॥
জয় জয় শ্রীপুরুষোত্তম—সর্ব্বজীব-প্রাণ।
তোমার পদারবিন্দে সতত প্রণাম॥
জয় জয় শ্রীপুরুষোত্তম—শ্রীনন্দনন্দন।
দুষ্কৃতি হরিয়া দেহ সুকৃতি প্রধান॥
জয় জয় শ্রীপুরুষোত্তম—পরম-ঈশ্বর।
সর্ব্বজীবের কর্ম্ম দেখ, বাহির-অন্তর॥
জয় জয় শ্রীপুরুষোত্তম—সর্ব্বজীব-শরণ।
কর প্রভু সবার অপরাধ মোচন॥

জয় জয় শ্রীপুরুষোত্তম—সর্ব্বজীব-পিতা।
আ-চণ্ডাল সবারে প্রেম-ভক্তিদাতা॥
জয় জয় শ্রীপুরুষোত্তম—সর্ব্ব-মহীপতি।
তোমার শরণ বিনা জীবের নাহি গতি॥
জয় জয় শ্রীপুরুষোত্তম—অগতির গতি।
জনমে জনমে দিও তুয়া পদে মতি॥
জয় জয় শ্রীপুরুষোত্তম—যশোদাকুমার।
অহং-মম-অভিমান ঘুচাও আমার॥
জয় জয় শ্রীপুরুষোত্তম—দেবকীদুলাল।
কামনা ঘুচায়ে দেহ শুদ্ধভক্তি-বল॥
জয় জয় শ্রীপুরুষোত্তম—গৌরগোপাল।
অস্থিরচিত্ত সুস্থির কর দেখিয়া কাঙ্গাল॥
জয় জয় শ্রীপুরুষোত্তম—শচীর দুলাল।
শরণ লইনু, ঘুচাও সংসার-জঞ্জাল॥
জয় জয় শ্রীপুরুষোত্তম—শচীর নন্দন।
তোমার অভয়পদে লইনু শরণ॥
জয় জয় শ্রীপুরুষোত্তম—সর্ব্বেশ্বরেশ্বর।
তুমি আমার, আমি ত' তোমার কিঙ্কর॥
জয় জয় শ্রীপুরুষোত্তম—পতিতপাবন।
বদ্ধজীব প্রেম পায় তোমারি কারণ॥
জয় জয় শ্রীপুরুষোত্তম—বাঞ্ছাকল্পতরু।
সর্ব্বজীবের পরমাত্মা পরম-গুরু॥
জয় জয় শ্রীপুরুষোত্তম—বৃন্দাবনচন্দ্র।
অনুক্ষণ হউ স্মৃতি তুয়া পদদ্বন্দ্ব॥
জয় জয় শ্রীপুরুষোত্তম—বৃন্দাবনচন্দ্র।
হৃদয়ে দান দেহ তব পদদ্বন্দ্ব॥
অগতির গতি প্রভু তুমি যে আমার।
শ্রীপুরুষোত্তম মাস! তোমায় কোটি নমস্কার॥

—শ্রীকৃষ্ণমধুসূদন দাস ব্রহ্মচারী, মাথাভাঙ্গা (কোচবিহার)

———

শরণাগত ও শরণাগত-রক্ষক ভগবান্ শ্রীহরি

শাস্ত্রাদিতে আমরা প্রকৃত ভক্তের কি-প্রকার শরণাগতি ও আর্ত্তির প্রয়োজন এবং তাতে শরণাগত-রক্ষক ভগবান্ শ্রীহরি কি-প্রকার কৃপা করে থাকেন, তার বহু প্রমাণ লক্ষ্য করেছি। গজরাজ-উদ্ধার-লীলা সেইসব প্রমাণের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জগতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরাদি থেকে আরম্ভ করে বহু দেবতা আছেন। এঁরা সকলেই সগুণ অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ যে-কোন এক গুণের দ্বারা আবৃত। তাই এইসব গুণ-প্রভাবে এই দেবতাগণ কিছু কিছু অভিমানযুক্ত, কিন্তু শরণাগত-রক্ষক ভগবান্ শ্রীহরি নির্গুণ। কোন গুণদ্বারা তিনি আবৃত নন। তাই স্বভাবতঃই তিনি নিরভিমান। হস্তী হলেও যখন হৃদয়ের একান্ত আর্ত্তি-সহকারে বিপদ হতে উদ্ধার লাভের জন্য স্তুতি-বন্দনা করতে আরম্ভ করলেন, তখন এই গজরাজ (হস্তীরাজ) বিশেষ করে কোন দেবতার উদ্দেশ্যে বন্দনা করেন নাই। তাতে অভিমানবশতঃ ব্রহ্মাদি দেবতাগণ কেউই গজরাজকে নক্রের (কুম্ভীর) হাত হতে রক্ষা করবার জন্য কৃপা-পরবশ হয়ে আসেন নাই। ছুটে এসেছিলেন—ভগবান্ শ্রীহরি। এতে পরিষ্কার বুঝা যায়,—ভগবান্ শ্রীহরি নিরভিমান এবং শরণাগত-রক্ষক।

এই গজরাজ-উদ্ধার-লীলাতে জগজ্জীবের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শ্রীল কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস দেখাচ্ছেন যে, বহুজন্মের পরে জীব ভাগ্যক্রমে সাধু-গুরু-কৃপায় ভক্তি লাভ করে এবং সেই ভক্তি-প্রভাবে ক্রমে ক্রমে অনন্তকালের জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি ত্রিতাপ দুঃখ হতে উদ্ধার পেয়ে পরমানন্দকন্দ শ্রীভগবানের চরণকমল লাভে সক্ষম হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে যদি কোন ঘটনাক্রমে গুরু-বৈষ্ণব-চরণে অপরাধ হয়, তাহলে তার পদস্খলন হয়ে যায়; তাতে ভক্তি সঙ্কুচিত হয়ে গিয়ে ভগবচ্চরণ-প্রাপ্তিতে বিলম্ব ঘটে। কিন্তু গুরু-বৈষ্ণবগণ অদোষদরশী, বিশেষতঃ করুণাসিন্ধু বলেই আশু তার অপরাধ স্খালনের জন্য শাসন করে সংশোধনের ব্যবস্থা করেন। সেই জীব যদি পুনঃ শরণাগত হন, তাহলে তখন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের দুর্ল্লভ ধন "প্রেমভক্তি" প্রদান করে ভগবচ্চরণে পৌঁছে দেন।

এই গজরাজ পূর্ব্বজন্মে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা হয়ে ভগবদ্ধ্যানমগ্ন অবস্থায় অগস্ত্য মুনির চরণে অতিথি-সৎকার না করারূপ যে অপরাধ করেছিলেন, তাতে মুনির অভিশাপে গজ-জন্ম পেয়েছিলেন। প্রকৃত বিচারে ভগবদনুশীলনকারিগণ কে তাঁদের সম্মান করল বা করল না, এটাকে তাঁরা প্রাধান্য দেন না। তবে ক্রোধাবিষ্ট হওয়ার

কারণ গুরু-বৈষ্ণবকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন না করা একপ্রকার অপরাধবিশেষ। সেই অপরাধে জীবের চরম অধোগতি হয়ে থাকে, অগস্ত্যমুনি সেই শিক্ষাই দিলেন। যদি বলা যায়, ভগবচ্চিন্তামগ্ন ছিলেন, অপরাধ হলে অজ্ঞাতসারে অপরাধ হয়েছিল, অজ্ঞাত-অপরাধ তো ধর্ত্তব্য নয়। বিচারক্ষেত্রে অপরাধ অপরাধই; তাহা জ্ঞাতসারে হউক, কি অজ্ঞাতে হউক।

এখানে প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, যাগ-যজ্ঞ-ধ্যান-তপস্যা অপেক্ষা ভগবৎ-ধর্ম্মানুশীলনরূপ শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ-বন্দনাদি নবধা ভক্ত্যঙ্গই ভগবচ্চরণপ্রাপ্তির সহজ ও সরলতম পন্থা। ইহাদ্বারাই শীঘ্র ভগবৎচরণ লাভ করা যায়। ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার কৃপা-প্রার্থনাতে মুনি তাকে ক্ষমা করে একজন্ম পরেই ভগবৎপাদপদ্মে পৌঁছে দিয়েছিলেন। তবে যদি অপরাধের পরে অনুশোচনা বা আত্মসংশোধনের চেষ্টা না থাকে, তাহলে চিরমঙ্গলের উদয় হয় না, বরঞ্চ বঞ্চিতই থেকে যেতে হয়।

আর একটী বিশেষ আলোচ্য বিষয় যে, যদি সত্যই নিত্যমঙ্গলেচ্ছু জীব নিষ্কপটভাবে ভগবচ্চরণ আশ্রয় করেন এবং হঠাৎ দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর পদস্খলন হলেও তাঁর ভক্তিভাব কখনও নষ্ট হয় না। এইজন্মে যতটুকু ভক্তি যাজন হল, পরজন্ম সে যে ভাবেই লাভ করুক না কেন, তারপর থেকেই ভক্তিযাজন শুরু হয়। প্রথম থেকে শুরু করতে হয় না অর্থাৎ জাগতিক বিদ্যা যেমন মৃত্যুর পর নষ্ট হয়ে যায়, পরজন্মে সেই বিদ্যা লাভের সম্ভাবনা না থাকতেও পারে, আর সম্ভাবনা থাকলেও বিদ্যা প্রথম থেকে আরম্ভ করতে হয়। কিন্তু ভক্তি পরমার্থ-বিদ্যা-স্বরূপ; এই বিদ্যা জাগতিক বিদ্যার মত নষ্ট হয় না। ভগবান্ নিত্য এবং তৎসম্পর্কিত বস্তু ও বিদ্যাও নিত্য; তাই এ ক্ষেত্রে নতুন করে আরম্ভ করবার প্রশ্নই ওঠে না।

গজজন্মে সাধারণ জীবের মত সাময়িক জাগতিক বল-বীর্য্যে গর্ব্বান্ধ হয়ে নিত্য-স্বরূপ জীবের ভগবদ্ দাসত্ব ভুলে যাওয়ার পর করুণাময় ভগবানের সংশোধনী মায়া-শক্তি জীবকে সংশোধন করে পুনরায় নিত্যস্বরূপে জীবকে প্রতিষ্ঠিত করেন, তাঁর কৃপায় জীব নিজচেষ্টা, বল-বীর্য্য মূল্যহীন, আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবের নিকট সহায়তা লাভের আশা করা বৃথা যখন অনুভব করে, তখন তার নিত্য স্বরূপজ্ঞানের উন্মেষ ঘটে এবং জন্মান্তরের সামান্য হলেও সেই ভক্তিভাব জাগরিত হয়ে জীবকে ভগবৎ-পাদপদ্মের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। গজরাজেরও তাই হল। বিগত জন্মেও ভগবদ্ভক্তি নষ্ট হয় নাই, পরন্তু তারপর থেকে ভক্তির শ্রেষ্ঠ অঙ্গ কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দন, পাদসেবন, আত্মনিবেদন করে ভগবদ্দর্শন ও কৃপালাভ করে পার্ষদত্ব পেয়েছিল। জড়ভরতাদি এইরূপ বহু প্রমাণ আছে।

'এক কার্য্যে করেন প্রভু কার্য্য পাঁচ সাত'।—এ ত' শাশ্বতী বাণী। গজউদ্ধার-লীলার মধ্যে বহু শিক্ষণীয় বিষয় ও ভগবানের লীলামাধুরী পরিপুষ্ট।

সমস্ত আলোচনা সম্ভব নয়, প্রবন্ধ-কলেবর সীমিত রাখবার জন্য। আর একটী বিশেষ অংশ আলোচনা না করলে তৃপ্তি হয় না। তা হল নক্রের (কুম্ভীর) কথা, যিনি গজরাজের পা ধরে জলতলদেশে আকর্ষণ করেছিলেন। এখানে অদ্ভুত ঘটনা অনুভব হয়। নক্র হলেও ইনি সাধারণ নন। জাগতিকভাবে বলশালী গজের সমতুল্য নহেন। আলোচ্য বিষয় হল গজরাজের ভগবদ্দর্শন ও পার্ষদত্ব লাভের পিছনে এই নক্রের ভূমিকা। নক্র যদি বিষমভাবে আকর্ষণ না করত, তাহলে জাগতিক দম্ভ-অহঙ্কার গজরাজের এত শীঘ্র নষ্ট হত না। জীব চরম দুঃখে-কষ্টে নিপীড়িত, নিশ্চেষ্ট হলে তবেই সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের শরণাপত্তি গ্রহণ করে। তাই নক্র আপ্রাণ চেষ্টা করে গজরাজকে আকর্ষণ করা থেকে বিরত হয় নাই, তা গজরাজকে ভগবানের স্মরণ, চরণাশ্রয় করতে বাধ্য করিয়েছিল, যার জন্য শীঘ্রই ভগবৎপ্রাপ্তি হল। তাই নক্রের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আবার ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করলে দেখা যায়,—"কোটী জন্ম করে যদি সাধন-ভজন। তথাপি না পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥" এখানে রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি-ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীশ্যামসুন্দরের কথা থাক, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডাধিপতি লক্ষ্মীনিবাস ভগবান্ নারায়ণ এসে গজরাজকে কৃপা করে জল থেকে উপরে টেনে তুলে সুদর্শনচক্রদ্বারা নক্রকে নিধন করে গজ উদ্ধার করেছিলেন। ইহাই সাধারণভাবে জানা যায়। কিন্তু এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন, সামান্য ভাগ্যে ভগবানের শ্রীহস্তে জীবের মৃত্যু হয় না। ভগবানের শ্রীহস্তে নিধনপ্রাপ্ত হতে হলে ভাগ্য চাই। তা নক্র কি ভাগ্যে লাভ করল? পদ্মপলাশলোচন ভগবানকে দর্শন করল, এটাই আলোচ্য বিষয়।

এখানে ভক্তবৎসল ভগবান্ দেখাচ্ছেন যে, এই নক্র পূর্ব্বজন্মে হূহূ-নামক গন্ধর্ব্ব ছিলেন। দেবলমুনির চরণে অপরাধ করে নক্র জন্ম লাভ করেন। তখন ঐ মুনির কৃপায় জেনেছিলেন, জীব যে অবস্থায় যেখানে থাকুন না কেন কখনও অমিশ্র আনন্দ লাভ করতে পারবে না, যদি সে ভগবানের চরণে উপনীত না হয়। তুমি (হূহূ গন্ধর্ব্ব)! যে পরম আনন্দলাভ করতে চাইছ নিত্য তোমার সঙ্গিণীগণের সঙ্গে, তা কিন্তু সম্ভব নয়। সবাই তোমরা অনিত্য এবং সবাই আনন্দ পেতে চাইছ। কে কার আনন্দের অভাব পূরণ করবে? আনন্দ পেতে হলে ভগবানের ভজন করতে হবে, তাঁর পাদপদ্মে যেতে হবে। সেই ভজনের শ্রেষ্ঠ পন্থা ভগবানের ভক্তগণের করুণা লাভ। তুমি যতই অযোগ্য, অধম, পামর হও না কেন, ভক্তগণ চাইলে ভগবান্ কৃপা করতে বাধ্য। জগদ্বন্দ্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন,—

'বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়। এহেন পামর প্রতি হবেন সদয়॥' দেবল মুনি বললেন,—এখন নক্রজন্ম লাভ কর, গজরাজ উদ্ধার করতে যখন ভগবান্ আসবেন, তখন তুমি ভগবানের হাতে উদ্ধার লাভ করবে। সেইমত হূহূ গন্ধর্ব্ব নক্র হয়ে গজরাজের চরণ ধরেছেন। গজরাজের স্বজন-বান্ধবগণের শত চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে প্রাণপণে চরণ আঁকড়ে আছেন। গন্ধর্ব্বের বক্তব্য যেন—"হে গজরাজ! আমি নিজের চেষ্টায় কোনদিন ভগবানের দর্শন লাভ করতে পারব না, আপনি ভগবানের ভক্ত, ভগবান্ ভক্তবৎসল। আপনি যদি তাঁকে কাতর হয়ে ডাকেন, তিনি নিজ ভক্তবাৎসল্যগুণে নিশ্চয়ই আপনার ডাকে আসবেন, আর তখনই আমার ভগবানের চরণদর্শন ও উদ্ধার লাভ হবে। আপনার চরণছাড়া হয়ে গেলে ভগবানের দর্শন পাব না। আপনি আমায় চরণছাড়া করবেন না।" প্রাণপণে তাই গজরাজের চরণ আশ্রয়।

প্রসঙ্গক্রমে ভূমণ্ডলের শ্রেষ্ঠস্থান নবদ্বীপধামে সমুদ্রগড়ের সমুদ্রসেন রাজার কথা স্মরণ হয়। রাজা সমুদ্রসেন চেয়েছিলেন ভগবানকে দর্শন করতে। কিন্তু ভক্ত-কৃপা ছাড়া ভগবানের দর্শন ত' পাওয়া যাবে না। তখন ভক্ত হিসাবে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখা পঞ্চপাণ্ডবগণের মধ্যে ভীমসেনকে পেলেন, যিনি যুধিষ্ঠির মহারাজের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়ার সঙ্গে ভ্রমণ করতে করতে সমুদ্রগড়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। ভীমসেনের সঙ্গে মিত্রতা করে ভগবানকে পেতে অনেক সময় লাগবে, কিন্তু ভক্তকে বিপদাপন্ন করলে বিপদভঞ্জন, ভক্তের ভগবান্ ভক্তরক্ষায় শীঘ্রই আসবেন। তখন অতি শীঘ্রই তাঁর দর্শনলাভ হবে। হলও তাই, যজ্ঞের ঘোড়া সমুদ্রসেন আটকে দিয়ে ভীমসেনের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন এবং ভীমসেনকে অস্থির করে তুললেন। বাধ্য হয়ে ভীমসেন ভগবানকে স্মরণ করতেই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্ সমুদ্রসেনের অন্তরের ভাব বুঝে তাঁকে দর্শন দিয়ে কৃপা করলেন। তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ হল। এখানে সেইরূপ ভক্ত গজরাজের কৃপায় ভগবানকে দর্শন করে জাগতিক নশ্বর এই পাঞ্চভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করে পরমানন্দময়ের ধামে যাব—সেই ইচ্ছায় হাজার বৎসর গজরাজের চরণ ধরে আছেন। শেষে নক্রের অপ্রতিহতা চেষ্টা ও ঐকান্তিকতা দেখে ভগবান্ এসে গজরাজের সঙ্গে নক্রকে টেনে তুলে শ্রীরূপ দর্শন করালেন সাক্ষাদ্‌ভাবে এবং শেষে নক্র-জন্ম থেকে উদ্ধার করলেন।

ভগবানের কৃপা লাভেচ্ছুগণের এইরূপ ভক্তগণের চরণ আশ্রয় করে অসীম ধৈর্য্য ধারণপূর্ব্বক অতি যত্নসহকারে কৃপালাভের অপেক্ষায় চেষ্টান্বিত থাকতে হবে। তাহলে 'অবশ্য রক্ষিবেন কৃষ্ণ বিশ্বাস পালন' বাক্যের সার্থকতা।

পরিশেষে, আর একটা কথা না বললে সংশয় থেকে যাবে। আমরা ভগবানের কৃপা, দর্শনলাভের জন্য কি তাহলে ভগবদ্-ভক্তগণকে কষ্ট দেব। তাঁদের সঙ্গে কি শত্রুতা আচরণ করব?—না, শত্রুতায় ভক্তদের মাধ্যমে ভগবানকে যে পাওয়া, তা ঠিক প্রবল তৃষ্ণাতুর ব্যক্তির সিন্ধুর কাছে গিয়ে জলবিন্দু পাওয়ার মত। কিন্তু মিত্রতা, সেবা পরিচর্য্যা প্রভৃতির দ্বারা ভক্তগণের প্রীতিবিধানের মাধ্যমেই যে ভগবানকে পাওয়া, সেইটাই প্রকৃত পাওয়া অর্থাৎ রসময় পরমানন্দ-নিকেতন ভগবানকে পরিপূর্ণভাবে লাভ করা। ইহাই জীবের চরম ও পরম-প্রাপ্তি।

—**শ্রীমতী লিপিকা সরকার**, শিলিগুড়ি

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৫শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৯৯ পৃষ্ঠার পর]

"শ্রীরাধারস-সুধানিধিঃ'র মধ্যে এমন সব তত্ত্ব আছে, তা সকলের আলোচনার ক্ষমতা নাই। প্রথমে দুই-একটী অধ্যায় হয়ত' আলোচনা করা যেতে পারে, কিন্তু পরে আর আলোচনা করা চলবে না। কে আলোচনা করবেন?—অত্যন্ত উন্নত পর্য্যায়ে যাঁরা আছেন, যাঁদের ভগবানের অপ্রাকৃত লীলামাধুরী শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণে কোনরকম ধরণের ভুল বুঝাবুঝি নাই, সেইপ্রকার ব্যক্তি আলোচনা করবেন।

শ্রীভাগবতের মধ্যেও কিছু তত্ত্বদর্শন আছে, যেমন—বস্ত্রহরণ-লীলা, নৌকা-বিলাস-লীলা, রাস-পঞ্চাধ্যায়, যেগুলো বর্ণনা করেছেন—এগুলো আলোচনার অধিকার সকলকে দেওয়া হয় নাই। বস্ত্রহরণ-লীলার যে ব্যাখ্যা রয়েছে শাস্ত্রে, সেটা অনেকে ভুল বুঝছেন। ছয় বছর বয়সের বালিকাগণ পূজা করছিলেন যোগমায়া দেবীর। সেইক্ষেত্রে বস্ত্রহরণ-লীলা হয়েছিল। বর্ত্তমানে যেভাবে বিকৃত করা হচ্ছে ইতিহাসটাকে, যারা সমালোচনার মনোভাব নিয়ে আমাদেরকে উল্টোভাবে ভুল বুঝাচ্ছেন, তাদের বিচার-বুদ্ধির প্রশংসা করা যায় না। ভগবানের লীলামাধুরী যদি প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার আচরণ বলে ভ্রম হয়, তাহলে মহাপরাধ। আমরা ভুল করে ফেলি বলে কতকগুলো আলোচনার ক্ষেত্রে সেইজন্য নিষেধনামা জারি করা হয়েছে। যদি কারও অধিকার আছে, তিনি এ ব্যাপারে আলোচনা করুন, সেটা ত' দোষনীয় নয়। কিন্তু সাধারণ মানুষ ঐ ধরণের আলোচনা করে না, করতে পারবে না, করা উচিত নয়। কেন এই নিষেধনামা? সেখানে শিব-ঠাকুরের উদাহরণ দিয়েছেন।

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্‌যথারুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥

ভয়ঙ্কর কথা ত'! সাগর থেকে মন্থন করা যে বিষটা উঠেছিল, সেই বিষটা শিবঠাকুর পান করেছিলেন। তাও তিনি বিষ খেয়ে মুহ্যমান হয়ে গিয়েছিলেন, সে ইতিহাসও আছে। কিন্তু ভগবৎকৃপায় আবার সুস্থ হয়েছেন। বিষ খেয়ে তিনি বিভোর হয়ে পড়েছেন, 'নীলকণ্ঠ', 'শিতিকণ্ঠ' নাম তাঁর হয়েছে। শিবঠাকুরের মত ক্ষমতা যারা পান নাই, তারা যেন এটা আলোচনা করতে অগ্রসর না হন। কথাটা কিরকম?—খুব ভাল কথা বলেছেন এটা। আলোচনা করলে খারাপ কি হবে? ভাল কথা বলছেন কোথায়? শ্রীবেদব্যাস ঠাকুরই বলে রেখেছেন আগেই।—

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ, শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্‌যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥

ব্রজবধূদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাসক্রীড়া যে ধীরব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে গুরুমুখে শ্রবণ করত অনুক্ষণ কীর্ত্তন করেন, তিনি অচিরে ভগবানে পরাভক্তি লাভ করে হৃদ্‌রোগ-কাম অনতিবিলম্বে দূর করতে সমর্থ হন। কিন্তু এখানে একটা নিষেধনামা জারি করা আছে, একটা শর্ত দেওয়া আছে। 'শ্রদ্ধান্বিত' শব্দেই সব কেটে গেছে। 'কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়।'—এটাতে আমার বিশ্বাস কোথায়? এ নির্ভরতা কোথায় আমার? এখানে ত' সব অধিকার কেটে যাচ্ছে। সুতরাং আমার অধিকার নাই।

ভাগবতের অন্যত্র যখন আলোচনা করছি, তখন আবার দেখি সেখানে যেন কিছু আশা-ভরসার কথা লেখা আছে। কিরকম?—

ন ময্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে।
ভর্জ্জিতা ক্বথিতা ধানাঃ প্রায়ো বীজায় নেশতে॥

এখানে এই শ্লোকটাতে সাধারণের জন্য কিছুটা আশা-ভরসা আছে। কৃষ্ণ বলছেন,—আমার প্রতি আসক্তচিত্ত ব্যক্তির কখনও কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য থাকতে পারে না, থাকে না। তাহলে জীবনটা কিরকম তাঁদের? কিভাবে তাঁদের জীবন কাটে? তাঁরা কেমন? 'ভর্জ্জিতা ক্বথিতা ধানাঃ প্রায়ো বীজায় নেশতে॥' এখানে 'ধান'-শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যে ধান ভাজা হয়ে গেছে, যে ধানকে সিদ্ধ করা হয়েছে, তার থেকে কি আর অঙ্কুরোদ্গমের সম্ভাবনা আছে?—নাই; সুতরাং যে ভক্তদের ঐরকম অবস্থা, তাঁরা সংসারে থেকেও আদৌ সংসারী নন, তাঁদের চেনা যায় না, তাঁরা বর্ণচোরা আম, তাঁরাই পাঁকাল মাছ;

সাধারণ মানুষ তাঁদের চিনতেই পারবে না, জানতেই পারবে না তাঁরা কি অবস্থায় আছেন। তাঁদের অবস্থাটা কৃষ্ণ নিজেই বর্ণনা করেছেন। সবগুলো পাশাপাশি রেখে বিচার করলে অনেক কিছু বুঝবার আছে। আমার চিত্ত কতটা অগ্রসর হয়েছে, আমি কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যে অভিভূত কিনা—বশীভূত কিনা, তার থেকে মুক্ত হতে পেরেছি কিনা, গুরুকৃপা আমার প্রতি কতটুকু হয়েছে, তার পরেই সবটা নির্ভর করছে। সেখানে কোন অহঙ্কার নাই, কোন বাহাদুরি নাই, কোন ঈর্ষা, হিংসা, মাৎসর্য্যের কথা নাই। সেখানে আছে কেবল আকুল ক্রন্দন, এছাড়া আর কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না। সেই আকুলতা-ব্যাকুলতার কথা রাধা-তত্ত্বদর্শনে পরিস্ফুট আছে।

রাধা—রাধিকা—সর্ব্বসাধিকা—যিনি ভগবানকে আরাধনার দ্বারা সবথেকে বেশী বশীভূত করেছেন। সেইজন্য তাঁর নাম রাধা। এই কারণে রাধার আর এক নাম হল—সেবারাণী। রাধিকার অষ্টোত্তরশতনাম আপনারা পড়েছেন। রাধিকার সহস্রনামস্তোত্র আছে। তার ভিতরে পার্থিব-অপার্থিব যত গুণ—সর্ব্বসদ্‌গুণগুলো বর্ণনা আছে অদ্ভুতভাবে। অর্থাৎ কোনদিকে কোনটা বাদ নাই। ভগবানকে বশীভূত করতে গেলে যে কৌশল লাগে, যে দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন, সমস্তগুলো তাঁর অধিগত। শ্রীকৃষ্ণকে যখন রাধা থেকে বাদ দেওয়া হয়, তখন কৃষ্ণের কোন পরিচয় নাই। শ্রীকৃষ্ণের ভাবপ্রকাশক সবকিছুই হলেন শ্রীমতী রাধারাণী। সেইজন্য তাঁকে ছাড়া কোন কিছু চিন্তা করতে পারা যায় না। 'রাধার দাসীর কৃষ্ণ সর্ব্ববেদে বলে॥'—একটা অদ্ভুত কথা। রাধারাণীর দাসীর অর্থাৎ সখীর অনুগত সখীর জন কৃষ্ণচন্দ্র বলে তাঁর পরিচয় দিচ্ছেন। ভয়ঙ্কর ব্যাপার! সেবার দ্বারা বশীভূত হচ্ছেন যে সেব্যবস্তু, তার জাজ্বল্যমান্ প্রমাণ এইটী।

আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরুবর্গ একজায়গায় বলেছেন,—"আপনারা মূল আশ্রয়-বিগ্রহের আনুগত্যে থেকে হরিভজন করুন।" যদি প্রশ্ন করা যায়,—মূলআশ্রয়-বিগ্রহ কে? অনেকেরই কিন্তু জিনিসটা জানা নাই, মূল আশ্রয়-বিগ্রহ হলেন—শ্রীমতী রাধারাণী। তারপরে নর্ম্মসখী, প্রিয়নর্ম্মসখী, মঞ্জরী ইত্যাদি। মূল আশ্রয়-বিগ্রহ রাধারাণীর অনুগত হয়ে সেবা করাই কর্ত্তব্য। সেই সেবাটাই সফল হবে, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হবে। আমরা মহাজন পদাবলীর মধ্যে দেখছি,—"আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে, আর সব মরে অকারণ॥" এর বহুরকম ব্যাখ্যা করা যায়। যেহেতু নিখিল আশ্রয় ভগবান্, আর তাঁর পরবর্ত্তী যত আশ্রয়-বিগ্রহ আছেন তাঁদের প্রত্যেকেরই আনুগত্য দরকার আছে। সে আনুগত্য যদি খাপছাড়া হয়ে যায়, সে আনুগত্য যদি Disconnected হয়, তাহলে তত্ত্বদর্শন

বিফল হল। শাস্ত্রে Preceptorial channel অর্থাৎ গুরু-পরম্পরার ধারা বর্ণনা আছে। 'আম্নায়'-শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে আমাদের গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যে। এ শব্দটা বেদের মধ্যে আছে। কি ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেখানে?—

আম্নায়ঃ শ্রুতয়ঃ সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মবিদ্যেতি বিশ্রুতাঃ।
গুরুপরম্পরাপ্রাপ্তা বিশ্বকর্ত্তুর্হি ব্রহ্মণঃ॥

গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত সেই আম্নায়—Channel ত' ঠিক আছে, Line ত' ঠিক আছে। [কোন কোন জায়গায় ভাষণ দিতে গিয়ে আমি আম্নায়-শব্দের ব্যাখ্যাকে মিলিয়ে গীতার শ্লোক বলতাম এবং ঐরূপ ব্যাখ্যা আছেও। আপনারা চিন্তা করে দেখবেন। যেখানে গীতায় কৃষ্ণ বলছেন অর্জ্জুনকে,—

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ॥

অর্জ্জুন! তোমাকে যে সনাতন ধর্ম্মতত্ত্ব উপদেশ করছি, এটা পূর্ব্বে আমি অনেককে বলেছি। 'প্রোক্তবানহমব্যয়ম্'—আমি কাকে বলেছি? 'বিবস্বান্'—সূর্য্যদেবকে বলেছি, সূর্য্যদেব নামকরা বৈষ্ণব। 'বিবস্বান্ মনবে প্রাহ'—বিবস্বান্ স্বায়ম্ভুব মনুকে বলেছেন। মনু ইক্ষ্বাকুকে বলেছেন। এইভাবে সেই সনাতন ধর্ম্মতত্ত্ব, ভাগবত-ধর্ম্মতত্ত্ব জগতে প্রচারিত হয়েছে। একথা শুনে অর্জ্জুনের তখন সন্দেহ হয়েছে। অর্জ্জুনের সন্দেহ কিসের? অর্জ্জুন ত' ভক্ত, অর্জ্জুন ত' তাঁর সখা। তিনি ভগবানের সঙ্গে সখ্যলাভ করেছেন, তাঁর আবার সন্দেহ কোথায়? এইরূপ একটা ভাব দেখাচ্ছেন—সন্দেহ হচ্ছে আমার, সংশয় হচ্ছে আমার, তুমি অপনোদন কর। সেইভাবেই প্রশ্নটা করছেন তিনি,—

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি॥

অর্জ্জুন বললেন,—কৃষ্ণ! তুমি ত' ইদানীং কালে জন্মগ্রহণ করেছ, আর বিবস্বান্ সূর্য্যদেব কতযুগ ধরে আছেন। সুতরাং তুমি যে সূর্য্যদেবকে এই যোগ বললে, তা আমি কি করে বিশ্বাস করব? আজকালকার মানুষ যা প্রশ্ন করে, সেইরকম প্রশ্ন করে বসেছেন অর্জ্জুন। তারই উত্তর দিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ। আমি আগে বলেছি,—আমি পুরাণ পুরুষ, আমি সকলের আদি অনাদি, সর্ব্বকারণকারণ। আমি এই সেদিন এসেছি বলে তুমি মনে করছ, আমি সেদিনকার ছেলেটা, আদৌ তা নয়। জেনে রাখো—আমি সকলের থেকে প্রাচীন, আমার থেকে কারও বয়স বেশী নয়, আমি পুরাণপুরুষ, আমার থেকে প্রাচীন কেহ নাই। সাধারণ মানুষের যে প্রাকৃত ধারণা, সেটা অপ্রাকৃত তত্ত্বে চাপিয়ে দিলে ত' হবে না। ভগবৎশক্তি—ভগবৎ তত্ত্ব সকলের উপরে।]

শাস্ত্রে এক জায়গায় লেখা আছে,—পার্ব্বতীদেবী দুর্গাদেবী বলছেন,—"তব বক্ষসি রাধাহং রাসে বৃন্দাবনে বনে।" যাঁরা জৈবধর্ম্ম ভাল করে পড়েছেন তাঁরা নিশ্চয়ই পেয়েছেন এই লাইনটা। মানেটা কি?—'আমি বৃন্দাবনে তোমার বক্ষবিলাসিনী রাধা।' এখন যারা Henothiest – পঞ্চোপাসকী আছেন, তারা বলবেন, বাঃ! এই ত' আমার দেবীর কথা বলা আছে এখানে। এই ত' আমার মা সবই। এখানে স্বরূপশক্তির, চিচ্ছক্তির কথা এসেছে। যদি জড়মায়া এটা বলেন, কথাটা ঠিক নয়; কিন্তু যদি যোগমায়া বলেন, তাহলে কথাটা ঠিক আছে, একটুও ভুল নাই। তত্ত্বদর্শন ঠিক আছে। শক্তি এবং সে শক্তির বিভিন্ন Function ভাগ করতে গিয়ে বিভিন্ন নামকরণ করা হয়েছে। কিন্তু সবটাকে এক করে দিলে ত' হবে না। বাড়ীর মালিকানী, আর ঝি-চাকরাণীকে কি এক করলে হবে? এ ভুল বিচার বুদ্ধিমান্ মানুষ মেনে নেবে কেন? "তব বক্ষসি রাধাহং রাসে বৃন্দাবনে বনে"—জড়মায়া একথা বলতে পারেন না, ক্ষমতা নাই তাঁর। ভগবানের পিছনে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে থাকেন তিনি। বহুশাস্ত্রে বর্ণনা আছে, ভাগবতেও বর্ণনা আছে।—

বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ॥

'বিলজ্জমানয়া'—লজ্জায় তিনি ভগবানের সামনে যান না, পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন।

সেইরকম একজন একটা অঘটন ঘটিয়ে ফেলেছিলেন। ওটা আপনাদের জানা থাকতে পারে। যখন সীতা হরণ হয়ে গেছে, শ্রীরামচন্দ্র সে-সময় সমস্ত বানর-সৈন্যগণের সঙ্গে Pact করেছেন। শ্রীরামচন্দ্র যাচ্ছেন মাদুরার মীনাক্ষি-মন্দিরের পাশ দিয়ে। আর কি দুর্ব্বুদ্ধি চেপেছে পার্ব্বতীর। তিনি মন্দিরের বাইরের দিকে এসে সীতার মূর্ত্তি ধারণ করে দাঁড়িয়ে গেছেন। অর্থাৎ পরীক্ষা করছেন, শ্রীরামচন্দ্র আমাকে চিনতে পারেন কিনা। শ্রীরামচন্দ্র সোজা যাচ্ছিলেন, হঠাৎ পাশের দিকে তাকিয়েছেন, দেখেন—দেবী দাঁড়িয়ে আছেন। দেবীকে দেখে বললেন,—দেবী, ভাল আছ ত'? এই বলে তিনি চলে গেলেন। তারপরে দেবী ফিরে গেছেন মন্দিরে। শিবঠাকুর বললেন,—তুমি এত বড় অন্যায় করতে পার? আমাদের উপাস্য শ্রীরামচন্দ্র, তাঁকে তুমি পরীক্ষা করতে গেছ! এত বড় তোমার অহঙ্কার! আজ থেকে তুমি আমার ডানদিকে বসবে, আর না হয় আমার সামনে বসবে। আমি তোমাকে পূজা করব। নিলেন না তাঁকে পত্নীরূপে। আবার তাঁকে দেহত্যাগ করতে হল, আবার তাঁকে জন্ম নিতে হল।

এগুলো ত' Discipline। শাস্ত্রে যদি এসব তত্ত্ব বর্ণনা আছে, তাহলে এগুলো কি আমাদের শিক্ষার বিষয় নয়? এটা ত' কেউ গাঁজায় দম দিয়ে লেখেন নাই। এগুলো হল তত্ত্বদর্শন, তত্ত্বসিদ্ধান্ত।

আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম দক্ষিণ দেশ থেকে এনেছিলেন দুখানা বই, একখানা ইংরাজী ও একখানা সংস্কৃত। তার মধ্যে একটী হল—"South India Shrines।" এর মধ্যে ঐদেশের বিখ্যাত মন্দিরগুলির ইতিহাস-ইতিবৃত্ত বর্ণিত হয়েছে, যা বিভিন্ন পুরাণের মধ্যে বর্ণনা আছে। শ্রীশিবঠাকুর পার্ব্বতীকে মেনে নিলেন না, তাঁকে দেহত্যাগ করে আবার শিবের কাছে আসতে হল। তবে শিব তাঁকে গ্রহণ করেছেন। এটা হল Punishment—সাজা। 'পঞ্চমুখে রামনাম গান ত্রিপুরারি।' দুজনে ত' সর্ব্বদা রাম-নাম, কৃষ্ণ-নাম জপ করছেন। তাঁদের আরাধ্যদেব, উপাস্যদেব যিনি, তাঁকে পরীক্ষা করতে যাওয়া শিবানীর পক্ষে কত বড় বেয়াদপি!

রাধাতত্ত্ব এত গম্ভীর যে সব জায়গায় এই গূঢ়তত্ত্ব আলোচনা করা যায় না। আপনাদের যাঁদের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা আছে, তাঁরা আলোচনা করবেন গোস্বামি-গ্রন্থ, কবি জয়দেবের গ্রন্থ, গর্গসংহিতা, শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের রাধারস-সুধানিধিঃ। এরূপ বহু গ্রন্থ আছে যার ভিতরে রাধাতত্ত্ব বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু পরম গোপনীয় রহস্য-কথা সকলের কাছে সমানভাবে বলা যায় না, আলোচনা করা উচিত নয়। কেন আলোচনা করা যায় না?—আমরা ভুল-ভ্রান্তির মধ্যে পড়ে যেতে পারি। কেউ বলছেন,—কিছু না করার থেকে কিছু করা ভাল। সেটা কখন?—আমি যখন কিছুই করি না, তখন বলছেন—তুমি বসে বসে নাম কর। তখন নাম করলাম। 'Something is better than nothing'—'নেই মামার থেকে কানা মামা ভাল।' কিন্তু অপরাধ করার চাইতে অপরাধ না করা ভাল,—এটা ত' একটা বিশেষ বিচার। আমার মন যদি উন্নত না হয়েছে, তাহলে ওটা আলোচনা থেকে বিরত থাকব। আর যদি বুঝি,—হ্যাঁ, ভগবান্ আমাকে অধিকার দিয়েছেন, গুরু আমাকে অধিকার দিয়েছেন, গোস্বামিগণ আমাকে অধিকার দিয়েছেন, তখন আমি সেইরকম বিচারধারা নিয়ে চলব। তবে সকলকে চিরদিন একই অবস্থায় থাকতে হবে, এমন কথা নয়। এটা কোথাও বলা হয় নাই। (ক্রমশঃ)

———

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।



ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষক্সেন-কথাসু যঃ। নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪৫শ বর্ষ | ১৬ হৃষীকেশ, গর্ভোদশায়ী, ৫০৭ শ্রীগৌরাব্দ | ৭ম সংখ্যা

৩১ ভাদ্র, শুক্রবার, ১৪০০, ইং ১৭/৯/৯৩

শ্রীশ্রীরাধাষ্টকম্

[শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

শ্রীবৃন্দাবনেশ্বর্য্যৈ নমঃ

দিশি দিশি রচয়ন্তীং সঞ্চরন্নেত্র-লক্ষ্মী-
বিলসিত খুরলীভিঃ খঞ্জরীটস্য খেলাম্।
হৃদয়-মধুপ-মল্লীং বল্লবাধীশ-সূনো-
রখিল-গুণ-গভীরাং রাধিকামর্চ্চয়ামি॥ ১॥

যিনি কোনদিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিলে মনে হয় যেন সেইদিকে খঞ্জনমালা খেলা করিতেছে, অর্থাৎ খঞ্জন-পক্ষীর ন্যায় বিলোকন-পটু সুতীক্ষ্ণ চঞ্চলদৃষ্টি-সম্পন্ন যাঁহার নয়নযুগল, যিনি শ্রীকৃষ্ণের চিত্তরূপ ভ্রমরের মল্লিকা-কুসুমস্বরূপ এবং অশেষ গুণের আশ্রয়হেতু যিনি গম্ভীর-প্রকৃতি, সেই শ্রীমতী রাধিকাকে আমি পূজা করি॥১॥

পিতুরিহ বৃষভানোরন্বয়-প্রশস্তিং
জগতি কিল সমস্তে সুষ্ঠু বিস্তারয়ন্তীম্।
ব্রজনৃপতি-কুমারং খেলয়ন্তীং সখীভিঃ
সুরভিণি নিজ-কুণ্ডে রাধিকামর্চ্চয়ামি ॥ ২ ॥

যিনি এই নিখিল জগতে স্বীয় পিতা বৃষভানুরাজের বংশ-শ্লাঘা বিস্তার করিতেছেন এবং যিনি বিবিধ জলজ-পুষ্পে সুরভিত নিজ বিলাস-স্থান শ্রীরাধাকুণ্ডে সখীগণে মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত জলক্রীড়া করিতেছেন, সেই শ্রীমতী রাধিকাকে আমি অর্চ্চনা করি ॥ ২ ॥

শরদুপচিত-রাকা-কৌমদীনাথ-কীর্ত্তি-
প্রকর-দমনদীক্ষা-দক্ষিণ-স্মেরবক্ত্রাম্।
নটদঘভিদপাঙ্গোত্তুঙ্গিতানঙ্গ-রঙ্গাং
কলিত-রুচি-তরঙ্গাং রাধিকামর্চ্চয়ামি ॥ ৩ ॥

যিনি মন্দ মন্দ হাস্যযুক্ত বদনমণ্ডলদ্বারা শরৎকালীন নির্ম্মল চন্দ্রের শোভাও তিরস্কার করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের চঞ্চল অপাঙ্গদ্বারা যাঁহার অনঙ্গ-রঙ্গ পরিবর্দ্ধিত হয় এবং যিনি শ্রীঅঙ্গে লাবণ্যের তরঙ্গ ধারণ করিতেছেন, সেই শ্রীমতী রাধিকাকে আমি পূজা করি ॥ ৩ ॥

বিবিধ-কুসুমবৃন্দোৎফুল্ল-ধম্মিল্লধাটী-
বিঘটিত-মদঘূর্ণৎ-কেকিপিঞ্ছ-প্রশস্তিম্।
মধুরিপু-মুখবিম্বোৎগীর্ণ-তাম্বুলরাগ-
স্ফুরদমল-কপোলাং রাধিকামর্চ্চয়ামি ॥ ৪ ॥

নানাবিধ কুসুম-শোভিত কেশপাশদ্বারা যিনি শিখণ্ড-গর্ব্বে গর্ব্বিত শিখণ্ডিগণের গর্ব্ব খর্ব্ব করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক যাঁহার সুন্দর গণ্ডদেশ তাম্বুলরাগে ঈষৎ রঞ্জিত, সেই শ্রীমতী রাধিকাকে আমি অর্চ্চনা করি ॥ ৪ ॥

অমলিন-ললিতান্তঃস্নেহ-সিক্তান্তরঙ্গা-
মখিলবিধ-বিশাখাসখ্য-বিখ্যাতশীলাম্।
স্ফুরদঘভিদনর্ঘ-প্রেম-মাণিক্য-পেটীং
ধৃত-মধুর-বিনোদাং রাধিকামর্চ্চয়ামি ॥ ৫ ॥

যাঁহার অন্তঃকরণ ললিতা-সখীর নির্ম্মল-আন্তরিক স্নেহে অভিষিক্ত, বিশাখার সহিত অশেষবিধ সখ্যভাব থাকায় যাঁহার সু-স্বভাব জগদ্বিখ্যাত, যিনি শ্রীকৃষ্ণের

অমূল্য প্রেমরূপ মাণিক্যের পেটিকা, মাধুর্য্য-বিনোদিনী সেই শ্রীমতী রাধিকাকে আমি পূজা করি ॥ ৫ ॥

অতুলমহসি বৃন্দারণ্য-রাজ্যেঽভিষিক্তাং
নিখিল-সময়ভর্ত্তুঃ কার্ত্তিকস্যাধিদেবীম্।
অপরিমিত-মুকুন্দ-প্রেয়সীবৃন্দ-মুখ্যাং
জগদঘহরকীর্ত্তিং রাধিকামর্চ্চয়ামি ॥ ৬ ॥

যিনি অতুল-প্রভাবসম্পন্ন বৃন্দাবন-রাজ্যের অধিশ্বরী, নিখিল সময়ের অধিপতি **কার্ত্তিক-মাসের যিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবী উর্জ্জেশ্বরী**, শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য প্রেয়সী-গণের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা এবং যাঁহার লীলা নিখিল পাপহারিণী, সেই শ্রীমতী রাধিকাকে আমি অর্চ্চনা করি ॥ ৬ ॥

হরি-পদ-নখকোটী-পৃষ্ঠপর্য্যন্তসীমা-
তটমপি কলয়ন্তীং প্রাণকোটেরভীষ্টম্।
প্রমুদিত-মদিরাক্ষীবৃন্দ-বৈদগ্ধি-দীক্ষা
গুরুমতিগুরুকীর্ত্তিং রাধিকামর্চ্চয়ামি ॥ ৭ ॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মস্থ নখপ্রান্তকে প্রাণের অভীষ্ট বলিয়া বোধ করেন অর্থাৎ কৃষ্ণগতপ্রাণ বলিয়া কৃষ্ণ ভিন্ন আর কিছুই যিনি জানেন না, যিনি নিখিল ব্রজরমণী-গণের বাক্‌চাতুর্য্য শিক্ষার গুরু, সেই বিপুল-কীর্ত্তি শ্রীমতী রাধিকাকে আমি পূজা করি ॥ ৭ ॥

অমল-কনকপট্টোদ্ঘৃষ্ট-কাশ্মীরগৌরীং
মধুরিম-লহরীভিঃ সংপরীতাং কিশোরীম্।
হরিভুজ-পরিরব্ধাং লব্ধরোমাঞ্চ-পালিং
স্ফুরদরুণ-দুকূলাং রাধিকামর্চ্চয়ামি ॥ ৮ ॥

কনক-কষ্টিপাথরে ঘৃষ্ট কুঙ্কুমের ন্যায় যিনি গৌরাঙ্গী, যাঁহার শ্রীঅঙ্গ মাধুর্য্য-তরঙ্গে পরিব্যাপ্ত, যিনি কৃষ্ণের ভুজদ্বারা আলিঙ্গিত হইলে তৎক্ষণাৎ পুলকিত-তনু হন, যাঁহার পরিধানে সুন্দর অরুণবর্ণ বসন, সেই ব্রজ-কিশোরী শ্রীরাধিকাকে আমি অর্চ্চনা করি ॥ ৮ ॥

তদমল-মধুরিম্নাং কামমাধার-রূপং
পরিপঠতি বরিষ্ঠং সুষ্ঠু রাধাষ্টকং যঃ।
অহিমকিরণপুত্রী-কূল-কল্যাণচন্দ্রঃ
স্ফুটমখিলমভীষ্টং তস্য তুষ্টস্তনোতি ॥ ৯ ॥

শ্রীরাধিকার বিশুদ্ধ স্বরূপ-গুণ-বিভূতিপূর্ণ এই উৎকৃষ্ট অষ্টক যিনি সুষ্ঠুভাবে পাঠ করেন, বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার সর্ব্বাভীষ্ট পরিপূর্ণ করেন ॥ ৯ ॥

প্রশ্নোত্তর

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৫শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২০৬ পৃষ্ঠার পর]

১২। শ্রীঅর্চ্চাবতার-বিরোধীর আধ্যক্ষিক-মতবাদ শ্রীভক্তিবিনোদ কিরূপে খণ্ডন করিয়াছেন ?

"There are some who startle at the theory of worshipping ***Shrimurti*** ! Oh Thay say "It is idolatry to worship '***Shrimurti***' ! Shrimurti is an idol framed by an artist and introduced by no other than Beelzebub himself. Worshipping such an object would rouse the jealousy of God and limit His omnipotence, omniscience and omnipresence !" We would tell them, brethren ! Candidly understand the question and do not allow yourself to be misled by sectarian dogmas. God is not jealous, as he is without a second. Beelzebub or Satan is no other than an object of imagination or the subject of an allegory. An allegorical or imaginary being should not be allowed to act as an obstacle to Bhakti. Those who believe God to be Impersonal, simply identify Him with some power or attribute in Nature, though in fact He is above Nature, her laws and rules. His Holy wish is law and it will be sacrilege to confine. His unlimited excellence by identifying Him with such attributes as omnipotence, omnipresence and omniscience,—attributes which may exist in created objects such as time and space etc. His excellence consists in having in Him mutually contradicting powers and attributes ruled by His Supernatural Self. He is identical with His All-beautiful Person having such powers as omnipresence, omniscience and omnipotence, the like of which cannot be found elsewhere. His Holy and Perfect Person exists eternally in the spiritual world and is at the same time existing in every created object and place in all its fulness. This idea excels all other ideas of the Deity. Mahaprabhu rejects idolatry as well, but considers Shrimurti-worship to be the only

unexceptionable means of spiritual culture. It has been shown that God is Personal and All-beautiful Sages like Vyasa and others have seen that beauty in their soul's eye. They have left us descriptions. Of course word carries grossness of matter. But Truth still is perceivable in those descriptions. According to those descriptions one delineates a Shrimurti and sees the great God of our heart there with intense pleasure! Brethern! is that wrong or sinful? Those who say that God has no form either material or spiritual and again imagine a false form of worship are certainly idolatrous. But those who see the Spiritual Form of the Deity in their soul's eyes, carry that impression as far as possible to the mind and then frame an emblem for the satisfaction of the material eye for continual study of the higher feeling, are by no means idolatrous. While seeing a 'Shrimurti' do not even see the image itself but see the spiritual model of the image and you are a pure theist. Idolatry and Shrimurti-worship are two different things, but my brethren! you simply confound one with the other out of hastiness. To tell you the truth, Shrimurti-worship is the only true form of worship of the Deity, without which you cannot sufficiently cultivate your religious feelings. The world attracts you through your senses and as long as you do not see God in the objects of your senses, you live in a awkward position which scarcely helps you in securing you your spiritual elevation. Place a Shrimurti in your house. Think that God Almighty is the guardian of the house. The food that you take is His Prasad. The flowers and scents are also His Prasad. The eye, the ear, the nose, the touch and the tongue all have a spiritual culture. You do it with a holy heart and God will know it and judge you by your sincerity. Satan and Beelzebub will have nothing to do with you in that matter! All sorts of worship are based on the principle of Shrimurti. Look into the history of religion and you will come to this noble truth. The Semetic idea of a patriarchal God both in the pre-

Christian period of Judaism and post-Christian period of Christianity and Mahamedanism is nothing but a limited idea of Shrimurti. The monarchic idea of a Jove amongst the Greeks and of an Indra amongst the Aryan Karmakandis is also a distinct view of the same principle. The idea of a force and Jyotirmaya Bhahma of the meditators and a formless energy of the Shaktas is also a very faint view of the Shrimurti. In fact the principle of Shrimurti is the Truth itself differently exhibited in different people according to their different phases of thought. Even Jaimini and Comte who are not prepared to accept a creating God, have prescribed certain phases of the Shrimurti, simply because they have been impelled by some inward action from the soul! Then again we meet with people who have adopted the Cross, the Shalgram shila, the lingam and such-like emblems as indicators of the inward ideas of Shrimurti.

Furthermore, if the Divine compassion, love and justice could be portrayed by the pencil and expressed by the chisel, why should not the Personal Beauty of the Deity embracing all other attributes be portrayed in poetry or in picture or expressed by the chisel for the benefit of man? If words could impress thoughts, the watch could indicate time and sign could tell us a history, why should not the picture or figure bring associations of higher thoughts and feelings with regard to the Transcendental Beauty of the Divine Personage?"

—*Chaitanya Mahaprabhu's Life and Precepts.*

ভগবদ্‌রসতত্ত্ব

১। শ্রীকৃষ্ণ অখিলরসামৃতমূর্ত্তি ও অসমোর্দ্ধরসস্বরূপ কেন?

"শ্রীকৃষ্ণস্বরূপই কেবল ঐ সর্ব্বোচ্চ রসের একমাত্র বিষয়। নিরপেক্ষ হইয়া ও মতবাদজনিত পূর্ব্ব সংস্কারের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া দেখিলে ইহাই সিদ্ধান্তিত হইবে যে, রসতত্ত্বে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপই সর্ব্বপ্রকার স্বরূপাপেক্ষা নির্ম্মল ও শ্রেষ্ঠ। *** অন্যান্য স্বরূপ যেরূপ চিন্ময়, জড়াতীত, পূর্ণগুণসম্পন্ন ও মায়াবিজয়ী, কৃষ্ণস্বরূপও তদ্রূপ অপ্রাকৃত গুণশালী। কৃষ্ণস্বরূপের আধিক্য এই যে, প্রপঞ্চ-মধ্যে পূর্ণ চিল্লীলা

স্বীয় চিচ্ছক্তিদ্বারা জড়েন্দ্রিয়-সকলকে প্রদর্শন করান। প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া প্রাপঞ্চিকবৎ ব্যবহারেও সর্ব্বত্র সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন। বালকের সহিত প্রাণপ্রিয় বালকের ন্যায়, পিতা-মাতা গুরুজনের নিকট আশ্রিত শিশুর ন্যায়, মধুর-রসাশ্রিত ভক্তগণের নিকট প্রাণনাথের ন্যায় ব্যবহারকালেও ঈশিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। নরের নিকট নরলীলা করিতে করিতেও সমস্ত আধিকারিক দেবতার সর্ব্বেশ্বরের ন্যায় কার্য্য করিয়া পণ্ডিতবর্গকে চমৎকৃত করিয়াছেন। কৃষ্ণ যদি গোপভাবে এই জগদুন্মাদিনী লীলা কৃপাপূর্ব্বক প্রকট না করিতেন, তাহা হইলে কি কেহ মধুর-রসের বিষয় বলিয়া পরমেশ্বরকে অনুভব করিতে পারিত ?"

—শ্রীমঃ শিঃ ৫পঃ

২। শ্রীকৃষ্ণের পারকীয়তা কি ঘৃণার্হা নহে ?

"কৃষ্ণ যে-স্থলে নায়ক, সে-স্থলে পারকীয়তা কখনই ঘৃণাস্পদ হয় না। সামান্য কোন জীব যেখানে নায়ক-পদবী প্রাপ্ত হন, সেখানে ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার আসিয়া পড়ে।"

—জৈঃ ধঃ ৩১শ অঃ

৩। শ্রীরাধাকৃষ্ণ কি তত্ত্ব ?

"শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় মধুর-রসই ভক্তগণের উপাস্য। এই রসে শ্রীরাধিকার অনুগত না হইলে রসাস্বাদন হয় না। সচ্চিদানন্দ-তত্ত্বই পরব্রহ্ম। সচ্চিদ্রূপে শ্রীকৃষ্ণ এবং আনন্দরূপিণীই শ্রীরাধা। রাধাকৃষ্ণ—এক তত্ত্ব ; রসের বিস্তৃতির জন্য দুই রূপে প্রকাশ।"

—চৈঃ শিঃ ৬।৫

৪। রস-সমুদ্র শ্রীকৃষ্ণের উদ্দীপন-বিভাব কিরূপ ?

"বিজয়কুমার অতি শীঘ্র প্রসাদ পাইয়া সমুদ্রতীর-পথে ভ্রমণ করিতে করিতে কালীমিশ্রের ভবনে চলিলেন। সমুদ্রের ঊর্ম্মি ও লহরী ইত্যাদি দেখিয়া তাঁহার মনে রস-সমুদ্রের ভাব উত্থিত হইতে লাগিল। তিনি মনে করিলেন,—"আহা, এই সমুদ্রই আমার ভাব উদয় করিতেছে। জড়বস্তু হইয়াও আমার অতি গুপ্ত চিদ্ভাবকে উদ্ঘাটন করিতেছে। প্রভু আমাকে যে রস-সমুদ্রের কথা বলেন, সে এইরূপ। আমার জড়দেহ ও লিঙ্গদেহ দূরে নিক্ষিপ্ত হইলে আমি রস-সমুদ্রের তীরে নিজ-মঞ্জরীস্বরূপে বসিয়া রসাস্বাদন করিতেছি। নবাম্বুদ-বর্ণ কৃষ্ণই আমাদের একমাত্র প্রাণনাথ। তাঁহার পার্শ্বস্থিতা বৃষভানুনন্দিনীই আমাদের ঈশ্বরী অর্থাৎ জীবিতেশ্বরী। রাধাকৃষ্ণের প্রণয়বিকারই এই সমুদ্র। রসভাব-সমূহই এই ঊর্ম্মিমালা। যখন যে ভাব উঠিতেছে, তাহাই বিচিত্র লহরী হইয়া তটস্থ সখী যে আমি, আমাকে প্রেমরসে ভাসাইতেছে। রস-সমুদ্রই—কৃষ্ণ ; সুতরাং সমুদ্র তদ্বর্ণবিশিষ্ট, তাহাতে প্রেমতরঙ্গ—রাধা, সুতরাং তাহাতে বর্ণলাবণ্য-

গত গৌরীত্ব। বৃহদ্‌বৃহদ্ ঊর্ম্মিগণ—সখী, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লহরীগণ—সখীর পরিচারিকা। আমি একজন তন্মধ্য হইতে দূর-তটে নিক্ষিপ্তা অনু-পরিচারিকাবিশেষ।' এই সকল ভাবিতে ভাবিতে বিজয় মুগ্ধ হইলেন। কিয়ৎকাল পরে সম্বিৎ লাভ করিয়া, ধীরে ধীরে শ্রীগুরুচরণে গিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া দীনভাবে বসিলেন।"

—জৈঃ ধঃ ৩৪শ অঃ

—জগদ্‌গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিলে সে বন্ধুত্ব কালে কালে বিনষ্ট হয়। মানুষ যে-সকল ভ্রমে পতিত হইয়াছে, তাহা নিরসন করিতে হইলে গুরুর বা আচার্য্যের শিষ্যত্ব বা আশ্রয়ত্ব স্বীকার করা দরকার। যাঁহারা সাধুমুখে হরিকথা শুনিবেন না, তাঁহারা চর্ম্মচক্ষে শ্রীমন্দির ও পুতুল দেখিবেন বা ভাঙ্গিবেন, আর দ্যূত-পানাদিদ্বারা অধর্ম্ম আচরণ করিবেন ছাড়া আর কি করিবেন?

যদি আমরা হরি-গুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্ম-সেবাসম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন হই, তাহা হইলে আমরা দুরাচার পশু হইয়া পড়ি। গুরু-বৈষ্ণবের অনুকরণ করিতে নাই। সর্ব্বদাই অনুসরণ করা দরকার। শ্রীগুরুদেবের সেবার উপকরণসকলেও গুরু-বুদ্ধি করিতে হইবে। শ্রীগুরুদেবকে নিজের মত অনর্থগ্রস্থ মর্ত্ত্য মানববুদ্ধি করিলে চিরতরে নরকে যাইতে হইবে।

যেন শ্রীরূপের অনুগতগণের চরণের ধূলি হইতে পারি। ধূলি হওয়া অর্থে রূপানুগগণের পাদপদ্মে নিত্যসংলগ্ন হইয়া থাকা বুঝায়। শ্রীরূপপ্রভু তিনি, যিনি ভগবানের রূপ বা শোভা বিস্তার করেন এবং যাঁহার রূপে শ্রীকৃষ্ণও আকৃষ্ট হন।

স্থূল শরীরের দ্বারা ভগবানের সেবা করা যায়—ইহা যেন কেহ মনে না করেন। চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি স্থূল ইন্দ্রিয় বা মন প্রভৃতি সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হরি-ভজন হয় না। কিন্তু এই কয়টাই এই জগতের সম্বল। এইজন্য শ্রীল রূপ-গোস্বামী প্রভু এই ইন্দ্রিয়সমূহ কিরূপে অতীন্দ্রিয় রাজ্যে পৌঁছিবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারে তজ্জন্য একটী কৌশল বলিয়াছেন। শ্রীরূপপ্রভু বলিয়াছেন,—"ইন্দ্রিয় যখন নিজ চেষ্টায় অতীন্দ্রিয়ে আরোহণ করিবার চেষ্টা করে তখন তাহা অতীন্দ্রিয়ে পৌঁছিতে পারে না। এইজন্য আরোহবাদী অপ্রাকৃতের সন্ধান পায়

না। কিন্তু ইন্দ্রিয় যখন অতীন্দ্রিয় রাজ্যে অবতীর্ণ সেবোন্মুখতায় আলোকিত হয়, তখনই ইন্দ্রিয়ের অতীন্দ্রিয় বিষয় ধারণার যোগ্যতা লাভ হয়। তখন আর ইন্দ্রিয়ের বহির্ম্মুখতা থাকে না। ইন্দ্রিয় সেবোন্মুখতায় উদ্ভাসিত হইয়া অতীন্দ্রিয়ের অন্তঃপুরে প্রবেশের অধিকার লাভ করে।

কোনরূপ জড়বাসনা লইয়া হরিনাম করিলে হরিনাম হইবে না। হরিভজনই করিব—এইরূপ বিচারযুক্ত হইয়া নাম-রূপ-গুণের আনুগত্যে হরিনাম করিলে তবে ভজন হয়। ভক্তসঙ্গে থাকিয়া খুব দৃঢ়-চিত্ত হইয়া অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিতে হইবে। ভক্ত ভক্তিবলে ভগবান্ ও তন্মিজজনকে চিনিতে পারেন।

ভগবৎসেবার অনুকূল-ক্ষেত্রে বাস করা কর্ত্তব্য। অধোক্ষজ-সেবাবঞ্চিত হইয়া যাহাতে আধ্যক্ষিক না হইয়া পড়ি, তজ্জন্য সর্ব্বক্ষণ হরিকথা শ্রবণ করা উচিত। শুধু খাটিয়া দেওয়া কর্ম্মমার্গীয় বিচার; তা অন্যান্য মনোধর্ম্মাবলম্বীরাও করিয়া থাকে। হরিভজনের দিকে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক; কারণ অনেক জন্ম কাটিয়া গিয়াছে অন্যান্য কার্য্যে। এই জন্মেই যাহাতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োজন লাভ হয়, তদ্বিষয়ে সর্ব্বক্ষণ সতর্ক থাকিতে হইবে। কেবল কর্ম্মকাণ্ড হইয়া না যায়। অন্ততঃ কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি হওয়া আবশ্যক। কিজন্য এইসকল কার্য্য হইতেছে, তজ্জন্য হরিকথা শ্রবণ করা আবশ্যক।

গুরুপাদপদ্ম দর্শন না হইলে কৃষ্ণসেবা হয় না। যদি কেহ বাস্তবিকই গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করেন, আর যদি গুরুসেবা করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই কৃষ্ণসেবা লাভ হইবে—কৃষ্ণবিষয়ে দিব্যজ্ঞান—দীক্ষা লাভ হইবে। মানুষ যখন নিজকে গুরুর পুত্র জ্ঞান করে, তখন এই সকল পিতাপুত্রের সহিত আর কোন সম্বন্ধ থাকে না, তখন মঠবাস হয়।

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণের বাসনা শেষ হইলে জীব ভাগ্যবান্ হয়। গুরুর অনুগ্রহবশে আত্মধর্ম্ম প্রকাশিত হইলে অস্মিতায় ভক্তিবীজ লভ্য হয়। গুরুর কৃপা আর কৃষ্ণের কৃপা আলাদা নয়। প্রসাদ—যাহা প্রকৃষ্টরূপে আনন্দিত হইয়া প্রদত্ত হয়, সেই অনুগ্রহ। যে অনুগ্রহ প্রার্থনা করে, সে অনুগ্রহ পায়। ভৃত্য হইয়া প্রভুকে সেবা করা—ভক্তি। পরে সেবাকার্য্যে মতিগতি হইবে, তার বীজ—ভক্তি বা সেবালতার বীজ। 'আমি সেবক, আমার সেবনধর্ম্ম'—এই বিচারে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই মালী হওয়া। ভক্তিলতার বীজলাভ—গুরুর আদর্শ সেবকের সেবা দেখিবার সৌভাগ্য লাভ আমার হয়—যদি নিষ্কপটে আমি গুরুপাদাশ্রয় করি। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাবলে ভজনের বাধা বাস্তবিক অপসারিত হইলে সুবিধা হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে এক মুহূর্ত্তের জন্য বিচ্যুত হইলে অসুবিধা অনিবার্য্য।

মহাপ্রভু সাধক জীবন থেকে সিদ্ধের জীবন কি করিয়া হয়, তা' দেখাইয়াছেন।

মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—বিষয় ভোগ করিতে ধাবিত হইও না, কিন্তু যথাযোগ্য বিষয় গ্রহণ কর। যথাযোগ্য বিষয় গ্রহণ না করা একটা transgression, যাহার যে অধিকার হয় নাই, তাহাকে যদি সেই অধিকারে enforce করা হয়, তাহা হইলে তাহার কিছু সুবিধা হইবে না।

যিনি যে অবস্থায় থাকুন না কেন, তিনি সে অবস্থা থেকেই শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষার অনুসরণে সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা লাভ করিতে পারেন। শ্রীমদ্ভাগবতের 'স্থানে স্থিত্বা' শ্লোকের practical use শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাতেই পাওয়া যায়। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী স্ব-স্ব আশ্রমে থাকিয়াই সুবিধা করিয়া লইতে পারেন। যদি লোকে ইহা বুঝিতে পারে যে, কৃষ্ণভজনই একমাত্র বাঞ্ছনীয় বস্তু, তাহা হইলে অন্যান্য সব প্রয়োজন পরিত্যাগ করিয়া তাহারা সেইরূপ সঙ্গই খুঁজিয়া লইবেন। রুচিটিকে নিয়মিত করাই সবশুদ্ধ কাজ পড়িয়া গিয়াছে। "আমার যাহা ভাল লাগে, তাহা করিব"—ইহা সকলের বিচার। 'আমার ভাল লাগা' জিনিষ আমার 'মঙ্গলজনক' না-ও হইতে পারে। ভগবৎ-সেবায় রুচিবিশিষ্ট ব্যক্তি ভগবৎসেবার দিকে টানেন, আর মায়ার রুচিবিশিষ্ট ব্যক্তি মায়ার দিকে টানেন। অনর্থযুক্ত ব্যক্তির রুচি ও অনর্থমুক্ত ব্যক্তির রুচি পৃথক্। যাহার ভগবানে রুচি নাই, তাহার রুচিকে পরিবর্ত্তিত এবং যাহার অল্প রুচি আছে, তাহাকে পরিবর্দ্ধিত করিবার জন্যই সাধন।

দুরাশার বশবর্ত্তী হইয়া এইরূপ একটা বুদ্ধি হইয়াছে যে, এ জগৎটার সঙ্গে আমাদের ভারী কাজ পড়িয়া গিয়াছে। Original Fountain Head হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়া এইরূপ অসদ্‌বুদ্ধি হইয়াছে। চোরাবালির উপর পা দিলে যেমন পা বসিয়া যায়, সেইরূপ treacherous soilরূপ phenomena-র উপর নির্ভর করিয়া আমরা ডুবিয়া যাচ্ছি।

বহুলক্ষ যোনি ভ্রমণের পর মানবজীবন লাভ হয়। তাড়াতাড়ি নিজের পূর্ণ মঙ্গলের জন্য যত্ন করিতে হইবে। কবে মরণ আসিবে, তার ত' স্থিরতা নাই। মানব জীবন ছাড়া ত' আর পরমার্থ পাইবার উপায় নাই। হেলায় হারাণটা কখনও বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আবার লক্ষ লক্ষ যোনি ভ্রমণ ত' অনিবার্য্য। যাহাতে ঐ পাক এড়াইয়া যাইতে পারা যায়, তাহার যত্ন না করিলে মানুষকে বুদ্ধিমান্ বলিবে কে?

সর্ব্বদা বিষ্ণুরই কীর্ত্তন করিতে হইবে, মায়ার কীর্ত্তন করিতে হইবে না। বৈকুণ্ঠ-রাজ্যে বাস করিতে হইবে—সর্ব্বক্ষণ মায়ায় বিমোহিত হইলেও আমাদের মায়াতীত রাজ্যে বিচরণ করিবার বলই বলদেব প্রভুর কৃপায় অর্জ্জন করিতে হইবে। যাহাদের চিদ্‌বল, চিদ্‌বিলাস লাভ হইয়াছে, তাঁহারা বাস্তব-সত্যের প্রচারের জন্য যত্ন করেন। এখানকার অনন্তকোটী ধন, বিদ্যা, জ্ঞান, সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট হওয়া দরকার নাই। যাঁহারা এইগুলোকে বহুমানন করিয়াছেন, আমরা দূর হইতে তাঁহাদিগকে দণ্ডবৎ করি।

শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য

গোকর্ণ ও ধুন্ধুকারীর উপাখ্যান

[পাদ্মোত্তরখণ্ড হইতে অনূদিত]

দাক্ষিণাত্যে তুঙ্গভদ্রা নদী-তটে এক অপূর্ব্ব নগর অবস্থিত ছিল। তথাকার চাতুর্ব্বর্ণাশ্রিত লোকসকল স্বধর্ম্ম-পালনদ্বারা সত্যপথে থাকিয়া ধর্ম্ম-কর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। সেই নগরে সর্ব্ববেদ-বিশারদ, শ্রুতি-স্মৃতিশাস্ত্রে পারদর্শী, সূর্য্যের ন্যায় তেজোবিশিষ্ট 'আত্মদেব' নামে এক ধার্ম্মিক ধনবান ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার সৎকুলোদ্ভবা, স্ববাক্য-স্থাপনে পটু অথচ পরচর্চ্চারতা, ক্রূরা, অধিকভাষিণী, কলহপ্রিয়া, গৃহকর্ম্মে সুচতুরা 'ধুন্ধুলী' নামে এক পত্নী ছিলেন। সেই দম্পতি নিঃসন্তান হওয়ায় প্রচুর অর্থাদি থাকা সত্ত্বেও তাঁহাদের মনে কোন প্রকার সুখ-শান্তি ছিল না। অবশেষে তাঁহারা উভয়ে সন্তান লাভার্থ ধর্ম্মাচরণে রত হইয়া দীন-দুঃখীজনকে গো, ভূমি, সুবর্ণ, বস্ত্রাদি দান করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহারা তাঁহাদের ধন-সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ উক্ত দান-ধর্ম্মে ব্যয় করিলেও তাঁদের পুত্র-কন্যা লাভ হইল না দেখিয়া ব্রাহ্মণ দুশ্চিন্তায় মগ্ন হইয়া অতি দুঃখে কাল কাটাইতে লাগিলেন।

একদিন সেই ব্রাহ্মণ মনের দুঃখে গৃহত্যাগ করিয়া বনে গমন করিলেন। তথায় ঘুরিতে ঘুরিতে মধ্যাহ্নকালে অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া একটী সরোবরের জলপান করিলেন। কিন্তু সন্তান-কামনা-চিন্তায় ক্ষিন্নমনা হইয়া সেই সরোবর-তটে বসিয়া রহিলেন। এমন সময় এক সন্ন্যাসীকে তথায় আগমনপূর্ব্বক জলপানে রত দেখিয়া, সেই বিপ্র সত্বর তাঁহার পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন।

সন্ন্যাসী তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ব্রাহ্মণ! তুমি কেন রোদন করিতেছ? কোন্ প্রবল চিন্তা তোমাকে আকুলিত করিয়াছে? তুমি সত্বর আমার নিকট তোমার দুঃখের কারণ বল।

ব্রাহ্মণ তদুত্তরে বলিলেন,—হে সন্ন্যাসীবর! আমার দুঃখের কথা কি আর বলিব? আমি সম্প্রীতি পূর্ব্বপাপ-ফলই ভোগ করিতেছি। আমার পিতা-পিতামহাদিকে মৎকর্ত্তৃক প্রদত্ত উদকাঞ্জলি তাঁহারা উষ্ণশ্বাসে অতিকষ্টে গ্রহণ করিতেছেন; কারণ আমি সন্তানবিহীন। আমি লুপ্তপিণ্ডোদক হইব ভাবিয়া আমার পিতৃপুরুষগণ চিন্তান্বিত হইয়াছেন। সুতরাং অপুত্রক আমার প্রদত্ত

বস্তুসকল দেবতা ও ব্রাহ্মণগণ প্রীতিভরে গ্রহণ করিবেন না। তাই সন্তান-কামনায় মর্ম্মাহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিবার নিমিত্ত এস্থানে আগমন করিয়াছি। পুত্রহীন ব্যক্তির প্রাণ, গৃহ, ধন ও কুলে ধিক্। আমার ভাগ্যে এক বন্ধ্যা ধেনু লাভ হইয়াছে, আমি ফলহীন বন্ধ্যা লতা রোপন করিয়াছি। আমার গার্হস্থাশ্রম বিফল হইয়াছে,—অপত্যবিহীন আমার বাঁচিয়া থাকিয়া ফল কি?—এইরূপ বলিয়া বিপ্র উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সেই সন্ন্যাসী করুণার্দ্র-হৃদয়ে বিপ্রের ভাগ্যলিপি গণনাপূর্ব্বক সকল বিস্তৃতভাবে অবগত হইলেন।

সন্ন্যাসী কহিলেন,—হে দ্বিজ! পুত্র-কামনারূপ অজ্ঞানজ মোহ পরিত্যাগ কর। কর্ম্মের বলিষ্ঠা গতি কেহই রোধ করিতে পারে না। তুমি সন্তান লাভাশায় আর দুঃখ না করিয়া বিবেকের আশ্রয়পূর্ব্বক সংসার-বাসনা পরিহার করিতে যত্নবান্ হও। তোমার প্রারব্ধ কর্ম্মফল জানিয়া বলিতেছি,—সপ্তজন্মাবধি তোমার অপত্যলাভ যোগ নাই। দেখ, পূর্ব্বকালে সগর ও অঙ্গরাজ অপত্যাদি লাভ করিয়াও কত দুঃখ পাইয়াছেন! সুতরাং হে বিপ্র! তুমি কুটুম্বের আশা পরিত্যাগ কর। সন্ন্যাসেই সর্ব্বথা সুখ বিদ্যমান—আমার এই বাক্য সত্য বলিয়া জানিবে।

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—যতিরাজ! কেবল বিবেকের দ্বারা কি হইবে? আপনি তপোবলে আমায় পুত্র দান করুন। তাহা না হইলে, আমি শোকে মূর্চ্ছিত হইয়া আপনার সম্মুখে প্রাণত্যাগ করিব। সন্তানাদি-সুখহীন যে শুষ্ক সন্ন্যাস-যোগ, তাহা আমি ভাল বলিয়া মনে করি না; পুত্র-পৌত্রাদি-সমন্বিত হইয়া আমি সরস গৃহী-জীবন যাপন করিতে ইচ্ছা করি।

বিপ্রের সংসার-ধর্ম্মে অত্যাগ্রহ দেখিয়া সন্ন্যাসী পুনঃ কহিলেন,—দেখ, চিত্রকেতু রাজাও বিধির লিখন খণ্ডাইতে পারেন নাই। হে দ্বিজ! তুমি নিশ্চয় জানিও, তোমার পুত্র হইতে সুখ অসম্ভব; কারণ ইহা দৈববিরুদ্ধ প্রয়াস। হঠকারী হইয়া তুমি আমার নিকট যেরূপ প্রার্থনা করিতেছ, উহার কি করিব—ভাবিয়া পাইতেছি না। তথাপি তুমি স্বীয় সঙ্কল্পচ্যুত নহ দেখিয়া অগত্যা এই ফলটী দিতেছি। ইহা তোমার পত্নীকে খাওয়াইলে অবশ্যই পুত্রলাভ হইবে—ইহাতে সংশয় করিও না। তোমার পত্নী সত্য, শৌচ, দয়া, দানাদি আচরণ এবং নিত্য একাহারী হইয়া ভক্তিভাবে নিয়মাদি পালন করিলে তাঁহার গর্ভে অতি সুলক্ষণযুক্ত পুত্র জন্মলাভ করিবে। এইরূপ বলিয়া যতিবর তথা হইতে চলিয়া গেলেন এবং বিপ্রও গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পত্নীর হস্তে সেই ফলটী যত্নের সহিত প্রদান করিলেন।

এদিকে বিপ্রের তরুণী ভার্য্যা সেই ফলটী লইয়া তাঁহার সখীর নিকট কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—হে সখি! আমার মহা-দুশ্চিন্তা উপস্থিত হইয়াছে, আমি এই ফল কখনই ভক্ষণ করিব না। ইহা খাইয়া গর্ভ হইলে আমার উদর বৃহৎ হইবে; তখন স্বল্পাহারে শরীর শক্তিহীন হইলে কে গৃহকর্ম্ম পরিচালন করিবে? দস্যু-তস্করাদির দৈব উপদ্রব হইলে গর্ভিণী আমি কিরূপে অন্যত্র পলায়ন করিব? গর্ভে শুকসম শিশুর অবস্থান হইলে গর্ভিণী কিরূপে তাহাকে প্রসব করিবে? শিশু বক্র হইলে প্রসব-সময়ে গর্ভধারিণী নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। সুকুমারী আমি, কিরূপে এই প্রসব-যন্ত্রণা সহ্য করিব? যদিও ইহাতে ভাল-মন্দ কিছু আশা করা যায়, কিন্তু আমার ননদিনী ইহাতে বাধা সৃষ্টি করিয়া আমার সর্ব্বস্ব হরণ করিবে। আর সত্য-শৌচাদি নিয়ম অতি সুকঠোর, তাহা আমি কিরূপে পালন করিব? প্রসূতিকে সন্তান লালন-পালনাদি-ক্লেশ সহ্য করিতে হয়, কিন্তু বন্ধ্যা বা বিধবা নারী বেশ সুখে জীবন-যাপন করে। এইরূপ কুতর্কবশে বিপ্রপত্নী সেই ফল ভক্ষণ করিলেন না। অধিকন্তু তাঁহার পতি ফল-ভক্ষণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি 'উহা খাইয়াছি' বলিয়া মিথ্যা উত্তর দিলেন।

একদা ঐ ব্রাহ্মণ পত্নীর ভগিনী দৈবযোগে আপন ইচ্ছায় বিপ্রগৃহে আগমন করিল। তখন ধুন্ধুলী স্বীয় অনুজাকে বলিলেন,—আমি দিবানিশি চিন্তা ও দুঃখে কালাতিপাত করিতেছি এবং তাহাতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে—আমি দুর্ব্বলা হইয়া পড়িয়াছি; হে ভগ্নী! কিসে এ জ্বালা জুড়াইবে, আমি কি করিব? ভগ্নী বলিল,—"আমি বর্ত্তমানে সন্তানসম্ভবা, পুত্র-সন্তান প্রসব করিলে তোমাকে উহা সমর্পণ করিব, তুমি চিন্তা করিও না। তুমি স্বীয় গৃহে গোপনে গর্ভবতীরূপে থাক, ইহা যেন কেহ জানিতে না পারে। আমার পতিকে কিছু অর্থ দান করিলে, সে তাহার সন্তান তোমাকে দিয়া দিবে। 'ছয়মাস কালে আমার পুত্র মারা গিয়াছে' —লোক-মাঝে এইরূপ রটাইলেই হইবে। আমি নিত্যই তোমার গৃহে আসিয়া মৎপ্রদত্ত বালককে যত্নে লালন-পালন করিব। এক্ষণে এই ফলটী তোমার গাভীকে খাওয়াইয়া পরীক্ষা কর।" স্ত্রী-স্বভাববশতঃ ধুন্ধুলী ভগ্নীর উপদেশমত তাহাই করিল। কালক্রমে সেই নারী পুত্র প্রসব করিলে সন্তানের পিতা অর্থলোভে মুগ্ধ হইয়া সদ্যোজাত শিশুটীকে আনিয়া ধুন্ধুলীকে অর্পণ করিল।

যথাসময়ে ধুন্ধুলী স্বীয় পতিকে তাহার পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে—সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। আত্মদেবও পুত্রলাভ করিয়া আনন্দিত-মনে সদ্যোজাত শিশুর জাতকর্ম্মাদি সম্পাদনপূর্ব্বক দ্বিজগণকে ধনাদি দান করিতে লাগিলেন; গীত-বাদ্য মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণের গৃহ পরিপূর্ণ হইল। তখন ধুন্ধুলী স্বামীকে কহিলেন,

—আমার স্তনে দুগ্ধ নাই, দুগ্ধবতী কেহ আসিয়া স্তনদান না করিলে কিরূপে এখন সন্তান বাঁচিবে? আমার ভগ্নীর প্রসবের পর তাহার পুত্র মারা গিয়াছে, তাহাকে আনিয়া আমার ঘরে রাখিলে, সে এই শিশুকে পালন করিতে পারিবে। ব্রাহ্মণ পুত্রের জীবন রক্ষার্থ তাহাই করিলেন। ধুন্ধুলী পুত্রের নাম রাখিলেন—**"ধুন্ধুকারী"**।

এদিকে তিনমাস অন্তে সেই গাভী ধেনু-বৎসের পরিবর্ত্তে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, অতি সুনির্ম্মল, কাঞ্চনবরণ এক দিব্য মনুষ্যাকার শিশু প্রসব করিল। বিপ্রও সুখে তাহার সংস্কারাদি সম্পন্ন করিলেন। স্থানীয় লোকসকল আসিয়া গাভী হইতে প্রসূত সর্ব্ব-সুলক্ষণযুক্ত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মনুষ্য-শিশু দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিতে লাগিল,—ব্রাহ্মণ আত্মদেবের মহাভাগ্যোদয় হইয়াছে, তাঁহার ধেনুও দেবপুত্র প্রসব করিল। কিন্তু কেহই ইহার রহস্য জ্ঞাত হইল না। শিশুর গো-কর্ণের ন্যায় কর্ণ দেখিয়া আদরপূর্ব্বক তাহার পিতা **'গোকর্ণ'** এই নামকরণ করিলেন। কালক্রমে শিশু দুইটী যৌবনে পদার্পণ করিল। গোকর্ণ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হইলেন, আর ধুন্ধুকারী মহাখলরূপে পরিণত হইল। ধুন্ধুকারী স্নান-শৌচ-ক্রিয়াহীন, কদাচারী, শবহস্ত-ভোজী, দুষ্ট-পরিগ্রহকারী, চৌর, সর্ব্বদ্বেষী, পরগৃহ-দাহকারী হইয়া কুখ্যাতি অর্জ্জন করিল। অপরের আদরের শিশুগণকে লইয়া কূপে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সশস্ত্র, হিংসক হইয়া প্রতিনিয়ত দীন-অন্ধকে পীড়ন করিত; সর্ব্বদা পাশ হস্তে লইয়া চণ্ডালাদি নীচজাতির সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে লাগিল। বারবণিতার কুসঙ্গে পিতৃবিত্তসকল নষ্ট করিতে লাগিল, একদিন পিতা-মাতাকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহারপূর্ব্বক গৃহস্থিত ধাতুপাত্রাদি হরণ করিল। ক্রমে তাহার পিতা ধনহীন হইয়া হা-হুতাশ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,—**দুঃখপ্রদ কুপুত্র অপেক্ষা নিঃসন্তান থাকাও শ্রেয়ঃ**। আমি কোথায় থাকিব, কোথায় যাইব, কে আমার এই দুঃখ ঘুচাইবে? এত কষ্ট আর সহ্য হয় না, এ দারুণ দুঃখে প্রাণত্যাগ করিব। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী

কাঁদে ভক্ত জীব-দুঃখ দেখে,
বলে,—"প্রভু একে রেখে
আছ তুমি কোথা ?
এসো হেথা,
পাপে
তাপে
পৃথ্বী ভরা
যেন আধ-মরা,—
দয়া-মায়া কিছু নাই,—
জীবে তুমি কৃপা করো তাই ॥"
বিশ্ব-জুড়ে চলে হানাহানি
ভীত-ত্রস্ত সব প্রাণী ;
নাই শান্তি-স্থিতি,
রীতি-নীতি
দ্বেষ
ক্লেষ।
ভ'রে আছে—
তুমি এসো কাছে ;
জন্ম লও পুনর্ব্বার
ধন্য হোক এ পৃথ্বী আবার ॥
"আমি তো শ্রেষ্ঠ",—বলে অধর্ম্ম
ধর্ম্মহানি মোর কর্ম্ম ;
সত্য নীচে ফেলি'
পায়ে দলি'
মানী
প্রাণী
তুচ্ছ হয়,
নাহি করি ভয় ;
শাস্তি দিতে নাই কেহ,
লৌহ-সম মোর এই দেহ ॥

দ্বাপরে তুমি যে ছিলে বীর—
উচ্চ তব ছিল শির ;
দস্যু ও দানব
এরা সব
বলে
তলে
ছিল তব,
তুমি নিত্য নব ;
মন-হরা বংশী-ধারি,
যে তোমায় ডাকে, তুমি তাঁ'রি ॥
বেগে বয় বায়ু—উঠে ঝড়,
মেঘ ডাকে কড়্-কড়্ ;
ঘন ঘন বাজ
পড়ে আজ ;
বৃষ্টি
সৃষ্টি
ধ্বংস করে,
কেহ ধুঁকে মরে,
হরি ! তুমি কৃপা করো,
দয়া করে অন্ধে হাত ধরো ॥
'কারা'-মাঝে মহা-লগ্ন আসে,
জন্ম ল'য়ে শিশু হাসে—
অতি পুতঃ আসো
জ্বলে ভাল ;
জ্যোতিঃ
অতি
শুভ্র তাঁর
সম নাহি আর ;
প্রেমভক্তি হ'তে সৃষ্টি,—
আহা কি মধুর ! সে কি মিষ্টি ॥

—শ্রীবলাই চাঁদ ঘোষ, সেবাসুহৃদ্
সাংবাদিক পি. টি. আই.

মহাজনোপদেশ

ভগবানের কৃপা হইলে তিনি শব্দরূপে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি রূপবৎ, গুণময়, লীলাময় ও পরিজনবেষ্টিত; তাঁহার ধাম আছে। এই জগৎ তাঁহারই নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকর-বৈশিষ্ট্যের বিকৃত হেয় প্রতিফলন। সেই শ্রীহরিই কৃপা করিয়া 'তিনি কিরূপ আকারের হরি, কি রকম রঙ এর হরি'—সকলই চেতনের বৃত্তিতে প্রকাশিত করিয়া দেন। ভগবৎসম্বন্ধজ্ঞানের উদয়ে জীবের সেবাপথ আবিষ্কৃত হয়। দেবতা যেরূপ নিত্য, গুরুও তদ্রূপ নিত্য। 'দেবতা'-শব্দে-অপ্রাকৃত কামদেব কৃষ্ণ। শ্রীগুরুদেব সেই কৃষ্ণস্বরূপ—কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন, কৃষ্ণের প্রকাশ-বিগ্রহ।

আমাদের অণুচেতনবৃত্তির একমাত্র স্বভাব—শরণাগত হওয়া—বৃহচ্চেতনের আশ্রয় গ্রহণ করা। আমরা যদি প্রত্যেক সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়দ্বারা বাস্তব-বস্তুর অনুশীলন করি—২৪ ঘণ্টা অনুশীলন করি, তাহা হইলেই বাস্তবসত্য আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হইবে। চেতনের বৃত্তির দ্বারা—চেতনের চক্ষুর দ্বারা চেতনের দর্শন হইবে। গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। আম্নায়পন্থা গ্রহণ ব্যতীত সত্যোপলব্ধির অন্য উপায় নাই। বাস্তবসত্য তখনই করায়ত্ত হয়—যখনই আমরা গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করি। হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে যদি কোন ব্যক্তি অপক্কদশায় স্খলিত বা মৃতও হন, তথাপি তাঁহার অমঙ্গল ঘটে না।

কৃষ্ণের পূর্ণ শরণ গ্রহণ ব্যতীত জীবের পূর্ণমঙ্গল নাই। একমাত্র পারমহংস্য-ধর্ম্মে অবস্থিতি অর্থাৎ অনুক্ষণ সর্ব্বেন্দ্রিয়ে আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন ব্যতীত জীবের পূর্ণমঙ্গল নাই—নাই—নাই। যেখানে আনন্দ ও চেতনধর্ম্ম নাই, সেখানেই জড়ত্ব। দর্শন সেবার দ্যোতক। দর্শনের পর ক্রিয়া, ক্রিয়ার পর ইষ্টসিদ্ধি। যাঁহারা দর্শনরহিত ভজনের ছলনা প্রদর্শন করেন, তাঁহাদের চেষ্টা অন্ধকারে হাতড়ান মাত্র। দর্শন বস্তুর বাস্তবতা বিনির্ণয় করিয়া দেয়। তাহার পর বাস্তব-বস্তুর প্রতি ভজন হইয়া থাকে। দর্শন না করিয়া ভজন—আন্দাজে ঢিল মারা। এই রক্ত-মাংসের চক্ষু দিয়া গৌড়ীয় দর্শন হয় না। আবার দর্শন জিনিসটাই ভজন। শ্রীজগন্নাথ দৃশ্য নহেন—জগন্নাথ দ্রষ্টা। জীবের দ্রষ্টৃ-অভিমান পরিত্যক্ত হইয়া যখন সম্পূর্ণভাবে জগন্নাথের দৃশ্য বা ভোগ্যরূপে শুদ্ধস্বরূপগত অভিমান হয়, তখনই জীব সেবোন্মুখ হইয়া থাকেন এবং সেই সেবোন্মুখ প্রেমনেত্রেই শ্রীজগন্নাথ-দর্শন লাভ করেন। জীবের আপনাকে দৃশ্য-অভিমানই তাহার পক্ষে শ্রেয়ঃ। দ্রষ্টৃ-

অভিমানে জগৎকে ভোগ্য জ্ঞান করিলে অমঙ্গল লাভ হয়। জগতের প্রতি সেব্য-দৃষ্টিতে অনুপাদেয়তা বা ভোগ্যত্ব দূরে গিয়া সেব্যত্ব বা অপ্রাকৃতত্ব-প্রকটন অর্থাৎ কৃষ্ণসংসার ও গোকুল-দর্শনই জীবের নিত্যমঙ্গল ও কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ।

যিনি নিজের যথাসর্ব্বস্ব, তথা ত্রিভুবনের যথাসর্ব্বস্ব সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য ব্যস্ত, তিনিই গুরুদেব। আর যিনি নিজের যথাসর্ব্বস্ব এবং ত্রিভুবনের যথাসর্ব্বস্ব শ্রীগুরুসেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য ব্যস্ত, তিনিই গুরুদাস; সুতরাং কৃষ্ণের অধিক প্রিয়। বৈষ্ণব এবং গুরুর মধ্যে পার্থক্য এই যে, বৈষ্ণবের দয়া তাঁহার নিকট অবস্থান করে, কিন্তু গুরুর দয়া শিষ্য লাভ করেন।

গুরুদেব সর্ব্বজ্ঞ। Gurudev is the giver of Bhakti, গুরু ভক্তিকে প্রকট করেন। Without গুরু ভক্তি থাকে না। সেবকাভিমান যেখানে, 'আমি তোমার সেবক'—এই শুদ্ধ-অহঙ্কার বা 'আমি তোমার শরণাগত অকিঞ্চন সেবক —দাস'—এই অভিমান যেখানে, সেখানে সব জিনিষ গুরুর। যেখানে আমি গুরুর—'আমি ত' তোমার জন'—এই অস্মিতা, সেখানে তাঁহাকে চালিত করিতেছেন গুরু। গুরুকৃষ্ণ বড় দয়াল। তাঁহাদের দয়ার উপর নির্ভর করিতে পারিলে আর চিন্তা নাই। একনিষ্ঠ হওয়া দরকার। শরণাগতি থাকিলে একনিষ্ঠ হওয়া যায়। একনিষ্ঠ হওয়া বা সতী-সাধ্বী হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

কলিকালে কৃষ্ণনামই পরমধর্ম্ম। নিরপরাধে কৃষ্ণনাম করিলে কৃষ্ণতুল্য বৈষ্ণব হয়। নিরপরাধে কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিলে শুদ্ধবৈষ্ণব সকলেই সমান হন সত্য, কিন্তু যে বৈষ্ণবে যতদূর নাম-বলোদয় হইয়াছে, সেই বৈষ্ণব ততদূর বলবান্। নামবল দুইপ্রকার অর্থাৎ স্বল্পবল ও বহুবল। কনিষ্ঠ-বৈষ্ণবে স্থল-বিশেষে শুদ্ধনামের যৎকিঞ্চিৎ বল হয়। মধ্যম-বৈষ্ণবে ততোঽধিক বল হইলেও বহুবল বৈষ্ণবের তুলনায় মধ্যম বৈষ্ণব স্বল্পবল বা মধ্যম-বল। উত্তমবৈষ্ণব বহুবলযুক্ত। জগতে দুইপ্রকার লোক অর্থাৎ বহির্ম্মুখ ও অন্তর্ম্মুখ। বহির্ম্মুখের কেবল আতিথ্যমাত্র ধর্ম্ম, বৈষ্ণবসেবা নাই। অন্তর্ম্মুখ আবার দুইপ্রকার অর্থাৎ বৈষ্ণব-বলজ্ঞ ও বৈষ্ণব-বলানভিজ্ঞ। বৈষ্ণব-বলানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বিষয়ী, অল্পবুদ্ধি, ভিক্ষুক বা ক্রূরবেশ দেখিলেই ভীত হয়, কাহাকে বৈষ্ণব-বল বলা যায় বা সেই বলের তারতম্য কি, তাহা তাহারা জানে না। বৈষ্ণবাগ্নির স্বল্পাগ্নিত্ব ও মহাগ্নিত্বের বিশেষ তাহারা অবগত নয়। সেই বৈষ্ণব-বলানভিজ্ঞ বিষয়ী, বৈষ্ণবপ্রায় কনিষ্ঠ-ভক্তগণ বালিশ-মধ্যে পরিগণিত। তাহারা দীক্ষিত হইয়া অর্চ্চন করেন বটে, কিন্তু কৃষ্ণভক্ত ও তদিতরের ভেদ করত বৈষ্ণবসেবা করিতে অক্ষম। তাহারা বেশধারী বা অতিথি-মাত্রকেই সমতার সহিত ব্যবহার করিতে বাধ্য। তাহারা যদি ভেদ করিতে

আরম্ভ করে, তবে অজ্ঞতাবশতঃ শুদ্ধবৈষ্ণব ত্যাগ করিয়া ভাক্তলোকের সেবামাত্র করিয়া নষ্ট হইবে। সুতরাং তাহাদের অজ্ঞতা-রোগের সমতাই পথ্য। কিন্তু বৈষ্ণব-বলজ্ঞ ব্যক্তির সম্বন্ধে এইরূপ নয়। ব্যবহার-পরমার্থী বৈষ্ণব শ্রবণ, দর্শন ও শুদ্ধসম্বন্ধজ্ঞানদ্বারা বিশেষবুদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা স্বল্পবল-বহুবল-বিচারে প্রবীণ—কাহার দেহে কৃষ্ণের কি পরিমাণে তেজ—স্বল্প বা বহু; তাহা সকলই জানেন। তাঁহারা বৈষ্ণবদিগের বলানুসারে বিশেষবুদ্ধি করিবেন। বলাবল না বুঝিয়া যদি ব্যবহার করেন, তাহা হইলে দোষভাগী হন। স্বল্পবল ও বহুবল-বৈষ্ণব উপস্থিত হইলে অগ্রে বহুবল বৈষ্ণবের পূজা কর্ত্তব্য, পরে সাধারণ-বলের। অসাক্ষাতেও তদ্রূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য। বাড়বাগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে প্রদীপাগ্নি সহজেই নির্ব্বাপিত হয়। যদি মহাবল ও মহাতেজা বৈষ্ণবের অগ্রে পূজা দেখিয়া স্বল্পতেজা বৈষ্ণব ক্রোধ করেন, তবে ক্রুদ্ধ, অন্যায়কারী মহতের তেজে ভগ্নতেজ হইয়া পূজাকারীর নিগ্রহ করিতে পারিবে না। এই সমস্ত ব্যবসায়ী দীর্ঘশ্রুত বৈষ্ণবগণ ব্যবহার-পরমার্থজ্ঞ হইয়া অবশ্য জানেন; জানিয়াও যদি বৈষ্ণব-বলানভিজ্ঞের ন্যায় সমব্যবহার করেন, তবে অবশ্য নষ্ট হইবেন। মধ্যম-বৈষ্ণবগণ ঈশ্বরে প্রেম, বৈষ্ণবে মৈত্রী, বালিশে কৃপা ও দ্বেষিলোকের প্রতি উপেক্ষারূপ বলাবল-বিচারিত কার্য্য না করেন, তবে বৈষ্ণবতা কিরূপে থাকিবে? বৈষ্ণব-জীবনই বা তাঁহাদের কিরূপে সিদ্ধ হইবে? শুদ্ধ-বৈষ্ণবকে যথাযথ সেবা করিলে সুমেরু পর্ব্বতের আশ্রিতজনের ন্যায় তাঁহারা সর্ব্বদা ভয়শূন্য হইবেন, অন্যে কেহ কিছু করিতে পারিবে না। তাঁহারা শুদ্ধবৈষ্ণবের বলাবল বিচারপূর্ব্বক অত্যন্ত স্বল্পবলের সম্মান, মধ্যম-বলের পূজা এবং বহুবলের সেবা যথাযথ করিয়া কৃষ্ণসংসার নির্ব্বাহ করিবেন। তাহা হইলে বৈষ্ণবনিন্দাদোষে নামাপরাধ হইবে না।

বৈষ্ণবের নিন্দা করিবে না। প্রমাদেও বৈষ্ণবের অবহেলা করিবে না। বৈষ্ণবের জন্য যদি মরণ হয়, তাহাতেও দুঃখ নাই। কর্ম্মাচার দেখিয়া বৈষ্ণবে দোষারোপ করিবে না। বৈষ্ণবের দৈবাগত পাপের নিন্দা করিবে না। যেহেতু বৈষ্ণবাঙ্গে কৃষ্ণাগ্নি আছে, সেই অগ্নিবলে পাপ আসিতে পারে না। যদি দৈবাৎ আসে, তবে সেই অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া যায়।

সমস্ত শুদ্ধবৈষ্ণবই গুরু। কেন না, সকলেই উপদেশ, সচ্চরিত্রদ্বারা অন্য জীবের হৃদয়ে শক্তির সঞ্চার করেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-জয়ন্তী

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৫শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২২৮ পৃষ্ঠার পর]

সনাতন ধর্ম্মের মূল

"ধর্ম্মমূলং হি ভগবান্ সর্ব্ববেদময়ো হরিঃ।" (ভাঃ ৭।১১।৭)

সর্ব্ববেদময় ভগবান্ শ্রীহরিই সনাতন ধর্ম্মের মূল। "ধর্ম্মস্তু সাক্ষাৎ ভগবৎ-প্রণীতম্" (ভাঃ ৬।৩।১৯) এই ধর্ম্মের প্রণেতাও ভগবান্ শ্রীহরি।

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতিজ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্॥
(গীঃ ১৫।১৫)

সকল প্রাণীর হৃদয়ে আমিই অন্তর্য্যামিরূপে অধিষ্ঠিত আছি। আমা হইতেই পূর্ব্বানুভবজাত স্মৃতি ও জ্ঞান এবং তদুভয়ের বিলোপ হইয়া থাকে; সমুদয় বেদ-দ্বারা আমিই জ্ঞেয়; আমিই বেদান্তার্থের সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক জ্ঞানদাতা গুরু এবং আমিই প্রকৃত বেদার্থবেত্তা।

এই সনাতন ধর্ম্ম বা বৈদিক ধর্ম্মের মূল বক্তাও সনাতন পুরুষ শ্রীনারায়ণ।

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥ (ভাঃ ১১।১৪।৩)

প্রলয়কালে বেদসংজ্ঞিতা বাণী নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, কাজেই পুনঃ সেই বেদ-সংজ্ঞিতাবাণী আদৌ তিনি (শ্রীনারায়ণ) ব্রহ্মাকে উপদেশ প্রদান করেন। যস্যাং ধর্ম্ম মদাত্মক, অর্থাৎ মৎবিষয়ক ধর্ম্ম, যে ধর্ম্মের অনুশীলন করিলে জীবসকল আমাকে (শ্রীহরিকে) জানিতে পারিবে, সেই বৈদিক ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করেন।

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥ (ভাঃ ২।৯।৩০)

বিজ্ঞানসমন্বিত রহস্য ও তদঙ্গযুক্ত আমার পরম গুহ্যজ্ঞান তোমাকে (ব্রহ্মাকে) কৃপা করিয়া আমি বলিতেছি, তাহা তুমি গ্রহণ কর।

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ব-বিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥ (ভাঃ ২।৯।৩১)

আমার স্বরূপ, আমার লক্ষণ, আমার রূপ-গুণ ও লীলা যে প্রকার; সেই সকলের তত্ত্ব-বিজ্ঞান আমার অনুগ্রহে তুমি প্রাপ্ত হও।

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যৎ যৎ সদসৎপরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥ (ভাঃ ২।৯।৩২)

এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবলমাত্র আমিই ছিলাম। সৎ, অসৎ এবং অনির্ব্বচনীয় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম পর্য্যন্ত অন্য কিছুই আমা হইতে পৃথক্‌রূপে ছিল না। সৃষ্টি হইলে পর এ সমুদয় স্বরূপে আমিই আছি এবং সৃষ্টি লয় হইলে একমাত্র আমিই অবশিষ্ট থাকিব।

পরমেশ্বর ভগবান্ শ্রীহরি, যে ধর্ম্ম ব্রহ্মাকে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, সেই ধর্ম্মের নাম সনাতন ধর্ম্ম, বৈদিক ধর্ম্ম, আত্মধর্ম্ম, নিত্যধর্ম্ম, সত্যধর্ম্ম, জৈবধর্ম্ম, ভাগবত ধর্ম্ম বা সার্ব্বজনীন প্রেম ধর্ম্ম। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা পরমেশ্বরের শ্রীমুখ হইতে যে ধর্ম্মজ্ঞান উপদেশপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনি এই বিশ্বসৃষ্টি করিয়া সেই ধর্ম্মের কথা নিজ পুত্রগণের নিকট কীর্ত্তন করেন।

ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ॥
(মুঃ উঃ ১।১।১)

সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্ব্বকে সর্ব্বপ্রথম ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করেন।

তেন প্রোক্তা স্বপুত্রায় মনবে পূর্ব্বজায় সা।
ততো ভৃগ্বাদয়োঽগৃহ্ণন্ সপ্ত ব্রহ্মমহর্ষয়ঃ॥ (ভাঃ ১১।৪।৪)

সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা নিজপুত্র মনু এবং মনুরও পূর্ব্বজাত সপ্তর্ষি ভৃগু, অঙ্গিরা, অত্রি, বশিষ্ঠ, মরিচী, পুলস্ত, পুলহ, ক্রতু ও অথর্ব্বকে এবং তাঁহাদেরও পূর্ব্বজাত নারদ, সনক, সনাতন, সনন্দন ও সনৎকুমার প্রভৃতির নিকট সেই বেদ সংজ্ঞিতা বাণী বলিয়াছিলেন।

এই ধর্ম্মের আদি বক্তা সনাতন পুরুষ শ্রীনারায়ণ, তারপরে বক্তা ব্রহ্মা, তারপরে নারদ, তারপরে কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদব্যাস, তারপরে শুকদেব প্রভৃতি। এইপ্রকারে গুরুপরম্পরাক্রমে সেই বেদ-সংজ্ঞিতাবাণী এই জগতে প্রচারিত হইয়াছে।

বেদব্যাস—এক বেদকে চারি ভাগ করেন—ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব্ব। ব্রহ্মসূত্র (বেদান্তদর্শন), বিস্তৃত মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি ১৮শ খানি মহাপুরাণ রচনা করেন।

সনাতন ধর্ম্মের মূল শাস্ত্র বেদ—

"বেদয়তি ধর্ম্ম ব্রহ্ম চ বেদঃ" ইতি নিরুক্তিঃ।
"ধর্ম্মং ব্রহ্মপ্রতিপাদকমপৌরুষেয়ং বাক্যং বেদঃ" ইতি বেদান্ত মতঃ।
"ব্রহ্মমুখ নির্গত ধর্ম্মজ্ঞাপক শাস্ত্রং বেদ" ইতি পৌরাণিক মতঃ।

"মীন শরীরাবচ্ছেদেন ভগবদ্বাক্যং বেদ" ইতি নৈয়ায়িক প্রভৃতি।

"বেদপ্রণিহিতো ধর্ম্মো হ্যধর্ম্মস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ।

বেদো নারায়ণঃ সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভুরিতি শুশ্রুম॥" (ভাঃ ৬।১।৪০)

বেদের যাহা বিধান তাহাই ধর্ম্ম, যাহা নিষেধ তাহাই অধর্ম্ম, বেদ সাক্ষাৎ নারায়ণ, এই কথা ব্রহ্মার নিকট আমরা শ্রবণ করিয়াছি।

সনাতন ধর্ম্মের মূলশাস্ত্র বেদ

'ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব্ব এই চারি বেদ। ঋক্ বেদই সর্ব্বপ্রথম রচিত হয়। আয়ুর্ব্বেদ (চিকিৎসা বিষয়ে), ধনুর্ব্বেদ (যুদ্ধ বিষয়ে) গান্ধর্ব্ববেদ (সঙ্গীত বিষয়ে) ও স্থাপত্যবেদ (শিল্প-বিজ্ঞানাদি বিষয়ে) এই চারি উপবেদ। শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ ও ব্যাকরণ—বেদের এই ছয় অঙ্গ। রামায়ণ (বাল্মীকি), মহাভারত, পুরাণ, ইতিহাস, পঞ্চরাত্র প্রভৃতি পঞ্চমবেদ বলিয়া কথিত।

"উক্ত চারিটী বেদের প্রতিটির চারিটী অংশ—মন্ত্র বা সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্।

সংহিতাংশে—বৈদিক দেব-দেবীর স্তুতি গান রহিয়াছে। সাম সংহিতার অধিকাংশই ঋক্ বেদ হইতে সঙ্কলিত। যজুঃ সংহিতায় যাগ-যজ্ঞের মন্ত্রাদি রহিয়াছে এবং অথর্ব্ব সংহিতায় কেবলমাত্র স্তোত্র নহে, রোগ নিরাময়, মৈত্রীকরণ, পিশাচ বিতাড়ন প্রভৃতির মন্ত্র-তন্ত্রও রহিয়াছে। ব্রাহ্মণাংশে—যাগযজ্ঞের বিধি বর্ণিত হইয়াছে। আরণ্যকে—বানপ্রস্থ আশ্রমাশ্রয়ী অরন্যবাসীর নিয়ম-বিধি বর্ণিত হইয়াছে। এই অংশে সংহিতার স্তুতির বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের তত্ত্বার্থ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। উপনিষদ্ বৈদিক সাহিত্যের সর্ব্বশেষ অংশ বলিয়া বেদান্ত নামেও অভিহিত হয়। ইহাতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার দার্শনিক তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। পরবর্ত্তী যুগের বৈদিক সাহিত্য স্মৃতি বা বেদাঙ্গ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বিশুদ্ধভাবে বেদপাঠ ও বৈদিক যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠানের স্মৃতি রক্ষাই বেদাঙ্গের উদ্দেশ্য। এইজন্য এইগুলি স্মৃতি নামেও অভিহিত। এই স্মৃতিরক্ষা যাহাতে সহজে হয় সেইজন্য এইগুলি সূত্রাকারে রচিত। বেদাঙ্গ ছয়টী—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ।

১। শিক্ষা শাস্ত্রে—বেদপাঠের বিশুদ্ধ উচ্চারণের নিয়মাবলী নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ২। কল্পশাস্ত্রে—বৈদিক যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান, গৃহস্থের করণীয় ও সমাজে পালনীয় আচারগুলি বর্ণিত হইয়াছে। ৩। নিরুক্তসূত্রে—শব্দের উৎপত্তি কিভাবে হইয়াছে, তাহা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ৪। ছন্দসূত্রে—বৈদিক

স্তোত্রগুলির ছন্দের নির্দ্দেশ আছে। ৫। বেদপাঠে ব্যাকরণের স্থান সর্ব্বাধিক। বিশুদ্ধ উচ্চারণ, শব্দ নিষ্পন্ন, ধাতুঃ, ধাতুর অর্থ, শব্দের অর্থ প্রভৃতির নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ৬। জ্যোতিষ শাস্ত্রে—গ্রহ, নক্ষত্র, তাহার প্রভাব, যাগ-যজ্ঞ, পূজার্চ্চন প্রভৃতির বিশুদ্ধ কালাকাল বর্ণনা করা হইয়াছে।

উপনিষদের তত্ত্বগুলি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উত্তরকালে ভারতীয় ষড়দর্শনের সৃষ্টি হয়। ১। কপিলের—সাংখ্য, ২। পতঞ্জলীর—অষ্টাঙ্গযোগ, ৩। গৌতমের—ন্যায়, ৪। কণাদের—বৈশেষিক, ৫। জৈমিনীর—পূর্ব্ব মীমাংসা, ৬। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের—উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত দর্শন। (ক্রমশঃ)

—শ্রীজগদ্বন্ধু দাস ব্রহ্মচারী

ক্রোধ

ক্রোধ মানবের অতি ভয়ানক শত্রু। চণ্ডালের যেমন হিতাহিত জ্ঞান নাই, ক্রোধ হইলে লোকের সেইরূপ কোন হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। ক্রোধান্ধ ব্যক্তি না করিতে পারে এমন অসৎকার্য্য বিশ্বে কিছুই নাই। মহাভারতের "বনপর্ব্বে" মহারাজ যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর প্রতি ক্রোধের কুফল সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

ক্রোধমূলো বিনাশো হি প্রজানামিহ দৃশ্যতে।
ক্রুদ্ধঃ পাপং নরঃ কুর্য্যাৎ ক্রুদ্ধো হন্যাৎ গুরূনপি॥
ক্রুদ্ধঃ পরুষয়া বাচা শ্রেয়সোঽপ্যবমন্যতে।
বাচ্যাবাচ্যে হি কুপিতো ন প্রজানাতি কর্হিচিৎ॥
নাকার্য্যমস্তি ক্রুদ্ধস্য নাবাচ্যং বিদ্যতে তথা॥
হিংসাৎ ক্রোধাদবধ্যাংস্তু বধ্যান্ সম্পূজয়েত চ।
আত্মানমপি চ ক্রুদ্ধঃ প্রেষয়েদ্ যমসাদনম্॥
ক্রুদ্ধো হি কার্য্যং সুশ্রোণি ন যথাবৎ প্রপশ্যতি।
ন কার্য্যং ন চ মর্য্যাদাং নরঃ ক্রুদ্ধোঽনুপশ্যতি॥

"হে সুশ্রোণি! ইহলোকে ক্রোধ মানবের বিনাশের মূল। ক্রুদ্ধব্যক্তি পাপকার্য্য করে, এমন কি গুরুকে পর্য্যন্ত হত্যা করিয়া থাকে। ক্রুদ্ধব্যক্তি কর্কশ বাক্যদ্বারা যাহা মানবের শ্রেয়ঃ বলিয়া কথিত তাহারও অবমাননা করিয়া থাকে। ক্রোধের বশীভূত হইলে বাচ্যাবাচ্য জ্ঞান থাকে না, ক্রুদ্ধব্যক্তি না করিতে পারে

এমন অপকর্ম্ম কিছুই জগতে নাই এবং না বলিতে পারে এমন অবাচ্যও কিছুই নাই। ক্রোধের উত্তেজনায় অবধ্য বধ হইয়া থাকে এবং বধ্যও পূজ্য হইয়া থাকে। ক্রুদ্ধব্যক্তি নিজকে যমালয়ে প্রেরণ করিয়া থাকে। ক্রুদ্ধ হইলে কোন্ কার্য্যের কি ফল তাহা বুদ্ধিগোচর হয় না। উচিত কার্য্য কি, মর্য্যাদা কিরূপে রক্ষা করিতে হয়, তাহা ক্রুদ্ধব্যক্তি বুঝিতে পারে না।"

চিকিৎসাশাস্ত্রে ক্রোধকে কোন কোন ক্ষেত্রে অপস্মার, উন্মাদ, মূর্চ্ছা, নাসিকা, হৃৎপিণ্ড ও পাকস্থলী হইতে রক্তস্রাব, রক্তবমন প্রভৃতি রোগের কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে ক্রোধের উত্তেজনায় মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে দেখা গিয়াছে। হাদীস শরিফের মিশকাত 'ক্রোধ' সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"তিক্ত ঔষধ যেমন মধুকে নষ্ট করে, ক্রোধ তেমন ঈমানকে নষ্ট করে।" উক্তগ্রন্থের শায়খানও উল্লেখ করিয়াছেন,—"অত্যধিক ক্রোধী ব্যক্তিই আল্লাহতালার কাছে সর্ব্বাধিক অপ্রিয়।" মল্লযুদ্ধে শত্রুকে পরাজিত করিবার মধ্যে যেরূপ প্রকৃত গৌরব নাই, তদ্রূপ ক্রোধের সময় আত্মসংযমের মধ্যেই প্রকৃত বীরত্ব নিহিত রহিয়াছে, ইহা উল্লেখ করিয়া কোরাণ মানবকে ক্রোধ থেকে বিরত থাকিতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হাদিস শরীফের মিশকাতের মতে,—"আল্লাহর্ উদ্দেশ্যে যে ক্রোধ দমন করা যায়, তার চেয়ে কোন বীরত্বই তার কাছে শ্রেষ্ঠ নয়। * * * * যে ব্যক্তি আল্লাহর্ উদ্দেশ্যে ক্রোধ গলাধঃকরণ করেছে, তার মত উত্তম পানীয় আর কেউ পান করে নি।" শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায়' 'ক্রোধ বা না করে কিবা, ক্রোধ ত্যাগ সদা দিবা'—এই পয়ারের মাধ্যমে সবাইকে সকল সময় ক্রোধের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চলিতে উপদেশ করিয়াছেন।

কামই ক্রোধের জনক

কাম রজোগুণকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয় এবং যখন অভিলাষ-সিদ্ধির ব্যাঘাত হয়, তখন তমোগুণকে আশ্রয় করিয়া ক্রোধ হইয়া পড়ে। সাধারণভাবে কাম বাধাপ্রাপ্ত হইলে যে সমস্ত দৈহিক তাড়নাদি ও মানসিক আক্রোশাদি আসে, তাহাই ক্রোধ নামে কথিত হয়। ক্রোধ রজোগুণ সমুদ্ভূত কাম হইতে জাত বলিয়া কামী লোকের মধ্যে তাই ইহার প্রাকট্য দেখা যায়। ক্রোধদ্বারা আক্রান্ত হইলে মানব পরমার্থবিচ্যুত হইতে বাধ্য হয়, পরমার্থ কেন, ধর্ম্ম, অর্থ, কামাদি লাভেও বঞ্চিত হয়। ভোগী ও ত্যাগী উভয় সম্প্রদায়ে কাম বাধাপ্রাপ্ত হইলে ক্রোধ উদ্দীপ্ত হয়। কৃষ্ণভক্ত ব্যতীত জগতের সকলে স্ব-স্ব কামকর্ত্তৃক চালিত হয় এবং কামের বাধাপ্রাপ্তিতে অশান্ত হইয়া পড়ে। নীতিশাস্ত্রে কামের ন্যায় ক্রোধও

বিশেষভাবে নিন্দিত হইয়াছে। কামের জয়ই ক্রোধের জয় অর্থাৎ কাম জয় হইলেই ক্রোধ জয় হইয়া থাকে। ক্রোধের রূপ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, তাই লোকে ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া পিতা-মাতা, ভাই, বন্ধু ও আত্মীয়স্বজনকে হত্যা করিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। এই বিষয়ে ইতিহাস তাহার অনেক সাক্ষ্য বহন করিয়া চলিতেছে। এমন কি, লোকে ক্রোধের বশীভূত হইয়া আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিয়া থাকে, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ভক্ত ভোগী-সম্প্রদায়ের ইন্দ্রিয়তর্পণের অনুমোদন না করিয়া তাহাতে সর্ব্বদাই বাধাসৃষ্টি করেন। ভক্তকর্ত্তৃক নিজেন্দ্রিয়তর্পণে ব্যাঘাত সৃষ্টিতে দুর্ভাগা ব্যক্তিগণ ভক্তের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করিতে গিয়া জন্মজন্মান্তরের জন্য ভক্তিমন্দির হইতে বিদায়লাভ করে। কেহ কেহ আবার ভক্তকে প্রহার করিতে গিয়া অনন্তকালের জন্য নরকে বাস করিতে বাধ্য হয়।

ভক্ত প্রাকৃত ক্রোধের বশবর্ত্তী নহেন

মহাভারতের বনপর্ব্বে পাওয়া যায়,—"যস্তু ক্রোধং সমুৎপন্নং প্রজ্ঞয়া প্রতিবাধতে। তেজস্বিনং তং বিদ্বাংসো মন্যতে তত্ত্বদর্শিনঃ॥" অর্থাৎ "যিনি সমুৎপন্ন ক্রোধকে প্রজ্ঞাদ্বারা বশীভূত করেন, পণ্ডিতগণ তাঁহাকে তেজস্বী বলিয়া আখ্যা প্রদান করেন।" এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতেও উল্লেখ রহিয়াছে,—

যঃ সমুৎপতিতং দেহে আকাশান্মন্যুমুল্বণম্।
আত্মজিজ্ঞাসয়া যচ্ছেৎ স গুণানতিবর্ত্ততে॥ (ভাঃ ৬।৪।১৪)

"যে ব্যক্তি আত্মবিচারদ্বারা আকাশ হইতে সমুৎপতিত (অর্থাৎ অকস্মাৎ উদ্ভূত) দেহস্থ উৎকট ক্রোধকে নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনিই দুঃখের হেতুভূত সংসারকে অতিক্রম করিতে সমর্থ।" কৃষ্ণভক্তগণ দৈন্য-বিনয়ে ভূষিত হইয়া ক্রোধরূপ মহাশত্রুকে চিরতরে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। বাস্তবিকপক্ষে কৃষ্ণভক্তই একমাত্র শান্ত। "কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, অতএব শান্ত। ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলি অশান্ত।" কৃষ্ণভক্তই একমাত্র পৃথিবীকে শাসন করিতে সমর্থ, কারণ তিনি বাক্য, ক্রোধ, মন, জিহ্বা, উদর ও উপস্থ—এই ষড়্‌বেগকে অনায়াসে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন। ইহা শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ তাঁহার "উপদেশামৃতের" প্রথম শ্লোক "বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং" এর মধ্যে বিশেষভাবে জানাইয়াছেন। কর্ম্মফল লাভের অতৃপ্তিতে ও মুক্তির অপ্রাপ্তি-হেতু ক্রোধ ভক্তের নাই। ভক্ত সর্ব্বপ্রকার হৃদ্গত কাম কৃষ্ণসেবায় নিয়োজিত করিয়া নিত্যকালের জন্য কর্ম্মবন্ধন হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়াছেন ও স্বীয় স্বরূপের সিদ্ধবৃত্তিতে অধিষ্ঠিত আছেন বলিয়া তাহাতে প্রাকৃত ক্রোধের কোন সম্ভাবনা নাই। ভক্ত কোন সদোষ পরিমিত কুণ্ঠাময়স্থানে বাস করেন না, তিনি

নিত্যকালই বৈকুণ্ঠবাসী—তথায় কোনপ্রকার শোক, ভয় ও প্রাকৃত ক্রোধ থাকিতে পারে না, অমৃতই তথাকার আদরণীয় বস্তু। নানাপ্রকার বিরুদ্ধমতবাদীর প্রতিদ্বন্দ্বী হইলে তাহাদের ক্রোধোৎপত্তি হইবে জানিয়াও ভক্ত নিত্যসত্য প্রচারে কুণ্ঠিত হন না, তাহাই ভক্তের ভগবানে আত্মনিবেদন ও জীবে দয়ার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

ভক্তদ্বেষীর প্রতি ক্রোধ প্রকাশেই প্রাকৃত ক্রোধ প্রশমন

মানবের মহাশত্রু ও মহা অনিষ্টকারী ক্রোধকে সাক্ষাদ্‌ভাবে কৃষ্ণসেবার কোন কার্য্যে নিয়োজিত করা যাইতে পারে না বটে, কিন্তু ভক্তদ্বেষীর প্রতি ইহাকে নিয়োজিত করিলে ভক্তির পরিপুষ্টি হইয়া থাকে। তাই শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর বলিয়াছেন,—"ক্রোধ ভক্তদ্বেষী-জনে।" বদ্ধজীবের জড় ভোগকামনায় ব্যাঘাত হইলে যে ক্রোধের উদয় হয়, তাহা কখনই আদরণীয় নহে, কিন্তু গুরুবৈষ্ণববিদ্বেষীর দণ্ডবিধানার্থ যে ক্রোধ, তাহা ভক্ত্যঙ্গ। মৎসরতা-বশে ভোগী ও ত্যাগী উভয় সম্প্রদায় ভক্তের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিয়া সত্য ধ্বংস করিতে উদ্যত হয়। যিনি অবাধে মৌনভাবে তাহাদের কার্য্যে অনুমতি প্রদান করেন, তাহার ভক্তিপথ রুদ্ধ জানিতে হইবে। ভক্তদ্বেষী-জনের ভক্তনিন্দা এবং ভক্তের বিদ্বেষজনক কার্য্য যদি সহ্য করা যায়, যদি তাহাতে সাধকের ক্রোধ বা অসহিষ্ণুতা প্রকাশ না হয়, তাহা হইলে বিষ্ণু ও বৈষ্ণবে যে তাহার প্রীতি আছে, তাহা প্রমাণিত হয় না। দক্ষ প্রজাপতির যজ্ঞে পরম বৈষ্ণব শ্রীমহাদেবের অবমাননা দর্শন করিয়া দক্ষদুহিতা সতীদেবী 'কর্ণৌ পিধায়' (ভাঃ ৪।৪।১৭) শ্লোকে প্রভুভক্তের ধর্ম্ম কি হইবে তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। ভক্তনিন্দার প্রতিবাদ-স্বরূপে স্বীয় দেহ পরিত্যাগ করিয়া সতীদেবী ভক্তের মর্য্যাদা কিরূপে রক্ষা করিতে হয় তাহা সাধককে দেখাইয়াছেন। রামভক্ত হনুমান ক্রোধ করিয়া লঙ্কাদাহন করিলেও তাহাকে শাস্ত্রে কোথাও প্রাকৃত ক্রোধের বশবর্ত্তী বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। প্রভু রামচন্দ্রের সুখের নিমিত্তই সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন বলিয়া হনুমানজী কখনও 'ভক্তপদবী' হইতে চ্যুত হন নাই।

ভগবানে প্রাকৃত ক্রোধের কোন সম্ভাবনা নাই

অষ্টাদশ মহাদোষ, যথা—মোহ, তন্দ্রা, ভ্রম, রুক্ষরসতা, উন্নকাম, লোলতা, মদ, মাৎসর্য্য, হিংসা, খেদ, পরিশ্রম, অসত্য, ক্রোধ, আকাঙ্ক্ষা, আশঙ্কা, বিশ্ববিভ্রম, বিষমত্ব, পরাপেক্ষা। এই অষ্টাদশ মহাদোষ সর্ব্বদাই বদ্ধজীবের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। অষ্টাদশ মহাদোষরই অন্যতম ক্রোধ। কেহ কেহ বলেন,—"ভগবান্ ত' স্বয়ং বিভিন্ন সময়ে ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা শাস্ত্রের বিভিন্নস্থলে প্রমাণ

পাওয়া যায়, তবে ভগবানকে কিরূপে ক্রোধ-মুক্ত বলা যাইবে?" ভগবানের ক্রোধ-প্রকাশ সম্বন্ধে শাস্ত্রে পাওয়া যায়,—

কীর্ত্তনের বাধ শুনি প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রোধে হইলেন প্রভু রুদ্র-মূর্ত্তিধর॥ (চৈঃ ভাঃ মঃ ২৩।১১৮)
'জ্ঞান' বড় অদ্বৈতের শুনিয়া বচন।
ক্রোধে বাহু পাসরিল শচীর নন্দন॥ (চৈঃ ভাঃ মঃ ১৯।১৩৩)
ক্রোধে রুদ্র হইলেন শচীর নন্দন॥ (চৈঃ ভাঃ আঃ ৮।১৩০)

ইহা ব্যতীত শ্রীভাগবত ও পুরাণাদিতেও ভগবানের ক্রোধ প্রকাশের প্রমাণের কোন অভাব নাই।

পূর্ব্বপক্ষের সন্দেহ নিরসনার্থে গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ 'সিদ্ধান্তরত্নমের' মধ্যে লিখিয়াছেন,—"শ্রীভগবানে ক্রোধাদি অষ্টাদশ প্রকার দোষ দেখা যাইতেছে, উহা মানুষের পক্ষে দোষাবহ, শ্রীভগবানের সম্বন্ধে নহে। কারণ ঐগুলি ভক্তগণের হৃদ্গত আনন্দের বৈচিত্র্যকে পুষ্টি করিয়া থাকে।" বিগ্রহাংশ, বিগ্রহ ও শ্রীভগবান্ এক বস্তু, পৃথক্ নহে। সকলই চিন্ময়, জড়াত্মক নহে। শ্রীভাগবতে কথিত রহিয়াছে,—"অখণ্ডিত-বিজ্ঞানজ্ঞানৈশ্বর্য্য ও নিখিলদেবতাস্তুত শ্রীভগবানে দেহসম্ভূত শোক, মোহ, ক্রোধ ও ভয়ের সম্ভাবনা কোথায়? তবে যে তাঁহাতে ঐ সকল ভাব দেখা যায়, সে তাঁহার ইচ্ছাধীন। মনুষ্যের ক্রোধাদি শারীরিক, শ্রীভগবানের কেবল মানসিক।" আবার ভগবানের মাৎসর্য্য, ক্রোধ ও হিংসাদি প্রকাশদ্বারা অসাধুবিনাশের সঙ্গে সঙ্গে সাধুসংরক্ষণও হইয়া থাকে। ভগবানের ক্রোধ ভক্তির মহিমাকেই ব্যাপ্ত করে।

সাধু-গুরু-কৃপা প্রাকৃত ক্রোধ প্রশমন ও কৃষ্ণভক্তিলাভের সহায়ক

প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের স্ব-স্ব বিষয়ে স্বভাবতঃ অনুরাগ ও বিদ্বেষ জন্মিয়া থাকে। যদি বিষয় ইন্দ্রিয়ের বাসনানুযায়ী হয়, তাহা হইলে তাহাতে প্রবল অনুরাগ জন্মে, আর যদি তাহা বাসনার বিরোধী হয়, তাহা হইলে তাহাতে বিদ্বেষ উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে বিষয়ে অনুরাগ থাকে, তাহা যদি শাস্ত্রনিষিদ্ধও হয়, তাহা হইলে মানুষ তাহা হইতে নিরস্ত হইতে পারে না। আর যে বিষয়ে মানুষের দ্বেষভাব থাকে, তাহা যদি শাস্ত্রবিহিতও হয়, তাহা হইলে মানুষ সেই দ্বেষ ত্যাগ করিতে পারে না। বিষয়-সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়ের অনুরাগ ও বিদ্বেষ কোন নিয়মের অধীন নহে। এই রাগ ও দ্বেষই জীবের পরম শত্রু। বিষয়ে রাগ ও দ্বেষই যাবতীয় অনর্থের মূল

জানিয়া কদাচ তাহার বশীভূত হওয়া উচিত নহে। শ্রেয়ঃকামী মানুষের এই রাগ ও দ্বেষ জয় করা অবশ্যই কর্ত্তব্য। সাধুসঙ্গে শাস্ত্রীয় জ্ঞান জন্মিলেই মানুষের হিতাহিত বোধ জন্মিবে। যে অজ্ঞান বা অবিদ্যাজনিত নানাবিধ দুর্ব্বাসনা অনাদিকাল হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহাও ক্রমে ক্রমে নিবৃত্ত হইবে।

কৃষ্ণবহির্ম্মুখতাই যাবতীয় অজ্ঞান বা অবিদ্যাজনিত ক্রোধের মূল। ভাগ্যক্রমে গুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় শাস্ত্র শ্রবণ হইলে, শুধু যে বিষয়জনিত ক্রোধ দূরীভূত হইবে তাহা নহে, অধিকন্তু জীবের কৃষ্ণবিমুখতা-রূপ মূলব্যাধি নিরাময় হইয়া হরিভজন-রূপ স্বাস্থ্যলাভ ঘটিবে। তাই শাস্ত্রে পাওয়া যায়,—

(জীব) কাম-ক্রোধের দাস হঞা মায়ার লাথি খায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু-বৈদ্য পায়॥
তাঁর উপদেশ-মন্ত্রে মায়া পিশাচী পলায়।
কৃষ্ণভক্তি পায়, তবে কৃষ্ণ নিকটে যায়॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ২২।১৪-১৫)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

বৈরাগ্যবিলাস

যযাতি রাজা যেরূপ ভোগের পরাকাষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, এ পৃথিবীতে আর কাহারও সেরূপ কথা শুনা যায় না। তাঁহার ইতিহাস কাহারও অবিদিত নাই, তথাপি স্মরণ করিয়া দিবার জন্য একবার আবৃত্তি করা আবশ্যক মনে হয়। বেদের প্রপক্ক ফল পরমহংস সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের অষ্টাদশ ও একোনবিংশ অধ্যায়ে তাঁহার চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে।

যে নহুষ রাজা ইন্দ্রত্ব করিয়াছিলেন ও অত্যন্ত দম্ভের জন্য অভিশপ্ত হইয়া অজগর সর্পাকারে ভীমসেনকে বেষ্টন করাতে যুধিষ্ঠির তাঁহার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করিলে তাঁহাকে মুক্ত করেন ও নিজে মুক্ত হন, সেই নহুষ রাজার দ্বিতীয় পুত্র রাজা যযাতি। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা যযাতি জড়ভোগময় রাজ্যের পরিণাম বুঝিয়া ও তাহাতে প্রবিষ্ট হইলে আত্মবিস্মৃতি ঘটে জানিয়া রাজ্য গ্রহণে অনিচ্ছুক হন বলিয়া রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

তিনি শুক্রকন্যা দেবযানীকে কূপ হইতে পাণিগ্রহণ করিয়া উদ্ধার করায় সেই বালার আগ্রহাতিশয্যেই তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। তৎসঙ্গে দানবেন্দ্র বৃষপর্ব্ব-তনয়া শর্ম্মিষ্ঠা শুক্রশাপে দেবযানীর পরিচারিকারূপে যযাতিপুরে গমন করেন।

দেবযানীর গর্ভে যযাতির যদু ও তুর্ব্বসু নামে দুই পুত্র এবং গোপনে শর্ম্মিষ্ঠা-গর্ভেও দ্রুহ্য, অনু ও পুরু নামে তিন পুত্র হয়। দেবযানী শর্ম্মিষ্ঠার প্রতি রাজার প্রীতি দেখিয়া পিত্রালয়ে গমন করেন এবং পিতা-কর্ত্তৃক যযাতিকে শাপগ্রস্ত করেন। শাপবলে তিনি সেইক্ষণে জরাগ্রস্ত হয়। স্তবে তুষ্ট হইয়া শুক্র বর দিলেন যে, তাঁহার যে পুত্র তাঁহার জরা গ্রহণ করিবেন, তাঁহাকে জরা অর্পণ করিয়া তিনি জরামুক্ত হইতে পারিবেন। পুরু ভিন্ন তাঁহার অন্য কোন পুত্র জরা গ্রহণে স্বীকার না করায় পুরুকেই জরা অর্পণ করিয়া পুরুর যৌবন লইয়া সহস্রবর্ষ সপ্তদ্বীপ শাসন করিয়া ও ইন্দ্রিয়সেবা করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই। শেষে তাঁহার বিবেকোদয় হয় ও বিগতস্পৃহ হইয়া পুরুকে তাহার বয়ঃ প্রদান করিয়া স্বীয় জরা পুনর্গ্রহণ করেন। সেইকালে তিনি দেবযানীকে অজা ও অজাস্বামীর উপাখ্যান বলিয়া স্বীয় অতৃপ্তির বিষয় খ্যাপন করেন। তাঁহার কথিত এই শ্লোক কয়টী পরম উপদেশপূর্ণ,—

"যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
ন দুহ্যন্তি মনঃ প্রীতিং পুংসঃ কামহতস্য তে॥
ন জাতু কামঃ কামান্নামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥
যা দুস্ত্যজাদুর্ম্মতিভির্জ্যর্যতো যা না জীর্য্যতি।
তাং তৃষ্ণাং দুঃখনিবহাং শর্ম্মকামোদ্রুতং ত্যজেৎ॥
মাত্রা স্বসা দুহিতা বা নাবিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥"

কামাহতচিত্ত ব্যক্তিকে পৃথিবীর সমস্ত ধনৈশ্বর্য্য বনিতাদি ভোগ্য-বিষয়সমূহ তৃপ্তি দান করিতে পারে না। কামের উপভোগে কাম শান্ত হয় না, বরং ঘৃতদানে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় ক্রমেই বাড়িতে থাকে। স্বীয় মঙ্গলকাম ব্যক্তি দুর্ম্মতিগণের দুস্ত্যজা ভোগতৃষ্ণাকে দ্রুত ত্যাগ করিবেন। স্ত্রী-সন্নিধান সর্ব্বদা দূরে পরিহার করিবেন, এমন কি মাতা, ভগিনী, কন্যার সহিতও সংকীর্ণাসনে উপবেশন করিবেন না, যেহেতু ইন্দ্রিয়সমূহ বিজ্ঞেরও চিত্তচাঞ্চল্য আনয়ন করে। পূর্ণ সহস্র বৎসর নিরন্তর বিষয়ভোগ করিয়াও আমার বিষয়-তৃষ্ণা প্রবল। সুতরাং বিষয়তৃষ্ণা ত্যাগ করিয়া ভগবানে মনঃসন্নিবেশ করিয়া নির্দ্বন্দ্ব নিরহঙ্কার থাকিব। যিনি সংসারকে আত্মনাশের হেতু বলিয়া জানিয়াছেন, তিনি আত্মদর্শন-বিজ্ঞ। এ অবস্থা পাইতে হইলে সংসারে দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয়সমূহকে অসজ্জ্ঞানে তদ্বিষয়ের চিন্তা হইতে বিরত হইতে হইবে।

ভোগের সম্বন্ধে যযাতির ন্যায় আর কে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন? তাঁহার কি উপদেশ তাহাই বিবেচ্য। কেননা যযাতির ন্যায় তৃষ্ণাপীড়িত হইয়া শ্রেয়োলাভের সময় নষ্ট করিয়া শিক্ষা পাইবার পরিবর্ত্তে ও তৎপূর্ব্বে অপরের অবস্থা দেখিয়া শিক্ষালাভ করাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। 'ঠেকে শেখার' ব্যবস্থা সমীচীন নহে। তাই বলি, যযাতির স্বীয় অভিজ্ঞতাসমুত্থ বিবেকের কথা জ্ঞাত হইয়া স্ব-স্ব নিত্যবিবেকের আশ্রয় গ্রহণ করাই ভাল। রূপজ মোহে ভুলিয়া অগ্নিতে হস্তার্পণ করিয়া দগ্ধ হওয়া অপেক্ষা যাঁহাদের সে অবস্থা হইয়াছিল, তাঁহাদের নিষেধ মানাই ভাল নয় কি?

যযাতির উপাখ্যান হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ভোগে জীবের তৃপ্তি নাই, অতৃপ্তিই প্রাপ্য। যযাতির যথেষ্ট ভোগসামর্থ্য ছিল, ভোগের উপকরণ ছিল, তাহার হ্রাস হয় নাই। এতকাল ভোগ করিয়া তিনিই বলিতেছেন, ভোগে তৃপ্তি নাই। সুতরাং বুদ্ধিমান্ জন অবশ্যই বুঝিতে পারেন যে, ভোগ জীবের নিত্যস্বরূপগত ধর্ম্ম নহে। জীব স্বরূপ-বিভ্রমবশে ভোগ করিতে যায়। কিন্তু তাহার ভাগ্যে তাহাতে আনন্দ-প্রাপ্তি ঘটে না, বরং অধিকাংশস্থলে অতৃপ্তি ও দুঃখভোগই তাহার প্রাপ্য হইয়া পড়ে। সুতরাং জীব ভোক্তৃতত্ত্ব নহে। তাহা হইলে ভোক্তৃতত্ত্ব কে, আর জীবেরই বা স্বরূপ কি? তবে এই পর্য্যন্ত দেখা গেল, ভোগে তৃপ্তি না পাইয়া যযাতি জড়াসক্তি ত্যাগ করিলেন ও ভগবানে মনঃ সন্নিবেশই করণীয় বলিয়া ধারণা করিলেন।

"স তত্র নির্ম্মুক্তসমস্তসঙ্গ আত্মানুভূত্যা বিধূতত্রিলিঙ্গ।
পরেঽমলে ব্রহ্মণি বাসুদেবে লেভে গতিং ভাগবতীং প্রতীতঃ॥"

সমস্ত আসঙ্গমুক্ত হইয়া আত্মানুভূতিপ্রভাবে ত্রিগুণাধিকার উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক জড়মলরহিত পরব্রহ্ম বাসুদেবে ভক্তিলাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

তাঁহার সাধুসঙ্গপ্রভাবে ভৃগুবংশজা দেবযানীরও পরাগতি লাভ হইয়াছিল।

"সর্ব্বত্র সঙ্গমুৎসৃজ্য স্বপ্নৌপম্যেন ভার্গবী।
কৃষ্ণে মনঃ সমাবেশ্য ব্যধুনোল্লিঙ্গমাত্মনঃ॥"

এক্ষণে বিচার্য্য, ভোগ যদি জীবের স্বরূপধর্ম্ম না হইল, তবে ত্যাগ তাহার স্বরূপধর্ম্ম কি না? ইহার বিচার শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ উল্লিখিত—

"নেহ যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ।"

যে কর্ম্মপ্রভাবে ধর্ম্ম লভ্য হয় না, যে ধর্ম্মপ্রভাবে জড়বিষয়ে বিরাগ না জন্মে, সে কর্ম্মকারীর জীবন ধার্ম্মিকের অধিষ্ঠান বিফল; আবার যে বৈরাগ্যের ফলে

শ্রীভগবচ্চরণসেবাতে রতি না জন্মে, সে বৈরাগ্যপর ব্যক্তি জীবিত থাকিয়াও মৃতবৎ। এই শ্লোক হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, যদি শ্রীহরিসেবাকল্পে ভগবদ্বিতর বিষয়ে যে বিরাগ জাত হয়, তাহাই যথার্থ বৈরাগ্য, সেই ত্যাগই সার্থক ত্যাগ, নচেৎ ত্যাগই ফল্গুবৈরাগ্য হইয়া দাঁড়ায়। এরূপ ত্যাগও জীবের স্বরূপধর্ম্ম নহে। শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু ইহার এইরূপ সংজ্ঞা দিয়াছেন,—

"প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধি বস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥"

যাহারা ভোগপ্রবৃত্তির দুঃখদফল দর্শন করিয়া তজ্জনিত ত্রিতাপজ্বালার হস্ত হইতে মুক্ত হইবার জন্য ভোগত্যাগে ব্যস্ত হন ও তৎকল্পে অহংগ্রহোপাসনায় মত্ত হন, তাহাদের শুষ্ক বৈরাগ্যকে শাস্ত্র গর্হণ করিয়াছেন। এরূপ ত্যাগে আগ্রহ কেবল প্রাপঞ্চিক বুদ্ধির ফল। এরূপ ত্যাগ ভোগেরই আর একদিক্। ভোগ যেমন মায়িক বুদ্ধির পরিচয়, শুষ্ক বৈরাগ্যও সেইরূপ মায়িকবিচারপ্রসূত। অপ্রাকৃত অর্থাৎ মায়াতীত বিচারে স্বতন্ত্রভাবে ত্যাগের অভ্যাস করিতে হয় না, ঈশসাম্মুখ্য হইলেই আপনা হইতেই ঈশ ভিন্ন বস্তুন্তরে বিরাগ স্বাভাবিক। উহার জন্য স্বতন্ত্র করিয়া চেষ্টার আবশ্যকতা নাই। যাঁহার যে পরিমাণে ঈশসাম্মুখ্য হইয়াছে, তাঁহার সেই পরিমাণে ঈশভক্তি ও ইতরবিষয়ে বিরাগও সেই পরিমাণে। যেমন ভোজন-কার্য্যের প্রতিগ্রাসে তদনুরূপ ক্ষুন্নিবৃত্তি, তদনুরূপ তৃপ্তি, সেই অনুপাতে শরীরের পুষ্টি সাধন হয়, ঈশ্বরবিশ্বাসের সহিত ঈশ্বরের অভিজ্ঞান এবং অন্যাসক্তি ত্যাগেরও এইরূপ সম্বন্ধ। যে-স্থলে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়, সেখানে মূলে কপটতা আছে। এ তত্ত্বে শ্রীমদ্ভাগবতে স্পষ্ট আদেশ আছে,—

"ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যু স্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্॥"

(ভাঃ ১১।২।৪০)

পরেশানুভব ব্যতীত যুক্ত-বৈরাগ্য সম্ভবপর নহে। শুষ্ক-বৈরাগ্য কেবল নিষেধাত্মক, তাহার সহিত ভোগের পূতিগন্ধও সংশ্লিষ্ট। একটী নিষেধাত্মক লক্ষণ কখনও জীবের স্বরূপধর্ম্ম হইতে পারে না। কিন্তু ফল্গু-বৈরাগ্য জীবের স্বরূপধর্ম্ম না হইলেও যুক্ত বৈরাগ্য ঐ ধর্ম্মে অনুস্যূত আছে। যেহেতু উহাও ভোগের অভাব। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের উদ্ধৃত শ্লোকে দেখা গেল, তাহা "ভক্তি ও পরেশানুভবের" সহগ। সুতরাং পরেশানুভবপর ভক্তিই জীবের স্বরূপধর্ম্ম। 'ভক্তি' অর্থে সেবা (ভজ্ সেবায়াম্)। সুতরাং ভোগের বিপরীত ধর্ম্ম সেবাই জীবের স্বরূপ। সেব্যতত্ত্ব "একমেবাদ্বিতীয়ম" শ্রীভগবত্তত্ত্ব। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদকে উপদেশ করিয়াছেন,—"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।"

ফল্গুত্যাগের ফলে নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানমূলে জড় হইতে মুক্তি ঘটিলেও স্থায়ী আশ্রয়ের অভাবে আমাদের সে অবস্থা স্থায়ী বা নিত্য হয় না। তাহা হইতেও পতন হয়। সুতরাং ভগবদ্ভক্তিতে স্থিতমূল না হইলে বৈরাগ্যে কিছু ফল নাই। তাই শ্রীমদ্ভাগবত (১০।২।৩২) বলিতেছেন,—

"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥"

যাঁহারা মুক্তাভিমানবশতঃ ভগবচ্চরণ অনাদর করেন, তাঁহারা ভগবচ্চরণ হইতে অবসর লইয়া অশুভবুদ্ধিপ্রযুক্ত বহুক্লেশে পরপদ পাইতে গিয়াই অধঃপতিত হন। সুতরাং ফল্গুত্যাগ জীবের স্বরূপ নহে, যুক্তবৈরাগ্য ঐ স্বরূপে আছে। উহার লক্ষণ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে এইরূপ উক্ত আছে,—

"অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥

সকল বিষয়ই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-সেবার অনুকূলে। কৃষ্ণসেবাপর বুদ্ধি লইয়া যথাযোগ্য বিষয়সমূহ উপভোগ করিলে তাহা ভোগ নহে, তাহাই যুক্তবৈরাগ্য। যুক্তবৈরাগ্যই কৃষ্ণদাসের আশ্রয়ণীয় ফল্গুবৈরাগ্য নহে। বিষয়-সমূহ ত্যাগ ফল্গুবৈরাগ্য। আর বিষয়গ্রহণব্যাজে কৃষ্ণসেবা ও নিজ ভোগেচ্ছা ত্যাগই যথার্থ ত্যাগ। অসৎ-সঙ্গই একমাত্র ত্যাগের বস্তু। অসৎ বলিতে জানিতে হইবে,—

"স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর।"

শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—

"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।"

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৫শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২৪০ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে বর্ণিত "তব বক্ষসি রাধাহং রাসে বৃন্দাবনে বনে (নাঃ পঃ ১২।৫৫) [আমি বৃন্দাবনের কাননে, রাস-মহোৎসবে তোমার বক্ষঃস্থল-বিহারিণী রাধিকা]—পার্ব্বতী দেবীর এই উক্তি আমাদিগকে সংশয় ও সন্দেহের মধ্যে নিক্ষেপ করে। কিন্তু যখন আমরা জানিতে পারি, "শক্তি দুই ন'ন—একই শক্তি

চিৎস্বরূপে রাধিকা ও জড়স্বরূপে জড়শক্তি মহামায়া ; বিষ্ণুমায়া নির্গুণ অবস্থায় চিচ্ছক্তি ও সগুণ অবস্থায় জড়শক্তি", তখন আমাদের সকল ভ্রান্তধারণা দূরীভূত হয়। মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত হয়েছে,—"মহামায়া হরেশ্চৈতত্তয়া সম্মোহতে জগৎ" বাক্যে শ্রীহরির শক্তি জড়মায়া, মহামায়া বা বিষ্ণুমায়াই এই জগৎকে মোহিত করেন। শ্রীভগবানের একই শক্তি ; চিৎকার্য্যে তিনি চিচ্ছক্তি, অচিৎ বা জড়কার্য্যে তিনি জড়শক্তি বা মায়াশক্তি। শাস্ত্রীয় বিচারে আমরা চিচ্ছক্তিস্বরূপিণী শ্রীরাধিকার অধীন ; তাঁহার আশ্রয়েই আমাদের শ্রীকৃষ্ণ-ভজন। চিচ্ছক্তিকে আশ্রয় না করে কেবল মায়াশক্তিতে যাঁদের রতি, তাঁরা শাক্ত হয়েও বৈষ্ণব ন'ন ; অপরপক্ষে বৈষ্ণবই চিচ্ছক্তির আশ্রয়ে শুদ্ধ শাক্ত।

গোলোক বৃন্দাবনই শ্রীকৃষ্ণের নিত্যধাম এবং তাঁর সেবাদ্বারা সেই ধামে গতি লাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণের ভজন, ধ্যান, নামকীর্ত্তন, তাঁর পাদোদক ও প্রসাদসেবনই পরম বাঞ্ছিত শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। শ্রীকৃষ্ণই পরম সত্য ও সনাতন এবং তাঁর শক্তি ও পার্ষদগণ নিত্য। নিখিল ব্রহ্মাণ্ড শ্রীকৃষ্ণময় ; তিনিই সকলের জনক ও নির্গুণ পরাৎপর তত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণ অচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে অনন্তগুণ, অনন্তবীর্য্য ও অনন্তলীল।

শ্রীনারদপঞ্চরাত্র-গ্রন্থে রাধাতত্ত্ব বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষাও শ্রীরাধিকার প্রাধান্য স্থাপিত। পরমেশ্বর দ্বিধা বিভক্ত হলে রাধা তাঁহার বামাঙ্গ-সম্ভূতারূপেই আবির্ভূতা হন। শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ প্রকৃতির অতীত, শ্রীরাধাও তদ্রূপ নির্গুণা ও অপ্রাকৃত। শ্রীহরির ন্যায় রাধাও নিত্যা ও সত্যস্বরূপা। তিনি বৃন্দাবনের যমুনা-পুলিনে পূর্ণচন্দ্রোদ্ভাসিত রাসমণ্ডলে রাসক্রীড়ায় শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক আলিঙ্গনধৃতা বলে শ্রীরাধিকা-নামে পরিকীর্ত্তিতা। সর্ব্বাদ্যা সর্ব্বশক্তিস্বরূপা শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষাও অধিক বন্দনীয়া। স্বয়ং রাধাকান্ত শ্রীরাধিকার অনুগামী ও শ্রীরাধা তাঁহার পরম ধ্যেয়। শ্রীরাধিকার প্রাণবল্লভ গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ রাধাচর্ব্বিত তাম্বূলাদি ভক্ষণে পরম প্রীতিলাভ করেন। সুদীর্ঘকাল শ্রীকৃষ্ণের আরাধনায় যে অভীষ্টলাভ হয়, শ্রীরাধিকার স্বল্পকাল আরাধনায় অনায়াসে তৎসমস্তই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণ জগতের পিতা, শ্রীরাধিকা জগন্মাতা, পিতা অপেক্ষা মাতা শতগুণে অধিক বন্দনীয়া, পূজ্যতমা। সাধুগণ নিরন্তর ত্রৈলোক্যনিস্তারিণী শ্রীরাধার উপাসনা করেন। শ্রীকৃষ্ণও প্রত্যহ ভক্তিভরে তাঁর পাদপদ্মে অর্ঘ্যপ্রদান করে থাকেন। পবিত্র বৃন্দাবনের বনস্থলীতে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিভাবে প্রেম-পরতন্ত্র হয়ে রাধার পাদপদ্ম-নখরে সুস্নিগ্ধ অলক্তক প্রদান করেন এবং তদবশেষ তাম্বূল গ্রহণে আনন্দিত হন। তাঁরা উভয়ে একতত্ত্ব ; দুগ্ধ ও ধবলতায় যেরূপ কোন ভেদ নাই, তদ্রূপ তাঁদের উভয়ের

মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধিস্বরূপিণী, সম্পত্তিরূপা এবং তিনিই মূলাপ্রকৃতি ও মহাবিষ্ণুর জননীস্বরূপা।

সেই শুভঙ্করী মহাদেবী শ্রীরাধিকার প্রাকৃত জন্ম-কর্ম্ম নাই। যখন শ্রীহরি লীলা প্রকাশের নিমিত্ত অবতীর্ণ হন, তখন শ্রীরাধিকাও লীলার সহায়কারিণীরূপে আবির্ভূতা হন। যাঁর অনুগ্রহে গোলোকপতি শ্রীকৃষ্ণ পরমপ্রভু হয়েছেন, তিনিই শ্রীরাধিকারূপে পরমা দেবী বলে কথিতা। শ্রীরাধিকাসহস্রনামস্তোত্র সকল শুভদায়ক। শ্রীরাধিকার চরণধ্যানে তৎপর শ্রীহরির পাদপদ্মসেবক ও রাধাপদ-সুধাস্বাদনশালী বৈষ্ণব উক্ত স্তোত্র নিয়মিতপাঠে অশেষ কল্যাণ লাভ করেন।

শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ গৌড়ীয়াচার্য্য গুরুবর্গ তাঁদের অপ্রাকৃত লেখনী ও ভাবসেবায় যে শ্রীরাধাভজন-নিষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন, তা সত্যই অতুলনীয়। মদভীষ্টদেব শ্রীল কেশব গোস্বামী প্রভু উকিল-ব্যারিষ্টার-বিচারকমণ্ডলী-সমলঙ্কৃত কোন বিদ্বজ্জনসভায় ভাষণদানকালে বলেছিলেন,—"মামলাদ্বারা শ্রীরাধারাণীর সেবালাভ ও তাহাতেই শ্রীকৃষ্ণকৃপা প্রাপ্তি ঘটে। আমরা সর্ব্বারাধ্যা শ্রীমতী রাধিকার অনুগত, তাঁর সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন ঘটানোই আমাদের বিশেষ সেবা। শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর সহিত মিলিত হলে সখিগণ শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকার নিকট নালিশ, পরে ডিক্রী ও 'বডি ওয়ারেণ্ট'দ্বারা তাঁকে শ্রীরাধার সঙ্গে মধুর মিলন করিয়েছিলেন।" শ্রীরাধাদয়িতদাস শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদও "মনঃশিক্ষায়" জানিয়েছেন,—"রাধাদাস্যে রহি, ছাড় ভোগ-অহি, প্রতিষ্ঠাশা নহে কীর্ত্তন-গৌরব। রাধা-নিত্যজন, তাহা ছাড়ি' মন, কেন বা নির্জ্জন-ভজন কৈতব!!" শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজও গেয়েছেন,—

"কোথায় গো প্রেমময়ি রাধে রাধে।
রাধে রাধে গো, জয় রাধে রাধে॥
দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ রাধে রাধে।
তোমার কাঙ্গাল তোমায় ডাকে রাধে রাধে॥
রাধে বৃন্দাবন-বিলাসিনি রাধে রাধে।
রাধে কানুমনোমোহিনি রাধে রাধে॥
রাধে অষ্টসখীর শিরোমণি রাধে রাধে।
রাধে বৃষভানুনন্দিনি রাধে রাধে॥"

শুদ্ধভক্তিধারার মূল ভগীরথ শ্রীগদাধরাভিন্নতনু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও গেয়েছেন,—

"কৃষ্ণ বশীকারে চন্দ্রাবলী আদি।　　পরাজয় মানে হইয়া বিবাদী॥

হরিদয়িত-রাধা-চরণপ্রয়াসী। ভকতিবিনোদ শ্রীগোদ্রুমবাসী ॥"

"যে ধরিল রাধাপদ পরম যতনে। সে পাইল কৃষ্ণপদ অমূল্যরতনে ॥
রাধাপদ বিনা কভু কৃষ্ণ নাহি মিলে। রাধার দাসীর কৃষ্ণ,—সর্ব্ববেদে বলে ॥"

"সখীগণ মম, পরম সুহৃৎ, যুগল-প্রেমের গুরু।
তদনুগ হয়ে, সেবিব রাধার, চরণ-কল্পতরু ॥"

"রাধিকা-চরণ, ত্যজিয়া আমার, ক্ষণেকে প্রলয় হয়।
রাধিকার তরে, শতবার মরি, সে দুঃখ আমার সয় ॥"

"রাধা-ভজনে যদি মতি নাহি ভেলা।
কৃষ্ণভজন তব অকারণে গেলা ॥
আতপ-রহিত সুরজ নাহি জানি।
রাধা-বিরহিত মাধব নাহি মানি ॥"

"ভকতিবিনোদ, আন নাহি জানে,
পড়ি নিজসখী-পায়।
রাধিকার গণে, থাকিয়া সতত,
যুগল-চরণ চায় ॥"

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইত প্রকাশিত

মায়াবাদ-নিরাসপর শ্রীমদানন্দতীর্থ পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্বাচার্য্য-বিরচিত

তত্ত্বমুক্তাবলী

[পরিশিষ্টে শ্রীমদ্‌বাদিরাজ স্বামিপাদ-কৃত

যুক্তিমল্লিকা-সহ]

আগ্রহী ব্যক্তিগণ শীঘ্রই সংগ্রহ করুন।

মজার ভুল

"ও বাবা!" "ও মা!" "গেলাম গো!" হঠাৎ এই চীৎকার শুনিয়া হরিহরপুরের জমিদার বাড়ীর কাছারীর লোকজন ও স্বয়ং জমিদার বাবু "কি হল", "কি হল" বলিয়া বাড়ীর ভিতর ছুটিলেন। জমিদার বাবু ও তাঁহার দুই একজন আত্মীয়-স্বজন দোতলার উপর উঠিতে থাকিলেন। অন্য সকলে সংবাদ কি জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া আছেন, এমন সময় দোতলার বারান্দা হইতে বাড়ীর ঝি বলিল,—"খোকাবাবু, হঠাৎ কি জানি কেন, চীৎকার করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে; আপনারা কে কোথায় আছেন, এদিকে আসুন্।"

দেখিতে দেখিতে জমিদার বাবু ও কয়েকজন দোতলার একটী ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন যে, বাবুর একমাত্র সন্তান দ্বাদশ বৎসরের "ছবি" মেঝের উপর অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া আছে, তাহার সমস্ত শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। গৃহিণী ঠাকুরাণী উন্মাদিনীর ন্যায় আমার কি হলো গো!' বলিয়া পুত্রের মুখের উপর মুখ রাখিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। দৃশ্য দেখিয়া কর্ত্তাবাবুও হতবুদ্ধি। আগন্তুকদিগের মধ্যে একজন প্রাচীন চিকিৎসক ছিলেন। তিনি সাহস দেখাইয়া, "কি হইয়াছে" বলিয়া সকলকে ধমক দিয়া শীঘ্র বালকের নিকট উপস্থিত হইলেন। বালকের মাতা গৃহন্তরে প্রবেশ করিলে চিকিৎসক তখন তৈল জল ও পাখা আনিবার আদেশ করিলেন। মুখের কথা মুখ হইতে বাহির হইবামাত্রই সব জিনিস আসিয়া উপস্থিত হইল। কবিরাজ মহাশয় তখন সকলকে গোলযোগ করিতে নিষেধ করিয়া "ছবির" মস্তকে তৈল ও জল দিয়া হাওয়া করিতে থাকিলেন। অল্পক্ষণ শুশ্রূষা করার পর বালকের কম্পন বন্ধ হইল এবং একটু পরেই চেতনাবস্থা লক্ষিত হইল। সকলেই কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া বালকের পরিণাম দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আছেন, অমনি বালক "ও বাবা!" ও মা!" বলিয়া পুনরায় চীৎকার করিয়া জড়-সড় হইয়া পাশ ফিরিয়া শয়ন করিল। কর্ত্তা ও গৃহিণী সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"বাবা ছবি! কি হয়েছে? এই যে আমরা!" তখন আবার একটা গণ্ডগোল পড়িয়া গেল। কবিরাজ মহাশয় তখন সকলকে ধমক দিলেন এবং বালকের কর্ণের নিকট মুখ রাখিয়া বলিতে লাগিলেন "ছবি! কি হয়েছে?"

অমনি বালক বলিয়া উঠিল—"তুমি কে? তুমি কে? আমি গেলাম।" কবিরাজ মহাশয় তখন কোমলস্বরে বলিলেন,—"দেখত ছবি! আমি কে—চোখ মেলিয়া দেখ।" বালক বলিল—"না গো! আমি চাইতে পাচ্ছি নে। ঐ দেখ, ঐ বড় সাপ।" এই বলিয়া ছবি দুই হস্তে দুইটী চক্ষু দৃঢ় করিয়া ধরিল।

সকলে "কই" "কই" বলিতে লাগিলেন। বালকও বলিয়া উঠিল—"ওই যে,—দেওয়ালে।"

সকলে দেওয়ালে সর্প অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও সর্পের সন্ধান পাওয়া গেল না। কবিরাজ মহাশয় পুনরায় বলিলেন—"কই, ছবি! সাপ কই?"

বালক অনিচ্ছাসত্ত্বেও দেওয়ালে লম্বমান একগাছা দড়ি দেখাইয়া বলিল,—"ঐ যে; দেখছো না?"

কবিরাজ—"না, ছবি! ও ত' সাপ নয়! ও যে দড়ি!"

ছবি—"না গো না, ওই সাপ!"

কবিরাজ—"চল তো ছবি! দেখি?"

ছবি—"না, আমি যাবো না, ঐ দেখছো না সাপ? ওর কাছে গেলে খেয়ে ফেলবে!"

কবিরাজ—"ছবি। ওটা সাপ নয়! ভয় খাচ্ছ কেন? চল আমার হাত ধরে চল। ভয় কি?"

এই বলিয়া কবিরাজ মহাশয় বালকের হস্ত ধারণ করিলেন। বালক কিন্তু সে দিকে যাইতে নিতান্ত অনিচ্ছুক। সে হাত ছিনাইয়া লইবার জন্য বারংবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কবিরাজ মহাশয় বুদ্ধিমানের ন্যায় অনেক মিষ্ট বাক্য বলিয়া শেষে ছবিকে কোলে করিয়া দড়ির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ছবি প্রতি মুহূর্ত্তেই সশঙ্ক। যতই দড়ির নিকট যাইতে লাগিল, ততই তাহার ভয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পরে কবিরাজ মহাশয় জোর করিয়া বালকের হাত ধরিয়া দড়িগাছাটীতে স্পর্শ করিলেন এবং বলিলেন—"দেখ তো ছবি! এটা কি?" তখন ছবি হাসিয়া বলিয়া উঠিল—"এ যে দড়ি।" এই বলিয়া বালক দড়িগাছা লইয়া টানাটানি করিতে লাগিল। পুত্রগত প্রাণ পিতা-মাতার হৃদয়ে প্রাণ ফিরিয়া আসিল। উপস্থিত লোকসকল তখন ঘটনা দেখিয়া হাসিতে হাসিতে নামিয়া গেলেন। কবিরাজ মহাশয়ও বালককে রাখিয়া চলিয়া গেলেন। গৃহিণী ঠাকুরাণী লোকজন চলিয়া গেলে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং হৃদয়ের ধনকে কোলে লইয়া আদর করিতে লাগিলেন। ক্ষণপরেই জমিদারবাবু ও কাছারীতে ফিরিয়া আসিলেন। পরস্পর তখন অতীত ঘটনা লইয়া রহস্য করিতে থাকিলেন।

প্রিয় পাঠকবর্গ! আজ আমরা যে ঘটনাটী লক্ষ্য করিলাম, তাহা অপরিণাম-দর্শীর কাণ্ডহেতু হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন সত্য। কিন্তু ধীর ব্যক্তিমাত্রই এ বিষয়ে হাসিয়া সন্তুষ্ট হইবেন না। তিনি বলিবেন,—হায়, বালক রজ্জু ও সর্প উভয় বিষয়ে অভিজ্ঞ হইয়াও রজ্জুতে সর্পভ্রমে জ্ঞানশূন্য হইয়া মৃত্যুদ্বারে উপনীত হইয়াছিল; পুনরায় রজ্জুজ্ঞান হওয়ায় বালক প্রকৃতিস্থ হইল। এ যে সে ভুল নয় —মজার ভুল!

আমরা আজ উপরিউক্ত ভুল-বিষয়ে আলোচনা করিব। দেখুন! বালক সর্প চিনিত এবং সর্প যে মানুষের জীবন নাশ করে, তাহাও জানিত। পক্ষান্তরে, সে রজ্জুও চিনিত এবং রজ্জু যে তুচ্ছ সামগ্রী, তাহাও সে জানিত। পূর্ব্বে

সে সর্প-দংশনে ভয় পাইত এবং রজ্জু-দর্শনে কোনরূপ ভাবান্তর গ্রহণ করিত না। আজ কিন্তু রজ্জুতে সর্প-ভ্রমে তাহার ভাবের দুই প্রকার পরিবর্ত্তন হইল। প্রথমতঃ তাহার রজ্জু-বিষয়ে স্মৃতি লোপ হইয়া গেল, দ্বিতীয়তঃ রজ্জুকে খেলার সামগ্রী না জানিয়া জীবন-হন্তা এই বিপরীত বুদ্ধি করিয়া বসিল। তাই, আজ রজ্জুকে তুচ্ছ বস্তু না জানিয়া রজ্জুভয়ে ভীত হইয়া মৃত্যুমুখে পড়িতেছিল। আবার দেখুন, অবশেষে অভিজ্ঞ চিকিৎসক বালককে অভয় দিয়া অতি আদর করিয়া ক্রমে ক্রমে তাহার বিপরীত বুদ্ধি ও ভ্রম অপসারিত করাইয়া তাহাকে সুব্যবস্থা দান করিলেন।

আমারও কিন্তু ঐ বালকের ন্যায় ভুলে পড়িয়াছি। আমরা নিজেদের ভুল নিজেরা বুঝিতে না পারিয়া স্বীকার করিতেছি না সত্য, কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ আমাদিগের অবস্থা দেখিয়া দয়ার্দ্র-চিত্তে ভুল-সংশোধনের জন্য ব্যস্ত আছেন। তাঁহারা বলিতেছেন,—দেখ, শ্রীভগবান্ অদ্বিতীয় অর্থাৎ তাঁহার সমানও কেহ নাই এবং তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠও কেহ নাই। তিনি অন্তরঙ্গা, তটস্থা, বহিরঙ্গা—এই ত্রিশক্তিধৃক। অপ্রাকৃত বৃন্দাবন ও তথাকার যাবতীয় বস্তুই অন্তরঙ্গা শক্তির কার্য্য। জীব তাহার তটস্থাশক্তি এবং মায়া বহিরঙ্গা শক্তি। তটস্থ শক্তি জীব তটস্থ ধর্ম্মবশতঃ বৈকুণ্ঠ ও মায়িক এই উভয় জগতে বিচরণ করিতে সমর্থ। যখন ঐ জীব নিজের উপাস্য দেবতার সেবা ভুলিয়া মায়িক জগতের প্রতি অভিনিবিষ্ট হয়, তখন ভগবদ্বিমুখ জীব মায়াশক্তিদ্বারা অভিভূত হয়। তখন মায়িক জগতে আগমনহেতু শুদ্ধজীবস্বরূপে মায়ার আবরণ পড়িয়া যায়। সেই মায়াবদ্ধ জীব অনিত্য দেহকে আত্মবুদ্ধি করে ও দেহসম্বন্ধীয় জনগণকে আত্মীয় জ্ঞান করিয়া দুই প্রকার ভ্রমে পতিত হয়। সে শ্রীভগবানকে ভুলিয়া যায় ও অনিত্য ধ্বংসশীল দেহকে নিত্য ও অবিনশ্বর বুদ্ধি করে। এইরূপে ভ্রান্ত জীব দেহ, কলত্র, অর্থ, ও সজ্জনাদির বিনাশচিন্তায় ভীত হয়। বিনাশ হইলে শোকাভিভূত হয়, বিনাশের পর পুনরায় তৎপ্রাপ্তির স্পৃহা করে; পরে লোভাভিভূত হয় এবং পুনরায় বিনাশে দুঃখসাগরে মগ্ন হয়। বিকারগ্রস্ত রোগীর জ্ঞানশূন্য প্রলাপের ন্যায় "আমি" ও "আমার" প্রলাপ-বাক্যই তখন তাহার সম্বল হয়। বিকারগ্রস্ত ব্যক্তি যেমন সুচিকিৎসকের কৃপা ব্যতীত নিজের বিকৃত অবস্থা বুঝিতে ও সুস্থাবস্থা পুনঃ-প্রাপ্তিতে অসমর্থ, সেইরূপ মায়াবদ্ধ জীব, শ্রীভগবত্তত্ত্ব-বেত্তা সাধুর কৃপা ব্যতীত নিজের গুরুতর ভ্রম হইতে উত্তীর্ণ হইয়া প্রকৃতাবস্থা পাইতে সমর্থ নহে। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলেন যে, জীব যখন নিজেকে অসহায়-জ্ঞানে প্রকৃত সাধুকে সংসার-সাগর-পারের তরণী-জ্ঞানে তদীয় শ্রীশ্রীচরণ-যুগলে কায়মনো-বাক্যে আশ্রয় লয় এবং নিষ্কপটে শ্রীগুরুদেবকে একমাত্র উপাস্য ও পরমবন্ধু-জ্ঞানে তদীয় সেবায় নিমগ্ন হয়, তখন তাহার ভ্রমের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি হয়।

আমরা আজ সেই ভ্রম-সংশোধনের জন্য শ্রীভাগবত-বিগ্রহ শুদ্ধ ভক্তগণের শ্রীচরণে শরণ-প্রার্থী। আমরা আর ভ্রান্ত থাকিতে চাই না। কারণ, এ যে সে ভুল নয়—বড় মজার ভুল।

শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠে

শ্রীঝুলনযাত্রা-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উত্তরবঙ্গীয় প্রচারকেন্দ্রের অন্যতম শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠের সেবকগণের উদ্যোগে এবং শ্রীসমিতির সভাপতি-আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের উপস্থিতিতে গত ১৩ই শ্রাবণ, ১৪০০ (ইং ২৯।৭।৯৩), বৃহস্পতিবার হইতে ১৭ই শ্রাবণ, ১৪০০ (ইং ২।৮।৯৩), সোমবার পর্য্যন্ত পঞ্চদিবসব্যাপী শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা-মহোৎসব মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়। এতদুপলক্ষে পূর্ব্ব হইতে ঝুলনযাত্রা-মহোৎসবের নিমন্ত্রণ-পত্র ও প্রচারপত্র বিতরণ করা হয়। 'পূর্ব্বাচল ভারত দর্পণ' নামক হিন্দী দৈনিক পত্রিকার ২৫।৭।৯৩ ও ৩০।৭।৯৩ তারিখের সংখ্যায় এবং 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ' পত্রিকার ২৯।৭।৯৩ তারিখের সংখ্যায় এই উৎসবের সংবাদ ও বিবরণ প্রচারিত হয়।

শ্রীঝুলনযাত্রা-মহোৎসবের পূর্ব্ব হইতেই ব্রহ্মচারিগণ শ্রীমঠের প্রবেশদ্বারের দুই পার্শ্বে বিভিন্ন স্টলে ভগবল্লীলার প্রদর্শনী করিয়াছিলেন। উক্ত প্রদর্শনী দর্শন করিতে প্রত্যহ বহু জনসমাগম হইত।

শ্রীল আচার্য্যদেবের অসুস্থতা-হেতু বিশ্বহিন্দু পরিষদের সেক্রেটারী Dr. P. K. Chatterjee (Neurologist), শিলিগুড়ি কলেজের ইংরাজী বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রলয় কুমার মজুমদার মহাশয় সভা উদ্বোধনপূর্ব্বক শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা-বিষয়ে ও সনাতন ধর্ম্ম প্রসঙ্গে বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীবাঁকেবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণানন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীরমেশকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅতুলকৃষ্ণ দাসাধিকারী প্রমুখ বক্তৃগণ বিভিন্ন দিবসে বক্তৃতা প্রদান করেন।

বক্তৃতান্তে প্রত্যহ স্থানীয় হিন্দী ও বাংলা ভাষাভাষী বালক-বালিকাদের বিভিন্ন ধর্ম্মমূলক শিক্ষণীয় নাটক ও নৃত্য-গীতাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীমঠের সেবকবৃন্দও কয়েকটি নাটক অভিনয় করিয়া দর্শকবৃন্দকে আনন্দদান করেন এবং পরোক্ষভাবে তাঁহাদিগকে শাস্ত্রীয় তত্ত্বোপদেশদ্বারা শিক্ষা প্রদান করা হয়। শ্রীরমেশ চাচানজী-পরিচালিত 'শ্রীপঞ্চমুখী বালাজী ভজন মণ্ডল' (মাড়োয়ারী সংস্থা) এই অনুষ্ঠানে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজন পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানের সমাপ্তি-দিবসে কৃতি বালক-বালিকাগণকে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

পঞ্চদিবসব্যাপী এই মহোৎসবে স্থানীয় জনসাধারণের সাহায্য-সহানুভূতি বিশেষ প্রশংসনীয়। শ্রীবাঁকেবিহারী ব্রহ্মচারীজী এই অনুষ্ঠানের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করায় শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিশেষ কৃপাভাজন হইয়াছেন।

এই ঝুলনযাত্রা-মহোৎসব শ্রীসমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ এবং অন্যান্য শাখামঠসমূহেও বিশেষ উৎসাহ-উদ্দীপনা সহকারে অনুষ্ঠিত হয়।

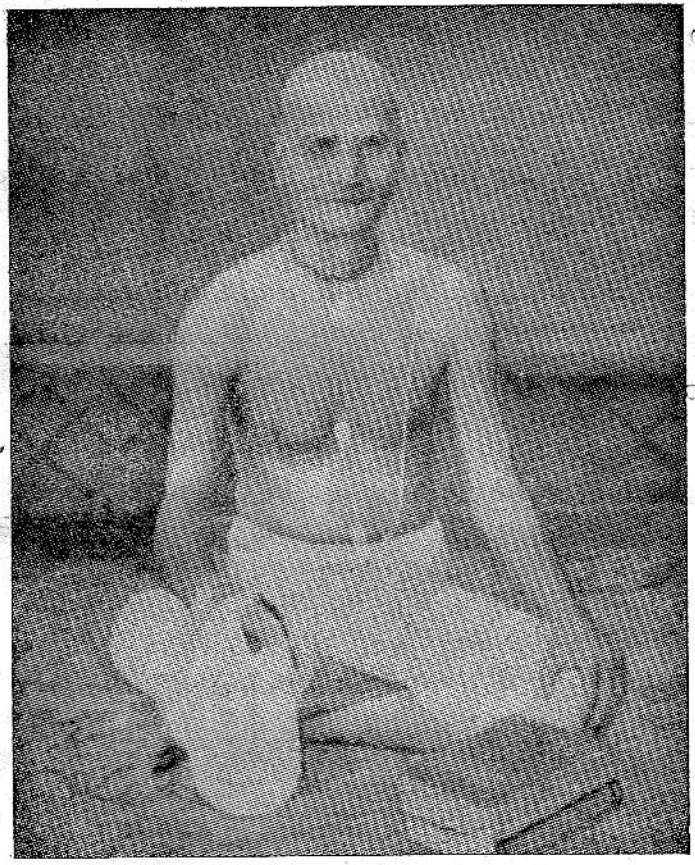
—নিজস্ব সংবাদ

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা

আচার্য্যবর্য্য পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

২৫শ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব



নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে।
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব ইতি নামিনে॥

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
শ্রীধাম নবদ্বীপ (নদীয়া)।

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)
ফোন—২৪৭

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।
১৬ হৃষীকেশ, ৫০৭ শ্রীগৌরাব্দ

শ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবন্নতিপূর্ব্বিকেয়ম্—

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বিকেয়ম্—

আগামী ৩০শে পদ্মনাভ, ১৩ই কার্ত্তিক, ১৪০০ (৩০।১০।৯৩) শনিবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ও তদধীনস্থ ভারতব্যাপী শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য অস্মদীয় শ্রীল গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তি-প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** তিরোভাব-তিথিপূজা উপলক্ষে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ এবং তৎশাখা মঠসমূহে ২৫শ বর্ষপূর্ত্তি বিরহ-মহোৎসবের শুভানুষ্ঠান হইবে।

এতদুপলক্ষে উল্লিখিত ঠিকানায় নিম্নবর্ণিত সেবাসূচী অনুসারে আপনি সবান্ধবে যোগদান করত আমাদিগকে বৈষ্ণব-সেবায় অধিকার দানে কৃপাপ্রকাশ করিবেন—ইহাই বিনীত প্রার্থনা। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটী মার্জ্জনীয়। ইতি—৩১শে ভাদ্র, ১৪০০

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

—ঃ সেবা-সূচী ঃ—

১৩ই কার্ত্তিক (ইং ৩০।১০।৯৩), শনিবার—
প্রাতে—মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র আলোচনা।
মধ্যাহ্নে—ভোগারতি, বৈষ্ণবসেবা ও মহাপ্রসাদ বিতরণ।
অপরাহ্নে—৪-৩০ মিনিটে বিরহ-সভার অধিবেশন।

বিঃ দ্রঃ—পত্র অথবা সেবানুকূল্য প্রেরণ করিতে হইলে "সাধারণ-সম্পাদক"-এঁর নামে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া (পঃ বঙ্গ)—এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪৫শ বর্ষ | ১৭ পদ্মনাভ, বাসুদেব, ৫০৭ শ্রীগৌরাব্দ
৩০ আশ্বিন, রবিবার, ১৪০০, ইং১৭/১০/৯৩ | ৮ম সংখ্যা

শ্রীগৌরাঙ্গস্তোত্ররত্নম্

শ্রীরাধিকারূপগুণোষ্মিচৌরঃ প্রতপ্তকার্ত্তস্বরকান্তগৌরঃ।
বেদান্তবেদাঙ্গ-পুরাণসারঃ জীয়াৎ স গৌরঃ করুণাবতারঃ॥ ১॥

যিনি শ্রীরাধিকার রূপ ও গুণসমূহকে চুরি করিয়াছেন, প্রতপ্ত স্বর্ণের ন্যায় যাঁহার উজ্জ্বল কান্তি, বেদ-বেদাঙ্গ-পুরাণসার করুণাবতার সেই শ্রীগৌরসুন্দর জয়যুক্ত হউন॥ ১॥

ব্রহ্মেন্দ্ররুদ্রস্তুতপাদপদ্মঃ ঔদার্য্য-মাধুর্য্যগুণাব্ধিসদ্মঃ।
রোমাঞ্চ-কম্পাশ্রুপ্রমোদভারঃ জীয়াৎ স গৌরঃ করুণাবতারঃ॥ ২॥

যাঁহার পাদপদ্ম ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও শিবকর্ত্তৃক স্তুত, যিনি ঔদার্য্য-মাধুর্য্য-সাগরের আধার, রোমাঞ্চকম্পাশ্রুপুলকান্বিত করুণাবতার সেই শ্রীগৌরসুন্দর জয়যুক্ত হউন॥ ২॥

স্বরূপরূপাদিক-প্রাণনাথঃ গোপাল-গোবিন্দমুকুন্দনাথঃ ।
দরিদ্রদুর্জ্জাত্যদুঃখদারঃ জীয়াৎ স গৌরঃ করুণাবতারঃ ॥ ৩ ॥

যিনি স্বরূপ-রূপ-গোপালভট্ট-গোবিন্দ ও মুকুন্দাদি ভক্তগণের প্রাণনাথ, দরিদ্র ও দুর্জাতিগণের দুঃখদূরকারী করুণাবতার সেই শ্রীগৌরসুন্দর জয়যুক্ত হউন ॥ ৩ ॥

মায়ামতধ্বান্তনিকারহারী বারাণসী-ন্যাসিসমূহতারী ।
বিশুদ্ধসদ্ভক্তিপ্রসারকারী জীয়াৎ স গৌরঃ করুণাবতারী ॥ ৪ ॥

মায়াবাদরূপ অন্ধকারবিনাশকারী কাশীবাসী সন্ন্যাসিগণের ত্রাণকর্ত্তা, বিশুদ্ধ ও নিত্য ভক্তির প্রসারকারী করুণাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর জয়যুক্ত হউন ॥ ৪ ॥

শ্রীদিগ্বিজেতৃদ্বিজদর্পহারী শ্রীসার্ব্বভৌমাতিপ্রসাদকারী ।
অষ্টাদশাব্দেশপুরীবিহারী জীয়াৎ স গৌরঃ করুণাবতারী ॥ ৫ ॥

দিগ্বিজয়ী কেশবকাশ্মীরীর দর্পচূর্ণকারী, শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের প্রতি সাতিশয় কৃপালু, শ্রীজগন্নাথ পুরীতে অষ্টাদশবর্ষ বিহারকারী করুণাবতার শ্রীগৌরসুন্দর জয়যুক্ত হউন ॥ ৫ ॥

মহোজ্জ্বলপ্রেমরসপ্রদাতা শ্রীনামসর্ব্বোত্তমভক্তিধাতা ।
গোলোকবৃন্দাবন-সদ্বিহারঃ জীয়াৎ স গৌরঃ করুণাবতারঃ ॥ ৬ ॥

উন্নতোজ্জ্বল প্রেমপ্রদাতা, সর্ব্বোত্তম ভক্তি শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনের বিধাতা, গোলোক ও বৃন্দাবনে নিত্যবিহারী করুণাবতার শ্রীগৌরহরি জয়যুক্ত হউন ॥ ৬ ॥

সদা হরেকৃষ্ণসুগানমত্তঃ যোগীন্দ্রমুনীন্দ্রসমাধিবিত্তঃ ।
দত্তব্রজপ্রেমসুধাসুসারঃ জীয়াৎ স গৌরঃ করুণাবতারঃ ॥ ৭ ॥

যিনি 'হরে কৃষ্ণ' এই নাম গানে নিরন্তর প্রমত্ত, যিনি যোগী ও মুনিশ্রেষ্ঠগণের সমাধিমাত্রলভ্য সম্পত্তি, অমৃতের সার ব্রজপ্রেম যিনি বিতরণ করিয়াছেন, সেই করুণাবতার শ্রীগৌরহরি জয়যুক্ত হউন ॥ ৭ ॥

কবাটবক্ষোনবপদ্মনেত্রঃ শ্রীসচ্চিদানন্দঘনাসুগাত্রঃ ॥
স্বাঙ্গপ্রভানিন্দিতকোটিমারঃ জীয়াৎ স গৌরঃ করুণাবতারঃ ॥ ৮ ॥

যাঁহার বক্ষ কপাটসদৃশ প্রশস্ত, নেত্র নবারবিন্দ তুল্য, যাঁহার চিত্ত ও শ্রীঅঙ্গ সচ্চিদানন্দঘন, যিনি স্বীয় অঙ্গপ্রভাদ্বারা কোটী কন্দর্পকেও হেয় করিতেছেন, করুণাবতার সেই শ্রীগৌরহরি জয়যুক্ত হউন ॥ ৮ ॥

নীলাদ্রি-শুভ্রাংশু-সুধাচকোরঃ রথাগ্রসঙ্গীতসুধাবিধূরঃ ।
শ্রীবৈষ্ণবব্রাতলসচ্ছরীরঃ জীয়াৎ স গৌরঃ করুণাবতারঃ ॥ ৯ ॥

যিনি নীলাচলচন্দ্রের জ্যোৎস্নার চকোরস্বরূপ, যিনি রথাগ্রে সঙ্কীর্ত্তনামৃত

লোলুপ, যাঁহার শ্রীঅঙ্গ বৈষ্ণবচিহ্নদ্বারা পরিশোভিত, করুণাবতার সেই শ্রীগৌরহরি জয়যুক্ত হউন ॥ ৯ ॥

ভক্তাবলীমানসরাজহংসঃ সন্ন্যাসিভূদেবকুলাবতংসঃ।
শ্রীমজ্জগন্নাথশচীকুমারঃ জীয়াৎ স গৌরঃ করুণাবতারঃ ॥ ১০ ॥

যিনি ভক্তগণের চিত্তরূপ সরোবরের রাজহংস সদৃশ, যিনি সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণ-কুলের শিরোভূষণস্বরূপ, শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবীর নন্দন সেই শ্রীগৌরহরি জয়যুক্ত হউন ॥ ১০ ॥

গৌরস্তুতিং গায়তি ভক্তিপূর্ব্বং প্রাপ্নোতি সুপ্রেমসুধাং সঃ সর্ব্বম্।
ত্রিতাপদাবানল-দুঃখমুক্ত প্রমোদতে কৃপাপদাব্জভক্তঃ ॥ ১১ ॥

যিনি ভক্তিসহকারে শ্রীগৌরস্তুতি গান করেন, তিনি সমগ্র প্রেমামৃত লাভ করেন, ত্রিতাপদাবানল দুঃখ হইতে মুক্ত হন এবং শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি লাভ করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হন ॥ ১১ ॥

প্রশ্নোত্তর

শ্রীকৃষ্ণনাম

১। কৃষ্ণনাম কি বস্তু ?

"শুদ্ধসত্ত্বতত্ত্বগত অখণ্ড রস কৃষ্ণাদি নামরূপে পুষ্পকলিকার ন্যায় বিশ্বে কৃষ্ণ-কৃপায় প্রচারিত হইয়াছেন।"　　—'ভজন-প্রণালী', হঃ চিঃ

২। বেদে উপদিষ্ট বস্তুর মধ্যে কোন্‌টি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ?

"বেদশাস্ত্রে যাহা কিছু উপদিষ্ট হইয়াছে, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা হরিনামোপদেশই শ্রেষ্ঠ।"　　—জৈঃ ধঃ ২৪শ অঃ

৩। নাম-ভজন একাধারে সাধ্য ও সাধন কিরূপে ?

"পরমেশ্বরের প্রসাদই সর্ব্বজীবের চরম উপেয় বা সাধ্য। কর্ম্ম ও জ্ঞান সেই উপেয় বা সাধ্যের মুখ্য সাধন নয় ; কেন না, তাহারা উপেয়ের নিকটস্থ হইলেই স্বরূপতঃ লুপ্ত হয়। নাম-সাধনটি সেরূপ নয়। শ্রীনাম পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন ; সুতরাং সাধ্য ও উপেয়রূপে সাধন বা উপায়রূপ নাম স্বয়ংই বর্ত্তমান থাকেন।"

—'নাম-মাহাত্ম্য-সূচনা', হঃ চিঃ

৪। ভগবানের নাম কয় প্রকার ? নাম-সম্বন্ধে মুখ্য ও গৌণ বিচার কি ঠিক ?

"ভগবানের নাম দুই প্রকার—মুখ্য ও গৌণ; জগৎসৃষ্টি হইতে মায়াগুণ অবলম্বনপূর্ব্বক যে-সকল নাম প্রচলিত হইয়াছে, সে সমস্তই গৌণ অর্থাৎ গুণ-সম্বন্ধী; যথা—'সৃষ্টিকর্ত্তা', 'জগৎপাতা', 'বিশ্বনিয়ন্তা', 'বিশ্বপালক', 'পরমাত্মা' প্রভৃতি বহুবিধ গৌণ-নাম। আবার মায়াগুণের ব্যতিরেক সম্বন্ধে 'ব্রহ্ম' প্রভৃতি কয়েকটী নামও গৌণ-নাম-মধ্যে পরিগণিত। এই সমস্ত গৌণ-নামে বহুবিধ ফল থাকিলেও সাক্ষাৎ চিৎফল সহসা উদিত হয় না। ভগবানের চিজ্জগতে যে মায়িক কাল ও দেশের অতীত নামসকল নিত্য বর্ত্তমান, সেই সমস্ত নামই চিন্ময় ও মুখ্য; যথা—'নারায়ণ', 'বাসুদেব', 'জনার্দ্দন', 'হৃষীকেশ', 'হরি', 'অচ্যুত', 'গোবিন্দ', 'গোপাল', 'রাম' ইত্যাদি সমস্তই মুখ্যনাম—এই সমস্ত নাম চিদ্ধামে ভগবৎস্বরূপের সহিত ঐক্যভাবে নিত্য বর্ত্তমান।" —জৈঃ ধঃ ২৩শ অঃ

৫। 'কৃষ্ণ' নামের বৈশিষ্ট্য কেন?

"'কৃষ্ণ'—এই নামটীই তাঁহার প্রেমাকর্ষণ-লক্ষণ পরম সত্তা-বাচক নিত্য নাম।"
—ব্রঃ সং ৫।১

৬। কৃষ্ণের প্রথম পরিচয় কি?

"কৃষ্ণনামই কৃষ্ণের প্রথম পরিচয়। কৃষ্ণপ্রাপ্তি-সঙ্কল্পে জীব কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিবেন।" —চৈঃ শিঃ ৬।৪

৭। নাম কি আভিধানিক শব্দ নহে? জড় জিহ্বায় কি নাম উচ্চারণ হয় না?

"জড়জগতে হরিনামের জন্ম হয় নাই। চিৎকণস্বরূপ জীব শুদ্ধস্বরূপে অবস্থিত হইয়া তাঁহার চিন্ময় শরীরে হরিনাম-উচ্চারণের অধিকারী। জগতে মায়াবদ্ধ হইয়া জড়েন্দ্রিয়ের দ্বারা শুদ্ধনামের উচ্চারণ করিতে পারেন না, কিন্তু হ্লাদিনী-কৃপায় স্ব-স্বরূপের যে সময়ে ক্রিয়া হয়, তখনই তাঁহার নামোদয় হয়। সেই নামোদয়ে মনোবৃত্তিতে শুদ্ধনাম কৃপাপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়া ভক্তের ভক্তিপূত জিহ্বায় নৃত্য করেন। নাম অক্ষরাকৃতি নন, কেবল জড়জিহ্বায় নৃত্য করিবার সময় বর্ণাকারে প্রকাশিত হন—ইহাই নামের রহস্য।" —জৈঃ ধঃ ২৩শ অঃ

৮। যুগে যুগে তারকব্রহ্মনামের বৈচিত্র্য দেখা যায় কেন?

"পূর্ব্ব পূর্ব্ব শাস্ত্রকারেরাও ভগবদ্ভাবের উদয়কাল হইতে এখন পর্য্যন্ত যে-সকল উন্নতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা আলোচনাপূর্ব্বক তারকব্রহ্মনামের যুগে যুগে ভিন্নতা প্রদর্শন করিয়াছেন।" —'উপক্রমণিকা', কৃঃ সং

৯। সত্যযুগের তারকব্রহ্মনাম ও তাঁহার তাৎপর্য্য কি?

"নারায়ণপরা বেদা নারায়ণপরাক্ষরাঃ।
নারায়ণপরা মুক্তির্নারায়ণ পরা গতিঃ॥

— এইটী সত্যযুগের তারকব্রহ্মনাম। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বিজ্ঞানভাষা, মুক্তি ও চরমগতি—এই সমস্ত বিষয়ের আস্পদই শ্রীনারায়ণ। ঐশ্বর্য্যগত পরব্রহ্মের নামই শ্রীনারায়ণ। বৈকুণ্ঠ ও পার্ষদসকল যে বর্ণিত আছে, তাহাতে নারায়ণরূপ ভগবদ্ভাব সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধ হয়। এই অবস্থায় শুদ্ধ শান্তের ও কিয়ৎপরিমাণে দাস্যের উদয় দেখা যায়।"

—'উপক্রমণিকা', কৃঃ সং

১০। ত্রেতাযুগের তারকব্রহ্মনাম ও তাঁহার তাৎপর্য্য কি ?

"রাম নারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন।
কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন॥

এইটী ত্রেতাযুগের তারকব্রহ্মনাম। ইহাতে যে-সকল নামের উল্লেখ আছে, তাহাতে ঐশ্বর্য্যগত নারায়ণের বিবিধ বিক্রমসকল সূচিত হইয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ দাস্যরসপর ও কিয়ৎপরিমাণে সখ্যের আভাস দান করিতেছে।"

—'উপক্রমণিকা', কৃঃ সং

১১। দ্বাপরযুগের তারকব্রহ্মনাম ও তাঁহার তাৎপর্য্য কি ?

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ॥

এইটী দ্বাপরযুগের তারকব্রহ্মনাম। ইহাতে যে-সকল নামের উল্লেখ আছে, তাহাতে নিরাশ্রিত জনের আশ্রয়রূপ কৃষ্ণকে লক্ষ্য করা হয়। ইহাতে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য—এই চারিটী রসের প্রাবল্য দৃষ্ট হয়।"

—'উপক্রমণিকা', কৃঃ সং

১২। কলিযুগের তারকব্রহ্মনাম ও তাঁহার তাৎপর্য্য কি ?

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

এইটী সর্ব্বাপেক্ষা মাধুর্য্যপর নাম-মন্ত্র বলিতে হইবে। ইহাতে প্রার্থনা নাই, মমতাযুক্ত সমস্ত রসের উদ্দীপকতাই ইহাতে দৃষ্ট হয়। ভগবানের কোনপ্রকার বিক্রম বা মুক্তিদাতৃত্বের পরিচয় নাই। কেবল আত্মা যে পরমাত্মা-কর্ত্তৃক কোন অনির্ব্বচনীয় প্রেম-সূত্রে আকৃষ্ট আছেন—ইহাই মাত্র ব্যক্ত আছেন। অতএব মাধুর্য্যরসপর জনগণের সম্বন্ধে এই নামটী একমাত্র মন্ত্রস্বরূপ হইয়াছে। ইহার অনুক্ষণ আলোচনাই একমাত্র উপাসনা। সারগ্রাহি-জনগণের ইজ্যা, ব্রত, অধ্যয়ন ইত্যাদি সমস্ত পারমার্থিক অনুশীলনই এই নামের অনুগত। ইহাতে দেশ-কাল-পাত্রের বিচার নাই। ইহাতে গুরূপদেশ, পুরশ্চরণ ইত্যাদি কিছুরই অপেক্ষা নাই। পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশটী মূলতত্ত্ব অবলম্বনপূর্ব্বক এই নাম-মন্ত্রের আশ্রয়

গ্রহণ করা সারগ্রাহি-জনগণের নিতান্ত কর্ত্তব্য। বিদেশীয় সারগ্রাহি-জনেরা—যাঁহাদের ভাষা ও সাংসারিক আশ্রম ভিন্ন, তাঁহারা এই নামের সমান কোন সাঙ্কেতিক উপাসনা-লিঙ্গ নিজ-নিজ-ভাষায় প্রস্তুত করত অবলম্বন করিতে পারেন অর্থাৎ উপাসনা-কাণ্ডে কোন অসরল বৈজ্ঞানিক বিচার, বৃথা তর্ক বা কোন অন্বয়-ব্যতিরেক-বিচারগত বাদ বা প্রার্থনাদি না থাকে। যদি কোন প্রার্থনা থাকে, তাহা হইলে উহা কেবল প্রেমের উন্নতি-সূচক হইলে দোষ নাই।"

—'উপক্রমণিকা', কৃঃ সং

১৩। মুক্তাবস্থায় হরিনামের কি প্রয়োজন আছে? ঐকান্তিকী নামাশ্রয়া ভক্তি কিরূপে হয়?

"জীবের কৃষ্ণনাম ব্যতীত আর ধন নাই, গতি নাই। শুদ্ধ জীবগণ মুক্ত অবস্থাতে শ্রীবৈকুণ্ঠে সর্ব্বদা হরিনাম গান করিয়া থাকেন। * * অপরাধশূন্য হইয়া হরিনাম না করিলে কখনই নামের একান্ত আশ্রয় লাভ ঘটে না।"

—'নামবলে পাপ-প্রবৃত্তি একটী নামাপরাধ', সঃ তোঃ ৮।৯

১৪। মহাপ্রভুর উপদেশ কি?

"জীবনটি কৃষ্ণনাম-ময় করাই মহাপ্রভুর উপদেশ। কৃষ্ণনাম ব্যতীত এ সংসারে আর কিছুই সত্য বস্তু নাই।" —'শ্রীকৃষ্ণনাম', সঃ তোঃ ১১।৫

১৫। শ্রীমন্মহাপ্রভু কিভাবে জীবোদ্ধার করিয়াছেন?

"কেবলমাত্র কৃষ্ণনাম দিয়া এবং কৃষ্ণনাম বলাইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু জীব উদ্ধার করিয়াছেন।" —'শ্রীকৃষ্ণনাম', সঃ তোঃ ১১।৫

১৬। কিরূপে সর্ব্বসিদ্ধি হয়?

"প্রভু-বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া শ্রীগুরু-কৃপাবলে কৃষ্ণনাম করিতে পারিলেই সকল লাভ হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।"

—'শ্রীকৃষ্ণনাম', সঃ তোঃ ১১।৫

১৭। শ্রীমূর্ত্তির প্রতি অপরাধ কিরূপে বিনষ্ট হয়?

"কৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তি-প্রতি অপরাধ করি'।
নামাশ্রয়ে সেই অপরাধ যায় তরি'॥"

—ভঃ রঃ 'দ্বিতীয় যামসাধন'

১৮। শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি কি জীবের প্রাকৃত দেহ ও ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য?

"জীবের প্রাকৃত দেহ ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্বময় নাম-রূপ-গুণ-লীলা অনুভূত হয় না। কৃষ্ণ কৃপা করিয়া সেই সেই তত্ত্ব জীবের মঙ্গলের জন্য

প্রত্যগ্‌ভাবে এই জগতে উদয় করাইয়াছেন। প্রত্যগ্‌ভাবেই চিত্তত্বের স্বপ্রকাশ ভাব।"　　—'নাম-মাহাত্ম্য-সূচনা', হঃ চিঃ

১৯। নাম কিভাবে রূপ প্রকাশ করেন?

"নামরূপ কলিকা স্বল্প স্ফুট হইতে হইতেই কৃষ্ণাদি মনোহর চিন্ময়-রূপ বিকশিত হয়।"　　—'ভজন-প্রণালী', হঃ চিঃ

২০। নাম কিরূপে গুণ প্রকাশ করেন?

"পুষ্পের সৌরভের ন্যায় স্ফুটিত কলিকায় কৃষ্ণের চতুঃষষ্টি গুণ-সৌরভ অনুভূত হয়।"　　—'ভজন-প্রণালী', হঃ চিঃ

২১। নাম কিরূপে লীলা প্রকাশ করেন?

"নামকুসুম পূর্ণ প্রস্ফুটিত হইলে কৃষ্ণের অষ্টকাল চিন্ময় নিত্য-লীলা প্রকৃতির অতীত হইয়াও জগতে উদিত হন।"　　—'ভজন-প্রণালী', হঃ চিঃ

২২। বিরহ ও সম্ভোগ উভয়কালেই কি হরিনাম আস্বাদ্য?

"বিরহ ও সম্ভোগ, উভয় অবস্থায়ই এইরূপ নাম ভাবনাভেদে নিত্য আস্বাদ্য।"　　—'প্রমাদ', হঃ চিঃ

২৩। গোলোকস্থ ও ভূলোকস্থ কামবীজের পার্থক্য কি?

"গোলোকে যে কামবীজ, তাহা—বিশুদ্ধ চিন্ময় এবং প্রপঞ্চে যে কামবীজ, তাহা—ছায়াশক্তিগত কাল্যাদি-শক্তির কামবীজ।"　　—ব্রঃ সং ৫।৮

২৪। কৃষ্ণের বংশীনাদটি কি?

"কৃষ্ণের মুরলীনাদ—সচ্চিদানন্দময় শব্দবিশেষ; সুতরাং সমস্ত বেদের আদর্শ তাহাতে বর্ত্তমান?"　　ব্রঃ সং ৫।২৭

২৫। ষোল নামের অষ্টযুগ কিরূপে অষ্টকাল-লীলায় শিক্ষাষ্টকের সহিত অনুশীলনীয়?

"হরেকৃষ্ণ ষোল নাম অষ্টযুগ হয়।
অষ্টযুগ অর্থে অষ্ট শ্লোক প্রভু কয়॥
আদি **হরেকৃষ্ণ** অর্থে—অবিদ্যা-দমন।
শ্রদ্ধার সহিত কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন॥
আর **হরেকৃষ্ণ** নাম—কৃষ্ণ সর্ব্বশক্তি।
সাধুসঙ্গে নামাশ্রয়ে **জ্ঞানানুরক্তি**॥
সেইত' ভজনক্রমে সর্ব্বানর্থ নাশ।
অনর্থাপগমে নামে নিষ্ঠার বিকাশ॥
তৃতীয়ে বিশুদ্ধ ভক্ত চরিত্রের সহ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ-নামে **নিষ্ঠা** করে অহরহ॥

চতুর্থেতে অহৈতুকী ভক্তি-উদ্দীপন।
রুচি সহ **হরে হরে** নাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥
পঞ্চমেতে শুদ্ধদাস্য আসক্তি সহিত।
হরেরাম সঙ্কীর্ত্তন স্মরণ বিহিত ॥
ষষ্ঠে **ভাবাঙ্কুরে হরেরামেতি** কীর্ত্তন।
সংসারে অরুচি, কৃষ্ণে রুচি সমর্পণ ॥
সপ্তমে **মধুরাসক্তি** রাধাপদাশ্রয়।
বিপ্রলম্ভে রাম রাম নামের উদয় ॥
অষ্টমে ব্রজেতে অষ্টকাল গোপীভাব।
রাধাকৃষ্ণ প্রেমসেবা প্রয়োজন লাভ ॥"

—ভঃ রঃ প্রথম যামসাধন

২৬। আকর্ষক-বাচক শ্রীকৃষ্ণনামই পরম মুখ্যতম কেন?

"কোন এক বৃহদ্ গুণকে লক্ষ্য করিয়া ভক্তসকল ভগবানের নামকরণ করিয়াছেন। ব্রহ্ম, পরমাত্মা, নারায়ণ প্রভৃতি সকল নামই বৃহদ্-গুণবাচক। ঐ সমুদায় গুণে জীব ও ঈশ্বরের সম্পূর্ণ সম্বন্ধ নিরূপণ হয় না। ভক্তি রাগরূপা এবং জীবেশ্বর এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তিনী সম্বন্ধরূপা অপ্রাকৃত রজ্জুবিশেষ। ইহার দ্বারাই ঈশ্বর-কর্ত্তৃক জীব অনন্তভাবে আকর্ষিত হইতেছেন; অতএব সম্বন্ধ-সূত্রে আকর্ষণই ঈশ্বরের একমাত্র উৎকৃষ্ট প্রকাশ। কৃষ্ণ—আকর্ষণ-শব্দ-বাচক; অতএব উপাসনা-তত্ত্বে জীবের কৃষ্ণের সহিতই কেবল নিত্য-সম্বন্ধ।" —তঃ সূঃ, ৪০ সূঃ

—জগদ্‌গুরু **শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর**

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য—সব জিনিষ ভগবান্ ও ভক্তের সেবায় লাগান। ভক্ত ভোগ করেন না, ভগবানের ভোগ দেন; কিন্তু বোকা লোক তা' বুঝে না। যে মুহূর্ত্তে আমি ভোগ ক'রব বুদ্ধি হয়, তখনই ভক্তি থেকে খারিজ হ'য়ে ব্যাভিচাররত অসৎ হ'য়ে যে'তে হয়। ভোগের দ্রব্য মাঝপথে মেরে নে'বার বুদ্ধি হ'লে সর্ব্বনাশ।

এই সংসার অনিত্য, এখানে কেহ চিরদিন বাস করিতে আসে নাই। ভগবান্ যাঁহাকে যখন যেখানে রাখেন, তিনি তখন অম্লানবদনে সেখানে থাকিয়া ভগবানের

পুরস্কার বা তিরস্কার গ্রহণ করিবেন। ভগবানের যাবতীয় পুরস্কার বা তিরস্কার মঙ্গলের জন্যই বিহিত হয়। ভগবানের মায়াশক্তির পুরস্কারকে আমরা আদর করি, আর তাঁহার তিরস্কারগুলি আমাদিগকে নানাপ্রকার যাতনা দেয়। মায়ার এই দণ্ড ভগবানের কৃপাপ্রসাদ লাভ করিবার উদ্দেশ্যেই বিহিত হয় বলিয়া তাহাও ভক্তগণ অনাদর করেন না, তাহা অম্লানবদনে সহিষ্ণুতার সহিত ভগবৎকৃপা বলিয়া গ্রহণ করেন। যাঁহারা সাংসারিক অমঙ্গলকে ভগবানের দয়া বলিয়া বুঝিতে না পারেন, তাঁহারা পুনরায় জগতের উন্নতি, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি অন্বেষণ করিতে গিয়া পরিশেষে নিষ্ফলতা লাভ করেন।

ভগবানের যেরূপ দরকার, সেইরূপ পোষাকে তাঁ'র কাছে যে'তে হ'বে। তিনি যে-যে-ভাবে আমাকে চান, তাঁ'র যে-যে-ভাবে আমার দ্বারা ইন্দ্রিয়তর্পণ হয়, আমার চিন্ময়-স্বরূপের সেই নির্ম্মলরূপ প্রকাশ ক'রে তাঁ'র কাছে যে'তে হ'বে। চিন্ময় যমুনার জল হ'য়ে, গরুর বাটে দুধ হ'য়ে আমাকে অপ্রাকৃত মদনমোহন কৃষ্ণের সেবা ক'রতে হ'বে।

মহৎ যিনি, তিনি ত' খুব উঁচু ; ক্ষুদ্র, খর্ব্বাকৃতি জীব আমরা তাঁ'র নাগাল পাই না, তাঁ'র মস্তক স্পর্শ ক'রতে পারি না। মহতের সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন প্রদেশ তাঁর পদপল্লব, আবার সেই পদপল্লবের যে ধূলি, যা' তিনি ঝেড়ে ফেলে দিতে পারেন, তাঁ'র দ্বারা যদি আমরা অভিষিক্ত হ'তে পারি—সেই ধূলি-দ্বারা যদি আমাদের মাথার মুকুট প্রস্তুত ক'রে আমরা মহতের সেবারাজ্যে অভিষিক্ত হ'তে পারি, তা' হ'লে আমাদের পরম মঙ্গল লাভ হয়। এতদ্ব্যতীত মঙ্গললাভের আর উপায় নাই।

সকলের একমাত্র প্রভু, একমাত্র ভোক্তা কৃষ্ণ এবং আমি সকলের সেবক ও দাস,—এই কথা সর্ব্বক্ষণ স্মরণ রাখিতে হইবে। যাঁহার যেরূপ ভাক্ত, তাঁহার প্রতি তদনুরূপ সেবা কর্ত্তব্য। প্রত্যেক ব্যক্তি আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা হীনজ্ঞানে মঠবাসী অপর বৈষ্ণবের সেবা করিবেন। ভক্তগণ আমার সেবা করুক—এই দুর্ব্বুদ্ধির হস্ত হইতে পরিত্রাণ না পাইলে আমাদের মঙ্গল নাই।

যিনি বাস্তবিক কৃষ্ণসেবা করেন, তাঁহার সেবা ব্যতীত কখনও মঙ্গল হইবে না। যাঁহারা প্রত্যেক শব্দে কৃষ্ণ দর্শন, প্রত্যেক উচ্চারণে সাক্ষাৎ গৌরসুন্দরের দর্শন না করেন, তাঁহাদের সঙ্গ আমরা করিব না। যদি ভগবানের সেবা প্রকৃতই করিব—এই চিত্তবৃত্তি হয়, তবে ভগবানের সেবার উপকরণরূপে সমগ্র জগৎকে দর্শন করিব।

হরিস্মৃতি সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয়। শ্রবণ হইলে কীর্ত্তন হয়, আবার

কীর্ত্তন হইলে স্মরণ হয়। যখন যখনই আমরা হরিকীর্ত্তন করি, সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের হরিস্মৃতি আসে। স্বাভাবিক রুচি উৎপন্ন হওয়ার নাম আত্মসমর্পণ। আমাদের এখানে আর কোন কাজ নাই—কেবল হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন ছাড়া।

কৃষ্ণ দয়াময়। তিনি পূর্ণবস্তু। তাঁহার দয়াও পূর্ণতা-প্রদানরূপ দয়া। পূর্ণবস্তু প্রদত্ত হইয়া যায় অপূর্ণের নিকট, তাহাতে অপূর্ণ পূর্ণকে অনায়াসে পাইতে পারেন। পূর্ণের নিকট না গেলে পূর্ণ মঙ্গল লাভ ঘটে না। আকর্ষকের কথা কীর্ত্তন করিলে তদনুগ্রহবশে আমরা অতি সহজেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ি। শ্রীবার্ষভানবী সর্ব্বদাই কৃষ্ণনাম করেন, তিনি কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কিছু নহেন।

কীর্ত্তন উচ্চৈঃস্বরেই বিধেয়। মহাপ্রভুর উপদেশ—সর্ব্বদা কীর্ত্তন কর। কৃষ্ণ-উক্তি ব্যতীত অন্য উক্তি শ্রবণরন্ধ্রে প্রবেশ করান উচিত নয়। কায়মনোবাক্যে হরি-কীর্ত্তন বিধেয়। কায়িক কীর্ত্তন, মানসিক কীর্ত্তন ও বাচিক কীর্ত্তন যুগপৎ করিতে হইবে।

আত্মা পরমাত্মার দর্শন পায়, উহার সহিত কথা বলিতে পারে। হরিসেবা-ফলে প্রাকৃত অভিমান-রহিত হইলে জীবের গোলোক-প্রাপ্তি হয়। জীব নিষ্কপট সেবা-ফলে মুক্তগণের, এমন কি, নিত্যমুক্তকুলের সমপর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারেন। তখন এই সংসারের কথা মনে থাকে না।

হরিসেবকগণ মঠে বাস করেন। অবনত-মস্তকে শাসন স্বীকার না করিলে তাহাকে শিষ্য বলা যাইবে না। ভগবৎপ্রসঙ্গ-বিমুখ হইলে জীবের পতন অবশ্যম্ভাবী। বৈষ্ণবসেবা করিতে হইবে, গুরুসেবা করিতে হইবে ও কৃষ্ণের অর্চ্চন করিতে হইবে।

আমরা দুর্ব্বল— সামান্য শক্তিলাভের জন্য আমরা কত যত্ন করি। গৌরসুন্দর ব'লছেন—তৃণাদপি সুনীচ হও, বৃক্ষের ন্যায় সহ্যসম্পন্ন হও, নিজের চেষ্টায় বলবান্ হ'বার দুর্ব্বুদ্ধি না ক'রে যিনি বলপ্রদাতা, সেই বলদেব প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ কর। যাঁ'র বল, তিনি বলদেব প্রভু। কৃষ্ণচন্দ্র বলদেবের অনুগতজন-কর্ত্তৃক সেবিত হ'তে ইচ্ছা করেন। বলদেব প্রভুর অনুগ্রহ ব্যতীত কৃষ্ণসেবা পাবার উপায় নাই। যাঁ'রা বলদেব প্রভুর সেবক হ'তে পারেন, তাঁরাই প্রকৃত-পক্ষে বলবান্ হ'ন। আমরা যদি অন্য কার্য্যে নিযুক্ত হ'য়ে যাই, তা' হ'লে বলদেব প্রভুর সেবা করবার পরিবর্ত্তে আমরা নিজেদের সেবাপ্রার্থী হ'য়ে যাই।

ভগবান্ বলেন,—এত দুঃখ-কষ্ট, বিপদ্-আপদ্ সাজিয়ে রেখেছি তোমাদিগকে দুঃখ দিবার জন্য নহে, পরন্তু দুঃখ যে অপ্রয়োজনীয়—ইহা শিক্ষা দিবার জন্য, নিত্য প্রার্থনীয় সুখ, নিত্য বরণীয় আনন্দ অনুসন্ধানের জন্য।

———

শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৫শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৫৪ পৃষ্ঠার পর]

তখন বিপ্রের জ্ঞানী পুত্র গোকর্ণ আসিয়া বৈরাগ্য-পথে পিতার জ্ঞানোদয় করাইয়া বলিতে লাগিলেন,—হে পিতঃ! **অসার সংসার—মোহের আগার, এখানে সুখের লেশমাত্র নাই, দুঃখই সার মাত্র।** কাহার পুত্র, কাহার ধন?—সবই মায়াময়। মায়া ও স্নেহাসক্ত ব্যক্তির চির অশান্তি লাভ হইয়া থাকে। হে পিতঃ! দেবরাজ ইন্দ্রেরও সুখলেশ নাই, রাজ-চক্রবর্ত্তীরও তাহাই জানিবেন। সাধুসঙ্গে রত বিরক্ত মুনিগণই শান্তিলাভ করেন। এক্ষণে পুত্রবুদ্ধিরূপ অজ্ঞানতা পরিত্যাগ করুন, মোহবশে নরকই লাভ হয়। এ জড়দেহের অবশ্যই পতন হইবে, অতএব সকল পরিহারপূর্ব্বক হরিভজনার্থ বনে গমন করুন। পুত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া আত্মদেবের বন-গমনে ইচ্ছা হইল। তিনি পুত্রকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে তাত! বনে গমন করিবার পর আমার কি কর্ত্তব্য, সেই তত্ত্বকথা বিস্তৃতভাবে আমার নিকট বর্ণনা কর। গৃহরূপ অন্ধকূপে জড় স্নেহপাশে বদ্ধ হইয়া আমি পঙ্গু হইয়া রহিয়াছি। স্বীয় কর্ম্মফলেই আমি এইরূপ পতিত হইয়াছি। হে পুত্র! আমার উদ্ধারের উপায় চিন্তা কর।

গোকর্ণ কহিলেন,—পিতঃ! অস্থি-মাংস-রুধিরময় এই জড়দেহে বৃথা অভিমান পরিত্যাগ করুন; দারা-পুত্র ইত্যাদিতে সর্ব্বদা মমতা বর্জ্জন করুন। এই বিশ্ব ক্ষণভঙ্গুর—ইহা সদা চিন্তা করুন এবং বৈরাগ্যানুরাগে চিত্ত রঞ্জিত করিয়া ভক্তিরসে কৃষ্ণপ্রেমে বিগলিত হউন। সর্ব্বদা ভাগবত-ধর্ম্মের ভজন ও যাজন করুন এবং কাম্য-কর্ম্মাদি লোকধর্ম্ম অনুক্ষণ পরিবর্জ্জনে আগ্রহবিশিষ্ট হউন। সাধুসেবাদ্বারা কাম-তৃষ্ণা নিবারণ করুন এবং অযথা অপরের দোষ-গুণ বিচার পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণসেবা-কথারূপ ভাগবত-রস নিয়ত পান করিতে থাকুন। পুত্রের মুখে সুদুর্ল্লভ উপদেশ লাভ করিয়া ষষ্টিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে সেই বিপ্র গৃহত্যাগপূর্ব্বক বনে গমন করিলেন। নিয়মিতভাবে কৃষ্ণসেবাযুক্ত হইয়া দ্বাদশস্কন্ধ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠদ্বারা অন্তিমে তিনি পরম ধন শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম লাভ করিলেন।

ব্রাহ্মণ আত্মদেব বনগমনপূর্ব্বক লোকান্তরিত হইলে ধুন্ধুকারী তাহার মাতাকে প্রায়ই তাড়ন-ভৎর্সন ও প্রহার করিতে লাগিল। সে মাতাকে বলিল,—কোথায় ধন লুক্কায়িত আছে, শীঘ্র আমাকে বল, নচেৎ লাথি মারিয়া, তোমায় হত্যা করিয়া আমি উহা লইব। পুত্রের ব্যবহারে চিরকাল দুঃখ পাইয়া এখন তাহার

বাক্যে ভীতা হইয়া মাতা ধুন্ধুলী রাত্রে কূপে পতিত হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। এদিকে গোকর্ণও ভক্তিযোগ অবলম্বনপূর্ব্বক তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইলেন—তাঁহার সুখ-দুঃখ, শত্রু-মিত্রাদি জ্ঞান ছিল না। ক্রূরকর্ম্মা হতবুদ্ধি ধুন্ধুকারীও সুযোগ বুঝিয়া পঞ্চ কুলটা-সঙ্গে সেই গৃহে কালযাপন করিতে লাগিল। একদা সেই বেশ্যাগণ লোভবশতঃ ধুন্ধুকারীর নিকট স্বর্ণাদি অলঙ্কার প্রার্থনা করিলে সেই কামান্ধ মৃত্যুভয়ে ভীত না হইয়া কোথা হইতে ধনরাশি ও বহুমূল্য বস্ত্রাদি লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক উহার আংশিক প্রদান করিল। তাহা দেখিয়া সেই বারাঙ্গনাগণ গভীর রাত্রে মন্ত্রণা করিতে লাগিল,—প্রতিদিন এই পাষণ্ড চৌর্য্যবৃত্তিদ্বারা এসকল আনয়ন করে। কোন্‌দিন রাজা ইহাকে ধরিয়া দণ্ড দিবেন বা পথে ইহার সকল ধন লুণ্ঠন করিয়া ইহাকে অন্যে মারিয়া ফেলিবে। সুতরাং ইহাকে গোপনে হত্যা করিয়া ইহার সকল ধন আমরাই অপহরণ করিব এবং যেখানে হউক পলাইয়া যাইব—একথা যেন কেহ জানিতে না পারে। এইরূপে কৃতনিশ্চয় হইয়া তাহারা নিদ্রিত ধুন্ধুকারীর হস্ত-পদাদি বন্ধনপূর্ব্বক তাহার গলদেশে দড়ির ফাঁস দিয়া প্রাণপণ টানিতে লাগিল। কিন্তু সত্বর তাহার মৃত্যু হইতেছে না দেখিয়া চিন্তাযুক্ত হইয়া তাহার মুখে জলন্ত অঙ্গারসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। গলে ফাঁস ও অগ্নি-জ্বালায় কিষ্ট হইয়া সে অবশেষে নিধন প্রাপ্ত হইল। তাহার মৃতদেহ লইয়া সেই দুষ্টা রমণীগণ গৃহাভ্যন্তরে গর্ত্ত করিয়া তাহাকে প্রোথিত করিল। তাহার মৃত্যু-রহস্য কেহ জানিতে পারিল না। কেহ ধুন্ধুকারীর সম্বন্ধে ঐ বারবণিতাগণকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিত,—আমাদের প্রিয়তম অর্থলিপ্সু হইয়া বহু দূরদেশে গিয়াছেন। তিনি প্রচুর অর্থ লইয়া বর্ষান্তে এখানে ফিরিবেন। দুষ্টা স্ত্রীগণের বাক্যে পণ্ডিতগণ কখনই বিশ্বাস স্থাপন করেন না। যে মূঢ় উহাদিগকে বিশ্বাস করে, তাহার দুঃখই লাভ হয়। অসতী নারীর মুখে সদাই সুধাময়ী বাণী, সে রসালাপে বিশেষ দক্ষা; তাহার হৃদয় ক্ষুরধার-সম; এই সংসারে কেহই তাহার প্রিয় নয়, সেও কাহারও প্রেমে বদ্ধ হয় না। যথাকালে ধন-রত্ন-বস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া সেই পুংশ্চলীগণ পলায়ন করিল।

ধুন্ধুকারীও আজীবন কুসঙ্গে কুকর্ম্মরত হওয়ার পরিণামে মহাপ্রেত-যোনি লাভ করিল। সে বায়ুভূত নিরাশ্রয়-অবস্থায় চতুর্দ্দিকে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে লাগিল; ক্ষুধা-তৃষ্ণা-শীতাতপে পরিক্লিষ্ট হইয়া কোথাও আশ্রয় না পাইয়া সদা হা-হুতাশ করিতে থাকিল। তীর্থে অবস্থানকালে গোকর্ণ ইহা শ্রবণ করত ভ্রাতাকে অনাথ জানিয়া গয়াদি বিভিন্ন তীর্থে বিধিমত ধুন্ধুকারীর প্রেতশ্রাদ্ধ সমাপন করিলেন। এইরূপে তীর্থযাত্রার পর তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক নিজালয়ে উপস্থিত

হইলেন। রাত্রে তাঁহার নিদ্রাকালে অলক্ষিতে গৃহ-প্রাঙ্গণে প্রেতযোনি-প্রাপ্ত ধুন্ধুকারী উপস্থিত হইয়া তাহার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিসকল দেখাইতে লাগিল। সে কখনও মেষ, কখনও মহিষের আকার ধারণ করিল, আবার কখনও ইন্দ্র, অগ্নি, পুরুষাদির রূপ ধারণ করিল। এই অসম্ভব রূপাদি দেখিয়া গোকর্ণ ইহাকে অপ্রাপ্তগতি কেহ মনে করিয়া ধৈর্য্যধারণপূর্ব্বক সদয় হইয়া সেই অশরীরীকে বলিতে লাগিলেন,—এই গভীর রাত্রিকালে উগ্রমূর্ত্তিধারী তুমি কে আগমন করিয়াছ, তোমার এইরূপ দশা কিরূপে হইল? তুমি প্রেত, পিশাচ অথবা রাক্ষস—কে, আমাকে তোমার পরিচয় প্রদান কর। গোকর্ণের এইরূপ প্রশ্ন শুনিয়া সেই প্রেত উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। তাহার কথা বলিবার সামর্থ্য না থাকায় সে পুনঃ পুনঃ আকার-ইঙ্গিতে তাহার দুঃখের বিষয় জানাইতে লাগিল। গোকর্ণ তাহার কষ্ট বুঝিতে পারিয়া অঞ্জলিতে জল গ্রহণপূর্ব্বক উহা মন্ত্রপূত করিয়া প্রেতের গাত্রে সিঞ্চন করিলে নিষ্পাপ হইয়া সে সকল কথা বিস্তারিতভাবে বলিতে আরম্ভ করিল,—

আমি তোমার ভ্রাতা ধুন্ধুকারী; স্বকীয় কর্ম্মদোষে ব্রাহ্মণত্ব হারাইয়াছি। মহামোহে অন্ধ হইয়া আমি যে কত কুকর্ম্ম করিয়াছি, তাহার গণনা কে করিবে? দুর্ম্মতি আমি সর্ব্বদা লোক-হিংসায় রত ছিলাম; অবশেষে বারাঙ্গণাগণ আমাকে অশেষ যন্ত্রণা দিয়া বধ করায় আমি এই প্রেতত্ব দশা বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছি —দৈবাধীন বাতাহারী হইয়া আমার কৃত কুকর্ম্মফল ভোগ করিতেছি। গোকর্ণ বলিলেন,—আমি তোমার উদ্দেশ্যে যথারীতি গয়ায় পিণ্ডাদি প্রদান সত্ত্বেও তুমি মুক্ত হও নাই দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি। গয়াশ্রাদ্ধে যদি তোমার সদ্গতি না হয়, তবে আর কি-প্রকারে হইবে?—আমার অন্য কোন বিধি-বিধান জানা নাই। অতএব হে প্রেত, আমাকে এখন আর কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা বিস্তারিত বল। প্রেত কহিল,—**শতবার গয়াশ্রাদ্ধেও আমার মুক্তি সম্ভব নয়,** কিরূপে আমি উদ্ধার পাইব? তুমিই আমার উদ্ধারের নিমিত্ত অন্য কোন উপায় সম্প্রতি চিন্তা কর। প্রেতের এইরূপ বাক্যে গোকর্ণ অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন,—শতশ্রাদ্ধে যাহার মুক্তি হইবে না, তাহার উদ্ধার-চেষ্টা বৃথা পণ্ডশ্রম মাত্র। তখন সেই প্রেতকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—তুমি এক্ষণে স্বস্থানে নির্ভয়ে অবস্থান কর, যাহাতে শীঘ্রই তোমার মুক্তি হয়, আমি চিন্তা করিয়া তাহার ব্যবস্থা করিতেছি। গোকর্ণের আদেশে ধুন্ধুকারী নিজস্থানে যাইয়া স্বীয় মুক্তি-কামনায় গভীর প্রতীক্ষায় রহিল।

এদিকে সারারাত্রি জাগরণপূর্ব্বক বহু চিন্তা করিয়াও গোকর্ণ সেই প্রেতের মুক্তির কোন নূতন উপায় খুঁজিয়া পাইলেন না। প্রাতঃকালে স্থানীয় লোকসকল

প্রীতি-সম্ভাষণের নিমিত্ত তাঁহার নিকট আসিতে লাগিলেন। গোকর্ণ তাঁহাদিগের নিকট রাত্রিকালে প্রেতের সহিত কথোপকথন বৃত্তান্ত-সকল বিবৃত করিলেন। পণ্ডিত, যোগী, জ্ঞানী, ব্রহ্মবাদী সকলে শাস্ত্রাদি আলোচনা করিয়াও প্রেতের মুক্তি-বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলেন না। অবশেষে সকলে মিলিয়া স্থির করিলেন,—সূর্য্যবাক্যই এ বিষয়ে একমাত্র প্রামাণ্য। তখন গোকর্ণ মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্ব্বক সূর্য্যদেবের গতিবেগ স্তম্ভণ করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া জানাইলেন,—হে দেব! জগৎসাক্ষিন্! আপনাকে প্রণাম করি। আমার ভ্রাতার মুক্তির পন্থা কৃপাপূর্ব্বক আমায় বলুন। তখন সূর্য্যদেব দূর হইতে সুস্পষ্ট ভাষায় গোকর্ণকে বলিলেন,—**সাতদিন শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণে মুক্তি হইবে, তুমি সপ্তাহ-পারায়ণের অনুষ্ঠান কর।**

সূর্য্যদেবের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া গোকর্ণ ইহা সহজ পন্থা জানিয়া আষাঢ়ীয় শুক্লা নবমী-তিথিতে সপ্তাহকাল যাবৎ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের অনুষ্ঠান করিলেন। নানা দেশ, গ্রাম হইতে পঙ্গু, অন্ধ, বৃদ্ধ, পাপী সকলে ভাগবত-কথা শ্রবণের নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হইলেন। এইরূপে তথায় সুমহান সম্মেলন দেবতাগণেরও বিস্ময়োৎপাদন করিল। গোকর্ণ যখন স্বীয় আসনে উপবেশনপূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবত-কথা আরম্ভ করিলেন, তখন সেই প্রেত-শরীরধারী ধুন্ধুকারীও সভায় উপস্থিত হইয়া ইতঃস্তত স্থান অন্বেষণ করিতে লাগিল। তথায় সপ্তগ্রন্থিযুক্ত উচ্চ বংশদণ্ড দেখিয়া তাহার মূল ছিদ্রে প্রবেশপূর্ব্বক ভাগবত শ্রবণ করিতে লাগিল। বায়ুভূত-নিরাশ্রয়-অবস্থায় তাহার শ্রবণে অসমর্থতাহেতু সে ঐ বংশদণ্ড আশ্রয় করিয়াছিল। বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠ শ্রোতৃমণ্ডলী-মণ্ডিত সেই মহতী সভায় গোকর্ণ ভাগবত-কথা প্রথম স্কন্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া দিবাশেষ পর্য্যন্ত যথাসম্ভব আলোচনা করিবার পর এক বিচিত্র ঘটনা ঘটিল। ঐ প্রেত যে বংশদণ্ড আশ্রয় করিয়া ছিল, তাহার একটী গ্রন্থি সশব্দে ফাটিয়া গেল,—সভাস্থ সজ্জনমণ্ডলী সকলেই ইহা নিরীক্ষণ করিলেন। দ্বিতীয় দিবসে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পাঠ হইলে বংশের ২য় গ্রন্থি, তৃতীয় দিবসে ঐরূপে ৩য় গ্রন্থি এবং সপ্তাহশেষে সেই বংশদণ্ডের সপ্তগ্রন্থি ভেদ হইল। এক সপ্তাহে দ্বাদশ স্কন্ধ শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়া প্রেতের প্রেতত্ব ঘুচিল।

তখন সেই প্রেত তুলসীমালা-মণ্ডিত, পীতবাস-পরিহিত, ঘনশ্যামবর্ণ, মুকুট-শোভিত, কুণ্ডলাশ্রিত হইয়া দিব্যরূপ ধারণপূর্ব্বক গোকর্ণকে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিল,—হে পরম বান্ধব! তুমি ভাগবত শ্রবণ করাইয়া আমাকে প্রেত-পাপ-জ্বালা হইতে উদ্ধার করিলে। এই প্রেত-পীড়া-বিনাশিনী ভাগবত-কথা সংসার মাঝে ধন্যা; তদপেক্ষা ধন্য এই সপ্তাহ-পারায়ণ-বিধি—যাহা কৃষ্ণলোক-প্রাপক। ভাগবত

এক সপ্তাহ শ্রবণ করিলে পাপীর দেহে পাপসকল কম্পিত হইয়া অচিরেই বিনষ্ট হয়। আর্দ্র, শুষ্ক, লঘু, স্থূল যত পাপ কায়মনোবাক্যে কৃত হয়, সে-সকল প্রকার পাপই ভাগবত-কথা-শ্রবণে অগ্নিতে সমিধ্ ভস্মরাশির ন্যায় দগ্ধ হয়। এই ভারতবর্ষে বেদ-সভায় পণ্ডিত সজ্জনগণ স্পষ্ট করিয়া ইহার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

এই ভাগবতী বাণী যে-মানব শ্রবণ করে না, তাহার জন্ম ও জীবন নিষ্ফল; মোহ-পরবশ হইয়া তাহার বলবান্ ও পুষ্টিমান শরীর ধারণের কি ফল? ভাগবত-শাস্ত্র-কথা বিনা তাহার শরীর ধারণ বৃথা; মাংস-শোণিত-চর্ম্মাবৃত অস্থিস্তম্ভ, স্নায়ুবদ্ধ দেহভার, পুতিগন্ধময় মূত্র-পুরীষ-দ্বার-বিশিষ্ট তাহার শরীর রোগ-মন্দির-বিশেষ। জরা-শোক-বিপাকাদিতে অতিশয় আর্ত্ত ও আতুর, দুষ্পূর, দুর্দ্ধর দেহ দুষ্ট, সদোষ এবং ক্ষণস্থায়ী। 'শরীর' বলিয়া যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা কৃমি-বিষ্ঠা-ভস্মের পরিণাম ভিন্ন আর কিছু নয়। যে অনিত্য কর্ম্মে এই জড়দেহ সদাই অস্থির, তাহার বিনিময়ে যদি চিরস্থায়ী ফল লাভ করিতে পারা যায়, তাহার সাধনে কেন বিরত হইব? প্রাতঃকালে সংস্কৃত উত্তম অন্নও সন্ধ্যাকালে পর্য্যুসিত হইয়া নষ্ট হয়; সেই অন্নরসে পুষ্ট দেহের কি নিত্যতা থাকিতে পারে? এই অনিত্য সংসারে সপ্তাহ ভাগবত-শ্রবণদ্বারা নিত্যসত্য শ্রীহরিকে অচিরেই লাভ করা যায়—সর্ব্বদোষ নিবারণে ইহাই একমাত্র সাধন। জীবমধ্যে যেরূপ মশকশ্রেণী এবং জলমধ্যে যেরূপ বুদ্বুদ মুহূর্ত্তে লীন হয়, তদ্রূপ ভাগবত-কথা-বিহীন মানব মরণের নিমিত্তই জন্মলাভ করে। ভাগবত-কথায় যদি শুষ্ক বংশদণ্ডের গ্রন্থি ফাটিতে পারে, তবে ইহাদ্বারা চিত্তগ্রন্থি ভেদ হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ভাগবত-কথা-শ্রবণে চিত্তগ্রন্থি ভেদ হয়, সকল সংশয় ছিন্ন এবং সর্ব্বকর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই ভাগবতী বাণী সংসার-কর্দ্দম-লিপ্ত ব্যক্তির অঙ্গ বিধৌত করিয়া তাহাকে পরিশুদ্ধ করিতে সমর্থ; ইহাতেই যাহার চিত্ত স্থির হইয়াছে তিনি শ্রীহরির পাদপদ্ম লাভরূপ মুক্তি-পদবাচ্য।

ধুন্ধুকারী-প্রেত শরীর পরিত্যাগপূর্ব্বক দিব্যদেহ ধারণ করিয়া এইরূপ কথা বলিতে লাগিলে আকাশমার্গে বৈকুণ্ঠ-পার্ষদযুক্ত স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময় এক বিমান উপস্থিত হইল। ধুন্ধুলী-সুত ধুন্ধুকারী সেই বিমানে আরোহণ করিলে তাহাতে অবস্থিত বিষ্ণুপার্ষদ বৈষ্ণবগণকে লক্ষ্য করিয়া গোকর্ণ বলিতে লাগিলেন,—এ স্থানে সরল নির্ম্মল চিত্তযুক্ত আমার বহু শ্রোতৃমণ্ডলী রহিয়াছেন, যুগপৎ তাঁহাদের জন্য রথ আসিল না কেন? তাঁহারা সকলেই সমভাবে ভাগবত-কথামৃত শ্রবণ করিয়াছেন; হে হরিপ্রিয়গণ! বলুন, তবে ইহাতে এত ফলভেদ কেন হইল?

বিমানারূঢ় হরিদাসগণ প্রত্যুত্তরে বলিতে লাগিলেন,—শ্রবণভেদেই এইরূপ ফল-

ভেদ উপস্থিত হইয়াছে। সকলেই সমভাবে শ্রবণ করিলেও একভাবে মনন করেন নাই। হে মানদ! আর ভজনভেদেও ফলভেদ দৃষ্ট হয়। সপ্তরাত্র উপবাস-পূর্ব্বক এই প্রেত একমনে ভাগবত শ্রবণ করিয়াছে। সুতরাং স্থিরচিত্তে উহা মনন করায় সে উত্তম ফল পাইয়াছে। সুতরাং দৃঢ়চিত্তে শ্রবণ না করিলে জ্ঞান হত হয় এবং প্রমাদে (অনবধানে) শ্রবণের ফল নষ্ট হয়। সন্দিগ্ধ ব্যক্তির মন্ত্র নষ্ট হয় এবং ব্যগ্রচিত্ত হইলে জপে বিঘ্ন ঘটে। বৈষ্ণব-বিহীন দেশ নষ্ট হয় ও অপাত্রে শ্রাদ্ধের দান বৃথা হইয়া থাকে। বেদজ্ঞানবিহীন ব্যক্তিকে যেরূপ দান করা অনর্থকর, সেইরূপ অনাচারী ব্যক্তির দ্বারাও কুল নষ্ট হয়। অতএব সদ্‌গুরু-বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন ও নিজের নিষ্কিঞ্চন দীনভাবে জীবন-যাপন কর্ত্তব্য। ভগবৎ-কথায় মতি নিশ্চলা হইলে নিজ-মনের দোষসকল জয় করা যায়। এইরূপে সকলকর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারিলে তখন ভাগবত-শ্রবণের ফল লাভ হইবে। এইরূপ নিয়মে পুনরায় ভাগবত-কথা শ্রবণ করিলে সকল শ্রোতাই বৈকুণ্ঠে স্থান লাভ করিবেন। হে গোকর্ণ! স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগোবিন্দ আপনাকে গোলোকে স্থান দিবেন—এই বলিয়া হরিকীর্ত্তনরত তাঁহারা বৈকুণ্ঠ-ভবনে গমন করিলেন।

নিখিল সদ্‌গুণাধার গোকর্ণও শ্রাবণ মাসের শুক্লা-নবমী-তিথিতে পুনরায় ভাগবত-কথা-কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। সেই সকল পূর্ব্বশ্রোতা সপ্তরাত্রি যাবৎ পুনঃ শ্রবণ করিবার পর অপূর্ব্ব ব্যাপার সংঘটিত হইল। ভক্তগণ-সঙ্গে স্বয়ং হরি বিমানারূঢ় হইয়া তথায় আবির্ভূত হইলেন। 'জয়' ও 'নমঃ' শব্দে সেইস্থান পরিপূরিত হইল, স্বয়ং ভগবান্ হর্ষভরে নিজের পাঞ্চজন্য-শঙ্খধ্বনি করিলেন। গোকর্ণকে গাঢ় আলিঙ্গনদ্বারা হরি তাঁহার সারূপ্য প্রদান এবং সকল শ্রোতৃবর্গকে ক্ষণকাল মধ্যে ঘনশ্যামরূপে, পীতাম্বর, কিরীট-কুণ্ডলে ভূষিত করিলেন। সেইগ্রামে কুক্কুর-চণ্ডালাদি যত জীব ছিল, সকলেই হরিপ্রিয় গোকর্ণের কৃপায় দিব্য বিমানে আরোহণ করিল। তাহারা সকলেই হরিলোক বৈকুণ্ঠে প্রেরিত হইল; কিন্তু গোপবল্লভ গোপাল শ্রীকৃষ্ণ গোকর্ণের সহিত স্বীয় গোলোক-ধামে উপস্থিত হইলেন। ভক্তবৎসল হরি স্ব-স্বরূপ-ভূত ভাগবত-কথায় পরিতুষ্ট হইয়া সদাই ভক্তস্থানে গমন করিয়া থাকেন। অযোধ্যা-বাসিগণ পূর্ব্বে শ্রীরামাবতারে তৎকর্ত্তৃক বৈকুণ্ঠধামে এইরূপ নীত হইয়াছিলেন। সিদ্ধমুনিগণ-দুর্ল্লভ, চন্দ্র-সূর্য্যেরও দুষ্প্রাপ্য এই গোলোকধাম শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের ফলেই লাভ করা যায়।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

গোসাইগাঁও, আসাম নিবাসী টি, কে, রায় মহাশয় তাঁহার প্রেরিত প্রশ্নগুলির উত্তর চাহিয়াছেন। প্রশ্নগুলি :—

(১) বিজ্ঞানের দরবারে আজ এটা পরিক্ষিত সত্য যে সূর্য একটা জলন্ত অগ্নিপিণ্ড, দাও দাও করে আগুন জলছে এবং তাতে কোন প্রাণের স্পন্দন নেই। তাহলে শাস্ত্রে আছে সূর্য নাকি রথ নিয়ে পরিভ্রমণ করে এবং সূর্যপুত্র কর্ণ, যম ইত্যাদি, এটা কি করে সম্ভব। এটা কি ঋষিদের কাল্পনিক কাহিনি।

(২) চৈতন্য চরিতামৃতের আদিলিলায় আছে যে পৃথিবী নাকি অনন্তনাগের মস্তকের উপর সর্ষের দানার মত অবস্থান করে। কিন্তু এটা আজ পৃথিবীর সবাই জানে যে পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে ভীষণ বেগে ঘুরে চলছে। তাহলে এটা অনন্তনাগের মাথায় থাকে কি করে?

(৩) আত্মা নিয়ে সারা পৃথিবীতে বিতর্ক এবং নানা জনের নানা মত। স্বামী অভেদানন্দ তার মরণের পারে (Beond death) গ্রন্থে লিখেছে যে আত্মার নাকি Photo তোলা যায়। আত্মা একটা বায়বিয় পদার্থ। তার ওজন 1 আউন্স ওজনের $\frac{3}{4}$ ভাগ। তিব্বতি মতে আত্মা দেখতে ১টা ভুট্টার দানার মত। আত্মার যদি সত্যই বাস্তব অস্তিত্ব থাকে তাহলে তার স্বরূপ একই হবে এত বিতর্ক কেন। ভারতিয় যুক্তিবাদি বিজ্ঞান সমিতির President প্রবীর ঘোষ চ্যালেঞ্জ করেছে যে আত্মার কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই (অলৌকিক নয় লৌকিক গ্রন্থে ১ম খণ্ড) যে আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণিত করতে পারবে তাকে 50000/- হাজার পুরস্কার দিবে এবং বিজ্ঞান সমিতি ভেঙ্গে দিবে। আজ পর্যন্ত কেউ যুক্তি দিয়ে বা বাস্তব প্রমাণ দিয়ে আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণিত করতে পারে নাই। আমি প্রবির ঘোষের ঠিকানা দিলাম কেউ যুক্তি দিয়ে বা প্রমাণ দিয়ে আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্টা করতে পারে।

(৪) স্বর্গ ও নরকের অস্তিত্বের কথা আমরা বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে পাই। এর কি সত্যই বাস্তব অস্তিত্ব আছে? নাকি শুধুই কল্পনায় আছে?

(৫) বিজ্ঞানের মতে প্রায় 500 কোটি বৎসর আগে সূর্য থেকে একটা অংশ ছিটকে এসে আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে পৃথিবীর সৃষ্টি হলো। জলের ভীতর প্রথম প্রাণের স্পন্দন দেখা দিলো cell বা এককোটি প্রাণী। তার থেকে বিবর্তন বাদের (ডারউইন) মধ্যে দিয়ে আজকের পৃথিবীর সৃষ্টি। শাস্ত্রমতে কৃষ্ণের

প্রতিনিধি ব্রহ্মার সৃষ্টি। বিজ্ঞান যেটা বলছে তার বাস্তব অস্তিত্ব আছে কিন্তু শাস্ত্রমতের কোন প্রমাণ নাই। কোনটা ঠিক?

(৬) কর্ম অনুযায়ি নাকি পরবর্ত্তী জন্ম নির্ধারিত হয়। তাই যদি হয় তাহলে সৃষ্টির প্রথমে **শাস্ত্রমতো** বিভিন্ন জন্ম কি করে পেলো। কেউ মানব জন্ম, কেউ পক্ষিজন্ম, কেউ পশুজন্ম। তখন তো কেউ পূর্ব্বজন্মের কর্মফলের প্রশ্নই উঠে না।

.....

মাননীয় রায় মহাশয়!

আপনি যে প্রশ্ন কয়টী পাঠাইয়াছেন, তাহার উত্তর দিয়া দুর্ল্লভ জন্মের হরি-ভজনের সময়টুকু নষ্ট করিবার মত ইচ্ছা না থাকিলেও আপনার কল্যাণ কামনায় কিছু মন্তব্য প্রকাশ করিতেছি। আপনি নিজে মহাভারত শাস্ত্রে বিশ্বাসী কিনা তাহা জানি না। ব্যাসদেব সম্বন্ধেও আপনার কিরূপ ধারণা তাহা আমার অজ্ঞাত। যদিও পৃথিবীর প্রায় সমগ্র দেশে মহাভারতোক্ত শ্রীকৃষ্ণকে এবং তাঁহার লীলাসঙ্গী পাণ্ডবাদিকে মিথ্যা ও কল্পনা বলেন না। আপনি অধুনা প্রকাশিত বিজ্ঞানী এবং মূর্খ ব্যক্তিগণের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য প্রশ্নগুলি সাধুদিগের প্রতি নিক্ষেপ করিয়া থাকিলে দুঃখিত।

আপনি নিশ্চয়ই জানেন—আপনার বহুমান্য বিজ্ঞানিগণ অধিকাংশক্ষেত্রেই তাঁহাদের পূর্ব্ব সিদ্ধান্তের পরিবর্ত্তন স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এরূপ অস্থিরসিদ্ধান্ত ও চপলমতিদিগের উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারেন না। তবে যেটুকু শাস্ত্র এবং সত্যদ্রষ্টা ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষ ও ভগবদবতারদিগের বাক্যের সহিত বিরোধী নহে, তাহাকে অস্বীকার করেন না। আপনার প্রশ্নগুলি অর্দ্ধকুক্কুটী ন্যায়ানুগ বলিয়া গ্রাহ্য হয় না। আপনি মহাভারতকে মিথ্যা বলিতে চাহেন না, কিন্তু তাহাতে বর্ণিত অলৌকিকতায় অবিশ্বাসী। আপনি শ্রীকৃষ্ণ, ভীষ্ম, যুধিষ্ঠিরাদি পুরুষদিগকে মিথ্যা বলেন নাই, পরন্তু তাঁহাদের সম্বন্ধীয় অলৌকিকতাকে মিথ্যা বলিতেছেন। আপনি ভীষ্মকে স্বীকার করেন, কিন্তু গঙ্গাদেবী তাঁহার মাতা—ইহা স্বীকার করেন না। আপনার মতে ব্যাসদেব মিথ্যাবাদী। অতএব আপনি সত্যদ্রষ্টা হিসাবে অনুগ্রহপূর্ব্বক ভীষ্মের প্রকৃত মাতার নামটি জানাইলে বাধিত হইব। শান্তনু রাজা ভীষ্মের পিতা—ইহাতে আপনার আপত্তি নাই। একই প্রকারে পঞ্চপাণ্ডবকে আপনার স্বীকারোক্তি থাকিলেও তাঁহাদের জন্ম-রহস্যটী আপনার বিশ্বাসনীয় নহে। আপনি স্বর্গলোকই যখন স্বীকার করিতে অপরাগ, তখন তল্লোকবাসী

দেবতাগণও আপনার অস্বীকার্য্য হইয়া পড়ে। তাঁহাদের অলৌকিক ক্ষমতাও সেই কারণে অবিশ্বাস্য। আপনি ব্রহ্মাণ্ড ও তাহার অন্তর্গত চতুর্দ্দশ লোকও কখনই সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন না। আপনি গঙ্গাদেবীকে যেরূপ জলরাশি বা নদী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তদ্রূপ সূর্য্যকেও জলন্ত অগ্নিপিণ্ড বলিয়াছেন, তাঁহাকে সূর্য্যদেব বলিলে কল্পনা করা বলিয়া জ্ঞান করেন। আপনি জীবের আত্মাকে স্বচক্ষে দর্শন না করিয়াও আপনার চপলমতি বিজ্ঞানীকে বিশ্বাস করিয়াছেন। আপনার উচিত ঐ চপলমতি বিজ্ঞানীকে লইয়া সর্ব্বসমক্ষে তাঁহার আবিষ্কারের সত্যতা প্রমাণ করা। কাহারও পাগলামিকে সকলেই স্বীকার করেন না। আপনি ও আপনার বহুমান্য বিজ্ঞানী সৃষ্টি-তত্ত্ব সম্বন্ধে হাবুডুবু খাইতেছেন। আদার ব্যাপারী জাহাজের খবর লইতে গেলে—এইরূপই অবস্থা ঘটে।

আপনি নিশ্চয়ই আপনার পিতা এবং পূর্ব্বপুরুষগণকে মিথ্যা বলেন না। অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনারা আপনাদের পূর্ব্বপুরুষগণের নাম, জীবিতকাল এবং ক্রিয়াকলাপাদি প্রকাশ করত জনসমাজে সুখ্যাতি অর্জ্জন করুন। শাস্ত্রমতে মনু হইতে মনুষ্যগণের উৎপত্তি। ব্যাকরণমতে 'মনু' শব্দের অপত্যার্থে 'ষ্ণ' প্রত্যয় করিয়া মানব পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। আপনারা মনু পর্য্যন্ত আপনাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের সঠিক পরিচয় প্রদান করিলে বিশ্ববাসী আপনাদের মহত্তের পরিচয় পাইবেন।

কূপমণ্ডুক বিরাট্ বিশ্বের ধারণা করিতে অক্ষম বলিয়া অন্য কেহই ধারণা রাখিতে যোগ্য নহে—এরূপ বিচার অসঙ্গত। মনুষ্য ব্যতীত ঈশ্বরকে বিশ্বাস করাই—নাস্তিকের বিচার। আস্তিকগণ নাস্তিকগণকে উপেক্ষাই করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতামতের উপর আস্তিকগণ গুরুত্ব আরোপ করেন না। তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ বা সত্য প্রকাশ করিলে তাঁহাদিগের অকল্যাণ করা হয় বলিয়া এই কার্য্য হইতে সত্যাশ্রয়িগণ সতত সাবধান থাকেন।

"ইদন্তে নাঽতপস্কায় নাঽভক্তায় কদাচন।
না চাঽশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি॥"

এম. এ. ক্লাসের পাঠ্যবিষয় ১ম শ্রেণীর ছাত্রের নিকট যেরূপ গ্রহণযোগ্য হয় না বা প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও কার্য্যকরী হয় না, তদ্রূপ জড়বিজ্ঞানী ও চিদ্বিজ্ঞানীতে ভেদ বর্ত্তমান। জড়বিজ্ঞানী যদি সর্ব্বশক্তিমান্ হয়, তবে সেও পৃথিবী, সূর্য্য এবং মনুষ্যাদি প্রাণী সৃষ্টি করিয়া তাহা প্রমাণিত করুন। **সৃষ্টির কোন বস্তু গ্রহণ না করিয়া** তাহারা আত্মা, দেহ, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য যেগুলিকে তিনি অস্বীকার করিতে অক্ষম, সেগুলি সৃষ্টি করিয়া সর্ব্বশক্তিমত্তার পরিচয় প্রদান

করুন। অণুর নিকট সর্ব্ববৃহৎ সর্ব্বদাই অগ্রাহ্য, অচিন্ত্য ও অবোধ্য থাকে। তাহার নাস্তিক্য বিচারে সর্ব্ববৃহতের কিছুই হানি হয় না। নিজের অযোগ্যতার ফল নিজকেই পাইতে হয়। তদনুসারে তাহার গতি বা জন্মাদি হইয়া থাকে।

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষেব যোনিষু॥
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥

প্রশ্নানুযায়ী সারগর্ভ উত্তর—

১। জড়বিজ্ঞানীর সূর্য্য-বিষয়ক যাবতীয় বৈচিত্র্য উপলব্ধির ক্ষমতা না থাকায় সে সূর্য্যদেবতার দর্শন পায় না এবং তাঁহার সন্তানোৎপাদন ক্ষমতাকে হরণ করত তাঁহাকে ক্লীব বলিলেও সূর্য্যদেবের কোন হানি নাই, নিজের মূঢ়তার ফল নিজেই পাইতে থাকে। ঋষিগণ সত্যদ্রষ্টা; কল্পনাকারী নহেন। যতদিন তাঁহাদের তুল্য ক্ষমতা বা যোগ্যতা অর্জ্জিত না হয়, ততদিন অযোগ্যতা বা মূঢ়তা প্রকাশিত থাকিবেই। সত্য সত্যই, মিথ্যা মিথ্যাই থাকিবে।

২। সর্ব্বশক্তিমানের ধারণা না থাকিলে এই কার্য্যটুকুও অসম্ভববোধ হইবেই। সামান্য লাটিমও বালকদিগের হস্তের উপর বেগে ঘুরিতে থাকে। অনন্তদেবের মস্তকে পৃথিবী ঘুরিলে তাহা নাস্তিকের নিকট অবিশ্বাস্য হয়, কারণ জড়েন্দ্রিয়দ্বারা অনন্তদেবের চিন্ময় বিগ্রহ কখনই গ্রাহ্য হয় না।

৩। কাহারও কাল্পনিক ধারণাকে বিজ্ঞব্যক্তি গ্রাহ্য করেন না। শিশুশ্রেণীর ছাত্রকে এম. এ. ক্লাসের পাঠ্য বুঝাইবার চেষ্টাকে বাতুলতা ও মূর্খতা বলিয়া জ্ঞান করা সঙ্গত।

৪। অন্ধের নিকট আলোকের বৈচিত্র্য প্রকাশ পায় না।

৫। জড়বিজ্ঞানীর জ্ঞান স্বল্প, তাহাদ্বারা সর্ব্ববৃহদ্ ব্রহ্মবস্তুকে জানা যায় না। আংশিক সত্যকে পূর্ণসত্য বলিলে ভুল হয়। ডারউইন ভারতীয় সত্যদ্রষ্টা ঋষিদেরই উচ্ছিষ্টভোজী, পরন্তু অযোগ্যতাহেতু অতি ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা লাভ করত পূর্ণবস্তুর বিজ্ঞান লাভ করেন নাই। সৃষ্টি-প্রকরণে তাহার অধিকার অতীব তুচ্ছ।

৬। অগ্নিকে স্পর্শ করিলে দগ্ধ হইতে হয়, বরফ স্পর্শ করিলে শীতলতা অনুভূত হয়—ইহা কি কর্ম্মানুগ ফল নহে? অচিন্ত্য শক্তিমান্ ঈশ্বরকে অক্ষম জ্ঞান করাই নাস্তিকতা।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

শ্রীদামবন্ধন-লীলা-কীর্ত্তন

শ্রীগোকুলে দীপ্তিমান, যশোদার প্রাণধন,
কর্ণে শ্রীকুণ্ডল ক্রীড়া করে।
সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ, ভুবনমোহন রূপ,
প্রণমি শ্রীরাধা-দামোদরে ॥ ১ ॥

দধিভাণ্ড ভঙ্গ করি' ঘরে প্রবেশ করি' হরি,
নবনীত ভুঞ্জায় বানরে।
শিক্যস্থিত নবনীত, উদূখলে হইয়া স্থিত,
প্রণমি শ্রীরাধা-দামোদরে ॥ ২ ॥

মাতৃহস্তে যষ্টি স্থিত, তাড়নের ভয়ে ভীত,
লম্ফ দিয়ে পলায় সত্বরে।
যশোদা পশ্চাৎ ধায়, দ্রুতবেগে কৃষ্ণ যায়,
প্রণমি শ্রীরাধা-দামোদরে ॥ ৩ ॥

মাতা যশোদার ভয়ে, মুহুর্মুহু শ্বাস বয়ে,
কতদূরে গিয়া গোপী ধরে।
যশোদা ভৎর্সনা করি', হস্ত-যষ্টি পরিহরি',
প্রণমি শ্রীরাধা-দামোদরে ॥ ৪ ॥

যোগীন্দ্র-মুনীন্দ্রগণ, ধ্যানযোগে নাহি পান,
ব্রহ্মা শিব না পায় অন্ত যাঁরে।
নিজপুত্র মনে করি', বাঁধে গোপী দিয়া ডোরি,
প্রণমি শ্রীরাধা-দামোদরে ॥ ৫ ॥

মাতার তাড়ন-ভয়ে, শঙ্কাযুক্ত নেত্রদ্বয়ে,
পুনঃ পুনঃ চক্ষুমার্জ্জন করে।
কজ্জল নয়ন-জল, কম্পমানাঙ্গ বিহ্বল,
প্রণমি শ্রীরাধা-দামোদরে ॥ ৬ ॥

ত্রিরেখাঙ্ক গলদেশ, মুক্তাহার আদি বেশ,
উদূখলে বান্ধে দামোদরে।
গোকুলেতে নিত্যকাল, লীলা করে শ্রীগোপাল,
প্রণমি শ্রীরাধা-দামোদরে ॥ ৭ ॥

দাম-বন্ধনাদি রূপ, বাল্যলীলার স্বরূপ,
পুনঃ পুনঃ নমি সর্ব্বেশ্বরে।
বর প্রদানে সমর্থ, নাহি মাগি পুরুষার্থ,
প্রণমি শ্রীরাধা-দামোদরে ॥ ৮ ॥
গোপাল বালকরূপ, গোকুলে তব স্বরূপ,
হেরি যেন সর্ব্বদা অন্তরে।
তবে যদি দিবে বর, এই ইচ্ছা সুখকর,
প্রণমি শ্রীরাধা-দামোদরে ॥ ৯ ॥
কর্ণরন্ধ্র নিত্যকাল, শ্রবণ-কীর্ত্তন-জল,
সেচন-সৌভাগ্য লাভ করে!
সাধন-ভজনহীন, অত্যন্ত নিকৃষ্ট দীন,
প্রণমি শ্রীরাধা-দামোদরে ॥ ১০ ॥
কমল বদনখানি, ভাগ্যবতী নন্দরাণী,
পুনঃ পুনঃ চুম্বে প্রেমভরে।
রক্তবর্ণ ওষ্ঠদ্বয়, মনে হউক উদয়,
প্রণমি শ্রীরাধা-দামোদরে ॥ ১১ ॥
দিব্যরূপ দামোদর, পাদপদ্মে নমস্কার,
হও মম নয়ন গোচরে।
সংসারে পতিত আমি, উদ্ধার করহ তুমি,
প্রণমি শ্রীরাধা-দামোদরে ॥ ১২ ॥
কুবেরের পুত্রদ্বয়ে, শাপমোচি' প্রেম দিয়ে,
পাদস্পর্শে দিব্যরূপ ধরে।
প্রেমভক্তি-বশীভূত, যশোদার প্রাণসুত,
প্রণমি শ্রীরাধা-দামোদরে ॥ ১৩ ॥
ওহে প্রভো দামোদর! দামে করি নমস্কার,
প্রণমি তোমার বিশ্বোদরে।
অনন্তলীল মূর্ত্তিদ্বয়, হৃদে হউক উদয়,
প্রণমি শ্রীরাধা-দামোদরে ॥ ১৪ ॥

— শ্রীনিত্যপদ দাস ব্রহ্মচারী

লোভ

'লোভ' অর্থে লালসা, জড়ীয়-বিষয়ে লোভ বা লালসা জীবের মহা অনিষ্টকারী বা সংসার-রোগের মূল। দ্বিতীয়াভিনিবেশবশতঃ জীব মায়িক বৈচিত্র্যে মোহিত হইয়া কামনা-পরবশ হয়। কামের বাধাপ্রাপ্তিতে যেরূপ ক্রোধ উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ কিঞ্চিন্মাত্র কামের সফলতায় জীব লোভাভিভূত হইয়া পড়ে। অসংখ্য বাধা-বিপত্তিকে অগ্রাহ্য করিয়া যে বৃত্তিবশে ইন্দ্রিয়গণ স্বাভাবিক অনুরাগভরে বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়, তাহাই 'লোভ' নামে কথিত। ইহা মনের একটী জড়ীয় অনুরাগময়ী চেষ্টাবিশেষ। ক্রোধের ন্যায় লোভও পরমার্থ-সাধনে কণ্টকস্বরূপ। লোভের বশীভূত হইলে নানাপ্রকার অসৎকার্য্য করিতে হয়, তাহাতে নিত্য পাপ বাড়িতে থাকে, পরে উপযুক্ত সময়ে পাপের ফলে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। তাই প্রবাদ-বাক্যে পাওয়া যায়,—

লোভেতে পাপের বৃদ্ধি
হয় নিতি নিতি;
সময় পাইলে পাপ করে বিনশ্যতি।

অন্য একটী প্রবাদবাক্যেও পাওয়া যায়,—"লোভে পাপ পাপে মৃত্যু।" মেষের পালের মধ্যে দুইটী ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্র ছাড়িয়া দিলে তাহারা যেমন তাহাদের ধ্বংস করে, তদপেক্ষ অধিক ধ্বংসকারী মানুষের কনক-কামিনীর লালসা ও জড়ীয় প্রতিষ্ঠার লোভ। লোভের বশীভূত হইয়া যে কল্পিত লাভের প্রত্যাশায় ধাবমান হয়, তাহার জীবনে শোচনীয় পরিণতি ঘটে। **লোভ হইল একপ্রকার দারিদ্র্য**। এই প্রসঙ্গে কোরাণের মধ্যে পাওয়া যায়,—"লোভের থেকে সাবধান থাক, এ হল প্রকাশ্য দারিদ্র্য। যা (তোমাকে) ওতে নিক্ষেপ করে ত্যাগ কর **** লোভী কখনও বেহশ্‌তে যাবে না।*** মানুষ স্বভাবতঃ নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি লোভী।" কোরানের (শায়খান, তিরমিজী) অন্যত্রও পাওয়া যায়,—"বার্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে দুটো জিনিসের প্রতি মানুষের লোভ বৃদ্ধি পায়—একটা অর্থ, অপরটা দীর্ঘ জীবন।" ঈষৎ শ্বেতকুষ্ঠ যেরূপ রূপবান্‌পুরুষের রূপ নষ্ট করে, তদ্রূপ কিঞ্চিন্মাত্র লোভই যশস্বিগণের নির্ম্মল যশঃ ও গুণিগণের প্রশংসনীয় গুণ নষ্ট করে।

অনিত্য বস্তুর প্রতি লোভ ধ্বংসের কারণ

ব্যাধ বংশীধ্বনিদ্বারা হরিণকে আকর্ষণ করিয়া যেরূপ তাহাকে জালের মধ্যে আবদ্ধ করে, তদ্রূপ জীবগণ ইন্দ্রিয়গণের প্ররোচনায় মুগ্ধ হইয়া জড়মায়াকে ভোগ বা অতিক্রম করিতে গিয়া অনন্ত অপার বাসনারাজিদ্বারা ক্রমপ্রবাহমান ভবচক্রে

ঘুরপাক খাইতে থাকে। বদ্ধজীবগণ লোভের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া চৌর্য্যবৃত্তি, পরদারাপহরণাদি অবৈধ ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া নানাবিধ দুষ্কর্ম্মের আবাহন করিতে বাধ্য হয়। মূর্খ ভ্রমর যেরূপ গন্ধ-লোভে একই পদ্মে অবস্থান করিয়া সূর্য্যাস্তকালে পদ্ম মুকুলিত হইলে তাহাতেই আবদ্ধ হয়, সেইরূপ যে-ব্যক্তি হরিসেবার কর্ত্তব্য না করিয়া অনিত্য ধন-যৌবনের লোভে তাহাকে আশ্রয় করে, সে ব্যক্তি তাহাতে আবদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করে। মধুমক্ষিকা অনেক কষ্টে মধু সঞ্চয় করে, কিন্তু মধু হরণকারী ব্যক্তি সেই সঞ্চিত মধুর সন্ধান পাইয়া তাহা হরণ করিয়া থাকে; তদ্রূপ লোভী পুরুষ অতি দুঃখের সহিত অর্থ সঞ্চয় করে, কিন্তু তাহা সৎব্যয় না করিলে অন্য লোক সেই ধনের সন্ধান পাইয়া উহা হরণ করিয়া থাকে। মৎস্য যেরূপ জিহ্বার লোভে বড়শীতে আবদ্ধ হইয়া প্রাণ হারায়, তদ্রূপ ভোগীসকল জিহ্বার লালসায় ইতি উতি ধাবিত হইয়া মায়ার কারাগারে আবদ্ধ হইয়া দুর্লভ মনুষ্য জীবনকে বৃথা নষ্ট করিয়া ফেলে। যাহারা "গাছেরও খাবতলারও কুড়াব অর্থাৎ জড় ও পারমার্থিক উভয় জগৎ হইতে মজা লুটিবার" লোভের পক্ষপাতী, তাহাদের কোনকালেই মঙ্গল হয় না। তাহারা কোন জগৎ হইতেই সুখলাভ করিতে পারে না। যেরূপ কাঁঠাল খাইতে গেলে পাছে গোঁফে আঁঠা লাগে এই ভয়ে গোঁফে তেল দেওয়া হইয়াছে, অথচ কাঁঠাল এখনও গাছে রহিয়াছে, তদ্রূপ লোকের জড়ীয় অনিত্য বস্তুর প্রতি লোভ দূরীভূত হইতেছে না, অথচ তাহারা পরমার্থ ধন সঞ্চয়ের জন্য লালায়িত, ইহা অতি অবাস্তব কথা। লোভের অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে শাস্ত্রে দেখা যায়,—

লোভঃ প্রজ্ঞানমাহন্তি প্রজ্ঞা হন্তি হতা হ্রিয়ম্।
হ্রীর্হতা বাধতে ধর্ম্মং ধর্ম্মো হন্তি হতা শ্রিয়ম্॥

(মহাভারত-উদ্যোগপর্ব্ব)

"লোভ প্রজ্ঞাকে নষ্ট করে, প্রজ্ঞা নষ্ট হইলে লজ্জা নাশ হয় অর্থাৎ লোভী ব্যক্তি নির্লজ্জ হইয়া পরধনাদি লোভনীয় বস্তু গ্রহণে প্রবৃত্ত হয়। লজ্জা বিনষ্ট হইলে ধর্ম্ম নষ্ট হয় এবং ধর্ম্ম নষ্ট হইলে যতকিছু শুভ সবই বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।"

সাধুসঙ্গে হরিকথায় লোভই পরমপুরুষার্থ

কথায় বলে,—"উদিতে তু সহস্রাংশৌ ন খদ্যোতো ন চন্দ্রমাঃ।" সূর্য্য উদিত হইলে তখন যেরূপ জোনাকি বা চন্দ্র সকলেরই জ্যোতি ম্লান হইয়া যায় এবং তাহাদের আর কোন প্রয়োজনই থাকে না, তদ্রূপ সাধুসঙ্গে হরিকথায় লোভ উৎপন্ন হইলে জড়ীয় অনিত্য পদার্থের প্রতি লোভ নিবারণ করিবার পৃথক্‌ভাবে চেষ্টা

করিতে হয় না, তাহা স্বতঃই নিবারিত হইয়া থাকে। শাস্ত্রে সম্বন্ধজ্ঞানাভাবে পরকালে সুখপ্রাপ্তির আশায় কর্ম্মে নিয়োজিত থাকিলেও লোভের হস্ত হইতে একেবারে নিষ্কৃতি লাভ করিবার কোন উপায় নাই। এক সম্প্রদায় সকল আশা-ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়া লোভের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পরিব্রাজক বেশে বনে গমন করিয়াও ভগবানে শরণাপত্তির অভাবে পুনঃ লোভের হস্তে পতিত হইয়া রাবণের সীতা হরণের ন্যায় অসৎকর্ম্মে পতিত হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হয়। যাহারা স্বয়ং কৃষ্ণকলেবর শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমূর্ত্তি, শ্রীহরিনামকে অর্থোপার্জ্জনের যন্ত্র বা পূজ্য-বস্তুকে সেবকসূত্রে গ্রহণ করে, অপরাধ-ফলে তাহারা অধিক লোভের বশবর্ত্তী হইয়া নরকের পথের যাত্রী হইতে বাধ্য হয়।

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর লিখিয়াছেন,—"লোভ সাধুসঙ্গে হরিকথা।" তাই ভক্তগণ লোভকে সাধুসঙ্গে হরিকথায় নিযুক্ত করিয়া মায়িক লোভের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান। ভক্তগণ জানেন,—"ব্যতিরেকভাবে বিষয় পরিত্যাগের চেষ্টা ফলবতী হয় না, কারণ প্রত্যেক স্বার্থের গতিই বিষ্ণু। বিষ্ণু-সেবাভিলাষী বস্তুর কোনকালে বিনাশ নাই।" সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণে সাধক অনায়াসে কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়া জীবন সার্থক করিয়া থাকেন এবং আনুষঙ্গিক ফলে তাঁহার ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, মোহ, লোভাদি বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। "প্রেমদাতৃত্ব যথা তমেব নিত্যং শৃণুয়াদভীক্ষ্ণং কৃষ্ণেহমলাং ভক্তিমভীপ্সমানঃ" (ভাঃ ১২।৩।১৫) অর্থাৎ মহতের শ্রীমুখে শ্রীকৃষ্ণের যশোগাথা শ্রবণ মাত্রেই শ্রীকৃষ্ণে প্রেমভক্তি হইয়া থাকে। ক্ষুৎপিপাসাদি সংসারধর্ম্ম নাশ সম্বন্ধে দেবর্ষি নারদের প্রাচীনবর্হির প্রতি উক্তি,—

তস্মিন্ মহন্মুখরিতা মধুভিশ্চরিত্রপীযূষশেষসরিতঃ পরিতঃ স্রবন্তি।
তা যে পিবন্ত্যবিতৃষো নৃপ গাঢ়কর্ণৈস্তান্ন স্পৃশন্ত্যশন-তূড়ভয়শোকমোহাঃ॥
(ভাঃ ৪।২৯।৪১)

"হে রাজন্! কেহ কেহ মনে করেন সাধুসঙ্গ ব্যতীত স্বয়ংই হরিকথা চিন্তনাদি-দ্বারা শ্রীভগবানে প্রেমভক্তির উদয় হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা অত্যন্ত অসম্ভব। হরিকথামৃত ব্যতীত অন্য কথাপ্রসঙ্গ যাহাতে নাই এতাদৃশ হরিকথারূপ সুধাতরঙ্গিণী যে সাধুসমাজে চারিদিকে প্রবাহিত হয়, সেই সাধুস্থানে উপবেশন করিয়া যাঁহারা সাবহিত কর্ণে ও অলংপ্রবৃত্তিরহিত হইয়া হরিকথাসুধা পান করেন, ক্ষুধা, পিপাসা, ভয়, শোক, মোহ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না।" শ্রীভগবান্ পৃথু মহারাজকে বর দিতে চাহিলে তিনি সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণের বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—

ন কাময়ে নাথ তদপ্যহং ক্বচিন্ন যত্র যুষ্মচ্চরণাম্বুজাসবঃ।
মহত্তমান্তর্হৃদয়ান্মুখচ্যুতো বিধৎস্ব কর্ণায়ুতমেষ মে বরঃ॥

(ভাঃ ৪।২০।২৪)

"হে নাথ! মহত্তমগণের হৃদয় হইতে তাঁহাদের মুখকমল-বিনিঃসৃত ভবদীয় গুণকীর্ত্তনরূপ শ্রীপাদপদ্ম-মকরন্দরস যাহাতে লাভ করা যায় না, এইপ্রকার মুক্তিতে আমার কোন প্রয়োজন নাই। আপনি আমার অসংখ্য শ্রবণেন্দ্রিয় বিধান করুন—যাহাতে আমি প্রাণ ভরিয়া আপনার গুণকথা শ্রবণ করিতে পারি, ইহাই আমার উত্তম বর।" ইহাদ্বারা সাধুসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকথায় লোভের পরম পুরুষার্থতা বুঝা যায়।

বৈধী ও রাগমার্গীয় ভক্তিতে লোভ

শ্রীমূর্ত্তিদর্শন হেতু ও শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের বাল্যাদি লীলামাধুর্য্য শ্রবণহেতু ভজনের নিমিত্ত "লোভ"। এই লোভের অপ্রাপ্তিবশতঃ ভক্তিতে প্রবৃত্তিলাভের হেতু লোভ না হওয়াতে, যেখানে ভক্তিপ্রবৃত্তি লোভের অধীন নহে, শাস্ত্র শাসনহেতু যে ভক্তিতে প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে, সেই ভক্তির নাম বৈধীভক্তি। যাঁহারা নিজাভিলাষিত শ্রীব্রজরাজনন্দনের সেবাপ্রাপ্তি-লোভে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গসকলের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের অনুষ্ঠিত সেই ভক্তিপরিপাটিই রাগানুগা-ভক্তি বলিয়া কীর্ত্তিত। ব্রজবাসি-ভক্তগণই কৃষ্ণের প্রেষ্ঠ, তন্মধ্যে যিনি যে ব্রজভক্তের মাধুর্য্যে লোভপূর্ব্বক তদনুগমনে অভীষ্টসেবা মনে করেন, তিনি তাঁহার পশ্চাতে থাকিয়া অন্তর্মনা হইয়া নিরন্তর কৃষ্ণসেবা করেন। এই প্রসঙ্গে শাস্ত্রে পাওয়া যায়,—

সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ববিভাগ ২।১৫১)

"রাগাত্মিকা ভক্তিতে যাঁহাদের লোভ হয়, তাঁহারা ব্রজজনের কার্য্যানুসারে সাধকরূপে বাহ্যে এবং সিদ্ধরূপে অভ্যন্তরে সেবা করিবেন।" "রাগানুগার প্রকৃতি" সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিয়াছেন,—

লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি।
শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে—রাগানুগার প্রকৃতি॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।১৫৩)

অন্যের কা কথা স্বয়ং নন্দনন্দন কৃষ্ণেরও নিম্নোক্ত তিনটী বিষয়ে লোভ উৎপন্ন হইলে রাধাভাবকান্তি লইয়া শচীগর্ভসিন্ধুতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।—

শ্রীরাধায়া প্রণয়-মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত-মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ-
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥

(চৈঃ চঃ আদি ১।৬ ধৃত স্বরূপগোস্বামী কড়চা)

"শ্রীরাধার প্রণয় মহিমা কিরূপ, আমার মধুরিমা যাহা শ্রীরাধা আস্বাদন করেন, তাহাই বা কিরূপ, আমার মধুরিমার অনুভূতি হইলে শ্রীরাধার বা কি সুখ উদয় হয়—এই তিনটী বিষয়ে লোভ জন্মিলে শ্রীকৃষ্ণরূপ চন্দ্র শচীগর্ভসমুদ্রে জন্মগ্রহণ করিলেন।" অতএব ইহ জগতের অনিত্য বস্তুসমূহের প্রতি লোভ নিবারণ করিতে হইলে অতি অবশ্যই হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবার প্রতি লোভ উৎপন্ন করিতে হইবে—ইহা সকল শাস্ত্রের সারকথা।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-জয়ন্তী

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৫শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৬২ পৃষ্ঠার পর]

বেদ শব্দ—বিদ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। বিদ্—ধাতুর অর্থ জানা। বেদ শব্দের অর্থ সামগ্রিক অখণ্ড জ্ঞান। (পাঃ পুঃ)

বেদ—বিদ্-ধাতুঃ = জানা অর্থাৎ যাহার দ্বারা পরমেশ্বরকে জানা যায়, তাহাকে বেদ বলে। যাহার দ্বারা তত্ত্ববস্তু ভগবান্ শ্রীহরিকে, তদীয় অংশ জীবকে এবং তদীয় শক্তি মায়াকে (জগৎ) জানা যায়, দিব্যজ্ঞানের উদয় হয়, তাহাকে বেদ বলে।

প্রশ্ন ঃ—বেদশাস্ত্র আমাদের কি উপকার করেন ?

উঃ—বেদশাস্ত্র আমাদের পরম মঙ্গল বিধান করেন। উচ্ছৃঙ্খল যে আমরা, সেই আমাদিগকে বেদশাস্ত্র শৃঙ্খলিত বা নিয়মন করেন। অসংযত যে আমরা, সেই আমাদিগকে সংযম-ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান করেন। "প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।" বেদশাস্ত্র প্রবৃত্তিমার্গ হইতে মানুষকে নিবৃত্তিমার্গে লইয়া যায়। "অসতো মা সদ্গময়ঃ"—অসৎ হইতে মানুষকে সৎ-য়ে লইয়া যায়। "তমসো মা জ্যোতির্গময়ঃ"—অন্ধকার হইতে মানুষকে আলোকে লইয়া যায়। "মৃত্যোর্মা

অমৃতং গময়ঃ"—বেদশাস্ত্র মৃত্যু হইতে মানুষকে নিত্য শাশ্বত শান্তিনিকেতনে পৌঁছাইয়া দেয় ইত্যাদি।

সেই বেদের পূর্ব্বভাগে ব্রাহ্মণ ও সংহিতাংশে ত্রয়ী অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কামাত্মক কর্ম্মকাণ্ডের বিপুল উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। সৎ কর্ম্মাদির দ্বারা স্বর্গাদিলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু পুণ্য সমাপ্ত হইয়া গেলে পুনরায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও তথা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া মর্ত্ত্যলোকে আগমন করিতে হয়।

ইষ্টেহ দেবতাযজ্ঞৈঃ স্বর্লোকং যাতি যাজ্ঞিকঃ।
ভুঞ্জীত দেববৎ তত্র ভোগান্ দিব্যান্ নিজার্জ্জিতাম্॥

(ভাঃ ১১।১০।২৩)

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে উদ্ধব! বর্ণাশ্রমরূপ কর্ম্মমার্গে অভয় ফল নাই। যাজ্ঞিক অর্থাৎ গৃহমেধী যজ্ঞপরায়ণ ব্যক্তি যজ্ঞদ্বারা দেবতাগণকে যজন করিয়া স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন। তথায় কর্ম্মফলানুসারে দেবতাদিগের ন্যায় দিব্য ভোগ্যসমূহ ভোগ করিতে থাকেন।

তাবৎপ্রমোদতে স্বর্গে যাবৎ পুণ্যং সমাপ্যতে।
ক্ষীণপুণ্যঃ পতত্যর্ব্বাগনিচ্ছন্ কাল চালিতঃ॥ (ভাঃ ১১।১০।২৬)

যে পর্য্যন্ত তাঁহার পুণ্য ক্ষয় না হয়, সে পর্য্যন্ত তিনি স্বর্গে আনন্দ লাভ করেন। কিন্তু পুণ্য শেষ হইয়া গেলে, তাঁহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও কালের দ্বারা চালিত হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হন।

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে॥ (গীঃ ৯।২১)

কর্ম্মিগণ যজ্ঞাদি পুণ্য কর্ম্মফলে স্বর্গলোক লাভ করে, তথায় প্রভূত সুখভোগ করিয়া পুণ্য ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে আগমন করে। এইরূপ কামকামী ব্যক্তিগণ বেদত্রয়ীর অনুগত হইয়া সংসারে পুনঃ পুনঃ গতায়াত করিতে থাকে।

এই বেদের উত্তরভাগে—আরণ্য ও উপনিষদাংশে জ্ঞান ও ভক্তির সম্বন্ধে উপদিষ্ট হইয়াছে। সেই উপনিষদের মধ্যে ১০৮ খানি বিশেষ প্রসিদ্ধ। তার মধ্যে আবার একাদশখানি সর্ব্বপ্রধান বা মূল বেদান্ত (বেদ+অন্ত=বেদান্ত) বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। সেই বেদান্তমতের অতি সংক্ষিপ্তসার দিগ্‌দর্শন করা যাইতেছে। সাম্প্রদায়িকতা ও সঙ্কীর্ণ বুদ্ধি পরিত্যাগপূর্ব্বক নিরপেক্ষভাবে এই বেদান্ত আলোচনা করিলে জানা যাইবে যে, ইহাতে পরমেশ্বরের ব্যক্তিত্ব, নিত্য নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর ও ধাম স্বীকৃত হইয়াছে। পরমেশ্বরের অণু অংশ যে

জীব, তাহারও নিত্যত্ব স্বীকৃত হইয়াছে এবং তাঁহার শক্তি যে মায়া, যে মায়া হইতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উৎপত্তি হইয়াছে, সেই মায়াকেও স্বীকার করা হইয়াছে। অমৃতের সন্তান জীব মায়ার অধীন হইয়া সুখ-দুঃখ ভোগ করিতেছে। জীব নিজ চেষ্টায় ভগবানকে জানিতে পারে না, তাঁহার কৃপাতেই তাঁহাকে জানা যায়। তাঁহার দর্শনপ্রাপ্ত হইলে জীবের হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হয় এবং সমস্ত কর্ম্মের ক্ষয় হইয়া থাকে। (মুঃ উঃ ২।২।৯, ভাঃ ১।২।২১)। তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম সেবালাভই মুক্তি বা বিমুক্তি। জ্ঞানের অঞ্জনপ্রাপ্ত জীব যে তত্ত্ববস্তু দর্শন করেন, তাহা অস্পষ্ট ও অসম্যক্ দর্শন। প্রেমের অঞ্জনপ্রাপ্ত জীবে যে তত্ত্ববস্তু দর্শন করেন, তাহা সুস্পষ্ট ও পরিপূর্ণ দর্শন। অণুচৈতন্য জীব বিভুচৈতন্য পরমেশ্বরের আনুগত্য অর্থাৎ সেবায় নিযুক্ত হইলে পরাশান্তি ও নিত্যধাম লাভের অধিকারী হইতে সমর্থ হয়, অন্যপন্থায় শাশ্বত শান্তিলাভ সম্ভব হয় না, ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত ও স্থিরিকৃত সিদ্ধান্ত।

সনাতন ধর্ম্ম

সনাতন ধর্ম্ম বা নিত্যধর্ম্ম, যে ধর্ম্মের অনুশীলনদ্বারা আত্মতত্ত্ব, পরমাত্ম-তত্ত্ব ও জগৎ সম্বন্ধে দিব্যজ্ঞান লাভ হয়, তাহাকে সনাতন ধর্ম্ম বলে। সনাতন বা সদাতন অর্থাৎ যাহা নিত্যকাল বর্ত্তমান থাকে, তাহাকে সনাতন ধর্ম্ম বলে।

"শাশ্বতস্তু ধ্রুবঃ নিত্যঃ সদাতনঃ সনাতনাঃ।" (অমরকোষ) শাশ্বত, ধ্রুব, নিত্য, সদাতন বা সনাতন ; একই পর্য্যায়ের এতগুলি শব্দ।

সমানং ত্রিষু কালেষু সর্ব্বাবস্থাষু শাশ্বতম্।
সনাতনং মতং নিত্যং চীয়তে নাপচীয়তে ॥ (হাঃ সং)

ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান—এই ত্রিকালে যাহা সমভাবে থাকে, সর্ব্বাবস্থায় যাহা শাশ্বত অর্থাৎ নিত্য, যার ক্ষয়, বৃদ্ধি বা লয় নাই, তাহাই সনাতন শব্দবাচ্য বা সনাতন মত।

সনাতন ধর্ম্মের উপাস্যবস্তু—ব্রহ্ম-পরব্রহ্ম-পরমাত্মা ভগবান্ শ্রীহরি। তিনি নিত্যবস্তু।

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্ ॥
(কঃ উঃ ২।২।১৩ ; শ্বেঃ শ্বঃ উঃ ৬।১৩)

যিনি অনিত্যগণের মধ্যে নিত্য বা নিত্যগণের মধ্যে মূল নিত্য এবং চেতনগণের মধ্যে যিনি পরম চৈতন্য বা বিভুচৈতন্য, যিনি এক হইয়াও বহুর কামনা এককালে পূর্ণ করিতে সমর্থ, সেই পরমাত্মাকে যাঁহারা হৃদয়ে দর্শন করেন,

তাঁহারাই নিত্য শান্তি ও শাশ্বত সুখের অধিকারী হইতে পারেন, অন্যের ভাগ্যে তাহা হয় না।

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং, ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা, সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে॥

(গীঃ ১১।১৮)

তুমি পরম অক্ষর ও তুমিই মুমুক্ষুগণের জ্ঞাতব্য, তুমি এই বিশ্বের পরম আশ্রয় ও তুমি অব্যয় এবং সনাতন ধর্ম্মের পালক, তুমি সনাতন এবং তুমিই পুরুষ—ইহা আমি অবগত আছি।

উপাসক জীবও সনাতন বস্তু। "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।" (গীঃ ১৫।৭) সনাতন জীবসকল আমারই অংশ। (গীঃ ২।২০-২৪,কঃ উঃ ১।২।১৮) উপাস্য সনাতন, উপাসক সনাতন এবং উপাসনায় 'সদ্'-শব্দ প্রয়োগ থাকায়, উপাসনাও নিত্য।

"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ"। (ঋগ্বেদ ১।২২।২০; ১।২২।২৩) 'সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ'—২৪ ঘণ্টা সূরিগণ শ্রীহরির পাদপদ্ম দর্শন (উপাসনা বা ভজনা) করিতেছেন। যেখানে ভজনীয় বস্তুর নিত্যত্ব, ভজনকারীর নিত্যত্ব এবং ভজনের নিত্যত্ব স্বীকার করা হইয়াছে, তথা হইতে সনাতন ধর্ম্ম আরম্ভ হইল।

"ভর্গঃ দেবস্য ধীমহি" (শ্রুঃ) ভর্গদেবকে (বিষ্ণুকে) আমরা ধ্যান করি। "সত্যং পরং ধীমহি" (ভাঃ ১।১।১)। নিরস্তকুহক পরম সত্য বাস্তববস্তু ভগবান্ শ্রীহরিকে আমরা ধ্যান করি। কস্মিন্‌কালেও এই ধ্যেয়, ধ্যাতা ও ধ্যান; জ্ঞেয়, জ্ঞাতা ও জ্ঞান; উপাস্য, উপাসক ও উপাসনা; আরাধ্য, আরাধক ও আরাধনা; সেব্য, সেবক, ও সেবা; পূজ্য, পূজক ও পূজা একীভূত হইবে না। এখান থেকেই প্রকৃতপক্ষে সনাতন ধর্ম্ম আরম্ভ হইল।

প্রঃ—ব্রহ্মে লয়, ব্রহ্মে প্রবেশ ও ব্রহ্ম নির্ব্বাণ—এই সমস্ত বাক্যে ত্রিপুটি বিনাশ অতিস্পষ্ট, যাহারা ব্রহ্ম বা পরমাত্মাকে একাত্মরূপে উপাসনা করেন, তাহারা কি সনাতনধর্ম্মী নহেন?

উঃ—বেদপন্থি মাত্রই সনাতনী। তবে মানুষের ক্রমিক অধিকারানুযায়ী কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি উপদিষ্ট হইয়াছে। ভক্তির ফলটিই একমাত্র নিত্য, অন্য সব ফল অনিত্য। মুক্তিলাভের জন্য যাঁহারা একাত্মভাবে ভজনা করেন, তাঁহাদের সেই ফলও নিত্য নহে, ব্রহ্মলোক হইতেও তাঁহাদের প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়, এ কথা ভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন।

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥ (গীঃ ৮।১৬)

হে কৌন্তেয়! ব্রহ্মলোক হইতেও জীবগণকে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয়; কিন্তু যাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। (কৃষ্ণ প্রেমানন্দের নিকট ব্রহ্মানন্দ অতিতুচ্ছ)।

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥ (গীঃ ১৫।৬)

নির্গুণ ভক্তি, শুদ্ধভক্তি, পরাভক্তি, রাগভক্তি ও প্রেমভক্তিকে আশ্রয় করিয়া যাঁহারা আমার ভজন করেন, তাঁহারাই আমার পরমধাম বা নিত্যধামে গমন করিতে সমর্থ, তাঁহাদের আর প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না। সেই ধাম চন্দ্র, সূর্য্য বা অগ্নি কেহই প্রকাশ করিতে পারে না।

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতোদৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥ (পদ্মপুরাণ)

জগতে দুইপ্রকার ভূত সৃষ্টি হইয়াছে, সুর ও অসুর। যাঁহারা পরব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীহরির নিত্য নাম, রূপ গুণ, লীলা, পরিকর ও ধাম স্বীকার করত তাঁহাতে প্রপন্ন বা শরণাগত হইয়া নিত্য ভজনপরায়ণ, তাঁহারা সুর। আর যাঁহারা তাহা স্বীকার করেন না, তাঁহারা অসুর পদবাচ্য।

অনন্ত শাস্ত্রং বহু বেদিতব্যং সল্পশ্চকালং বহুবশ্চবিঘ্না।
যৎ সারভূতং তদুপাদিতব্যংহংস যথা ক্ষীরমিবাম্বুমধ্যাৎ॥
(নীঃ শাঃ)

শাস্ত্র অনন্ত এবং জ্ঞাতব্য বিষয়ও বহু, তবে সময় খুব কম ও বিঘ্নবহুল। ইহার মধ্যে যাহা সর্ব্বশাস্ত্রের সারশিক্ষা বা সর্ব্বগুহ্যতম উপদেশ তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। হংসের ন্যায় সকলের সার গ্রহণ করা উচিত। (ক্রমশঃ)

—শ্রীজগদ্বন্ধু দাস ব্রহ্মচারী

ভগবানের ভুল কি ?

কবিদিগের কথায় অনেক অসামঞ্জস্য থাকে। তাহা যে শুধু দোষ বলিয়া গণ্য হয় না, তাহা নহে, তাহা অলঙ্কার বা সৌন্দর্য্য বলিয়াই গণ্য হয়। যেমন, স্বনামখ্যাত ইংরাজ কবি মিল্টন একস্থানে বলিয়াছেন,—"Darkness visible" অর্থাৎ এমন অন্ধকার যে অন্ধকার পর্য্যন্ত দেখা যায়! অন্ধকার আবার দেখা যায়, কেমন করিয়া? এখানে অন্ধকারের গাঢ়তা জানাইবার জন্যই কবি এরূপ সামঞ্জস্যহীন শব্দ প্রয়োগ করিয়া তাহার ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। মনুষ্যের ভাব প্রকাশে যখন এরূপ অসামঞ্জস্য আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন একজাতীয় শাস্ত্র তাহাদিগকে রক্ষা করে। ইহাকে অলঙ্কার শাস্ত্র কহে।

এখানে আমরা মনুষ্যের নহে, স্বয়ং ভগবানের একটী বাহ্যতঃ সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যহীন কথার অবতারণা করিব। তাহার বাস্তব সত্যতা নির্দ্ধারণ করিতে পারি কি না, বিচার করিয়া দেখিব।

যাহারা গৃহে অগ্নিপ্রদান, বিষদান বা অস্ত্রদ্বারা অপরের প্রাণনাশ, ধন অপহরণ, ক্ষেত্র বা পরস্ত্রী প্রভৃতি হরণ করে, তাহাদিগকে আততায়ী বলে। রাজনীতি-শাস্ত্রে ব্যবস্থা আছে, এই ছয় প্রকার আততায়ীকে পাইবামাত্র বধ করিবে। যখন এই নীতি অনুসারে কুরু-পাণ্ডবগণ যুদ্ধার্থ কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছেন, তখন গুড়াকেশ, পরন্তপ, গাণ্ডীবধারী বীরচূড়ামণি ক্ষাত্রকুলগৌরব অর্জ্জুনের হৃদয়ে দুর্ব্বলতা আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহার কণ্ঠ শুষ্ক হইল, হাত-পা কাঁপিতে লাগিল, মাথা ঘুরিল, হাত হইতে ধনুর্ব্বাণ খসিয়া পড়িল। ইহাকে অর্জ্জুনের বিষাদ বা মোহ বলা হইয়াছে। এই বিষাদগ্রস্ত বা মোহগ্রস্ত অর্জ্জুনের বিষাদ বা মোহ দূর করিবার জন্য শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে অনেক উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটী কথা আছে—

"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥"

অর্থাৎ প্রত্যেক মনুষ্য নিজ নিজ ধর্ম্ম পালন করিবেন। উহা যদি অসম্যক্ বা অসম্পূর্ণও হয়, তবুও উহা শ্রেষ্ঠ। অপরের ধর্ম্ম পূর্ণাঙ্গ হইলেও শ্রেষ্ঠ নহে। স্বধর্ম্ম পালন করিতে মৃত্যু হওয়াও শ্রেয়স্কর। পরধর্ম্ম পালন করিয়া জীবিত থাকাও ভাল নহে ইত্যাদি।

আবার অর্জ্জুনকে অন্যস্থানে বলিতেছেন :—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

হে অর্জ্জুন! সকলপ্রকার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমার আশ্রয় লও। সেইসকল ধর্ম্ম পালন না করাতে তোমার যে পাপ হইবে, আমি তাহা হইতে তোমাকে মুক্ত করিব" ইত্যাদি।

এই দুই উক্তির সামঞ্জস্য কোথায়? একস্থলে স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য পীড়াপীড়ি, অন্যস্থলে উহা ত্যাগের জন্য অভয়দান! তবে কি অর্জ্জুনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীভগবানেরও মোহ বা বিষাদ উপস্থিত হইল? অর্জ্জুনের মোহ সারাইতে গিয়া নিজে মোহে পড়িয়া গেলেন কি?

মানুষ মানুষকে রক্ষা করিতে গিয়া ভুলে বা সেই বিপদে পড়িতে পারেন। কিন্তু শ্রীভগবান্ ত' সমগ্র ভুল, মোহ বা বিষাদের অতীত। এই সকল দুর্ব্বলতা মায়ার কার্য্য। মনুষ্য মায়ার অধীন, শ্রীভগবান্ মায়াধীশ—মায়াতীত, সুতরাং ইহা ভগবানের ভুল নহে; তবে কি?

প্রত্যেক মনুষ্যের ধর্ম্ম 'স্ব' ও 'পর' ভেদে দুই প্রকার। এই 'স্ব' ও 'পর' কি? —তাহাই আমরা প্রথমে আলোচনা করিব।

প্রত্যেক মনুষ্যের দুইটী রূপ, একটী 'স্ব' ও দ্বিতীয়টী 'পর'। মনুষ্যের স্বরূপ 'জীব' বা 'আত্মা' বা 'দেহী'—ইহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, বিভিন্ন দেহে প্রবেশ করিলেও উহার রূপের পরিবর্ত্তন হয় না, নিত্যকাল একই ভাবে থাকেন। এই জীব বা আত্মা যখন সত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণময়ী মায়ার অধীন হয়, তখন মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কাররূপ একটী সূক্ষ্ম দেহ ও মাটী, জল, আগুন, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূতে নির্ম্মিত একটী স্থূল দেহ প্রাপ্ত হন। এই প্রকার দেহপ্রাপ্ত জীবকে বদ্ধজীব বলে। এই বদ্ধজীব মায়ার অধীনতায় যখন সত্বগুণের পরিচয় দেয় অর্থাৎ শমদমাদি ক্রিয়া করে, তখন ব্রাহ্মণ বলা হয়। যখন সত্ব বা রজোগুণের মিশ্রিত পরিচয় দেয়, অর্থাৎ যুদ্ধবিগ্রহাদি কার্য্য করে, তখন তাহাকে ক্ষত্রিয়; যখন রজঃ ও তমোগুণের পরিচয় দেয়, অর্থাৎ কৃষিবাণিজ্যাদি কার্য্য করে, তখন বৈশ্য; আর যখন তমোগুণের পরিচয় দেয় অর্থাৎ বিপ্রাদি অপর তিন-জাতির সেবাশুশ্রূষা করিতে থাকে, তখন তাহাকে শূদ্র বলা হয়। এইরূপ গুণের পরিচায়ক কর্ম্মদ্বারাই জাতি নির্ণয় করিতে হইবে,—শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে এই কথা বলিয়াছেন। অর্থাৎ জীব বদ্ধ হইয়াই যে কোন কুলে জন্মগ্রহণ করুক না কেন, দেখিবে সে যে-সকল কর্ম্ম করিতেছে, তাহা সত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিনের কোন্‌টীর পরিচয় দিতেছে। যাহাতে যে গুণের পরিচয় পাইবে, তাহাকে সেই গুণানুসারে বিভাগ করিবে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চারিজাতির একটীর অন্তর্গত করিবে।

শ্রীভগবান্ গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে এই চারিটী প্রকোষ্ঠ সৃষ্টি করিয়া রাখিলেন। যখন যিনি যে গুণান্বিত হইবেন, তখন তিনি সেই প্রকোষ্ঠে অবস্থান করিবেন। অর্থাৎ স্থাবর সম্পত্তি যেমন পুরুষ-পরম্পরায় মৌরসী পাট্টার বলে প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই প্রকোষ্ঠগুলি তদ্রূপ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অনেকে যেমন মৃত্যুকালে উইল করিয়া যান যে, 'যদিও উত্তরাধিকারিসূত্রে আমার পুত্রগণই আমার স্থাবর সম্পত্তির মালিক, তবুও আমার ইচ্ছা, আমার পুত্রগণের মধ্যে যাঁহারা সৎ-চরিত্র হইবেন, হরিনাম বিক্রয় করিবেন না, কিংবা কনক-কামিনী বা প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টাযুক্ত হইবেন না, তাঁহারা আমার সম্পত্তি প্রাপ্ত হইবেন। যদি আমার পুত্রগণের মধ্যে কেহই এরূপ গুণসম্পন্ন না হন, তবে আমার দেশবাসীর মধ্যে প্রধান প্রধান দশ ব্যক্তি যাঁহাকে এইরূপ গুণশালী বোধ করিবেন, তিনিই সম্পত্তির মালিক হইবেন।' শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে উপদেশ প্রদানকালে এই কথাই বিশেষ করিয়া বলিতেছেন, ব্রাহ্মণের বংশে জন্মগ্রহণ করিলেই ব্রাহ্মণত্বরূপ সম্পত্তির মালিক হইতে হইবে, তাহা নহে, কিংবা ক্ষত্রিয়ের বংশে উৎপন্ন ব্যক্তি ক্ষত্রিয়ত্ব, বৈশ্যের কুলে উৎপন্ন ব্যক্তি বৈশ্যত্ব ও শূদ্রকুলে উৎপন্ন ব্যক্তি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইবেন, এমন নহে। জীব জন্মের পর, তাহার কর্ম্ম দেখিয়া তাহাতে যে গুণের পরিচয় পাইবে, তদনুসারে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র বলিয়া নির্দ্দেশ এবং ঐ জাতি-পরিচায়ক যে চিহ্ন, তদ্দ্বারা তাহাকে চিহ্নিত করিবে।

ইহা হইল বদ্ধজাতির বিভাগ। ইহারই নাম বর্ণ, এই বর্ণানুসারে যাহার যে-প্রকার কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য, তাহার নাই 'স্বধর্ম্ম'। এক বর্ণের পরিচয় দিয়া অন্য বর্ণের কর্ম্ম করিলে তাহাকে 'পরধর্ম্ম' কহে। প্রত্যেক বদ্ধজীবকে শ্রীভগবান্ স্বধর্ম্ম পালন করিতে বলিতেছেন। এই স্বধর্ম্ম কিভাবে অনুষ্ঠান করিলে স্বধর্ম্মই 'পরধর্ম্মে' পরিণত হইবে এবং আমরা সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার যোগ্য হইব, তাহা বুঝিতে পারিলেই আমরা শ্রীভগবানের অশেষ কল্যাণবাণীর তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিব।

———

শান্তি !!

(১)

কে ব'লবে শান্তি আমার
কোথায় আছে ব'সে ?
ভোরের বায়, সাঁঝের ছায়ায়,
আছে কি সে মিশে ?

(২)

রৌপ্যরূপে আছে কি সে
প্রিয়ার বাহু পাশে ?
আছে কিগো সত্যি শান্তি
সম্ভোগ-ষড়রসে ?

(৩)

সুবাসভরা স্নিগ্ধ ঐ
ফুলের পাপ্‌ড়ি-তলে ?
কিংবা শান্তি আছেরে ঐ
শিশুর বাণীর মূলে ?

(৪)

পিতা, মাতা, ভাই, বোনে,
বন্ধুবর্গ-পরিজনে,
সত্যি ক'রে বল প্রভু !
কোথায় সে কোন্ বনে ?

(৫)

কে যেন ব'ল্‌ছে, শোন,
"শান্তি তোর সঙ্গে ফেরে,"
চিনে নেনা—ওরে মূঢ়
"কেন রে মরিস্ ঘুরে ?"

(৬)

"নেই সে বিষয়-রসে
শব্দ-রূপ-গন্ধ-স্পর্শে,
তবু সে রে সর্ব্বস্থানে,
আছে তোর আত্ম-পাশে !!"

(৭)

"শান্তি শান্তি ক'রে মর,
শান্তিময়ে ফেলে দূরে,
চিত্তে শান্তি ঘটে ভ্রান্তি,
শান্তি পাবে গো কি ক'রে ?"

(৮)

"শান্তি হরি-সেবায় কেবল,
শান্তিরে তোর সৎসঙ্গে !
নাইকো শান্তি কোথাও আর,
শান্তি শুধু সৎপ্রসঙ্গে !!"

(৯)

"ওরে ভ্রান্ত ! দেখরে চেয়ে ;
শান্তি সেই হরিবোলে !
(যে নামে) শিলা গলে, খঞ্জ চলে,
অন্ধ চায় চোখ মেলে !

———

ব্রহ্মচর্য্য বনাম বৈষ্ণবতা

সমালোচনা ছাড়া সাহিত্য হয় না, সহানুভূতি ছাড়া সমালোচনা হয় না, আবার বহুদর্শন ব্যতীত সহানুভূতি হইতে পারে না। অতএব প্রগাঢ় সহানুভূতি-শীল বহুদর্শী ব্যক্তিই সার্থক সাহিত্য সৃষ্টির অধিকারী। শুধু তথ্য-সমৃদ্ধ রচনা হইল ইতিহাস। তথ্য-সমৃদ্ধ জীবন-রসবৈশিষ্ট্যাবেদনপূর্ণ রচনা 'সাহিত্য'। সাহিত্যের লক্ষ্য হইল—রসোত্তীর্ণ হওয়া। "বাক্যং রসাত্মকম্ কাব্যম্।" রসপূর্ণ বাক্যই কাব্যের প্রাণ। কাব্য সাহিত্যান্তর্গত। বৈষ্ণব-সাহিত্যের মূল প্রাণকেন্দ্র হইল—রস, তাই ইহা কালজয়ী। বর্ত্তমান সাহিত্যে সুস্পষ্ট, বলিষ্ঠ ও মৌলিক চিন্তাধারার বড়ই দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে।

আমাদের বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয় **"ব্রহ্মচর্য্য বনাম বৈষ্ণবতা"** নামকরণের মধ্যেই স্পষ্ট যে, ইহা একটী সমালোচনামূলক রচনা। সমালোচনার অর্থ সম বা সম্যক্ অথবা পূর্ণরূপে আলোচনা। অর্থাৎ যে বস্তু যাহা, তাহার ধনাত্মক ও ঋণাত্মক উভয় দিক্ লইয়া আলোচনাই হইল পূর্ণ আলোচনা। দুই বা ততোধিক জিনিষের পারস্পরিক তুলনামূলক মিল, অমিল ও সম্বন্ধ লইয়া আলোচনাই হইল সমালোচনা। আত্ম-সমালোচনা ও তদন্তর্গত কোন একটী প্রাদেশিক বাক্যের উপর জোর দিলে সমালোচনার অর্থ ক্ষুণ্ণ হয়। কোন একটী বিষয়ের একটী দিক্ অর্থাৎ শুধু উৎকর্ষতা বা অপকর্ষতা প্রদর্শনের চেষ্টার নাম—আলোচনা। ইহার মধ্যে উদারতার অভাব থাকিতে পারে, সমালোচনায় সঙ্কীর্ণতার স্থান নাই।

এখন ব্রহ্মচর্য্য কি বৈষ্ণবতার পরিপূরক না পরিপন্থী? অথবা বৈষ্ণবতা ব্রহ্মচর্য্যের পরিপন্থী না অনুপন্থী, ইহা বিচার্য্য। শাস্ত্রে প্রত্যেকটি বাক্যের একটী মুখ্যার্থ ও অপরটী গৌণার্থ, একটী অভিধা ও অপরটী লক্ষণা আছে। উন্নত সাহিত্যেও প্রতি শব্দের প্রতি বাক্যের দুইটী অর্থ থাকে। একটী শব্দার্থ বা বাচ্যার্থ, অপরটি ব্যঙ্গার্থ। শব্দের সামান্য বা সাধারণ অর্থকে ছাপাইয়া যখন মূল অর্থ একটী সুদূর অসাধারণ ব্যঞ্জনা বা আবেদনকে উদ্দেশ করে, তখন তাহাই ব্যঙ্গার্থ বলিয়া শব্দিত হয়। শব্দের সাধারণ অর্থই শব্দ-সামান্য।

'ব্রহ্মচর্য্য' অর্থে একটী আশ্রম-বিশেষ, চারি আশ্রমের সর্ব্বপ্রথম আশ্রম। 'ব্রহ্ম'-শব্দে বেদ-প্রতিপাদ্য বাস্তববস্তুকে বুঝায়। সেই বেদ-প্রতিপাদ্য বাস্তববস্তুই পুরুষোত্তম। 'চর্য্য'-শব্দে মৈথুনাভাব। 'আশ্রম'-শব্দে 'আশ্রয়' ও 'আলোক'। যে আশ্রয়ে একদিকে গুরু, অপরদিকে শিষ্য; একদিকে শিক্ষাদাতা, অপরদিকে

শিক্ষার্থীরা থাকেন। গুরুর আশ্রয়ে থাকিয়া গুরুর নির্দ্দেশে জ্ঞানের আলোকে সেই পুরুষোত্তমের অনুশীলন করিবেন শিক্ষার্থী বা ব্রহ্মচারী। তজ্জন্য তদুপযুক্ত যে-সকল আচার, আচরণ, নিয়ম, নিষ্ঠা ও বিধি-নিষেধের ব্যবস্থা, তাহাই ব্রহ্মচর্য্য। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম—এগুলি এই সমস্ত নিয়ম-নিষ্ঠার অন্তর্গত।

এইসমস্ত আচরণের মুখ্যফলস্বরূপ যিনি নিজস্বরূপ বিশেষরূপে জানেন, স্বধর্ম্ম পরিচালন করেন এবং নিত্যকাল স্বানন্দে মগ্ন, তিনি **"স্বরূপ"** নামক ব্রহ্মচারী। যিনি স্বয়ং জ্যোতির্ব্রহ্মকে বিশেষরূপে জানেন এবং তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশদ্বারা বিশেষরূপে যোগযুক্ত, তিনি **"প্রকাশ"** নামে কথিত। যিনি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া সত্য, জ্ঞান, অনন্ত ও ব্রহ্মকে সর্ব্বদা ধ্যান করেন এবং স্বানন্দে বিহার করেন, তিনি **"আনন্দ"** নামে খ্যাত। যিনি অচিন্মিশ্র-ভাবাতীত চিন্মাত্র, জড়প্রতিফলিত চিত্তবিকার রহিত, অনন্ত, অজর এবং মঙ্গলময় ব্রহ্মকে জানেন, তিনি **"বিদ্বান্"** এবং **"চৈতন্য"** নামে অভিহিত হন। শ্রীশঙ্করমতে প্রধানতঃ ব্রহ্মচারী এই চার প্রকার। যথাযথভাবে ব্রহ্মচর্য্য অনুশীলন করার পর ব্রহ্মচারী গুরুর অনুমতিক্রমে গুরুদক্ষিণা প্রদানান্ত গার্হস্থ্য-জীবনে প্রবেশ করেন, তৎপরে যথাসময়ে বাণপ্রস্থ, অবশেষে সন্ন্যাস-ধর্ম্ম আশ্রয় করেন।

ব্রহ্মচর্য্যকালে ব্রহ্মচারীর স্ত্রী-সংসর্গ, এমনকি স্ত্রী-চিন্তা, স্ত্রী-দর্শনও কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। দেহের যাবতীয় উৎকর্ষতার উৎস হইল বীর্য্য, তাই ব্রহ্মচারী শম, দম, যম, নিয়ম, তপ, শৌচ, আসন, প্রাণায়ামদ্বারা মনের স্থৈর্য্য রক্ষা করিয়া বীর্য্য রক্ষা করিবেন। দুর্ব্বল শরীর প্রবল ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারে না, সেজন্য যোগ-ব্যায়ামাদি শরীরচর্চ্চাদিদ্বারা পেশীসকলকে লৌহবৎ মজবুত করিবেন। নিজের মানসিক উন্নতি কতটা হইতেছে, তাহা লক্ষ্য করিবার জন্য সুচিন্তা ও কুচিন্তায় কতটা সময় ব্যয় হইতেছে, তাহা দিনপঞ্জীতে লিখিয়া নিজেকে সুচিন্তারত করিবার চেষ্টা করিবেন। প্রবল কামরিপুকে জয় করাই এই আশ্রমের মুখ্য উদ্দেশ্য। অবশেষে কেহ কেহ 'অহং ব্রহ্মাস্মি' চিন্তায় ব্যাপৃত থাকিবেন। কেহ কেহ বেদ-পাঠে বিপ্র হইবেন। কেহ শুধু শরীর লইয়াই ব্যস্ত থাকিবেন। ব্রহ্মচারীর এই সমস্ত ব্রহ্মচর্য্যই দেহ ও মনোধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া।

অবলম্বনহীন অর্থাৎ সম্বন্ধহীন অবস্থা যত সুউচ্চই হউক, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। কারণ তাহাতে ভগবানের কি আসে যায়? তাহাতে ভগবৎপ্রীতির কোন অপেক্ষা নাই। দেহাতিরিক্ত সেই পরাৎপর তত্ত্বের প্রীত্যনুসন্ধান ইহাদের লক্ষ্যবস্তু নহে এবং তাহাতে ইহাদের অধিকারও নাই। তজ্জন্য ইহাদের সমস্ত শ্রমই পরিণামে পণ্ডশ্রমে পরিণত হয়। এই সমস্ত ব্রহ্মচর্য্যই বিদ্ধ, অপাংক্তেয়,

অতএব হেয়। ভাগ্যফলে অকস্মাৎ কোন তদুপযুক্ত গুরুর সংস্পর্শে আসিলে ইহারা বিষ্ণুভজনে অধিকারী হন। প্রকৃতপ্রস্তাবে শুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্যের অর্থ পরে আলোচনা করা যাইতেছে।

বিষ্ণুর ভজনকারিগণই বৈষ্ণব। এই অর্থে গণেশাদি পঞ্চদেবতার উপাসকগণও নিজেদের 'বৈষ্ণব' বলিয়া দাবী করেন। কিন্তু ইহাদের উপাসনার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হইল—ফলাকাঙ্ক্ষা। তাই ইহারা কর্ম্মী। বৈষ্ণবের বাহ্যবেশ বা কোন আচার-আচরণাদিদ্বারা শুদ্ধ-বৈষ্ণব চিহ্নিত করা সম্ভবপর নহে। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু কুলীনগ্রামবাসী ভক্তগণকে বৈষ্ণব চিনিবার অধিকারের বিষয় উপদেশ করিলেন। যাঁহার মুখে একবারও কৃষ্ণনাম আসে, তাঁহাকে 'কনিষ্ঠ' বৈষ্ণব বলিয়া জানিবে। যিনি নিরন্তর হরিনাম করেন, তিনি 'মধ্যম' বৈষ্ণব এবং যাঁহাকে দেখিলে আপনা-আপনি মুখে হরিনাম আসে, তিনিই 'উত্তম' বৈষ্ণব। শুদ্ধবৈষ্ণবের স্বাভাবিক আচার-আচরণই বৈষ্ণবতা। শুধু লোকদেখানো তিলক, মালা ও বেশ-ভূষাদি ধারণ ও উদ্দেশ্যমূলকভাবে কৃত্রিম দৈন্যাদি ও লোক-ব্যবহার বৈষ্ণবতা নহে।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীক্ষেত্রে থাকাকালীন তাঁহার শরীরে মালা-তিলক ইত্যাদি বাহ্যাড়ম্বরাদি না থাকায় এক কন্থাপরিহিত বৈষ্ণব-নামে পরিচিত ব্যক্তি তাঁহার নিন্দা করিয়াছিলেন। ফলস্বরূপ তিনি যথার্থ শিক্ষা পাইয়াছিলেন। বস্তুতঃ বাহ্যিক নিয়ম-কানুন ও বিধি-নিষেধ এক জিনিস, আর শুদ্ধ-বৈষ্ণবতা সম্পূর্ণ পৃথক্ জিনিস। এই অবকাশে অপরপক্ষ নিশ্চয় প্রশ্ন তুলিবেন, তবে কি মালা-তিলকাদি বৈষ্ণব-বিধিসকল অবৈষ্ণবতা এবং মালা-তিলকহীন অবস্থাই বৈষ্ণবতা? বস্তুতঃ তাহা নহে। বাহ্যিক চিহ্নসকল একটী বিশেষ সম্প্রদায়, একটী বিশেষ গোষ্ঠী ও তাঁহাদের ভজন-বিষয় ও নিষ্ঠা নির্দ্দেশ করে ও নিষ্ঠা উৎপন্ন করায়, অর্থাৎ শিক্ষানবিশী অবস্থা, কিন্তু "মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ"—মহাপুরুষদের আচার-আচরণ-সকলই বিধি। কারণ সমস্ত বিধি ও নিষেধ সেই পরমপুরুষ প্রেমময় ভগবানকে কেন্দ্র করিয়াই রচিত ও প্রতিষ্ঠিত। সেই পরমপুরুষ শুদ্ধ-বৈষ্ণবের হৃদয়ে সর্ব্বদা বিশ্রাম করেন। তিনি যাহাই করুন, তাঁহার মধ্যে সর্ব্বদা বিধি অনুস্যূত থাকে। তাই তাঁহার আচরণই বিধি। অনধিকারী কথায় কথায় তাঁহাকে টানিয়া তাহার সমপর্য্যায়ে ফেলিয়া তুলনা করিলে অপরাধে পতিত হইবে। অনধিকারীর অধিকার-প্রাপ্তির জন্যই বিধি-নিষেধের ব্যবস্থা। অধিকারী-ব্যক্তি বিধি-নিষেধাতীত। অনধিকারীর অন্তঃকরণে সদ্‌বস্তুর অনুভব নাই, তাই বাহ্যবেশই তাহার আপাতঃ অবলম্বন। (ক্রমশঃ)

—শ্রীবীরভদ্র দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-মহোৎসব

শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ, শিলিগুড়ি (দার্জ্জিলিং)

বর্ত্তমান বর্ষে শ্রীসমিতির সভাপতি-আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের উপস্থিতিতে ও আনুগত্যে শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠে বিশেষ উৎসাহ-উদ্দীপনাসহকারে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের জন্মাষ্টমী-তিথি উদ্‌যাপিত হয়। এতদুপলক্ষে পূর্ব্ব-প্রচারিত অনুষ্ঠান-সূচী অনুযায়ী গত ২৫শে শ্রাবণ, ১৪০০ (ইং ১০।৮।৯৩), মঙ্গলবার বেলা ১০ ঘটিকায় এক বিশাল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন রাজপথ পরিক্রমা করেন।

হস্তী, অশ্ব, ব্যাণ্ড ও চলন্ত গাড়ীতে বিভিন্ন প্রদর্শনী-সমন্বিত এই শোভাযাত্রা যখন শহরের মধ্য দিয়া চলিতেছিল তখন শহরবাসী উৎসুক জনসাধারণ পুষ্প ও ফল-মূলাদি বর্ষণ করিতেছিলেন। সর্ব্বোপরি কীর্ত্তনদল মহামন্ত্র ও ব্রজের বিভিন্ন ভজন-কীর্ত্তনদ্বারা এই শোভাযাত্রাকে প্রাণবন্ত করিয়া তোলেন।

শ্রীজন্মাষ্টমী-তিথিতে অর্থাৎ ২৬শে শ্রাবণ (ইং ১১।৮।৯৩), বুধবার সারাদিবস-ব্যাপী শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী পারায়ণ হয়। সন্ধ্যায় ব্রহ্মচারিগণ মহাজন-পদাবলী ও বিভিন্ন ভজন-কীর্ত্তন করেন। তৎপরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত গোবিন্দ মহারাজ ও শ্রীবাঁকেবিহারী ব্রহ্মচারী 'শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী' সম্পর্কে ভাষণ প্রদান করেন। অতঃপর রাত্রি ১২টায় অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের শুভাবির্ভাব-মুহূর্ত্তে শ্রীবিগ্রহগণের অভিষেক, আরতি ও ভোগরাগাদি সম্পন্ন হয়। তৎপরে উপস্থিত সকল ভক্ত-বৃন্দকে অনুকল্প প্রসাদ পরিবেশন করা হয়।

নন্দোৎসব-দিবসে (২৭শে শ্রাবণ, ইং ১২।৮।৯৩) আহূত, অনাহূত ও রবাহূত দ্বি-সহস্রাধিক ব্যক্তিকে সুস্বাদু মহাপ্রসাদ পরিবেশন করা হয়।

তিনদিনব্যাপী এই মহোৎসবের সংবাদ 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ', 'পূর্ব্বাচল ভারত দর্পণ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং সকল অনুষ্ঠানের আলোকচিত্র ভি. ডি. ও. ফিল্মে ধরা হয়। শ্রীরমেশ চাচানজী-পরিচালিত 'শ্রীপঞ্চমুখী বালাজী ভজন মণ্ডল' শোভাযাত্রায় বিশেষ সাহায্য-সহানুভূতি করিয়া শ্রীসমিতির ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ, তুরা (মেঘালয়)

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির শাখাকেন্দ্র শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী বিশেষ সমারোহের সহিত উদ্‌যাপিত হয়। অধিবাসের দিন এক সুদৃশ্য তোরণদ্বারসহ শ্রীমঠকে সুসজ্জিত করা হয়।

১১।৮।৯৩ তারিখে অর্থাৎ শ্রীজন্মাষ্টমীর দিন সন্ধ্যা ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত এক মহতী ধর্ম্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্ম্মসভার আলোচ্য বিষয় ছিল,—"Lord Shri Krishna and Bhaktiyoga"। উক্ত ধর্ম্মসভায় পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পুরী মহারাজ, শ্রীভক্তিবেদান্ত যতি মহারাজ, শ্রীভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ, শ্রীখগেনকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমচাঁদ শর্ম্মা প্রমুখ বক্তৃতা প্রদান করেন।

১২।৮।৯৩ অর্থাৎ নন্দোৎসবের দিন প্রায় ত্রিসহস্রাধিক ভক্তগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যা ৭টায় অনুষ্ঠিত ধর্ম্মসভার আলোচ্য বিষয় ছিল,—"Kaliyugadharma—Namsankirtan।" উক্ত ধর্ম্মসভায় পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত যতি মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ, Shri Ramananda Bhattacharyya (Principal, Tura Govt College), Prop. T. K. Das (Tura Govt. College), Prof. Girish Kumar (Tura Don Bosco College), Prof. K. P. Choudhury (Tura Govt. College) প্রমুখ বক্তৃতা প্রদান করেন।

১৩।৮।৯৩ তারিখে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত বিদ্যাপীঠের (English Medium) ছাত্রছাত্রীরা এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। শ্রীভক্তিবেদান্ত যতি মহারাজ কৃতি ছাত্রছাত্রীদিগকে পুরস্কার বিতরণ করেন। প্রত্যহ ধর্ম্মসভার শেষে শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ দাসাধিকারী রামায়ণ গান পরিবেশন করেন। এইবারে জন্মাষ্টমী উৎসবের অন্যতম আকর্ষণীয় বিষয় ছিল,—"মূর্ত্তি-সহযোগে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাম ও শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলার বিভিন্ন প্রদর্শনী।" এই উৎসবে শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমুকুন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্বেতকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীরোহিনীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীযদুকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীবটকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীকীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপূর্ণানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীনন্দদুলাল দাসাধিকারী, শ্রীজ্যোতিষকুমার মহান্ত, শ্রীরতনকুমার সাহা প্রমুখের সেবাপ্রচেষ্টা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

বলাবাহুল্য, এই শ্রীজন্মাষ্টমী-মহোৎসব সমিতির মূলকেন্দ্র ও অন্যান্য সকল শাখামঠসমূহেও বিশেষ সমারোহে উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

—নিজস্ব সংবাদ

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪৫শ বর্ষ | ১৭ দামোদর, প্রহ্যুম্ন, ৫০৭ শ্রীগৌরাব্দ | ৯ম সংখ্যা
৩০ কার্ত্তিক, মঙ্গলবার, ১৪০০, ইং ১৬/১১/৯৩

(শ্রীকৃষ্ণ)-প্রণাম-প্রণয়াখ্য-স্তবঃ

[শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতঃ]

শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ

কন্দর্পকোটি-রম্যায় স্ফুরদিন্দীবর-ত্বিষে।
জগন্মোহন-লীলায় নমো গোপেন্দ্র-সূনবে॥ ১॥

যিনি কোটি-কন্দর্পের ন্যায় রমণীয়, বিকসিত নীল-পদ্মের ন্যায় যাঁহার অঙ্গ-কান্তি, যিনি চমৎকার লীলাপ্রকাশে ত্রিজগৎ মুগ্ধ করিতেছেন, সেই গোপেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি॥ ১॥

কৃষ্ণলা-কৃতহারায় কৃষ্ণ-লাবণ্যশালিনে।
কৃষ্ণ-কূল-করীন্দ্রায় কৃষ্ণায় করবৈ নমঃ॥ ২॥

যিনি গুঞ্জাহার-ভূষণে ভূষিত, ইন্দ্রনীল-মণির ন্যায় যাঁহার লাবণ্য এবং যিনি কালিন্দী-কূলের করীন্দ্র-স্বরূপ, সেই শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি ॥ ২ ॥

সর্ব্বানন্দ-কদম্বায় কদম্ব-কুসুমস্রজে ।
নমঃ প্রেমাবলম্বায় প্রলম্বারি-কনীয়সে ॥ ৩ ॥

যিনি অখিল আনন্দের কারণ-স্বরূপ, কদম্ব-কুসুম-মালায় যাঁহার বক্ষঃস্থল সুশোভিত, যিনি ভক্তগণের প্রেমদ্বারা বশীভূত হন, সেই রামানুজ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি ॥ ৩ ॥

কুণ্ডল-স্ফুরদংসায় বংশায়ত্ত-মুখশ্রিয়ে ।
রাধা-মানস-হংসায় ব্রজোত্তংসায় তে নমঃ ॥ ৪ ॥

দোদুল্যমান কর্ণকুণ্ডলদ্বারা যাঁহার স্কন্দদেশ সুশোভিত, বংশী-বাদনহেতু ঈষৎ বক্রীকৃত মুখমণ্ডলদ্বারা যিনি সুশোভিত, যিনি শ্রীরাধিকার চিত্তরূপ মানস-সরোবরের হংসস্বরূপ, ব্রজবাসিগণের শিরোভূষণ-স্বরূপ সেই শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি ॥ ৪ ॥

নমঃ শিখণ্ড-চূড়ায় দণ্ড-মণ্ডিত-পাণয়ে ।
কুণ্ডলীকৃত-পুষ্পায় পুণ্ডরীকেক্ষণায় তে ॥ ৫ ॥

ময়ূর-পুচ্ছে যাঁহার চূড়া সুশোভিত, যিনি গো-রক্ষণের নিমিত্ত রত্নখচিত দণ্ড ধারণ করিতেছেন, পুষ্প-নির্ম্মিত কর্ণ-কুণ্ডলে যাঁহার কর্ণযুগল ভূষিত, সেই পুণ্ডরীক-নয়ন শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি ॥ ৫ ॥

রাধিকা-প্রেম-মাধ্বীক-মাধুরী-মুদিতান্তরম্ ।
কন্দর্পবৃন্দ-সৌন্দর্য্যং গোবিন্দমভিবাদয়ে ॥ ৬ ॥

শ্রীরাধিকার প্রেমরূপ রসমাধুরী পান করিয়া যাঁহার অন্তঃকরণ সর্ব্বদা হর্ষযুক্ত ও কন্দর্পকোটির ন্যায় যাঁহার সৌন্দর্য্য, সেই শ্রীগোবিন্দকে আমি অভিবাদন করি ॥ ৬ ।

শৃঙ্গাররস-শৃঙ্গারং কর্ণিকারত্ত-কর্ণিকম্ ।
বন্দে শ্রিয়া নবাভ্রাণাং বিভ্রাণং বিভ্রমং হরিম্ ॥ ৭ ॥

যিনি শৃঙ্গার-রসের ভূষণ-স্বরূপ, যিনি কর্ণিকার-কুসুমদ্বারা কর্ণভূষণ করিয়াছেন, যিনি শ্রীঅঙ্গ-কান্তিদ্বারা নবীন মেঘের ন্যায় ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়াছেন, সেই শ্রীহরিকে আমি বন্দনা করি ॥ ৭ ॥

সাধ্বীব্রত-মণিব্রাত-পশ্যতোহর-বেণবে ।
কহ্লারকৃত-চূড়ায় শঙ্খচূড়-ভিদে নমঃ ॥ ৮ ॥

যাঁহার বংশী, সাধ্বী রমণীগণের ধর্ম্মনিষ্ঠা-রূপ রত্ন-নিচয়ের অপহারিকা, পদ্মপুষ্প-দ্বারা যাঁহার চূড়া সুশোভিত এবং যিনি শঙ্খচূড়-নামক কংস-ভৃত্যের নিহন্তা, সেই শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি ॥ ৮ ॥

রাধিকাধর-বন্ধুক-মকরন্দ-মধুব্রতম্ ।
দৈত্য-সিন্ধুর-পারীন্দ্রং বন্দে গোপেন্দ্র-নন্দনম্ ॥ ৯ ॥

শ্রীরাধিকার অধররূপ বন্ধুক-পুষ্পের মকরন্দ-পানে যিনি ভ্রমর-স্বরূপ এবং যিনি দানব-রূপ-মাতঙ্গগণের সিংহস্বরূপ, সেই গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি ॥ ৯ ॥

বর্হেন্দ্রায়ুধ-রম্যায় জগজ্জীবন-দায়িনে ।
রাধা-বিদ্যুদ্বৃতাঙ্গায় কৃষ্ণাম্ভোদায় তে নমঃ ॥ ১০ ॥

যিনি ময়ূরপুচ্ছরূপ ইন্দ্রধনুদ্বারা কমনীয় মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, যিনি জগতের জীবনদাতা এবং শ্রীরাধিকারূপ বিদ্যুন্মালায় যাঁহার শ্রীঅঙ্গ সুশোভিত, সেই শ্রীকৃষ্ণরূপ নবীন মেঘকে প্রণাম করি ॥ ১০ ॥

প্রেমান্ধ-বল্লবীবৃন্দ লোচনেন্দীবরেন্দবে ।
কাশ্মীর-তিলকাঢ্যায় নমঃ পীতাম্বরায় তে ॥ ১১ ॥

যিনি প্রেমান্ধ ব্রজ-বণিতাগণের নয়নরূপ ইন্দীবরের চন্দ্র-স্বরূপ এবং যিনি কুঙ্কুম-রচিত তিলকে সুশোভিত, সেই পীতাম্বর শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি ॥ ১১ ॥

গীর্ব্বাণেশ-মদোদ্দাম-দাব-নির্ব্বাণ-নীরদম্ ।
কন্দুকীকৃত-শৈলেন্দ্রং বন্দে গোকুল-বান্ধবম্ ॥ ১২ ॥

যিনি দেবরাজ ইন্দ্রের প্রগাঢ় গর্ব্বরূপ দাবানল নির্ব্বাণে নবীন মেঘ-স্বরূপ এবং যিনি গিরিরাজ গোবর্দ্ধনকে ক্রীড়া-কন্দুকের ন্যায় উত্তোলন করিয়াছিলেন, সেই গোকুল-বন্ধু শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি ॥ ১২ ॥

দৈন্যার্ণবে নিমগ্নোঽস্মি মন্দগ্রাবভরার্দ্দিতঃ ।
তুষ্টে কারুণ্য-পারীণ ময়ি কৃষ্ণ কৃপাং কুরু ॥ ১৩ ॥

হে কারুণ্যবারিধে ! হে শ্রীকৃষ্ণ ! আমি অপরাধরূপ পাষাণ-ভারগ্রস্ত হইয়া দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইয়াছি ; অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক এই মন্দ ব্যক্তিকে উদ্ধার করুন ॥ ১৩ ॥

আধারোঽপ্যপরাধানামবিবেক-হতোঽপ্যহম্ ।
ত্বৎকারুণ্য-প্রতীক্ষোঽস্মি প্রসীদ ময়ি মাধব ॥ ১৪ ॥

হে মাধব ! আমি শত শত অপরাধের আধার ও অজ্ঞান-প্রভাবে হতচিত্ত হইয়া এক্ষণে আপনার কারুণ্যের প্রতীক্ষা করিতেছি ; অতএব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ১৪ ॥

প্রশ্নোত্তর

শ্রীকৃষ্ণপার্ষদ

১। বৈকুণ্ঠে ভক্তগণের কি কি বিচিত্রতা আছে ?

"বৈকুণ্ঠে পঞ্চ প্রকার ভক্ত নিত্য বর্ত্তমান—(১) জ্ঞানভক্ত, (২) শুদ্ধভক্ত, (৩) প্রেমভক্ত, (৪) প্রেমপরভক্ত এবং (৫) প্রেমাতুর ভক্ত। মুক্তিতে তুচ্ছ-বুদ্ধির সহিত ভগবৎপাদপদ্মে ভক্তি-মহিমাদি-জ্ঞানমিশ্র নববিধ সেবা-ভক্তি-বিশিষ্ট ভরতাদিই জ্ঞানভক্ত। কর্ম্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্যশূন্য কেবলভক্তিকাম অম্বরীষাদিই শুদ্ধভক্ত। প্রীতির সহিত সেবামাত্র-বাসনা-যুক্ত শ্রীহনূমানাদিই প্রেম-ভক্ত। ভগবৎকৃপাজনিত বিশুদ্ধ প্রেমোৎপাদিত তদ্দর্শনোৎকণ্ঠ নর্ম্মসখ্য সৌহৃদাদি-শৃঙ্খলবদ্ধ অর্জ্জুনাদিই প্রেমপর ভক্ত। সর্ব্বদা প্রেমসম্পত্তিবিহ্বল বিচিত্র প্রেম-সম্বন্ধাকৃষ্টাশয় শ্রীউদ্ধবাদিই প্রেমাতুর ভক্ত।"

—বৃঃ ভাঃ, তাৎপর্য্যানুবাদ

২। বৈকুণ্ঠে কি নারায়ণের মাতা-পিতা আছেন ?

"বৈকুণ্ঠে নিত্য-মাতা-পিতার সম্ভাবনা নাই ; কেন না তাহা বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্য-বিরুদ্ধ ; অথচ নন্দ-যশোদাদির প্রেমাতুর গতি মনে করিলে ভক্তগণের শরীর শিহরিয়া উঠে।"

—বৃঃ ভাঃ, তাৎপর্য্যানুবাদ

৩। শুদ্ধব্রজানুগত ও নবদ্বীপানুগত ভক্তগণের অবস্থিতি কোথায় ?

"রসভেদে ভক্তগণের গোলোকে পৃথক্ পৃথক্ স্থিতি কৃষ্ণের অবিচিন্ত্য শক্তিদ্বারা নির্ণীত আছে। শুদ্ধব্রজানুগত ভক্তগণ কৃষ্ণলোকে এবং শুদ্ধনবদ্বীপানুগত ভক্তগণ গৌরলোকে অবস্থিত হন। ব্রজ ও নবদ্বীপের ঐক্যসেবাগত ভক্তগণ কৃষ্ণলোক ও গৌরলোকে যুগপৎ সেবা-সুখ লাভ করেন।"

—ব্রঃ সং ৫।৫

৪। চিদ্বিলাসগত ভক্তগণ কি ঐশ্বর্য্যমুগ্ধ হন ?

"চিদ্বিলাসগত ভক্তগণ ভগবন্মাধুর্য্যে সর্ব্বদা এতদূর মুগ্ধ থাকে যে, ঐশ্বর্য্য-সত্ত্বেও তাহা তাঁহাদের নিকট প্রতীত হয় না। এ অবিদ্যা মায়াভাবগতা নয়।"

—কৃঃ সং ৪।১৬

শক্তিতত্ত্ব

১। শক্তি ও শক্তিমান্ কি পৃথক্ ?

"পৃথক্ হইয়াও বস্তু ও বস্তুশক্তি অপৃথক্ ; পার্থক্য ও অপার্থক্য যুগপৎ সিদ্ধ। এতন্নিবন্ধন বস্তু ও বস্তুশক্তির অচিন্ত্যভেদাভেদাত্মক স্বভাব।"

—শ্রীমঃ শিঃ ৪র্থ পঃ

২। শক্তির অদ্বয়ত্ব ও অনন্তত্ব কিরূপে যুক্তিযুক্ত ?

"নৌকা-গঠনের সময় নির্ম্মাতা যে ভাবাপন্ন হয়, গৃহ-গঠনের সময় তাহার ভিন্ন একটী ভাবের উদয় হয়, স্বীকার করিতে হইবে। গঠন-সামর্থ্য একই শক্তি, কেবল ভাবসকলের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ-মাত্র, অতএব শক্তির অদ্বয়ত্ব ও আনন্ত্য-সম্বন্ধে কোন বিরোধ নাই।"

—তঃ সূঃ, ৬ সূঃ

৩। 'শক্তি' কেন স্ত্রীরূপা ?

"শক্তি পরাধীনা, এ প্রযুক্ত স্ত্রীরূপে কল্পিতা হইয়া শক্তিমান্ চৈতন্যের আলিঙ্গনের পাত্রী হইয়াছেন। তত্ত্বে যৎকিঞ্চিৎ পরিষ্কার মনোগম্যভাব সংযোগ করিবার প্রার্থনায় ব্রহ্মর্ষিগণ আলঙ্কারিক বিবরণ করেন। বস্তুতঃ রাধাকৃষ্ণ একই পরম-তত্ত্ব।"

—তঃ সূঃ, ৭ সূঃ

৪। অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা শক্তির স্বরূপ ও কার্য্য কি ?

"ভগবদন্তরঙ্গা স্বরূপ-শক্তির অণুপ্রকাশস্থলীয় তটস্থা জীবশক্তি, ছায়া-প্রকাশ-স্থলীয় বহিরঙ্গা মায়াশক্তি। জীবশক্তির অন্বয় বা অণুবৃত্তি-ক্রমে জৈবজগৎ। মায়া-শক্তির অন্বয়ক্রমে জড়জগৎ। জীবের ব্যতিরেক বা ব্যাবৃত্তি-বুদ্ধি কিংবা মিথ্যাভিমানরূপ বিবর্ত্তক্রমে তাঁহার জগৎ সম্বন্ধ।"

—'সূচনা', শ্রীভাঃ মাঃ ১।১

৫। শক্তির কি কি বিশেষ বিক্রম ?

"শক্তির বিশেষরূপ বিক্রম ত্রিবিধ—সন্ধিনী-বিক্রম, সম্বিদ্-বিক্রম ও হ্লাদিনী-বিক্রম। সন্ধিনী-বিক্রম হইতে সমস্ত সত্তা। শরীরসত্তা, শেষসত্তা, কালসত্তা, সঙ্গসত্তা, উপকরণসত্তা প্রভৃতি সমুদায় সত্তাই সন্ধিনী-নির্ম্মিত (প্রকটিত)। সম্বিদ্-বিক্রম হইতে সম্বন্ধ জ্ঞাতের ভাব। হ্লাদিনী-বিক্রম হইতে সমস্ত রস। সত্তা ও সম্বন্ধ-ভাব-সকলের শেষ প্রয়োজনই 'রস'। যাঁহারা বিশেষ মানেন না অর্থাৎ নির্ব্বিশেষবাদী, তাঁহারা অরসিক। বিশেষই রসের জীবন।" —প্রেঃ প্রঃ ৯ম প্রঃ

৬। স্বরূপ-শক্তিকে বেদ কি নামে অভিহিত করেন ?

"শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্রা স্বরূপ-শক্তির নাম—শবল।"

—শ্রীমঃ শিঃ ৩য় পঃ

৭। সন্ধিনী-শক্তির কার্য্য কি ?

"সা শক্তিঃ সন্ধিনী ভূত্বা সত্তাজাতং বিতন্যতে।
পীঠসত্তাস্বরূপা সা বৈকুণ্ঠরূপিণী সতী॥

কৃষ্ণাদ্যাখ্যাভিধা সত্তা রূপসত্তা কলেবরম্।
রাধাদ্যা সঙ্গিনী-সত্তা সর্ব্বসত্তাতু সন্ধিনী ॥
সন্ধিনীশক্তিসম্ভূতাঃ সম্বন্ধা বিবিধা মতাঃ।
সর্ব্বাধারস্বরূপেয়ং সর্ব্বাকারা সদংশকা ॥

অর্থাৎ সন্ধিনী হইতে সমস্ত সত্তাজাত উদিত হইয়াছে। পীঠসত্তা, অভিধাসত্তা, রূপসত্তা, সঙ্গিনীসত্তা, সম্বন্ধসত্তা, আধারসত্তা ও আকার প্রভৃতি সমস্ত সত্তাই সন্ধিনী-সম্ভূতা। সেই পরাশক্তির তিন প্রকার প্রভাব অর্থাৎ চিৎপ্রভাব, জীবপ্রভাব ও অচিৎপ্রভাব। চিৎপ্রভাবটি স্বগত এবং জীব ও অচিৎপ্রভাবদ্বয় বিভিন্ন-তত্ত্বগত। শক্তির প্রভাবানুসারে ভাবসকলের ভিন্ন-ভিন্ন বিচার করা যাইতেছে। চিৎ-প্রভাবগত পরাশক্তির সন্ধিনী-ভাগবত পীঠসত্তাই বৈকুণ্ঠ; তাঁহার অভিধা-সত্তা হইতে কৃষ্ণাদি নাম; রূপ-সত্ত হইতে কৃষ্ণ-কলেবর, সঙ্গিনী ও রূপ-সত্তার মিশ্রভাব হইতে শ্রীরাধাদি প্রেয়সী; সন্ধিনী শক্তি হইতে সমস্ত সম্বন্ধের উদয় হয়; সদংশ-স্বরূপ সন্ধিনীই সর্ব্বাধার ও সর্ব্বাকার স্বরূপা।"

—কৃঃ সং ২।৩-৫

৮। সম্বিৎ-শক্তির কার্য্য কি?

"সম্বিদ্ভূতা পরা শক্তির্জ্ঞান-বিজ্ঞানরূপিণী।
সন্ধিনীনির্ম্মিতে সত্ত্বে ভাবসংযোজিনী সতী ॥
ভাবাভাবে চ সত্তায়াং ন কিঞ্চিদপি লক্ষ্যতে।
তস্মাত্তু সর্ব্বভাবানাং সম্বিদেব প্রকাশিনী ॥
সন্ধিনীকৃতসত্ত্বেষু সম্বন্ধ-ভাবযোজিকা।
সম্বিদ্রূপা মহাদেবী কার্য্যাকার্য্যবিধায়িনী ॥
বিশেষাভাবতঃ সম্বিৎ কার্য্যাকার্য্যবিধায়িনী।
বিশেষসংযুতা সা তু ভগবদ্ভক্তিদায়িনী ॥

অর্থাৎ সম্বিদ্ভাবগতা পরাশক্তিই জ্ঞান ও বিজ্ঞান-রূপিণী। তদ্দ্বারা সন্ধিনী-নির্ম্মিত সত্ত্বসকলে সমস্ত ভাবের প্রকাশ হয়। ভাবসকল না থাকিলে সত্তার অবস্থান জানা যাইত না। অতএব সম্বিৎকর্ত্তৃক সমস্ত তত্ত্বই প্রকাশ হয়। চিৎ-প্রভাবগত সম্বিৎকর্ত্তৃক বৈকুণ্ঠস্থ সমস্ত ভাবের উদয় হইয়াছে। কার্য্যাকার্য্য-বিধানকর্ত্রী সম্বিদ্দেবীই বৈকুণ্ঠস্থ সকল সম্বন্ধভাব যোজনা করিয়াছেন। শান্ত-দাস্য প্রভৃতি রস ও ঐ সকল রসগত সাত্ত্বিক কার্য্যসমুদায় সম্বিৎ-কর্ত্তৃক ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। বিশেষ-ধর্ম্মকে আশ্রয় না করিলে সম্বিদ্দেবী নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মভাবকে উৎপন্ন করেন এবং তৎকালে জীবগত সম্বিৎ ব্রহ্মজ্ঞান আশ্রয় করে। অতএব

ব্রহ্মজ্ঞান কেবল বৈকুণ্ঠের নির্ব্বিশেষ আলোচনা-মাত্র। বিশেষ-ধর্ম্মের আশ্রয়ে সম্বিদ্দেবী ভগবদ্ভাবকে প্রকাশ করেন। তৎকালে জীবগত সম্বিৎকর্ত্তৃক ভগবদ্ভক্তির ব্যাপ্তি গৃহীত হইয়া থাকে।"　　—কৃঃ সং ২।৬-৯

৯। হ্লাদিনী-শক্তির কার্য্য কি?

"হ্লাদিনীনাম-সংপ্রাপ্তা সৈব শক্তিঃ পরাখ্যিকা।
মহাভাবাদিষু স্থিত্বা পরমানন্দদায়িনী॥
সর্ব্বোর্দ্ধ্ব-ভাবসম্পন্না কৃষ্ণার্দ্ধরূপধারিণী।
রাধিকাসত্ত্বরূপেণ কৃষ্ণানন্দময়ী কিল॥
মহাভাবস্বরূপেয়ং রাধা কৃষ্ণবিনোদিনী।
সখ্যঃ অষ্টবিধা ভাবা হ্লাদিন্যা রসপোষিকাঃ॥
তত্তদ্ভাবগতা জীবা নিত্যানন্দ পরায়ণাঃ।
সর্ব্বদা জীবসত্তায়াং ভাবানাং বিমলা স্থিতিঃ॥

অর্থাৎ চিৎপ্রভাবগত পরাশক্তি যখন হ্লাদিনীভাব সংপ্রাপ্ত হন, তখন মহাভাব পর্য্যন্ত রাগ-বৈচিত্র্য উৎপত্তি করিয়া তিনি পরমানন্দদায়িনী হন। সেই হ্লাদিনী সর্ব্বোদ্ধ্ব-ভাবসম্পন্না হইয়া শক্তিমানের শক্তিস্বরূপা তদর্দ্ধরূপিণী রাধিকা-সত্তাগত অচিন্ত্য কৃষ্ণানন্দরূপ এক অনির্ব্বচনীয় তত্ত্বের ব্যাপ্তি করেন। সেই কৃষ্ণবিনোদিনী রাধা মহাভাবস্বরূপা হয়েন, সেই হ্লাদিনীর রসপোষিকারূপ অষ্টবিধ ভাব আছে, তাঁহারাই রাধিকার অষ্ট সখী। জীবগত হ্লাদিনীশক্তি যখন জীবসত্তায় কার্য্য করেন, তখন সাধুসঙ্গ বা কৃষ্ণ-কৃপাবলে যদি চিদ্গত-হ্লাদিনী-কার্য্য কিয়ৎপরিমাণে অনুভূত হয়, তবে তত্তদ্ভাবগত হইয়া জীবসকল নিত্যানন্দ-পরায়ণ হইয়া উঠে এবং জীবসত্তাতেই বিমল-ভাবের নিত্যস্থিতি ঘটে।"　　—কৃঃ সং ২।১০-১৩

১০। হ্লাদিনীর স্বরূপ কি?

"হ্লাদিনী-নাম্নী মহাশক্তি সর্ব্বশক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা। শ্রীরাধিকা সেই হ্লাদিনীসারভাব।"　　—জৈঃ ধঃ ৩৩শ অঃ

১১। হ্লাদিনী-শক্তির বিক্রম কি?

"হ্লাদিনী-শক্তির কৃপা ব্যতীত জীব প্রেমরূপ-প্রয়োজন-লাভের অধিকারী হন না। হ্লাদিনীর বল পাইয়া জীবের চিদ্বৃত্তি ব্রহ্মধাম ভেদপূর্ব্বক পরব্যোমে যাইতে পারেন।"　　—শ্রীমঃ শিঃ ১১শ পঃ

১২। চিচ্ছক্তি ও মায়াশক্তিতে সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনীর কার্য্য কি কি?

"তিন শক্তির প্রভাবদ্বারা চিজ্জগৎ, জৈবজগৎ ও জড়জগৎ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রভাবে সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনীরূপা তিনটী বৃত্তি লক্ষিত হয়। চিচ্ছক্তিতে

যে সন্ধিনী বৃত্তি, তাহার কার্য্যরূপে চিদ্ধাম, চিদবয়ব, চিদুপকরণ ইত্যাদি সর্ব্ব-প্রকার চিদ্বৈভবের উদয় হইয়াছে ; কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণরূপ, কৃষ্ণগুণ ও কৃষ্ণলীলা সমুদায়ই সন্ধিনীর কার্য্য। চিচ্ছক্তির যে সম্বিদ্‌বৃত্তি, তাহার কার্য্যস্বরূপ সমস্ত চিন্তামণি ভাবের উদয় হইয়াছে। চিচ্ছক্তির যে হ্লাদিনী বৃত্তি, তাহার কার্য্যস্বরূপ সমস্ত প্রেমানন্দের অনুশীলন হইতেছে। জীবশক্তিতে যে সন্ধিনী, তাহার কার্য্যস্বরূপ জীবের চিন্ময় সত্তা, নাম ও স্থান সমুদিত হইয়াছে ; তাহাতে যে সম্বিৎ-শক্তি তাহার কার্য্যস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানাদির উদয় হয় ; তাহাতে যে হ্লাদিনী, তৎকার্য্যস্বরূপ ব্রহ্মানন্দ ক্রিয়া লাভ করে। অষ্টাঙ্গযোগ-গত সমাধি-সুখ বা কৈবল্য-সুখও তাহার কার্য্য-বিশেষ। মায়া-শক্তিতে যে সন্ধিনীবৃত্তি আছে, তাহার কার্য্যস্বরূপ চতুর্দ্দশ-লোকময় সমস্ত জড় বিশ্ব, বদ্ধজীবের জড় ও লিঙ্গ শরীরদ্বয়, বদ্ধ-জীবের স্বর্গাদিলোকগতি ও সমস্ত জড়েন্দ্রিয়াদি নির্ম্মিত হইয়াছে। বদ্ধ-জীবের জড়ীয় নাম, জড়ীয় রূপ, জড়ীয় গুণ ও জড়ীয় কার্য্য—সমুদায়ই তদ্ভূত। মায়াতে যে সম্বিদ্‌বৃত্তি, তদ্দ্বারা জড়বদ্ধ জীবের চিন্তা, আশা, কল্পনা ও বিচার-সমুদায় উদিত হয়। মায়াতে যে হ্লাদিনী বৃত্তি, তদ্দ্বারা স্থূল জড়ানন্দ ও স্বর্গাদিগত সূক্ষ্ম জড়ানন্দ উদিত হইয়াছে।" —শ্রীমঃ শিঃ ৪র্থ পঃ

১৩। চিন্ময় দেশ কিরূপে প্রকাশিত হইয়াছে ?

"ভগবানের অচিন্ত্য-শক্তি বিশেষরূপ বিক্রম প্রকাশ করিয়া ভগবদ্বপুঃ ও জীব-শরীর এবং এতদুভয়ের অবস্থানভাবরূপ চিন্ময়-দেশ ইত্যাদি প্রকাশ করিয়াছেন।"

—প্রেঃ প্রঃ ৯ম প্রঃ

১৪। তটস্থা শক্তি কাহাকে বলে ?

"যে শক্তি চিদচিৎ উভয় জগতের উপযোগী, তাহারই নাম—তটস্থা।"

—শ্রীমঃ শিঃ ৬ষ্ঠ পঃ

১৫। 'যোগনিদ্রা' কি ?

"স্বরূপানন্দ-রূপ আনন্দ-সমাধিই 'যোগনিদ্রা'।" —ব্রঃ সং ৫।১২

১৬। যোগমায়া কি তত্ত্ব ? তিনি কি করেন ?

"চিচ্ছক্তির অন্য নাম—যোগমায়া। তিনিই কৃষ্ণলীলায় এমত কোন ব্যাপার প্রকট করেন, যাহা দেখিয়া জড়মায়াবিষ্ট দ্রষ্টৃগণের চক্ষে অন্যতর প্রত্যয় হইয়া উঠে। তিনিই গোলোকস্থ পরোঢ়া অভিমানকে নিত্যপ্রিয়াগণের সঙ্গে সঙ্গে আনিয়া ব্রজে সেই সেই অভিমানকে পৃথক্ সত্ত্বরূপে স্থিত করেন।" —জৈঃ ধঃ ৩২শ অ

(ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

শ্রীগুরুমহিমাই একমাত্র শ্রোতব্য। আমার গুরুবর্গ আমাকে যেভাবে থাকিবার দরকার মনে করেন, আমাকে তাহা মাথায় পাতিয়া স্বীকার করিতে হয়। এইজন্য যে অসুবিধা হয়, তাহার ফল আমি লইতে প্রস্তুত নহি।

আমি যতই না কেন অযোগ্য হই, অযোগ্য—অভদ্রমণ্ডিত—অমঙ্গল-মণ্ডিত আমার মঙ্গলের জন্য বহু ভক্ত কৃপাপূর্ব্বক আবির্ভূত হইয়াছেন। আমার দুর্দ্দমণীয় দাম্ভিকতা দমনার্থ বহু ভক্তের সমাবেশ হইয়াছে। তাঁহারা সকলেই আমাকে ভগবদ্ভজন শিক্ষা দিতেছেন। ভগবদ্ভক্তের নিকট অধিক সম্মান পাইব এই প্রকার দুর্ব্বুদ্ধিকে যে দিন শতসহস্র শতমুখীদ্বারা নীরাজীকৃত করিতে পারিব, অন্যের নিকট সম্মানের সুবিধা লাভাশা হইতে যেদিন উদ্ধার লাভ করিব, সেইদিনই আমাদের প্রতি ভগবানের অনুগ্রহ হইবে, আমরা ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়া ধন্য হইব।

ভক্তি আশ্রয় করিয়া যদি দাম্ভিক হই,—শুধু ভগবানের পূজা করিয়া ভক্তের পূজায় অনাদর প্রদর্শন করি, তাহা হইলে ভক্তের চরণে অপরাধবশতঃ নানাপ্রকার অসুবিধা হইবে ভক্তিতে—বিতৃষ্ণা আনিয়া সমূহ অমঙ্গল বরণ করিতে হইবে।

মনুষ্যজীবন যে অমঙ্গল সঞ্চয়ের জন্য নহে, পরম মঙ্গললাভেরজন্যই, ইহা ভুলিয়া যাই কেন? মায়ার প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া ভোগী হইবার—বড় হইবার বিচার নিতান্ত ক্ষুদ্র ও অপ্রয়োজনীয়। যদি জগতে বড় হইবার প্রবৃত্তি কমাইবার দরকার থাকে, তাহা হইলে বৈষ্ণবের বিচারই গ্রহণ কর্ত্তব্য।

যোগ্য ব্যক্তি যাঁহারা তাঁহাদের সেবাবল যথেষ্ট, তাঁহারা বলবান্। আমি এত বল লাভ করি নাই – যে বলে দৃপ্ত হইয়া বৈষ্ণবের ছিদ্রানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব, বৈষ্ণবতাকে দোষ দিব, যে-প্রকারে সেবা হয় তাহা অগ্রাহ্য করিয়া স্বমত স্থাপনে যত্নবান্ হইব। ইহাতে মনুষ্যজীবনের যে কিরূপ সর্ব্বনাশ সাধিত হয়, তাহা বলিবার নহে। আমাদের ভক্তেতর অন্যের সঙ্গে সংস্রব নাই। তাদৃশ সংস্রবে নিজ নিজ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির আশাই বাড়িতে পারে।

যিনি হরিসেবা করেন, তিনি নিজেকে সর্ব্বাপেক্ষা হীন জ্ঞান করেন। সর্ব্বাপেক্ষা হীন অভিমান হইলেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব হইতে পারেন। সর্ব্বোত্তম হইতে হইলে নিজের অযোগ্যতা পরীক্ষা করা দরকার। নিজের পরীক্ষা হইতেছে না, অথচ পরছিদ্রানুসন্ধানে এত প্রবৃত্তি কেন? এই কি বৈষ্ণবের স্বভাব?

আমরা কৃষ্ণ কি জিনিষ তা জানি না। তাই কৃষ্ণ নিজসর্ব্বশক্তি কৃষ্ণনামে

অর্পণ করিয়া শ্রীনামরূপে জগতে অবতীর্ণ। গৌণ-নামে শব্দে ও শব্দীর মধ্যে কিছু ভেদ আছে, কিন্তু মুখ্য-নামে শব্দ ও শব্দী অভেদ। নাম-শ্রবণে যোগ্যতার বিচার নাই। কিন্তু ঠাকুর পূজায় যোগ্যতার বিচার আছে—যেমন দীক্ষাগ্রহণ করিতে হইবে, স্নান করিতে হইবে ইত্যাদি। দেশগত বিচার, কালগত বিচার ও পাত্রগত বিচার হরিকীর্ত্তন সম্বন্ধে নাই।

শ্রীচৈতন্যদেব সকলকে দয়া করিয়া সর্ব্বদা হরিনাম কীর্ত্তন করিতে বলিয়াছেন। কোন সময় হরিনাম করিতে হইবে না, এরূপ নহে—'হরিঃ সদা কীর্ত্তনীয়ঃ'। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কীর্ত্তন সর্ব্বতোভাবে জয়যুক্ত হউন। কীর্ত্তন শ্রবণ করিলে কীর্ত্তন আরম্ভ হয়, কীর্ত্তন করিলে স্মরণ হয়। কীর্ত্তনকারী যখন হরি-কীর্ত্তন করেন, তখন হরির কথা স্মরণ পথে আসে।

কৃষ্ণ প্রেমময় বস্তু। তিনি সকলকেই প্রীতির সহিত আকর্ষণ করেন। তিনি আমাদের সেবা পাইলে আনন্দিত হন। অধোক্ষজ কৃষ্ণের নিরন্তর সুখৈষণার নামই সেবা। সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণের সুখৈষণা ব্যতীত আমাদের আর অন্য কোন কার্য্যই নাই। কৃষ্ণের নামভজনে ক্রমে রূপের, গুণের, পরিকরগণের ও লীলার সেবা পাওয়া যাইবে। শ্রীনাম-ভজনেই সর্ব্বসিদ্ধি। শ্রীনামের ভজন ব্যতীত নামীর ভজন হয় না। ইহজগতে নানাপ্রকার শব্দ আমাদের কর্ণে ঝঙ্কৃত হইতেছে; তাহা অপসারিত করিয়া কৃষ্ণের কথা শ্রবণ করিতে হইবে।

ভগবান্ প্রচুর দয়াময় বলিয়া আমাদিগকে ভগবৎ-কথা শ্রবণ ও কীর্ত্তনের সুযোগ দিয়াছেন। জীবনে-মরণে কৃষ্ণের কথা কীর্ত্তন ব্যতীত আমাদের অন্য কোন গতি বা কৃত্য নাই। যিনি কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন করেন, তাঁহার সকল আত্মা সেবারসে স্নাত হয়। সুমেধাগণ কৃষ্ণকথা-কীর্ত্তনকারী আর কুমেধাগণ অন্যাভিলাষ-জ্ঞান-কর্ম্মাচরণকারী।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ও

পরিক্রমা-গ্রন্থাবলী

[শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-শতকম্', 'শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যম্—প্রমাণখণ্ডঃ', 'শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমা' (শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর—দ্বাদশ তরঙ্গ ও পরিশিষ্ট-সহ , 'শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য' ও 'শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ'-সহ]

আগ্রহী ব্যক্তিগণ শীঘ্রই সংগ্রহ করুন।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা-জয়ন্তী

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৫শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৩১১ পৃষ্ঠার পর]

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রস্থানত্রয়

শ্রুতিপ্রস্থান, ন্যায়প্রস্থান ও স্মৃতিপ্রস্থান। উপনিষদ্—বেদান্তের শ্রুতিপ্রস্থান, ব্রহ্মসূত্র—বেদান্তের ন্যায়প্রস্থান এবং গীতা—বেদান্তের স্মৃতিপ্রস্থান।

শ্রুতিপ্রস্থান—উপনিষদ্‌রাজি প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যা অর্থাৎ আত্মতত্ত্বজ্ঞান মানবের বিমুক্তির একমাত্র উপায়। কর্ম্ম—মুক্তির কারণ নহে, কর্ম্মফল বিনাশী। ব্রহ্মবিদ্যা অর্থাৎ যে বেদবিদ্যা কর্ম্মবিদ্যা হইতে শ্রেষ্ঠ, এ বিষয়ে উপনিষদ্‌সমূহের মতভেদ নাই। তবে যাগ-যজ্ঞাদি কাম্যকর্ম্ম মুক্তির কারণ না হইলেও ব্রহ্মবিদ্যা লাভের সোপানস্বরূপ। জগতের এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞান—যে জ্ঞানের উপলব্ধিতে বিশ্বস্রষ্টা, বিশ্বনিয়ন্তা পরব্রহ্মের সহিত মানব আত্মার বা জীবের সহচরত্ব বোধ জন্মে। নশ্বর জগতে মানব অমরত্ব লাভ করে—সেই অবিদ্যা শাতন—মায়া প্রহেলিকার মোহান্ধকার অপসারণকারী ব্রহ্মবিদ্যা—উপনিষদের অনন্তরত্নাকরেই সমাহিত। এজন্য উপনিষদ্‌রাজি বেদান্তের শ্রুতিপ্রস্থান।

ন্যায়প্রস্থান—ব্রহ্মসূত্রকে বেদান্তশাস্ত্রের ন্যায়প্রস্থান বলা হয়। ন্যায়দর্শন যেমন প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপময় ও নিগমন—এই পঞ্চাবয়ব বিচার পদ্ধতিক্রমে অনুমানের মীমাংসা করিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপিত করেন। বেদান্ত দর্শনও তেমনই বিষয়, সংশয়, সঙ্গতি, পূর্ব্বাপক্ষ ও সিদ্ধান্ত—এই পঞ্চবিধ প্রকারে ব্রহ্মসূত্র বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, সেইজন্য বেদান্তদর্শনকে ন্যায়প্রস্থান বলা হয়।

স্মৃতিপ্রস্থান—গীতা বেদান্তের স্মৃতিপ্রস্থান। স্মৃতি বেদাঙ্গ (কল্পসূত্র, (শ্রৌত সূত্রাদি); স্মার্ত্তসূত্র (গৃহ্যসূত্র, ধর্ম্মসূত্রাদি), ধর্ম্মশাস্ত্র, ইতিহাস, পুরাণ (অষ্টাদশ) ও নীতিশাস্ত্র—এই ছয় বিভাগের সমন্বয়ে পরিপূর্ণ স্মৃতিশাস্ত্র। সর্ব্ব উপনিষদ্‌সার গীতা-পঞ্চমবেদ মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত। মহাভারত স্মৃতিশাস্ত্র, সেইজন্য শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাকে বেদান্তের স্মৃতিপ্রস্থান বলা হয়।

উপনিষদ্ শ্রুতিপ্রস্থান, ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত ন্যায়প্রস্থান এবং গীতা স্মৃতিপ্রস্থান। এই তিন শাস্ত্রের বা প্রস্থানত্রয়ের সমন্বয় পরিপূর্ণ বেদান্ত দর্শন। বেদ + অন্তঃ = বেদান্ত, অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্রের চরমোপদেশ। দর্শন—দৃশ্-ধাতু-লুট্ প্রত্যয় করিয়া

"দর্শন" শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। দৃশ্-ধাতুর অর্থ অবলোকন করা, দেখা, প্রত্যক্ষ করা, বিচার করা, অনুভব করা, উপলব্ধি করা প্রভৃতি বুঝায়।

বেদান্ত—ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন। "ব্রহ্ম অস্তি তাবন্নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাবং সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি সমন্বিতং ব্রহ্ম॥"

ব্রহ্ম :—বহি ধাতু-মন্ প্রত্যয়ে ব্রহ্মশব্দ নিষ্পন্ন। বহি ধাতুর অর্থ—বৃদ্ধি বা মহত্ত্ব। ব্রহ্ম "বৃংহতি বৃংহয়তি" ইতি শ্রুতিশ্চ; "বৃহত্ত্বাদ্বং হনতাচ্চ যদ্ ব্রহ্মপরমং বিদুঃ" ইতি বিষ্ণুপুরাণং চ বৃহত্তেন শক্তিমত্তত্ত্বং দর্শয়তি। (শ্রুঃ ও পুরাণ) শ্রুতিতে ব্রহ্মশব্দের অর্থ করিয়াছেন,—'যিনি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন এবং বর্দ্ধন করেন।' সেইজন্য বিষ্ণুপুরাণ বৃহত্ত্বপদদ্বারা শক্তিমত্তত্ত্ব দেখাইয়াছেন। নিরাতিশয় বৃহত্ত্ব বা মহত্ত্ব একমাত্র পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কাহারও নাই। (গীঃ ৭।৭)

বৈদান্তিক ব্যাখ্যা

যিনি স্বয়ং বৃহৎ ও অপরকে বৃহৎ করিবার শক্তি ধারণ করেন, তাহাকেই অথর্ব্বশির উপনিষদ্ ও বিষ্ণুপুরাণ 'ব্রহ্ম' বলিয়াছেন; তিনিই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ।

"বিষ্ণুরেব জ্যোতির্ব্বিষ্ণুরেব ব্রহ্ম বিষ্ণুরেব।
আত্মা বিষ্ণুরেব বলং বিষ্ণুরেব আনন্দঃ॥" (ব্রঃ সূঃ ১।৩।৪০ মাধ্ব ভাষ্যধৃত অথর্ব্বশির উপনিষদ্)

বিষ্ণুই জ্যোতি, বিষ্ণুই ব্রহ্ম, বিষ্ণুই আত্মা, বিষ্ণুই বল এবং বিষ্ণুই আনন্দ বা আনন্দময়।

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ (ভাঃ ১।২।১১)

তত্ত্ববিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন যে,—একই অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ববস্তুর ত্রিবিধ প্রকাশ—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্। জ্ঞানিদিগের নিকট ব্রহ্ম জ্যোতিস্বরূপ, কোন আকার নাই। যেমন—ঘরে বসিয়া সূর্য্য দর্শন, আলো বা জ্যোতিমাত্র। ইহা ব্রহ্মের অস্পষ্ট ও অসম্যক্ দর্শন। যোগিগণের নিকট সেই ব্রহ্ম—স্বরাট্ বিরাট্ ভূমা হইয়াও জীবের হৃদয়াকাশে ব্রহ্মপুরে অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত পরমাত্মাস্বরূপ। যেমন ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া সূর্য্যদর্শন। সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা অনেক বড় হইয়াও আমার চক্ষুর সামনে একখানি থালার মত দেখা যাইতেছে। ইহা ব্রহ্মের স্পষ্ট (আকার) আংশিক দর্শন। ভক্তগণের নিকট সেই ব্রহ্ম ষড়ৈশ্বর্য্যশালী। ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য) শ্রীভগবান্‌স্বরূপ। যেমন—সূর্য্যের কাছে গিয়া সূর্য্যদর্শন, যেখানে আলো বা জ্যোতি বা থালামাত্র নহে, বিরাট্ ব্যাপার। ইহাকে ব্রহ্মের সুস্পষ্ট ও পরিপূর্ণ দর্শন বলে। ভক্তিদর্শনই পরিপূর্ণ দর্শন।

তপস্বী, কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগী প্রভৃতি ইহারা ভগবান্ শ্রীহরিকে দেখিতে পায় না, সেই কারণ ব্রহ্ম বা ভগবান্ নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া চিৎকার করিয়া থাকে।

বেদ, উপনিষদ্ ও বেদান্তাদি শাস্ত্রে ব্রহ্ম সম্বন্ধে যে সমস্ত উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, গীতা তাহা অতি সুস্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—শাস্ত্রে যে ব্রহ্ম, পরব্রহ্ম, পূর্ণব্রহ্ম, অক্ষরপুরুষ, অন্তর্য্যামী, পরমাত্মা, বাসুদেব, স্বরাট্, বিরাট্, ভূমা, ভগবান্ প্রভৃতি শব্দ বর্ণিত হইয়াছে, সেই ভগবান্ একমাত্র আমিই। যাজ্ঞিকগণ যে যজ্ঞপুরুষের আরাধনা করিয়া থাকেন সেই যজ্ঞপুরুষ একমাত্র আমিই।

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥ (গীঃ ৯।২৪)
প্রিয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্ব যজ্ঞেশ্বর হরি।
তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্ট প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ॥

আমিই সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা ও ফলদাতা, ইহা যথাবৎ অবগত হইতে পারে না; এইজন্যই তাহারা সংসারে পুনরাবর্ত্তিত হয়। জ্ঞানিগণ যে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করেন, সেই ব্রহ্মেরও প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আশ্রয় বা মূল কারণ আমিই।

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥ (গীঃ ১৪।২৭)

যেহেতু আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আমি ঘনীভূত ব্রহ্ম (ঘনঃ—শব্দে "মূর্ত্তৌ," পানিনি) এবং নিত্যমুক্ত বলিয়া নিত্য অমৃত-স্বরূপ মোক্ষেরও প্রতিষ্ঠা, শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ বলিয়া তৎকারণভূত সনাতন ধর্ম্মেরও প্রতিষ্ঠা। আর আমিই পরমানন্দ স্বরূপ, এজন্য ঐকান্তিক সুখেরও (ব্রহ্মানন্দেরও) প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়।

যোগিগণ যে পরমাত্মার উপাসনা করেন, সেই অন্তর্য্যামী পরমাত্মারও মূল কারণ আমিই

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥ (গীঃ ১০।৪২)

অথবা হে অর্জ্জুন! এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ বহুজ্ঞানে তোমার প্রয়োজন কি? আমি একাংশে সমুদয় জগৎ ধারণ করিয়া অবস্থিত আছি।

আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোন তত্ত্ব নাই এবং আমার সমানও কেহ নাই, কাজেই ভগবান্ বলিতে একমাত্র আমিই।

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥ (গীঃ ৭।৭)

হে ধনঞ্জয়! আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এ জগতের সৃষ্টি-সংহারের অন্য কোন কারণ নাই। সূত্রে গ্রথিত মণিগণের ন্যায় এই জগৎ আমাতে গ্রথিত আছে (সুতরাং স্থিতির কারণও আমি)।

পূর্ব্বপক্ষ বলিতেছেন যে,—এরকম ভগবান্ মুখে মুখে সকলেই হইতে পারে। ভগবান্ হওয়াত' খুব সুবিধার কথা বটে, কেননা তাহাতে রাসলীলা, বস্ত্রহরণ প্রভৃতি আছে। তবে মুখে মুখে ভগবান্ হইলে ত' চলিবে না। বৃক্ষ তোমার নাম কি? —'ফলেন পরিচীয়তে'—ফলের দ্বারাই পরিচয় হওয়া ভাল।

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥ (বিঃ পুঃ ৬।৫।৪৭)

ভগবান্ শব্দের অর্থ—সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই ছয়টী গুণ পরিপূর্ণরূপে যাঁহাতে বর্ত্তমান আছে, তিনিই ভগবান্ শব্দবাচ্য। হে কৃষ্ণ! এই ছয়টী গুণ আপনাতে আছে কি?

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হাঁ, এইসব গুণ আমাতে আছে। ১। আমার ঐশ্বর্য্য সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা দুইবার দেখিয়াছেন। একবার গো-বৎস হরণকালে বৃন্দাবনে, আর একবার আমাকে দর্শন করিতে আসিয়া দ্বারকাতে। তাহাতে ব্রহ্মা বলিয়াছেন যে,—"যাঁহারা বলে শ্রীকৃষ্ণকে আমরা জানিয়াছি, তাঁহারা জানুক। কিন্তু আমি বলিতেছি যে,—কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য এবং বৈভব আমার বাক্য ও মনের অগোচর।" (ভাঃ ১০।১৪।৩৮)

২। আমার বীর্য্যও অপরিসীম। ছয়দিন বয়সে আমি দীর্ঘদেহবিশিষ্টা দেবগণের ত্রাসকারী রণবিজেতা পূতনাকে নিধন করিয়াছি এবং সাত বৎসর বয়সে আমি সাতক্রোশ বিস্তৃত গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে সাতদিন ছত্রাকারে একহস্তে ধারণ করিয়া কুপিত ইন্দ্রের ঝড়বৃষ্টি হইতে ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করিয়াছি। (ভাঃ ১০।২৫।১৯)

৩। আমার যশ সিন্ধুগঙ্গার পবিত্রাকেও অতিক্রম করিয়াছে। (ভাঃ ১০।৯০।৪৭)

৪। আমার শ্রীতে মুগ্ধ হইয়া শ্রীদেবী আমাকে 'বেলবনে' তপস্যা করিয়াছেন। (ভাঃ ১০।১৬।৩৬)

৫। আমার জ্ঞানও অপরিসীম, সামান্য একটু গীতায় বলিয়াছি এবং ভাগবতে উদ্ধবকেও বলিয়াছি, তাহাও জগতে অতুলনীয়।

৬। বৈরাগ্য—এইবার ত' বাপু ঠেকাইলে। তবে বলিতেছি শ্রবণ কর। বৈরাগ্য-শব্দের অর্থ মায়ার দ্বারা বশীভূত না হওয়া। আমি মায়াধীশ, কখনও

মায়ার দ্বারা বশীভূত হই না। ব্রহ্মা—কন্যারূপী মায়াতে মোহিত হইয়াছে এবং শিব মোহিনীমূর্ত্তি মায়াতে মোহিত হইয়াছে; কিন্তু আমি কোথাও মোহিত হই নাই। আমি নর-নারায়ণরূপে তপস্যা করিতে থাকিলে, ইন্দ্র ভীত হইয়া আমার তপস্যা ভঙ্গ করিবার জন্য—রতি, মদন, বসন্ত, তিলোত্তমা, রম্ভা, মেনকা প্রভৃতিকে পাঠাইয়াছিল। কিন্তু তাহারা আমাকে মোহিত করিতে পারে নাই। আর ইহাতেও যদি সন্তুষ্ট না হও, তবে বলিতেছি যে—আমি ব্রহ্মচারী। "কথং কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী", "কথং দুর্ব্বাসা নিরাহারী" (অথর্ব্ব বেদান্তর্গত গোঃ তাপনী উপনিষদ্)। গান্ধর্ব্বিকা (শ্রীমতী রাধিকা) কহিলেন,—কৃষ্ণ হইল ব্রহ্মচারী, আর দুর্ব্বাসামুনি হইল নিরাহারী, হায়! এই কথা আমি কার কাছে বলিব? তদুত্তরে দুর্ব্বাসামুনি কহিলেন,—হে গান্ধর্ব্বিকে! আত্মারামী আমি নিরাহারী ত' বটেই, আর আত্মারামগণাকর্ষি শ্রীকৃষ্ণ যে ব্রহ্মচারী, ইহাতে বিস্ময় কি? কৃষ্ণের মত ব্রহ্মচারী অখিল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে আর দ্বিতীয় কেহ নাই।

পূঃ পঃ—ঈশ্বর বা পরমেশ্বর মুখে বলিলে হওয়া যায় না। "কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা-কর্ত্তুম যঃ শক্যতে সঃ ঈশ্বরঃ।" যিনি সম্ভবকে অসম্ভবে পরিণত করিতে পারেন বা অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করিতে পারেন এবং সম্ভব ও অসম্ভব ছাড়াও অন্যকিছু করিতে সমর্থ, তিনিই ঈশ্বর শব্দবাচ্য। হে কৃষ্ণ! এই সমস্ত আপনি কিছু করিয়াছেন কি?

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হ্যাঁ, এই সমস্তও আমি করিয়াছি। সম্ভবকে আমি অসম্ভবে পরিণত করিয়াছি। মাতা যশোমতী আমাকে বন্ধন করিতে পারেন নাই, দুই অঙ্গুলী কম পড়ে। পরে মাতার কষ্ট দেখিয়া আমি বন্ধন স্বীকার করি। তারপর একদিন মাতা আমার মুখের মধ্যে বিশ্বরূপ দেখিয়া মহাবিস্মিত হইয়াছে।

পূঃ পঃ—মাতা যশোমতী স্ত্রীলোক, তাহাতে আবার একা। কাজেই কি দিয়া কি করিয়াছেন, ভাল বুঝা যায় না। দশজনের সম্মুখে কোন কিছু করিয়াছেন কি? লোকে কথায় বলে—"দশচক্রে ভগবান্ ভূত"। দশজনের ভোটের দ্বারা ভগবান্ও অনেক সময় ভূত হইয়া পড়েন।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হ্যাঁ, তাহাও আমি করিয়াছি। দশজনের সম্মুখে আমি অসম্ভবকে সম্ভব করিয়াছি। সাতক্রোশ বিস্তৃত গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে ছত্রাকারে সাতদিন ধরিয়া আমি ইন্দ্রের ঝড়বৃষ্টি হইতে সমস্ত ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করিয়াছি।

পূঃ পঃ—হ্যাঁ ইহা একটা বিরাট কার্য্য বটে। কিন্তু তাহা হইলেও সবত' নিজের পক্ষের লোক। স্বপক্ষ, বিপক্ষ ও তৃতীয়পক্ষ লোকের সম্মুখে কোন কিছু করিয়াছেন কি?

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হ্যাঁ, তাহাও আমি করিয়াছি। কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে সকলপক্ষ লোকের সম্মুখে জয়দ্রথের বধের সময় আমি দিনকে রাত্র করিয়াছি। (মঃ ভাঃ)

পূঃ পঃ—ঈশ্বর পূর্ণ, পূর্ণ হইতে পূর্ণ প্রকাশিত হইলেও পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে (ঈঃ উঃ ও বৃঃ আঃ উঃ) এবং তিনি এক হইয়াও বহুর মনোবাসনা একই সময়ে পূরণ করিতে পারেন। (কঠ উপনিষদ্ ২।২।১২-১৩)। হে কৃষ্ণ! আপনি এই সমস্ত করিয়াছেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হ্যাঁ, ইহাও আমি করিয়াছি। পূর্ণ হইতে পূর্ণপ্রকাশ রাসে আমি করিয়াছি এবং এক হইয়াও রাসে ও মহিষী বিবাহে আমি বহু হইয়াছি। রাসে ও বিবাহে একই সময়ে আমি তাঁহাদের মনোবাসনা পূরণ করিয়াছি। অথবা আমা হইতে ব্রহ্মা, ব্রহ্মা হইতে প্রজাপতিগণ এবং তাহা হইতে বিশ্বপূর্ণ হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

—শ্রীজগদ্বন্ধু দাস ব্রহ্মচারী

মোহ

কামনা বা বিষয়বাসনাই যখন মানবকে অনিত্য দেহ-দৈহিকাদি বা নশ্বর বস্তুতে আসক্ত করিয়া রাখে, স্বরূপের উপলব্ধি করিতে দেয় না বা আত্মজ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া দেয়, তখন তাহার নাম হয় 'মোহ'। পদ্মপুরাণে 'মোহে'র সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে,—

মম পিতা মম মাতা, মমেয়ং গৃহিণী গৃহম্।
এবম্বিধং মমত্বং যৎ স মোহ ইতি কীর্ত্তিতঃ॥

"আমার পিতা, আমার মাতা, আমার গৃহিণী, আমার গৃহ—এই যে জড়ীয় বস্তুতে সর্ব্বত্র 'আমার' 'আমার' জ্ঞান, ইহারই নাম 'মোহ'।" মোহ না থাকিলে অনিত্য দেহ-দৈহিকাদিতে বা নশ্বর বস্তুতে কাহারও এত লোভ বা আসক্তি জন্মাইত না। স্বরূপের অনুসন্ধানে বা আত্মতত্ত্বজ্ঞানে সকলেই পরমার্থ লাভে শাশ্বত আনন্দের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইতে পারিতেন। কই, সেইরূপ ত' পরিদৃষ্ট হয় না। তৃষ্ণার্ত্ত পথিক যেরূপ জলভ্রমে মরীচিকার পিছনে ধাবিত হইয়াও একফোঁটা জল লাভ করিতে পারে না, তাহার পরিশ্রমই সার হয়; তদ্রূপ বিষয়ী মোহান্ধ হইয়া প্রবলবেগে বিষয়ের দিকে ছুটিয়া গিয়া পরে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বাধ্য হয়। জীব আমিত্ব ভুলে নাই, জড়দেহকে 'আমি' বুদ্ধি করিয়াছে, প্রেম ভুলে

নাই, প্রেমের বিষয়কে ভুলিয়া কামকে প্রেম মনে করিয়াছে; বিবর্ত্তবুদ্ধিতে মিথ্যাভিমানে অনিত্য বস্তুর উপাসনায় ব্যস্ত হইয়াছে। উপাস্য, উপাসক ও উপাসনার বিচার অভাবহেতু উহা কালে পরিসমাপ্তি হইয়া যাইতেছে, ইহাই মোহান্ধতা।

কাহারও মতে, ষড়্‌রিপুর অন্যতম 'মোহ' অন্য রিপুপঞ্চকের জননী। 'মোহ' ভগবানের অঘটনঘটনপটীয়সী মায়ার শক্তিবিশেষ। কখনও কখনও জীব শারীরিক দুর্ব্বলতাহেতু ইন্দ্রিয়জ্ঞান হইতেও মোহপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। চিজ্জগতের অতি ক্ষুদ্র পরমাণু জীব কৃষ্ণসেবা-বিমুখ হইয়া শক্তিহীন হয় এবং মায়াকর্ত্তৃক সম্মোহিত হইয়া আত্মবিস্মৃতি লাভ করে। তখন তাহার নিত্য সংজ্ঞা বা সম্বন্ধ-জ্ঞান আচ্ছাদিত হয়, ফলস্বরূপে কৃষ্ণভজনের প্রতিকূল ব্যবহারদ্বারা সে মোহপাশে আবদ্ধ হইতে বাধ্য হয়। এই প্রসঙ্গে যোগবশিষ্ঠে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি মহর্ষি বশিষ্ঠ বলিয়াছেন,—

কৃশোঽতিদুঃখী বদ্ধোঽহং হস্তপদাদিমানহম্।
ইতি ভাবানুরূপেণ ব্যবহারেণ বধ্যতে॥

"আমি কৃশ, আমি অতিশয় দুঃখী, আমি বদ্ধ, আমি হস্তপদাদিযুক্ত মানব—এই ভাবের অনুরূপ ব্যবহারদ্বারা মানুষ মোহপাশে আবদ্ধ হয়।" মোহপ্রাপ্ত হইলে আত্মতত্ত্বজ্ঞানের অভাব, প্রাকৃত ইন্দ্রিয়জ্ঞানের প্রবলতা, নশ্বর বস্তু হইতে সুখেচ্ছা, ইন্দ্রিয়গণের অনিয়ামকতা, কর্ত্তব্য বিচ্যুতি প্রভৃতি দোষের দ্বারা জীব আক্রান্ত হয়। মোহবিশিষ্টতা হইতেই জীবগণ মাৎসর্য্যহেতু প্রাকৃত বস্তুতে আমিত্ব বুদ্ধি করে, তাহা হইতে তাহাদের জাগতিক নানাবিধ কামনা-বাসনার উদয় হয়। কামের বাধাপ্রাপ্তিতে ক্রোধ ও বারংবার সম্ভোগের ইচ্ছায় 'লোভ' উৎপন্ন হয়, ইহাই মোহের ক্রমপরিণতি। মায়াদেবী মোহরূপ কটাহে জীবগণকে নিক্ষেপ করিয়া অহর্নিশ কষ্ট প্রদান করিতেছেন, ইহা বকরূপী ধর্ম্মের প্রশ্নের উত্তরে মহামতি যুধিষ্ঠির মহারাজ বলিয়াছিলেন।

নশ্বর বস্তুর প্রতি মোহ—জীবের অজ্ঞানতা হইতে জাত

জীবের ভোগবাসনা প্রবল হইলে তাহারা শম-দমাদি ভুলিয়া নানাবিধ দুর্ব্বিসহ অপমান ও অসুবিধা ভোগ করিয়াও কনক-কামিনীতে প্রবল আসক্তি প্রকাশ করে। মোহবশতঃ কামোন্মত্ত হইয়া তাহার যে সকল অহোরাত্র বৃথাই অতিবাহিত হইতেছে, তাহা সে জানিতে পারে না। কামাসক্ত ব্যক্তিগণই মূঢ় বা মোহগ্রস্ত। এই প্রসঙ্গে গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্‌গৃহীত্বাসদ্‌গ্রহান্ প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ॥

"দুষ্পার কামকে আশ্রয় করত দম্ভ, মান ও মদযুক্ত সেই পুরুষগণ অশুচিকার্য্যে ব্রতী হইয়া মোহবশতঃ অসদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়।" মায়াবদ্ধ হইলে জীব আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া দৈহিক-মানসিক অভাব পরিপূরণের নিমিত্ত অত্যন্ত দক্ষতার সহিত গৃহনির্ম্মাণ, দেহ রক্ষার্থে উত্তম উত্তম ভোজ্য প্রস্তুতকরণ, সামাজিক বিধিবিধানদ্বারা সমাজ রক্ষা, ব্যাধি প্রশমনের জন্য ঔষধ আবিষ্কার ও নানাবিধ বৈজ্ঞানিক উন্নতির চেষ্টা করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—"মানুষ্যমর্থদম্।" মনুষ্যজন্মই একমাত্র 'অর্থদ', যেহেতু মানুষ হরিভজনের দ্বারা নিজকে রক্ষা করিতে সমর্থ; পশু বা অন্যজন্মে যাহা সম্ভবপর নহে। যাহারা দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াও পরমার্থান্বেষণ বাদ দিয়া জড় অর্থান্বেষণে ব্যস্ত, তাহারা আকৃতিতে মনুষ্য হইলেও স্বভাবে দ্বিপদ পশু। বিবর্ত্তক্রমে দেহে আত্মবুদ্ধিবশতঃ স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে, পিতা পুত্রকে যে ভালবাসিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহা প্রেমের ন্যায় দেখাইলেও প্রকৃতপক্ষে নিকৃষ্ট 'কাম'। জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ তাঁহার পত্রাবলীর মধ্যে বলিয়াছেন,—পুত্র স্নেহ-পাশ, পত্নী সহবাস সুখ প্রভৃতি নানা বিপজ্জনক বস্তু সর্ব্বদা আমাদিগকে হরিভজন হইতে নিত্যকালের জন্য পাতিত করায়।" কে কাহার পুত্র?—এই বিবেক নষ্ট না হইলে আমাদের মঙ্গলের কোন সম্ভাবনা নাই। অনেকে স্ত্রী-পুত্রাদি সঙ্গজাত কামসমূহ দুঃখাত্মক জানেন, অথচ মোহবশতঃ তাহাদের পরিত্যাগে অসমর্থ। মায়ার বন্ধন ছিন্ন বা অভাবমোচন কিসে হয়, তাহা না জানিবার জন্য জীব দুঃখের সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতে বাধ্য হয়।

লোকে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণকালে একাই আসে এবং মৃত্যুকালে একাই চলিয়া যায়। পৃথিবীতে তাহার কাহারও সহিত সম্বন্ধ নাই, অতএব মোহ কিসের জন্য? "তুমি কার, কে তোমার, কারে বলরে আপন।" "আসতেও একা, যেতেও একা, কার সঙ্গে বা কার দেখা।" রাত্রিকালে নানাপক্ষী এক বৃক্ষে আসিয়া বাসা বাঁধে, কিন্তু রজনী প্রভাত হইলেই তাহারা নানাদিকে চলিয়া যায়, অতএব কাহার প্রতি কি বেদনা? এই প্রসঙ্গে প্রবাদবাক্যে পাওয়া যায়,—

কস্য মাতা কস্য পিতা কস্য ভ্রাতা সহোদরঃ।
কায়ঃ প্রাণৈর্ন সম্বন্ধ কা কস্য পরিবেদনা॥

"মাতা, পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয়গণ কাহার? যখন এই দেহের সহিতই প্রাণের কোন সম্পর্ক নাই, তখন অন্যের সহিত কি সম্পর্ক থাকিতে পারে?" জগদ্গুরু শ্রীশঙ্করাচার্য্য "মোহমুদ্গরের" মধ্যে বলিয়াছেন,—

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ, সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াতঃ, তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ॥

"কে তোমার স্ত্রী ? কে তোমার পুত্র ? এই সংসার অতীব বিচিত্র। তুমি কার ? কোথা হইতে আসিয়াছ ? হে ভ্রাতঃ ! মোহ ত্যাগ করিয়া এই তত্ত্ব চিন্তা কর।"

মোহের নিমিত্তই জীব নিত্যধর্ম্ম-নির্দ্ধারণে ভ্রান্তিগ্রস্ত

কালে কালে শুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্তবিরোধী নানাবিধ কুমতবাদ সমাজকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে, যাহার ফলে মানুষ নিত্যধর্ম্ম নির্ণয় করিতে গিয়া গোলোকধাঁধায় পতিত হইতেছে। দেশ-কাল-পাত্রজ অনিত্য বা নৈমিত্তিক ধর্ম্মকে মোহবশতঃ নিত্যধর্ম্ম বলিয়া চালাইতে গিয়া জীব ভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে। কর্ম্মী জড়, স্থূলরূপ ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মে মোহিত হন। আবার জ্ঞানিগণ ভগবানের ঐশ্বর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার অঙ্গকান্তি ব্রহ্মজ্যোতিতে মোহিত হইয়া ঔদার্য্য ও মাধুর্য্য দর্শনে বঞ্চিত হন। কর্ম্মী ও জ্ঞানী মোহ পরিত্যাগের নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করিয়াও 'মোহ' হইতে উদ্ধার পান নাই। এই প্রসঙ্গে শ্রীভাগবতে বর্ণিত রহিয়াছে,—

কর্ম্মাকর্ম্ম বিকর্ম্মেতি বেদবাদো ন লৌকিকঃ।
বেদস্য চেশ্বরাত্মত্বাৎ তত্র মুহ্যন্তি সূরয়ঃ॥ (ভাঃ ১১।৩।৪৩)

"কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম বলিয়া যে বিতর্ক হয়, তাহাও বেদবাদ। বেদ স্বয়ং ঈশ্বর। সুতরাং পণ্ডিতাভিমানী সূরিগণও তাহাতে মোহপ্রাপ্ত হন।" শুদ্ধভক্তিকে বাদ দিয়া মোহবশতঃ যাহারা অন্যপন্থাকে আশ্রয় করিয়াছিলেন, তাহাদের সকলেরই অধঃপতন হইয়াছিল, এই বিষয়ে শাস্ত্রে ভূরি ভূরি প্রমাণ রহিয়াছে। শুদ্ধভক্তি আশ্রয় ব্যতীত কাহারও কোনকালে নিস্তার নাই।

ইষ্টপ্রাপ্তির নিমিত্ত যে মহাবিরহ-ব্যাকুলতা, তাহাই প্রকৃত মোহ ও সমস্ত শ্রেয়ের আকর

ভক্ত যে-প্রকারে মোহকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহা শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম আমাদিগকে জানাইবার জন্য 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকার' পয়ারে লিখিয়াছেন,—"মোহ ইষ্টলাভ বিনে, মদ কৃষ্ণগুণ গানে, নিযুক্ত করিব যথা তথা।" ভক্ত নির্ম্মৎসর, সর্ব্বভূতে দয়াবিশিষ্ট বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে হিংসার লেশমাত্র নাই, তাই তাঁহারা রিপুসকলের যথাযোগ্যস্থানে নিযুক্ত ব্যতীত একেবারে ধ্বংস করিবার বাসনা করেন না। বিষয়ের প্রতি যে অনুরাগ তাহা যদি ঈশ্বরাভিমুখী হয়, তবে জীব বিমল নিত্যানন্দের অধিকারী হয়। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন,—"বিষয়িলোকের বিষয়ের প্রতি যেরূপ অনুরাগ, ভগবান্ তোমাতে আমার ঐরূপ অনুরাগ উদিত হউক।" দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াও যাহারা শ্রীহরিভজন

করেন না, তাহারা মায়াদ্বারা বিমোহিত এবং তাহাদের জীবনধারণ বৃথা। তাই ব্রহ্মা শ্রীভাগবতে (৩।১৫।২৪) বলিয়াছেন,—"হায়! যে মনুষ্যজন্ম আমাদের প্রার্থনীয় বস্তু, যাহা ভগবদ্ধর্ম্মের সহিত ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপযোগী, তাদৃশ মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়াও যাহারা শ্রীহরির ভজন না করে, তাহার সেই ভগবানের বিস্মৃতা মায়াদ্বারা বিমোহিত।"

ভক্তিসাধক মোহকে স্বীয় ইষ্টলাভ অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপ্তি বা শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ সেবাপ্রাপ্তির বিহনে ভগবদ্‌বিরহজনিত মোহ ভজনে নিয়োজিত করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণাদিতে সাধক যে লোকাতীত আনন্দলাভ করিয়া থাকেন, ঐ আনন্দের মধ্যেও সাধকের সতত সাক্ষাৎ ভগবৎ-প্রাপ্তির অভাব বা বিরহোৎকণ্ঠা জাগরিত হইয়া থাকে। দম্পতির মিলনে যেরূপ সন্তান জাত হয়, তদ্রূপ সেবার সহিত উৎকণ্ঠা যোগ হইলে ভগবদ্দর্শন সম্ভবপর হইয়া থাকে। শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথাদি ষড়্‌গোস্বামিগণ সাক্ষাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ হইয়াও ইষ্টলাভের অভাবে কি অলৌকিক বিরহ-ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের চরিত্রানুশীলনের দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়। তাঁহাদের সেই মহাবিরহ-ব্যাকুলতা বা ইষ্টের নিমিত্ত সতত মোহ সুমেরু-শিখরের ন্যায় ভক্তিসাধকগণের চির আদর্শস্থানীয় হইয়া রহিয়াছে। প্রযত্নশীল সাধক ষড়্‌রিপুর অন্যতম এই মোহকে যদি তাঁহার ইষ্টবিরহের নবম দশারূপে গ্রহণ করেন, তবে অচিরে অভীষ্টের দর্শন বা সেবালাভে ধন্য হইতে সক্ষম হইবেন।

গীতায় (২।৬৯) শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—"যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী। যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥" অর্থাৎ "যে আত্ম-প্রবণা বুদ্ধি জড়মুগ্ধ সাধারণ জীবের নিকট রাত্রিবিশেষ, স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি তাহাতে জাগরিত থাকেন এবং যে বিষয়প্রবণাবুদ্ধিতে সাধারণ জীবগণ জাগরিত থাকে, তত্ত্বদর্শী মুনির নিকট তাহাই রাত্রিস্বরূপ।" "তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী"—এই উক্তি হইতে যাহারা অষ্টাঙ্গযোগ, হঠযোগ, রাজযোগ ইত্যাদিকে ইন্দ্রিয়সংযমের নিমিত্ত বরণ করিয়াছিলেন, তাহাদের সেই পন্থা উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভার কামকটাক্ষে বিধ্বস্ত ও ভগ্ন হইয়াছিল, তাহা পুরাণাদি হইতে জানা যায়। ভক্তজীবনে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নির্জ্জন গোফায় রাত্রিকালে রামচন্দ্র খাঁন প্রেরিত বেশ্যা বহুবিধ মনোমুগ্ধকর ব্যাপারদ্বারা ঠাকুরের চিত্ত বিক্ষিপ্ত করিতে পারেন নাই। কারণ শ্রীল হরিদাস ঠাকুর সর্ব্বতোভাবে 'মোহ ইষ্টলাভ বিনে' ইহার অনুবর্ত্তনকারী, ভোগী যেখানে ভোগে উন্মত্ত তিনি তথায় মোহপ্রাপ্ত সংজ্ঞাশূন্য, আর বিষয়ীলোক যথায় সুপ্ত তিনি তথায় জাগ্রত থাকিয়া শ্রীহরিনামের অনুশীলনকারী। ভক্ত

হরিদাসের আদর্শানুসরণে শ্রীকৃষ্ণের চরণে শরণাগত স্বরূপাভিমানে স্থিতপ্রজ্ঞ ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের বিরহকে মোহরূপে নিয়োগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যামৃত আস্বাদনে ধন্য হইয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণ বংশীধ্বনিদ্বারা জগতের সকল প্রাণিকে মোহিত করিতেছেন, তাহা শ্রবণ করিয়া যিনি মোহিত না হন, তাহার জীবন ধারণ বৃথা। ব্রজের গোপীগণ ভাগবতে (১০।২৯।৪০) "কাস্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃতবেণু" শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন,—"কৃষ্ণ, তোমার কলপদামৃতবেণু গীতদ্বারা সম্যগ্ মোহিত হইয়া এই ত্রৈলোক্যমধ্যে কোন্ স্ত্রী নিজধর্ম্ম হইতে চালিত না হয়? তোমার ঐ বেণুগীত শ্রবণ ক রয়া পুরুষ পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইয়া থাকেন।" যিনি কায়মনোবাক্যে সর্ব্বতোভাবে গুরু-বৈষ্ণবের পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহার হরিসেবা প্রবৃত্তি আদর্শস্থানীয়। কাম-ক্রোধাদি রিপুগণ তাঁহার চিত্তে কোন ক্ষোভ উৎপাদন করিতে পারে না। তাই শুদ্ধভক্তির আচার্য্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ,　　মদ-মৎসরতা-সহ,
জীবের জীবনপথে বসি'।
অসচ্চেষ্টা রজ্জুফাঁসে,　　পথিকের ধর্ম্মনাশে,
প্রাণ লয়ে করে কষাকষি ॥
মন, তুমি ধর বাক্য মোর।
এই সব বাটপাড়,　　অতিশয় দুর্নিবার,
যখন ঘেরিয়া করে জোর ॥
আর কিছু না করিয়া,　　বৈষ্ণবের নাম লঞা,
ফুকারিয়া ডাক উচ্চরায়।
(বকারি-কৃষ্ণ) বকশত্রু সেনাগণে,　　কৃপা করি' নিজজনে,
যাতে করে উদ্ধার তোমার ॥

– ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

ব্রহ্মচর্য্য বনাম বৈষ্ণবতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৫শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৩১৮ পৃষ্ঠার পর]

জৈবধর্ম্ম গ্রন্থে পরমহংস বাবাজী মহারাজ সন্ন্যাসী ঠাকুরকে কহিলেন,—"মহাত্মন্! আমি বেশের প্রতি কোনপ্রকার রাগ-দ্বেষ রাখিতে উপদেশ করি না।

অন্তঃকরণের ধর্ম্ম পরিষ্কৃত হইলে বেশ সহজেই পরিষ্কার হইয়া পড়ে। **যেখানে বাহ্যবেশের বিশেষ আদর, সেখানে অন্তরের ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ অমনোযোগ।** আমার বিবেচনায় প্রথমে অন্তঃশুদ্ধি করিয়া যখন সাধুদিগের বাহ্যাচারে অনুরাগ হয়, তখন বাহ্য-বেশাদি নির্দ্দোষ হয়। আপনি স্বীয় হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অনুগত করুন। তাহা হইলে যে-সকল বাহ্য সম্বন্ধে রুচি হইবে, তাহা আচরণ করিবেন।"

যেমন ভেকহীন শুদ্ধবৈষ্ণবগণ বহির্ম্মুখ-জন হইতে আত্মরক্ষার জন্য নিজেদের ভজন-পরিপাট্যকে অন্তর-নিষ্ঠাতেই আবদ্ধ রাখিয়া লোক-ব্যবহারে যত্ন করেন, তেমনই অনেক বৈষ্ণব-বেশধারী কপটী জীবনধারণের সুযোগ-সুবিধার জন্য সাধু সাজিয়া থাকে। ইহারা প্রকৃত সাধু সমাজের শুধু কলঙ্ক নহে, সাধু সমাজের পরম শত্রু। অতএব বাহ্যিক আচারশীল অথবা বাহ্যিক আচারহীন উভয়ই পারতপক্ষে বৈষ্ণবতার পরিচায়ক নহে। বৈষ্ণবতা তদতিরিক্ত একটী সম্পূর্ণ পৃথক্ জিনিষ।

ইহাতে অনেকে হয়ত' অস্বস্তি অনুভব করিবেন, তজ্জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হওয়া সাধকের একটী মহৎ গুণ। অনেকে নিজেদের বৈষ্ণব ভাবিয়া অপরকে কতই না গালি দেন। কিন্তু গভীরে প্রবেশ করিবার অবকাশ নাই বলিয়াই এই প্রকার স্বল্প-অভিজ্ঞতার চমক লাগাইয়া নিজেদের স্বরূপের (?) বহিঃপ্রকাশ ঘটাইবার চেষ্টা করেন। যেমন, "রাক্ষসাঃ কলিমাশ্রিত্য জায়ন্তে ব্রহ্মযোনিষু। উৎপন্না ব্রাহ্মণকুলে বাধন্তে শ্রোত্রিয়ান্ কৃশান্॥" বরাহপুরাণের এই শ্লোকটী তুলিয়া তাঁহারা বর্ত্তমান ক্ষয়িষ্ণু ব্রাহ্মণ-সমাজকে কতই না গালি দেন। কিন্তু ইহার গভীরে যান না। গেলে দেখিতে পাইবেন, 'ব্রহ্মযোনিষু'-শব্দের মধ্যেই নিহিত প্রকৃত ব্রাহ্মণতার অস্তিত্ব ব্রাহ্মণ কুলে আছে। সেই কুলকে আশ্রয় করিয়া দেব-দ্বিজদ্বেষী অসুরগণ কলিতে অবশিষ্ট একপাদ ধর্ম্মকেও ধ্বংস করিবে। কারণ চারিযুগে ব্রাহ্মণগণই বৈষ্ণবধর্ম্মের ধারক, বাহক ও প্রচারক। তাই উহাদিগকে ধ্বংস করিতে হইবে, এই অভিপ্রায়ে যাহারা এই কুল আশ্রয় করিবে তাহারা রাক্ষস, তাহারা ব্রাহ্মণ নহে। ইহারা অস্পৃশ্য। তাই বলিয়া ব্রাহ্মণকুল মাত্রই রাক্ষস এবং আমরাই একমাত্র ব্রাহ্মণ এবং বেদ-তাৎপর্য্য অধিক বুঝি, এই অভিমানে নির্ব্বিচারে ব্রাহ্মণকুলকে গালি দিয়া অপরাধে পতিত হন। অনুরূপভাবে বৈষ্ণব-বিচার করিতে গিয়াও অনবধানতার প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং এই কুলকে সম্মান করিয়াছেন। অধিকারী-জনই সমালোচনার অধিকারী। তাই নিজ নিজ অধিকার সর্ব্বাগ্রে বিচার করা প্রয়োজন।

আমি কে? আমি কার ও আমার কি কাজ? অর্থাৎ কে, কা, কি এই

তিন "ক" কারই সমস্ত জিজ্ঞাসা, সমস্ত দর্শন, ধর্ম্ম ও শাস্ত্রোৎপত্তির মূল। সমস্ত জিজ্ঞাসার উত্তরের জন্য যাবতীয় চেষ্টা, তাহার সর্ব্বপ্রথম সোপান "ব্রহ্মচর্য্য" যাহারা একেবারে উচ্ছৃঙ্খল, বহির্ম্মুখ, পাশবিক জীবনযাত্রা হইতে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার জন্য নিয়ম-শৃঙ্খলাময় জীবনে পদার্পণ করিতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত বা সঙ্কল্প গ্রহণ করিতে হয়। ইহারা বহির্ম্মুখ কামুক লোকের নিকট পূজ্য, বিস্ময় এবং বাহবার যোগ্য। যেমন নিরক্ষর পল্লীর কোনো একটী শিশু যদি প্রাথমিক স্কুলে ভর্ত্তি হয়, তবে সে সেই এলাকায় বাহবার যোগ্য এবং শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত হইবে, কারণ তাহাদের শিক্ষাসম্বন্ধে কোন ধারণাই নাই। কিন্তু এই অবস্থাই পরবর্ত্তী জীবনের ভিত্তিস্বরূপ। তাই শাস্ত্রে ইহাদের উৎসাহ প্রদানার্থ বহুমানন করা হইয়াছে।

'ব্রহ্মচর্য্য' একটী ব্রতবিশেষ, যাহার আচরণই হইল অভ্যাস-সাধ্য। উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রা হইতে জীবনকে একটী সুন্দর নিয়মে প্রতিষ্ঠিত করা ইহার উদ্দেশ্য। যাহার প্রধান লক্ষ্য হইল—ঊর্দ্ধরেতা হইয়া স্ত্রী-সম্ভাষণাদি ত্যাগ করিয়া মনের প্রশান্তি বজায় রাখা।

কিন্তু বৈষ্ণবের আচরণাদি স্বপ্রতিষ্ঠ, স্বাভাবিক অভ্যাস এবং স্বয়ং প্রকাশ্য। ব্রহ্মচারীর ইন্দ্রিয় নিগ্রহপূর্ব্বক মনের প্রশান্তি হইল—সাধন। কিন্তু সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা সেই হৃষীকেশের সর্ব্বপ্রকার সেবাই হইল বৈষ্ণবের ধর্ম্ম। এই অর্থে 'সেবা হি পরমো ধর্ম্মঃ।'

ব্রহ্মচর্য্য হইল সাধনের অতি প্রারম্ভিক অবস্থা।

বৈষ্ণবতা জীবের সর্ব্বোচ্চ সাধনের মাপকাঠি।

ব্রহ্মচর্য্য একটী-আশ্রম বিশেষ।

বৈষ্ণবতা সমস্ত বর্ণাশ্রমাতীত অবস্থা।

ব্রহ্মচারী সদা সজাগ, সঙ্কুচিত, স্বধর্ম্ম রক্ষার্থে ভীত।

বৈষ্ণব সদা হাস্য, স্বাভাবিক, নিরপেক্ষ, নিঃসঙ্কোচ, নিরুদ্বিগ্ন।

ব্রহ্মচর্য্য, আশ্রয়-অবলম্বনহীন, নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যহীন একপ্রকার আত্মান্তর সাধন।

বৈষ্ণবতা নির্দ্দিষ্ট বস্তুতে, নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক জীবের পরম প্রয়োজন প্রেমাস্বাদনের অবস্থা।

ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হইয়াছে,—"বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দতে॥" অর্থাৎ সেই পরমেশ্বর ভগবান্, পরমাত্মা এবং ব্রহ্ম—এই তিনরূপে তত্ত্ববিদ্‌গণদ্বারা কথিত হন। সেই পরমেশ্বর ভগবানই স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র, ইহা বেদের সর্ব্বত্র মুখ্যার্থে কথিত হইয়াছে। "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দ সর্ব্ব-কারণকারণম্॥" ব্রহ্ম সেই স্বয়ং ভগবানের অঙ্গকান্তি জ্যোতি বা শক্তি। অতএব 'ব্রহ্ম' শব্দে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শক্তি ইহা সিদ্ধ হইল।

এখন প্রকৃতপ্রস্তাবে ব্রহ্মচারী কে? "ব্রহ্মে চরতি যঃ সঃ ব্রহ্মচারী।' অর্থাৎ

ব্রহ্মে যিনি বিচরণ করেন, যিনি রমণ করেন, আনন্দ দেন এবং আনন্দ গ্রহণ করেন অথবা এই ব্রহ্মোদ্দেশ্যেই যাঁহার সমস্ত আচরণ, তিনিই ব্রহ্মচারী। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া যে-সমস্ত নিয়ম-কানুন, ন্যায়-নীতি, তাহাই 'ব্রহ্মচর্য্য'। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৩/১৯) বলা হইয়াছে, তিনি "অপাণি-পাদো জবনো গ্রহীতাঃ।" অর্থাৎ তাঁহার হস্ত-পদাদি কিছুই নাই। আবার পরেই বলা হইতেছে—তিনি শীঘ্র চলেন, শীঘ্র গ্রহণ করেন, কথা বলেন ইত্যাদি। অর্থাৎ 'অপাণিপাদো'-শব্দে প্রাকৃত হস্তপদাদিরহিত, অপ্রাকৃত চিন্ময় হস্তপদাদির কথা বলা হইয়াছে। তদ্রূপ 'চর্য্য' শব্দে প্রাকৃত ঘৃণ্য মৈথুনাভাব ও চিন্ময়ানন্দের কথা বলা হইয়াছে।

একদা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রেয়সী গোপীদিগের সহিত মিলিত হইতে কিছু বিলম্ব করিয়া ফেলিলেন। গোপীগণ তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে, তাঁহার গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করিয়া আসিতে একটু বিলম্ব হইয়া গেল। তাহা শুনিয়া গোপীগণ অবাক্ বিস্ময়ে তাকাইয়া বলিলেন,—'তোমার আবার গুরু আছে নাকি? এটা ত' জানিতাম না। তাহা হইলে তাঁহাকে ত' একবার দেখিতে হয়।' এই পরামর্শ করিয়া তাঁহারা সদলবলে সুন্দর, সুস্বাদু, সুখাদ্যসহ যমুনা পার হইয়া, দুর্ব্বাসা-টিলায় গিয়া দুর্ব্বাসা মুনির সহিত দেখা করিলেন এবং সমস্ত আহার্য্য দ্রব্যাদি তাঁহার মুখগহ্বরে অর্পণ করিলেন। অতঃপর বাক্যালাপাদিতে রজনী গভীর হইলে, যমুনার স্ফীতাবস্থা দেখিয়া তাঁহারা দুর্ব্বাসাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মুনিবর! অবলা নারী আমরা, এই রজনীতে কেমন করিয়া এই উদ্দাম উছলা যমুনা পার হইব?" তখন মুনি তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমরা কেমন করিয়া এপারে আসিলে?" গোপীগণ হাসিয়া বলিলেন,—"কৃষ্ণ আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, যমুনাকে গিয়া বলিবে, হে যমুনে! কৃষ্ণ যদি আজীবন ব্রহ্মচারী হন, তবে তুমি আমাদের রাস্তা করিয়া দাও।" আমরা সেই কথা বলিতেই, যমুনা দুই ভাগ হইয়া আমাদের রাস্তা করিয়া দিলেন। আমরা সেই রাস্তায় এপারে আসিয়া দেখি, যমুনা আবার এক হইয়া গেল। একথা শুনিয়া দুর্ব্বাসা গম্ভীর হইয়া বলিলেন,—"তোমরা যমুনাকে গিয়া বলিবে, 'দুর্ব্বাসা যদি কোনদিন কিছু না খাইয়া থাকেন ত' যমুনে! তুমি আমাদের রাস্তা দাও।" গোপীগণ তাহা শুনিয়া অবাক্ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন,—আমরা নারী; কৃষ্ণ আমাদের ছাড়া এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারেন না, তিনি হলেন ব্রহ্মচারী। আর ইনি আমাদের সম্মুখে আমাদেরই প্রদত্ত প্রচুর ভোজ্য সামগ্রী খাইয়া বলেন কিনা জীবনে কিছু খাই নাই! এ কেমন কথা?" যাই হোক, দুর্ব্বাসা মুনির কথামত যমুনা পার হইয়া, "যেমন গুরু, তার তেমন চেলা" বলিয়া খুব হাসিতে লাগিলেন।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সর্ব্বশক্তিমান্ এবং শ্রীমতী রাধিকা তাঁহার পূর্ণশক্তি। 'শক্তি শক্তিমতোরভেদঃ'—শক্তি ও শক্তিমান্ তত্ত্ব অভেদ। ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার নিজস্ব পূর্ণশক্তিতে অর্থাৎ পূর্ণব্রহ্মে সর্ব্বদা রমণ করেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণ-

চন্দ্র একমাত্র প্রকৃত **'ব্রহ্মচারী'**। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া যাঁহাদিগের সকল চেষ্টাদি অন্যাভিলাষিতাশূন্য, তদনুরাগী জনই 'ব্রহ্মচারী'।

অপরদিকে ভগবান্ বিষ্ণুর যাঁহারা আরাধনা করেন, তাঁহারাই বৈষ্ণব। আরাধনা অর্থে সেবা বা প্রীতি। এই আরাধনা কি? "আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং, রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেন যা কল্পিতা।" ব্রজবধূ অর্থাৎ ব্রজগোপীগণের সেবার যে শ্রেষ্ঠা পরকাষ্ঠা, তাহাই আরাধনা। তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠা রাধিকা—রাধা। যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা আরাধিকা, তিনিই শ্রীমতী রাধা। শ্রীমতী রাধিকাই একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠভাবে ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করিয়াছিলেন। অতএব শ্রীবৃষভানুনন্দিনীই শ্রেষ্ঠা 'বৈষ্ণবী' বা 'আশ্রয়-বিগ্রহ'। তাঁহার আচরণাদিই বৈষ্ণবতা। তাঁহার আচরণাদি সাধারণের বুঝিবার সাধ্য নাই। সাধারণের বিষ্ণু আরাধনার জন্য অনেক উৎসাহমূলক উপদেশ দেওয়া আছে। যেমন বিষ্ণুপুরাণে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পালনের কথা বলা হইয়াছে। "বর্ণাশ্রমচারবতা পুরুষেণ পরো পুমান্। বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যৎ তত্তোষকারণম্॥" বলা হইল, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মই একমাত্র পথ। বিষ্ণুকে তুষ্ট করিবার আর অন্য পন্থা নাই। কিন্তু বিচার করিলে এই উপদেশ হেত্বর্থে হেয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে।

শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর অনুগামী জনগণ পাল্য—দাস্যাভিমানে তাঁহার সামান্য ভাবলিপ্সু হইবার জন্য সাধনা করেন। তাঁহারাই 'বৈষ্ণব' বলিয়া কথিত। তাঁহাদিগের ভাবগতি বুঝা সাধারণের অসাধ্য। তাঁহাদের সেবা-চেষ্টাদি কার্য্যসকল কেমন হইবে?—

"সেবা সাধকরূপেন সাধ্যরূপেন চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা **ব্রজলোকানুসারতঃ**॥"

তাঁহাদের লক্ষণ কেমন হইবে?—

"ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা॥
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ॥
আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাতভাবাঙ্কুরে জনে॥"

"যে-সকল ব্যক্তির চিত্তে ভাবের অঙ্কুর মাত্র জন্মিয়াছে, সেই সকল ব্যক্তিতে এই অনুভাবগুলি প্রকাশ পাইয়া থাকে। যথা—ক্ষান্তি (ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইলেও তাহাতে ক্ষুব্ধ না হওয়া), অব্যর্থকালতা (হরিসেবা ব্যতীত ক্ষণকালও অন্যকার্য্যে কালক্ষেপণ না করা), বিরক্তি (কৃষ্ণেতর-বিষয়ে অনাসক্তি), মান-শূন্যতা (আপনার উৎকর্ষ সত্ত্বেও অমানিত্ব), আশাবন্ধ (ভগবৎ-প্রাপ্তিবিষয়ে দৃঢ় আশাযুক্ত), সমুৎকণ্ঠা (অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত গুরুতর লোভ), নামগানে সদা রুচি, ভগবদ্গুণ-বর্ণনে আসক্তি ও ভগবদ্বসতিস্থলে প্রীতি।" ইহাই "বৈষ্ণব-ব্রহ্মচারী" বা "ব্রহ্মচর্য্য বনাম বৈষ্ণবতা"র বাস্তব তাৎপর্য্য।

—শ্রীবীরভদ্র দাস ব্রহ্মচারী

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের বিরহ-বাসরে

প্রণতি-প্রসূনাঞ্জলি

জয় জয় জয় গুরু জয় দয়াময়।
এ দীন অধম প্রতি হওগো সদয়॥
সবাক পুষ্প কিছু করিয়াছি চয়ন।
কৃপা করি' পদতলে করহ গ্রহণ॥
উহাতে নাহিক মিশ্রণ ভক্তিচন্দন।
কেবল আছে শুধু আর্ত্তিভরা ক্রন্দন॥
আজি হ'তে পঞ্চবিংশতি বর্ষ-পূরবে।
লীলা সম্বরিলে তুমি অতীব গৌরবে॥
গ্রহণের কালে সবে করিতেছে স্নান।
অকস্মাৎ এক বাণী চিত্ত কৈল ম্লান॥
বিনা মেঘে বজ্রপাত যেন অনুমান।
শ্রীল কেশব গোস্বামীর মহাপ্রয়াণ॥
সেই শারদ-পূর্ণিমার গ্রহণের কালে।
অভীষ্টদেবের সেবায় তুমি গেলে চলে॥
শ্রীবার্ষভানবী তোমা সদয় হইয়া।
নিত্যধামে লঞা গেলা কৃপামাল্য দিয়া॥
নিত্যলীলায় তুমি শ্রীবিনোদমঞ্জরী।
সেবা প্রকাশিলে রাধা-বিনোদবিহারী॥
শ্রীবিনোদবিহারী-কান্তি কৃষ্ণবরণ।
রাধাচিন্তা নিবেশে তা' হল বিলোপন॥
(কেবল) শ্রীকৃষ্ণ চিন্তায় রাধা নাহিক মগন।
কৃষ্ণও রাধা চিন্তায় হন নিমগন॥
এই তত্ত্বসিদ্ধান্ত প্রকটের নিমিত্ত।
প্রকাশিলে চিল্লীলা শ্রীমিথুনের তত্ত্ব॥
তুমি রাধা-বিনোদের নিত্যসহচরী।
ভৌমজগতে আসিলে গুরুরূপ ধরি'॥

জগজনে জানাইলে হও কৃষ্ণদাস।
শ্রীকৃষ্ণভজন কর করিয়া বিশ্বাস॥
রাধা-নিত্যজনে সবে করহ স্মরণ।
অচিরে লভিবে তবে শ্রীকৃষ্ণচরণ॥
রাধা আনুগত্য বিনা শ্রীকৃষ্ণভজন।
কভু না মাগয়ে তাহা রূপানুগজন॥
শ্রীরূপের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণভজন।
মাগয়ে সর্ব্বদা তব পদাশ্রিত জন॥
তোমার বিরহে আজি কাঁদে ভক্তগণ।
নিত্যধাম হ'তে কর কৃপা বরিষণ॥

শ্রীগুরু-কৃপাবারিপ্রার্থী—
—শ্রীগৌরাঙ্গপদ ব্রহ্মচারী

মুক্তি বনাম ভক্তি

বৃহৎ এই বিশ্বে মানুষের কত কিছুরই না চাওয়ার থাকে! কেউ বা চায় মুক্তি, কেউ বা ভুক্তি, কেউ বা পার্থিব ধন-সম্পত্তি, কেউ বা পারিবারিক কিছু। বিশ্বজগৎ যন্ত্রণাময়। জরা, ব্যাধি আর ঘন গহন মৃত্যু-জ্বালার ছড়াছড়ি প্রতি মুহূর্ত্তেই। তাই সেই জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে চায় মুক্তি। আর মানুষ যখন মুক্তি চায়, তখন কিছুতে এড়ানো যায় না জন্ম-মৃত্যুকে। কিন্তু আসলে মুক্তি কি? 'মুক্তি' আমরা কাকে বলব? সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণাকে ভয় পেয়ে তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াই কি মুক্তি? আমরা শুনতে পাই,—"আত্যন্তিক-দুঃখ-নিবৃত্তির্হি মুক্তিঃ।" জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধি হতে নিষ্কৃতিলাভই মুক্তি বলে নিরীশ্বর দার্শনিকগণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

কিন্তু এই মুক্তিই কি সব? এরূপ মুক্তির উপরেও যে অনেক বড় কিছু আছে, তা হল—ভক্তি। ভক্তি চাওয়ার যোগ্য অধিকারী মানুষ কোথায়? সারা বিশ্বে এই মুক্তি যেখানে নিরানব্বই শতাংশ মানুষের কাম্য, সেখানে এক শতাংশ মানুষের কাম্য হল পরম ভক্তি পাওয়ার কামনা! তাহলে কি বলব ভক্তির চেয়েও এই মুক্তি অনেক বড়? উত্তর কি তবে ইতিবাচক? না, না

কখনই নয়। জড় ক্লেশবিমুক্তি আর ভক্তি দুই বিপরীত বিন্দুতে অবস্থান করছে। "হিত্বা অন্যথারূপং স্বরূপেন ব্যবস্থিতির্হি মুক্তিঃ"—অর্থাৎ অবিদ্যা-বিরহিত হইয়া আত্মস্বরূপে অবস্থানকেই মুক্তি বলে। ইহাই মুক্তির তাৎপর্য্য। "মোক্ষং - মুক্তিং বিষ্ণুভক্তি লাভম্"—ভগবৎ-পাদপদ্ম-সেবালাভই মুক্তি বা মোক্ষ বলে শাস্ত্রে অভিহিত হয়েছে।

ভক্তি হল সেই জিনিস যার দ্বারা পরম পিতার, জগতের পরম বন্ধু ও জগতের একান্ত আপনজনের একান্ত নিকটে পৌঁছে যাওয়া যায়। তাই ভক্তি সাধনের আবার কতকগুলি ক্রমপর্য্যায় আছে। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রতিতে এই সাধন পূর্ণতা লাভ করে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলা অষ্টম পরিচ্ছেদে বর্ণিত শ্রীচৈতন্যদেব ও রায়-রামানন্দের পরস্পর কথোপকথনের মাধ্যমে পাই,—

প্রভু কহে,—"পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।"
রায় কহে,—"স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়॥"
প্রভু কহে,—"এহো বাহ্য, আগে কহ আর।"
রায় কহে,—"কৃষ্ণ কর্ম্মার্পণ—সর্ব্বসাধ্যসার॥"
প্রভু কহে,—"এহো বাহ্য, আগে কহ আর।"
রায় কহে,—"স্বধর্ম্ম-ত্যাগ—এই সাধ্যসার॥"
প্রভু কহে,—"এহো বাহ্য—আগে কহ আর।"
রায় কহে,—"জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি—সাধ্যসার॥"
প্রভু কহে,—"এহো বাহ্য—আগে কহ আর।"
রায় কহে,—"জ্ঞানশূন্যা ভক্তি—সাধ্যসার॥"
প্রভু কহে,—"এহো হয়, আগে কহ আর"।
রায় কহে,—"প্রেমভক্তি সর্ব্বসাধ্যসার॥"
প্রভু কহে,—"এহো হয়, আগে কহ আর॥"
রায় কহে,—"দাস্য প্রেম—সর্ব্বসাধ্যসার॥"
প্রভু কহে,—"এহো হয় কিছু আগে আর।"
রায় কহে, "সখ্য প্রেম—সর্ব্বসাধ্যসার॥"
প্রভু কহে, "এহো উত্তম, আগে কহ আর।"
রায় কহে,—"বাৎসল্য প্রেম—সর্ব্বসাধ্যসার॥"
প্রভু কহে,—"এহো উত্তম, আগে কহ আর।"
রায় কহে—"কান্তভাব প্রেমসাধ্যসার॥"

তাহলে দেখা যাচ্ছে,—কান্তভাবের ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই কান্তভাবের ভক্তি কেমন? ভগবানকে প্রিয়তম, আর নিজের কান্ত বলে মনের মধ্যে তাঁর দিব্যস্মৃতি জাগ্রত করে রাখা। তখন ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে সম্পর্কটা এইরূপ হয়,—

"তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং প্রসাদয়ে ত্বাম্ অহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্॥"

পিতা যেমন পুত্রের, সখা যেমন সখার এবং প্রিয় যেমন প্রিয়াকে ক্ষমা করেন, তুমিও আমাকে তেমনই করে ক্ষমা কর। 'ভক্তি' হল সেই জিনিস। ভক্তিমহাদেবীর করুণায় সাধক-সাধিকা হয়ে ওঠে প্রেমিক ভক্ত। আর সেই প্রেমিক ভক্ত পরম প্রিয়তম ভগবানের একেবারে কাছের জন হয়ে পড়েন। ইহাই জীবের চির আকাঙ্ক্ষিত ও পরম প্রাপ্তি।

জড়মুক্তি ও ভক্তি দুটীর মধ্যে তাই আকাশ-পাতাল পার্থক্য। মুক্তি যেখানে মানুষকে জড়তার আবর্ত্তনে জড়িয়ে ফেলে, সেখানে ভক্তি মানুষকে নিত্য অপ্রাকৃত শান্তি দান করেন। তাই যে কোন সাধকের উচিত, ভক্তিদেবীর চরণে শরণাপন্ন হওয়া এবং তাঁর আশ্রয়ে সাধনভক্তি, ভাবভক্তি, প্রেমভক্তি-লাভে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হওয়া। আমাদের সকলেরই প্রার্থনা হোক,—ভক্তিদেবীর আশীর্ব্বাণী লাভ করার একান্ত ইচ্ছা।

—**শ্রীমতী কুহু বেরা,** অমর্ষি (মেদিনীপুর)

সৌভাগ্য

প্রয়াগে শ্রীগৌরহরি শ্রীরূপ গোস্বামীকে ভক্তিধর্ম্ম-বিষয়ে অলৌকিক শক্তি সঞ্চার করিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন। তন্মধ্যে আমরা লক্ষ্য করি যে, ভাগ্যবান্ জীবই ভগবৎকৃপা ও ভগবজ্জন-কৃপা হইতে ভক্তিলতার বীজ শ্রদ্ধালাভ করেন। যিনি শ্রদ্ধা লাভ করেন, তিনি সৌভাগ্যবান্। শ্রদ্ধাবৃত্তির জনকরূপে আমরা সৌভাগ্যকে দর্শন করি। ভক্তিলতার বীজ হইতে জীবাত্মার শুদ্ধবৃত্তি ভক্তিলতা গোলোক পর্য্যন্ত গতিবিশিষ্টা হইয়া ভজনীয় বস্তুকে সেব্যরূপে নিজবৃত্তি প্রদর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করে।

'শ্রদ্ধা'-শব্দে সুদৃঢ় বিশ্বাসকেই লক্ষ্য করে। সুদৃঢ় বিশ্বাস ও অন্ধ বিশ্বাস পরস্পর বিপরীত ধর্ম্মবিশিষ্ট। অক্ষজ-জ্ঞানদ্বারা পরোক্ষ বা অপরোক্ষ বস্তুতে আস্থা-

স্থাপনকেই অন্ধ বিশ্বাস বলে। অধোক্ষজ বস্তুর নিত্যাধিষ্ঠান ও অবিসংবাদিত চিদানন্দ কখনই অন্ধ বিশ্বাসের লক্ষীভূত বস্তু নহে। ভাগ্যহীন জনগণই অক্ষজ জ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া ভজনীয় বস্তুর প্রথমাবৃত্তিকে অন্ধ বিশ্বাসরূপে ভ্রান্ত ধারণা করিয়া শ্রদ্ধাহীন হয়। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে শ্রদ্ধা অজ্ঞেয় বস্তুর সম্বন্ধে অন্ধ বিশ্বাস-মাত্র নহে। শ্রদ্ধার পাত্ররূপে শ্রদ্ধার পরিণামে যে সাধুর সঙ্গ হয়, তিনি অধোক্ষজ-সেবাপর জ্ঞানবিশিষ্ট। সুতরাং ইন্দ্রিয়সাধ্য দৃশ্য জগতের জ্ঞান-গৃহে আবদ্ধ নহেন। সত্যজ্ঞান যাঁহার দৃশ্যপটে উদিত হওয়ায় অনর্থময় দৃশ্য জগৎকেই যিনি একমাত্র অবলম্বন মনে করেন না, তাদৃশ সাধুতে বা সিদ্ধশাস্ত্রে সাধকের প্রপত্তিই শ্রদ্ধা-নাম্নী বৃত্তি।

শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিই ভক্তির অধিকারী। অশ্রদ্দধানের অভক্তিভূমিকায় তিনটী পথ দেখা যায়। অক্ষজ-জ্ঞান চালিত হইয়া ঐ পথ তিনটীতে ভ্রমণ করিতে গেলে ভক্তি-পথের সন্ধান পাওয়া যায় না। অক্ষজ-জ্ঞান প্রাকৃত দৃশ্যজগৎকে জ্ঞেয় বলিয়া মীমাংসা করায় অন্ধ বিশ্বাস ব্যতীত তাঁহার অন্য গতি নাই। অন্ধ দৃশ্যজগৎ দর্শন করিতে অসমর্থ। তাহার কেবল চেষ্টাই দৃশ্য জগৎকে দর্শন, সুতরাং অন্ধ বিশ্বাস অসিদ্ধ। অধিরোহ-পথে এক অন্ধ অক্ষজ জ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া অপর অন্ধকে নিজের অনভিজ্ঞতা গোপন করিয়া নিজকে লব্ধদর্শন বলিয়া পরিচয় দেওয়ায় এবং অন্ধবিশ্বাসী তাঁহার অনুগমন করায়, ওতপ্রোতভাবে দৃশ্য জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া কেহ বা ব্রহ্মশব্দে অচিৎ দৃশ্য, কেহ বা মায়াশব্দে দৃশ্য জগতের মূলকারণকে সংস্থাপিত করেন। উভয়েই বাস্তব বস্তুজ্ঞানে অজ্ঞানী হইয়া অভক্তির পথকেই নিজ নিজ ভ্রমণমার্গ জ্ঞান করেন। অন্যাভিলাষিতা, নিজের উপাধিদ্বারা ঐহিক পরলৌকিক অনিত্য ভোগ অথবা নির্ভেদ-ব্রহ্মানু-সন্ধানকেই নিঃশ্রেয়স্ বলিয়া স্থাপন করেন। অন্ধবিশ্বাসের দ্বারা অদৃষ্ট বস্তুকে লাভ করিবার উদ্ভাবনী শক্তি গুরু ও শিষ্যকে অভক্ত-সজ্জায় অজ্ঞানকূপে পাতিত করে। এজন্য ভক্তিমানই সৌভাগ্যবান্, অভক্ত অন্ধ বিশ্বাসকারী।

জ্ঞানরাজ্যে নির্ভেদব্রহ্মাভিন্ন গুরু-পরিচয়াকাঙ্ক্ষ মুক্তাভিমান করিলে তাঁহার বিচারে জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতার একত্বপ্রযুক্ত উপদেশ-যোগ্য বস্তুন্তরাভাব। আবার অসিদ্ধ অবস্থায় অজ্ঞানবশে তাঁহার গুর্ব্বভিমান। সুতরাং এক অন্ধ অপর অন্ধকে সাধন-রাজ্যেই সিদ্ধি-প্রাপ্তির নৈষ্ফল্য প্রদর্শন করে। সেজন্য তাঁহারা ভক্তিহীন ও মন্দভাগ্য।

ভাগ্যবান্ জীব ভগবান্ ও গুরুদেবের প্রসাদ লাভ করেন। সেই প্রসাদ হইতে তাঁহার ভক্তি সোপানের প্রথম স্তর শ্রদ্ধাবৃত্তির প্রাকট্য। জীবের সৌভাগ্য

দুই প্রকারে উদিত হয়। দৃষ্ট ও অদৃষ্ট-ভেদে যে সুকৃতির উদয় শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাই সাধুগণও বলিয়া থাকেন। জাতিস্মর দেবর্ষি তাঁহার প্রাক্তন সুকৃতির কথা বলিয়াছেন, আমরা তাঁহার উক্তি হইতে জানিতে পারি যে, আমাদেরও অদৃষ্ট-সুকৃতি ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণকালে লাভ হইবার সম্ভাবনা আছে। দৃষ্ট সুকৃতি-বিচারে আমরা নিজ রুচিদ্বারা সাধু ও শাস্ত্রের উপদেশ লাভ করি। সঙ্গপ্রভাবে শ্রবণ-জন্য আমাদের দৃষ্ট সৌভাগ্য উদিত হয়। সৌভাগ্য-উদয়ে আমাদের নিজত্বে আমরা অন্ধ বিশ্বাসের পরিবর্ত্তে নিত্য উপলব্ধি-জনিত পূর্ব্বপরিচিত নিত্যজ্ঞানময় সাধু ও শাস্ত্রের সান্নিধ্য লাভ করি। তাহাতে আমাদের দর্শনভাবজন্য কোনও অন্ধ বিশ্বাস করিতে হয় না। দৃশ্য জগতের প্রত্যক্ষাদি ভোগময়ী উপলব্ধিই আমাদের নিত্যোপলব্ধির বাধক হইয়া নশ্বর বস্তুতেই অন্ধ বিশ্বাস স্থাপন করায়। ভক্তির প্রথমাবস্থায় সাধন-রাজ্যের শ্রদ্ধা সুকৃতিজন্য। চক্ষুষ্মান্ বিশ্বাসই সৌভাগ্য।

পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুবরের

২৫শ বর্ষপূর্ত্তি বিরহ-বাসরে

ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি

জয় জয় প্রভুবর শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান।
তব কৃপা বিনা মোর নাহি পরিত্রাণ॥
ভকতবৎসল প্রভু পতিত পাবন।
সাধন সম্পদ্-সার তব শ্রীচরণ॥
প্রভুপাদ তব গুণে হৈয়া বড় প্রীত।
"কৃতিরত্নবর্য্য" নামে করিলা ভূষিত॥
ধন্য তুমি গুরু-কাছে পেয়ে এ সম্মান।
সকলে জানিল তুমি ভকত-প্রধান॥
প্রভুপাদ জানিত তুমি "বিনোদ মঞ্জরী"।
ডাকিত তোমারে তাই 'বিনোদ' নাম ধরি'॥
রাধা-চিন্তারত কৃষ্ণ, রাধা-বর্ণ পায়।
তব ধ্যানে সেই কৃষ্ণ শ্রীমঠেতে ভায়॥

হেন রাধা-কৃষ্ণ বিগ্রহ—তব আবিষ্কার।
তব সম চিদ্‌বিজ্ঞানী নাহি দেখি আর॥
তব আবিষ্কার সব অতি চমৎকার।
'জগদ্‌গুরু' নামে তুমি খ্যাত চারিধার॥
কৃষ্ণকে নন্দিত করি' 'কৃষ্ণানন্দ' নাম।
প্রভুপাদ-প্রিয় তনু, সর্ব্বগুণধাম॥
অনন্ত মহিমা তব লেখা নাহি যায়।
যাহা লিখি সে ত' শুধু তোমার কৃপায়॥
আমার শক্তির উৎস তোমার চরণ।
তোমার করুণা তাই যাচি অনুক্ষণ॥
আজি তব তিরোভাব-তিথি সমাগত।
বিরহে ব্যাকুল মোরা কাঁদি অবিরত॥
মন-প্রাণ সঁপিয়াছি তোমার চরণে।
তোমারে ত্যজিতে নারি জীবনে-মরণে॥
প্রভুপাদ-মনোঽভীষ্ট করি' সম্পাদন।
শ্রীরাধার ইঙ্গিতে কৈলা লীলা-সংগোপন॥
শ্রীরাধা-সঙ্গিনী হ'য়ে শ্রীহরির রাসে।
খেলিছ প্রাণের খেলা মাতি' প্রেম-রসে॥
তোমার বিচ্ছেদে হেথা তব ভৃত্যগণ।
বাহু তুলি' আর্ত্তনাদ করে সর্ব্বক্ষণ॥
তুমি ত' শুনিছ প্রভু মোদের ক্রন্দন।
কৃপা করি' এসে পুনঃ দাও দরশন॥
বহু ভাগ্যে এ জনমে তোমারে পাইনু।
হায় মোর কর্ম্মদোষে তাও হারাইনু!!
তোমার বিরহ-জ্বালা এত তীব্র হয়!
যা'র হয় অনুভব, সে জানে নিশ্চয়॥
ধৈরয ধরিতে নারি আজি সর্ব্বদাই।
কেমনে জুড়াবে জ্বালা ভেবে নাহি পাই॥
তোমার অভয়পদ আমার সম্বল।
তোমারে হারায়ে মোর জীবন বিফল॥

তব প্রেষ্ঠজন প্রভু শ্রীভক্তি বামন।
তাঁর কাছে মন্ত্র-দীক্ষা করেছি গ্রহণ॥
তাঁহার হৃদয়ে তুমি 'রাজো সর্ব্বক্ষণ।
তাঁর কৃপা হৈলে তব পা'ব দরশন॥
তাঁর পদে জানাইছি কাতর প্রার্থনা।
পূরাইও হেন মোর মনের বাসনা॥
তাঁর কাছে যত শুনি তব গুণ-কথা।
বিস্ময়ে পুলক জাগে ততই সর্ব্বথা॥
মোদের আর্ত্তিতে তুমি হইয়া কাতর।
মন্দিরে শ্রীমূর্ত্তিরূপে 'রাজো নিরন্তর॥
তিরোভাবেতেও জাগে আবির্ভাব-স্মৃতি।
এ যেন "তপ্তেক্ষু চর্ব্বণবৎ"—অনুভূতি॥
বিষামৃতের যুগপৎ একত্র মিলন।
হৃদে তাহা অনুভব করে ভক্তগণ॥
বড়ই কৃপালু তুমি, আশ্রিত-পালক।
আশ্রিত জনেরে কভু কর নি বিমুখ॥
মোর অন্তরের কথা সব তুমি জান।
হৃদি শোধি' দেহ কৃষ্ণ-সম্বন্ধ বিজ্ঞান॥
কৃপা কর যেন আমি মরণের পরে।
নিত্য তব কাছে থাকি' সেবি প্রাণ ভরে॥
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া আজি তব পূত পদে।
অনন্ত প্রণতি মোর জানাই বিষাদে॥

কৃপা-প্রার্থী—

৩০ পদ্মনাভ, শ্রীগৌরাব্দ ৫০৭
ইং ৩০।১০।৯৩

—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী
বড় বহরকুলি (বর্দ্ধমান)

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য

কোন সময়ে মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাস বদরিকাশ্রমে, সরস্বতী নদীতটে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার চিত্তের অপ্রসন্নতার কারণ সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছিলেন। তিনি লোকসকলের হিতসাধনের জন্য বেদ-বিভাজন, বেদান্ত সূত্র, উপনিষদ্, পুরাণ এবং পঞ্চম বেদ-স্বরূপে মহাভারতাদি বহুশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াও স্বীয় মনে শান্তি পাইতেছিলেন না, সুতরাং এই সকল শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন, অনুশীলনে লোকসকলের কল্যাণ বা চিত্তে শান্তি লাভ কিরূপে সম্ভব হইবে, সে বিষয়ে চিন্তা করিতেছিলেন।

এমন সময় তথায় দেবর্ষি শ্রীনারদ বীণা-সহযোগে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের গুণগান করিতে করিতে উপস্থিত হইলে মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহাকে গুরুর ন্যায় যথাবিধ আদর-সৎকার-পূজাদি করিয়া তাঁহার চিত্তের অপ্রসন্নতার কথা নিবেদন করিলেন।

শ্রীনারদ তাঁহাকে বলিলেন,—"হে পরাশরনন্দন! তুমি বহুবিধ গ্রন্থ লোকসকলের মঙ্গল ও হিত-সাধনের জন্য প্রণয়ন করিলেও উহা তোমার 'জুগুপ্সিত ধর্ম্ম' ও 'বায়সতীর্থ' তুল্য হইয়াছে; ইহার মধ্যে তুমি প্রচুর পরিমাণে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষসাধক চতুর্ব্বর্গের কথা বর্ণন করিয়াছ, কিন্তু শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের অমল যশঃ, লীলা, গুণাদির কথা কীর্ত্তন কর নাই। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ তাহাও পরিষ্কাররূপে বর্ণনা কর নাই; কোথাও গৌণভাবে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের কথা জানাইলেও উহা ভুক্তি, মুক্তি-প্রাপ্তির জন্যই পর্য্যবসিত হইয়াছে। ভক্তের, ভক্তির মহিমা বিশেষ করিয়া ব্রহ্ম-শিববন্দিত ভক্তচূড়ামণি ব্রজগোপীগণের মহিমা বিস্তারিতরূপে কীর্ত্তন না করিবার জন্য তোমার চিত্ত সুপ্রসন্ন নহে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের বিবিধ লীলা সমাধিযোগ অবলম্বনপূর্ব্বক ধ্যান করিয়া বর্ণনা করিবে।"

শ্রীবেদব্যাস দেবর্ষি নারদের উপদেশ মত চিত্ত একাগ্র করিয়া সমাধিযোগে দর্শন করিলেন,—"ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে। অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়ম্॥" (ভাঃ ১।৭।৪) শ্রীব্যাসদেব ভক্তিযোগের দ্বারা শুদ্ধ সমাহিত চিত্তে পূর্ণপুরুষ ভগবান্ অর্থাৎ আনন্দ-চিন্ময়রস-স্বরূপ মহাভাবের মূর্ত্তি শ্রীরাধিকাও সখীগণের সহিত লীলাপরায়ণ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের দর্শন এবং পশ্চাদ্ভাগে গর্হিতরূপে অবস্থিত মায়াকেও দর্শন করিলেন। শ্রীভগবানে অব্যবহিত ভক্তি অনুষ্ঠিত হইলে জীবসকলের সংসার-ভোগ-দুঃখ নিবৃত্ত হয়—ইহা দর্শন করিয়া লোকসকলের জন্য পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিলেন। "যস্যাং বৈ শ্রূয়মানায়াং কৃষ্ণে পরম পুরুষে। ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোক-মোহ-ভয়াপহা॥" (ভাঃ ১।৭।৭)

অন্য পুরাণাদি পঞ্চলক্ষণযুক্ত, কিন্তু মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত দশটী লক্ষণযুক্ত। ইহাতে সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, ঊতি, মন্বন্তর, ঈশানুকথন, নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয়, বিষয় উত্তমরূপে বর্ণিত, নয়টী আশ্রিত তত্ত্বের আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-কল্যাণকর, মনোহর লীলাসমূহ দশমস্কন্ধে বিশদরূপে বর্ণিত। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধকে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের 'মনোজ্ঞ আত্মস্বরূপ' বলিয়াছেন। বৃত্রাসুর উপখ্যান, নারায়ণ কবচ মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

পদ্মপুরাণে দ্বাদশস্কন্ধযুক্ত শ্রীমদ্ভাগবতকে ভগবানের অবয়বরূপে বর্ণিত হইয়াছে,

পাদৌ যদীয়ৌ প্রথম-দ্বিতীয়ৌ তৃতীয়তুর্য্যৌ কথিতৌ যদূরূ।
নাভিস্তথা পঞ্চম এব ষষ্ঠো ভুজান্তরং দোর্যুগলং তথান্যৌ॥
কণ্ঠস্তু রাজন্নবমো যদীয়ো মুখারবিন্দং দশমঃ প্রফুল্লম্।
একাদশো যস্য ললাটপট্টং শিরোঽপি তু দ্বাদশ এব ভাতি॥"

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতে বলিয়াছেন,—"গ্রন্থরূপে কৃষ্ণ অবতার। সর্ব্ব পুরুষার্থ ভক্তি ভাগবতে হয়॥"

"রসো বৈ সঃ" শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতও রসস্বরূপ, বেদ-কল্পতরুর সুপক্ক রসময় ফল। কঠিন হেয়াংশবর্জ্জিত কেবল রসই রস। রসিক ভাবনা-চতুর ভক্তগণ ইহার গানের যথার্থ অধিকারী।

যেরূপ কোন গ্রন্থ আলোচনা করিতে হইলে তাহার উপক্রম, উপসংহার জানিতে হয়, তদ্রূপ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয় জানিতে হইলে প্রথমে শাস্ত্রোক্ত ছয়টী লক্ষণ জানা অতি আবশ্যক,—উপক্রম উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতাফল, উপপত্তি, অর্থবাদ। শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে বিচার করিলে দেখা যায়, উপক্রমে 'সত্যং পরং ধীমহি' এবং উপসংহারেও 'সত্যং পরং ধীমহি' পদ দৃষ্ট হয়। 'সত্যং পরং' বস্তু একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। ব্রহ্মাদি দেবতাগণ, দেবকীর গর্ভস্থিত ভগবানের স্তব-প্রসঙ্গে 'সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে। সত্যস্য সত্যমৃত সত্যনেত্রং সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্না॥"

শ্রীমদ্ভাগবত তত্ত্ব বস্তু-নিরূপণে "বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্"—অদ্বয়জ্ঞান ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তাহা "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" বাক্যের দ্বারা শ্রীব্যাসদেব জানাইলেন। সমস্ত অবতার শ্রীকৃষ্ণের অংশ, কলারূপে অবস্থান করিতেছেন, কিন্তু তিনি স্বয়ং পূর্ণাবতারী। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের লীলা-চরিত্র প্রতিটী স্কন্ধে, প্রতিটী শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে। উপক্রমরূপে 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্' বলা হইলেও তাঁহার লীলাচমৎকারিতা এবং নাম-মহিমাদি অপূর্ব্বতা ফল, যাহা আশ্চর্য্য-

জনকতা উৎপন্ন করায়। এইভাবে অন্য অবতার অপেক্ষা তাঁহার বৈশিষ্ট্য বর্ণনে উপপত্তি দেখান হইয়াছে এবং পুনঃ পুনঃ সেই বিষয়ে উল্লেখ থাকায় তাহার অভ্যাস দেখান হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে "বেদ্যং বাস্তবমত্র" শ্লোকে 'বাস্তব' শব্দে ভক্তি, ভক্ত, ভগবান্ — তিনের স্মরণ করা হইয়াছে। জগতে সবই অবাস্তব বস্তু। অন্য সাধন পরিহার-পূর্ব্বক আদি, মধ্য, অন্তে ভক্তির মহিমা প্রকাশিত হইয়াছে। ভক্তির তারতম্যে ভক্তগণেরও তারতম্য দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ দেখা যায়,—শ্রীধ্রুব, প্রহ্লাদ, নারদাদি হইতে উদ্ধবজী, তাহা হইতে ব্রজের গোপীগণের এবং তাহার মধ্যে পুনরায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীমতী রাধারাণীর প্রেমের পরাকাষ্ঠা অন্তঃসীমা প্রাপ্ত।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত পুরঞ্জন-পুরঞ্জনী উপাখ্যান, দেবহূতি-কপিল-সংবাদ, ভবাটবী-যযাতি মহারাজের উপাখ্যান বর্ণনার দ্বারা জীবের সাংসারিক আসক্তি মোহ দূর করাইয়া ভগবানের প্রতি রুচি উৎপাদন এবং কৃষ্ণদাসত্ব উপলব্ধি করাইয়া তাহার অতি মনোহর চিত্তাকর্ষক লীলাকথা শ্রবণের যোগ্যতা প্রদান। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের লীলাকথাই তিনি স্বয়ং। জীবের চিত্ত কামনা-বাসনার দ্বারা ভরপূর, মলিন থাকিলে কথারূপী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অবস্থান তথায় কখনই সম্ভবপর নহে।

দশমে দশম তত্ত্ব বিশ্বজগতের আশ্রয়রূপী একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। তিনি অদ্বয়-জ্ঞান, রসরাজ, সচ্চিদানন্দময় স্বয়ং ভগবান্। শ্রুতির 'একমেবাদ্বিতীয়ম্', 'রসো বৈ সঃ', 'আনন্দং ব্রহ্ম', 'মধু ব্রহ্ম' প্রভৃতি বাক্যের চরমকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেও ব্রজসুন্দরী-গণের মহাভাবের দ্বারা, বিশেষ করিয়া তাঁহাদের সহিত রাসক্রীড়ার মাধ্যমে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আনন্দ-মাধুর্য্য, মদনমোহনত্বগুণের চরমতম অভিব্যক্তি প্রকাশিত হইয়া থাকে অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—চতুর্ব্বিধ প্রেমের বিষয় হইলেও মধুর অর্থাৎ শৃঙ্গার রসেই তাহার অসমোর্দ্ধ্ব মাধুর্য্য প্রকাশিত।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের বহুবিধ মনোহারী লীলা থাকিলেও রাসলীলাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, চিত্ত চমৎকারী লীলা—যাহা শিব, ব্রহ্মা, শুক, নারদাদি মুক্তগণেরও ধ্যেয়। রাসরসিক স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বলিয়াছেন, "সন্তি যদ্যাপি মে প্রাজ্যা লীলাস্তান্তা মনোহরাঃ। নহি জানে স্মৃতে রাসে মনো মে কীদৃশং ভবেৎ॥"

'রাসলীলা' পঞ্চ অধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবতের প্রাণ-স্বরূপ—পঞ্চ প্রাণ। বিশেষ করিয়া গোপীগীত প্রাণের প্রাণ। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ এই পঞ্চাধ্যায়কে শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চইন্দ্রিয় তুল্য বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সহিত ব্রজসুন্দরীগণের অপ্রাকৃত রাস-ক্রীড়াকে কেহ যেন প্রাকৃত কামক্রীড়ার সাম্যে দর্শন না করেন। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে

শ্রীল শুকদেব মহারাজ সাবধান করিয়াছেন,—"নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ। বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথা রুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥" (ভাঃ ১০।৩৩।৩০) অনধিকারিগণ বাক্যদ্বারা, কর্ম্মের দ্বারা এবং মনের দ্বারা কখনও আচরণ করিবে না। পুনরায় রাসলীলার অন্তশ্লোকে বলা হইয়াছে, "বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ। ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরা॥" শ্রীভগবানের কামবিজয়রূপ এই রাসক্রীড়া শ্রবণের ফলও কাম বিজয়। শ্রদ্ধার সহিত নিরন্তর শ্রবণ-কীর্ত্তনে অতিশীঘ্র হৃদয়ের কামনা-বাসনারূপ মল হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রেম প্রাপ্তি। শ্রীধরস্বামী রাস-পঞ্চাধ্যায়কে 'নিবৃত্তি পরা' এবং 'কন্দর্প বিজয়' লীলারূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবানের পরিকর সাধক, সিদ্ধগণের যে সব পাত্র-পাত্রীর উল্লেখ আছে তাহার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিসত্তম, সাক্ষাৎ বৃহস্পতির শিষ্য শ্রীকৃষ্ণের সখা, মন্ত্রণাদাতা প্রিয় উদ্ধব মহাশয় গোপীগণের অপার অগাধ প্রেমমহিমা সমুদ্রের কিঞ্চিৎমাত্র উপলব্ধি করিয়া প্রার্থনা করিলেন, –"বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ। যাসাং হরিকথোদ্গীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥" (ভাঃ ১০।৪৭।৬৩)

গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের আদিগুরু শ্রীব্রহ্মাজী প্রার্থনা রাখিলেন,—"তদ্ভূরি ভাগ্যমিহ-জন্ম কিমপ্যটব্যাং যদ্গোকুলেঽপি কতমাঙ্ঘ্রি রজোভিষেকম্। যজ্জীবিতং তু নিখিলং ভগবান্ মুকুন্দ স্ত্বন্যাপি যৎপদরজঃ শ্রুতিমৃগ্যমেব॥" (ভাঃ ১০।১৪।৩৪-৩৫) শ্রীব্রহ্মা উদ্ধবের ন্যায় সাক্ষাৎ ব্রজগোপীগণের চরণরেণু বন্দনা বা ধূলিকণা প্রার্থনা করিলেন না। তাঁহার প্রার্থনা বৃন্দাবনে যদি কোন তৃণ-গুল্ম-লতাদি হইবার সৌভাগ্য না হয়, তবে ব্রজের যে কোন স্থানে, গোকুলে এবং যে কোন ব্রজবাসীর চরণ-রজ যদি তাহার দেহে স্পর্শলাভ হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতের ইহা সব পর্য্যালোচনায় জানা যায়, বেদ-শ্রুতি-উপনিষদাদিবন্দিত আরাধ্য 'অনাদি আদি গোবিন্দদেব', তিনি কিরূপে গোপীগণের বিশেষ করিয়া শ্রীমতী রাধারাণীর প্রেমদ্বারা বশীভূত হইয়া গীতার 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্' শ্লোকের কথা রক্ষায় অসমর্থ হইয়া "ন পারয়েঽহং" বলিয়া নতমস্তকে নিজেকে শ্রীমতীজীর নিকট ঋণী বলিয়া স্বীকার করিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র প্রতিপাদ্য বিষয় হইলেও প্রেমিক ভক্তের এবং তাঁহাদের অপূর্ব্ব প্রেম-মহিমা বর্ণনই চরম প্রতিপাদ্য।

—শ্রীযুক্তা উমা দেবী

স্বধামে শ্রীযুক্তা কল্যাণী দেবী

আমরা বিশেষ দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, আমাদের পূজনীয়া শ্রীযুক্তা কল্যাণী দেবী (বিশ্বাস) গত ৬ই আশ্বিন ১৪০০ বঙ্গাব্দ, ইং ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৩, বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী-তিথিতে রাত্র ১০ টা ৪০ মিনিটে স্বধামে গমন করিয়াছেন। তাঁহার পারলৌকিক কৃত্য অনুষ্ঠানাদি গত ৫ই কার্ত্তিক, ২২শে অক্টোবর, শুক্রবার গৌর-সপ্তমী তিথিতে শিলিগুড়ি মিলনপল্লীস্থ তাঁহারই দানকৃত 'শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠে' বিশেষ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি বৎসর এই তিথিতে তাঁহার ভক্তিমান্ ধার্ম্মিক স্বামী শ্রীমৃণালকান্তি বিশ্বাস মহাশয়ের স্মৃতিকল্পে বার্ষিক অনুষ্ঠানাদি হইয়া থাকে। শ্রীযুক্তা কল্যাণীদেবীর পারলৌকিক কৃত্যাদিও এই শারদীয়া শুক্ল-সপ্তমীতেই নির্দ্ধারিত হয়।



বিগত ৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ (ইং ২৫।১১।৭৯), রবিবার তিনি শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি-আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত

বামন গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণাশ্রয়ে শ্রীহরিনাম-দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তদবধি তাঁহার শ্রীগুরুদেবের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা-ভক্তি ও বৈষ্ণবসেবার উৎসাহ এবং গুরুভ্রাতাগণের প্রতি মাতৃসুলভ স্নেহ-মমতা সকল বৈষ্ণবগণকে মুগ্ধ করিয়াছিল।

তাঁহার পরলোকগমন সংবাদ পাইয়া সেবকগণসহ তাঁহার শ্রীগুরুপাদপদ্ম—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ যথাসময়ে শিলিগুড়িস্থ শ্রীমঠে উপস্থিত হন। শ্রীধাম নবদ্বীপ হইতে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ, শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী প্রভৃতি, মথুরার শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের প্রেরিত শ্রীশুভানন্দ ব্রহ্মচারী, বৃন্দাবনস্থ শ্রীগোপীনাথজী গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীচারুকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ও শ্রীবাঁকেবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ ও শ্রীমাধব দাস ব্রহ্মচারী, শিলচর শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত যতি মহারাজ, শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ, তুরা হইতে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ, শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী, গৌহাটী শ্রীগোবিন্দজী গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীপরেশানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমানন্দ গৌড়ীয় মঠ, ধুবড়ী হইতে শ্রীজয়গোপাল দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীকিশোরকৃষ্ণ দাসাধিকারী; কোচবিহার শ্রীনরোত্তম গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীমদ্ভক্তিশরণ সাধু মহারাজ, শ্রীসদাশিব দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনরনারায়ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা হইতে "শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার" কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীসত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, চিত্তরঞ্জন (বর্দ্ধমান) হইতে শ্রীজগদীশ চন্দ্র দাসাধিকারী, সর্ব্বোপরি শিলিগুড়িস্থ শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ, শ্রীজগন্নাথ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগোপাল আশ্রম (শিলিগুড়ি) হইতে শ্রীগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী এবং শিলিগুড়ি দেশবন্ধুপাড়াস্থ শ্রীনরোত্তম গৌড়ীয় মঠের সেবায়েৎ ও মঠরক্ষক শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ জনার্দ্দন মহারাজ প্রভৃতি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন।

শিলিগুড়ি ও অন্যান্য স্থান হইতে আগত ও সমাবেত সকলের প্রচেষ্টা ও যত্নে কল্যাণী দেবীর বিরহ-মহোৎসব সাফল্যমণ্ডিত হয়। শ্রীমন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে নব-নির্ম্মীয়মান মন্দিরে বৈষ্ণব-হোমাদির জন্য যজ্ঞক্ষেত্র নির্ম্মিত হয়। ব্রহ্মচারী সেবকগণের শিল্পনৈপুণ্যে যজ্ঞবেদী সুন্দরভাবে সুসজ্জিত হয়। বিচিত্র রঙ্গিন কাগজ, আম্রপল্লব ও পুষ্পমাল্যাদিদ্বারা ইহার শোভা বর্দ্ধন করে। যজ্ঞবেদীর চতুষ্কোণে প্রস্থানাত্রয় পাঠের ব্যবস্থা হয় এবং পার্শ্বেই গুরুবর্গ, পৌর্ণমাসিসহ শ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারীজীউ ও শ্রীরাধা-শ্যামসুন্দরজীউ এবং শ্রীযুক্তা কল্যাণী দেবী ও মাননীয় শ্রীমৃণালকান্তি মহাশয়ের আলেখ্য অধিষ্ঠিত হন।

অতঃপর স্বয়ং শ্রীগুরুপাদপদ্মের সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে শ্রীশুভানন্দ ব্রহ্মচারী যজ্ঞের কার্য্য শুরু করিয়া উপস্থিত সাধু-সজ্জনবৃন্দকর্ত্তৃক পূর্ণাহুতি প্রদানান্তর যজ্ঞকার্য্য সমাপন করেন। যজ্ঞ চলাকালীন ব্রহ্মচারিগণ সর্ব্বক্ষণ মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন।

যজ্ঞকার্য্য সমাপ্ত হইলে পর পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের অনুমতিক্রমে মধ্যাহ্ন বিরহসভার সভাপতিরূপে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিশরণ সাধু মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ প্রভৃতি বক্তৃগণ শ্রীযুক্তা কল্যাণী দেবীর শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব সেবার আদর্শ, শ্রীরাধা-শ্যামসুন্দরের প্রতি আত্মনির্ভরতা ও ঐকান্তিক সেবানিষ্ঠা, পতিভক্তি, শাশুড়ী-ননদের প্রতি কর্ত্তব্যপরায়ণতা, আশ্রিত শ্রীভগবান্ প্রসাদ বর্ম্মার (ব্যবসায়িক ম্যানেজার) প্রতি স্নেহ ও বিশ্বাসভাজন, স্মার্ত্তগণের শ্রাদ্ধ-তর্পণের সাথে বৈষ্ণবগণের সাত্বত শ্রাদ্ধপদ্ধতির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেন। সভাশেষে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত গোবিন্দ মহারাজ তাঁহার প্রতি কল্যাণীদেবীর বাৎসল্য স্নেহ ও শ্রীমঠের ভবিষ্যৎ রক্ষণাবেক্ষণ-বিষয়ে কথোপকথনাদির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। বক্তৃতান্তে বিরহসভায় যোগদানকারী আহূত, অনাহূত ও বরাহূত সকলকেই বিচিত্র সুস্বাদু মহাপ্রসাদ পরিবেশন করা হয়।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউ ও শ্রীরাধা-শ্যামসুন্দরের সন্ধ্যারতির পর মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন করেন ব্রহ্মচারিগণ। অতঃপর সন্ধ্যাকালীন বিরহসভায় শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত যতি মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ, শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, শ্রীশুভানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীসদাশিব দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীরঘুনন্দন ব্রহ্মচারী গুরুসেবার আদর্শ ও কল্যাণীদেবীর শ্রীহরিভক্তিমূলক বিভিন্ন গুণসৌরভ ব্যক্ত করেন। পরিশেষে শ্রীমৎ আচার্য্য মহারাজ ম্যানেজার শ্রীভগবান্ প্রসাদ বর্ম্মাকে সর্ব্বসমক্ষে পরিচিত করান এবং তিনি যাহাতে তাঁহারই আশ্রয়দাতৃ কল্যাণীদেবীর অভীষ্ট সেবা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিয়া যান, তাহার জন্য অনুরোধ জানান। সর্ব্বশেষে শ্রীমৎ গোবিন্দ মহারাজ কল্যাণীদেবীর আত্মপরিচয় ও গুণমহিমা-স্বরূপ 'শ্রীশ্রীরাধা-শ্যামসুন্দর চরিতসুধা' গ্রন্থখানি উপস্থিত সকলের হস্তে অর্পণ করেন।

শ্রীযুক্তা কল্যাণীদেবীর শাশুড়ী মাতা শ্রীযুক্তা শৈলবালা বিশ্বাস ও ননদ শ্রীযুক্তা শান্তি রায় এবং তাঁহার আত্মীয়-স্বজনগণের শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবগণের প্রতি ভক্তি-নিষ্ঠা যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তজ্জন্য আমরা মঙ্গলময় শ্রীহরির নিকট প্রার্থনা জানাই।

—নিজস্ব সংবাদ

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৪৫শ বর্ষ | ১৭ কেশব, কারণোদশায়ী, ৫০৭ শ্রীগৌরাব্দ | ৩০ অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, ১৪০০, ইং ১৬/১২/৯৩ | ১০ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীচৈতন্যাষ্টকম্

[শ্রীশ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

উপাসিত-পদাম্বুজস্তমনুরক্ত-রুদ্রাদিভিঃ
প্রপদ্য পুরুষোত্তমং পদমদভ্রমুদ্ভ্রাজিতঃ।
সমস্ত-নত-মণ্ডলী-স্ফুরদভীষ্ট-কল্পদ্রুমঃ
শচীসুত ময়ি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপাম্ ॥ ১ ॥

ভক্তিরসতত্ত্বাচার্য্য শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য-দেবকে দর্শন করিয়া এইরূপ স্তব করিতেছেন।—হে শচীনন্দন! হে প্রভো! হে মুকুন্দ! তুমি আমাকে কৃপা কর। প্রকটস্বরূপ তোমাকে অন্যত্র অন্বেষণ করিতেছিলাম, অতএব আমি মন্দ। তোমার অনুরক্ত রুদ্রাদি দেবতা আচার্য্যাদিরূপে তোমার

পাদপদ্ম উপাসনা করিতেছেন। পুরুষোত্তম স্থান প্রাপ্ত হইয়া তুমি অতি শ্রেষ্ঠরূপে বিদ্যোতমান্ হইয়াছ। তুমি সমস্ত প্রণত জীবের অভীষ্টদাতারূপ কল্পবৃক্ষ হইয়া স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়াছ। আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম ॥ ১ ॥

নু বর্ণয়িতুমীশতে গুরুতরাবতারায়িতা
ভবন্তমুরুবুদ্ধয়ো ন খলু সার্ব্বভৌমাদয়ঃ।
পরোভবতু তত্র কঃ পটুরতো নমস্তে পরং
শচীসুত ময়ি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপাম্ ॥ ২ ॥

দত্তাত্রেয়, বাদরায়ণ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ মুনিগণের অবতারস্বরূপ যাঁহাদের আচরণ, সেই পরম বুদ্ধিশালী সার্ব্বভৌমাদি তোমার স্তব বর্ণনে যখন শক্ত হন নাই, তখন অন্য কাহারই বা সেই কার্য্যে সামর্থ্য হইবে? অতএব হে শচীসুত! হে প্রভো! হে মুকুন্দ! আমি প্রণতিপূর্ব্বক তোমার শরণাপন্ন হইলাম, তুমি আমাকে কৃপা কর ॥ ২ ॥

ন যৎ কথমপি শ্রুতাবুপনিষদ্ভিরপ্যাহিতং
স্বয়ঞ্চ বিবৃতং ন যদ্গুরুতরাবতারান্তরে।
ক্ষিপন্নসি রসাম্বুধে তদিহ ভক্তিরত্নং ক্ষিতৌ
শচীসুত ময়ি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপাম্ ॥ ৩ ॥

বেদশাস্ত্রে উপনিষদ্গণও যে বিশুদ্ধ ভক্তিরত্নের স্পষ্ট বর্ণন করেন নাই এবং স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্রও ব্যাসাদি গুরুতরাবতারে যাহার স্পষ্ট বিবরণ করেন নাই, সেই অতি গোপনীয় রসসমুদ্রের ভক্তিরত্ন তুমি পৃথিবীতে ধান্যরাশির ন্যায় নিক্ষেপ করিতেছ, অতএব তোমার তুল্য আর কৃপালু কেহই নাই। হে শচীসুত! হে প্রভো! হে মুকুন্দ! এই মন্দজীব যে আমি, আমাকে কৃপা কর ॥ ৩ ॥

নিজ প্রণয়বিস্ফুরন্নটনরঙ্গ বিস্মাপিত
ত্রিনেত্র নতমণ্ডল প্রকটিতানুরাগামৃত।
অহঙ্কৃতি কলঙ্কিতোদ্ধতজনাদি দুর্ব্বোধ হে
শচীসুত ময়ি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপাম ॥ ৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ যে তুমি তোমার নিজ প্রণয়দ্বারা উদিত নৃত্যরঙ্গ দৃষ্টি করিয়া শিবাবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছেন। সমস্ত ভক্তমণ্ডলের নিকট অনুরাগামৃতস্বরূপ প্রকট হইয়াছ। জাতিবিদ্যাদি অহঙ্কারজনিত লাঞ্ছনাদ্বারা যাহারা মোহিত তুমি তাহাদের বোধগম্য নও। এমন যে শ্রীশচীনন্দন তুমি হে প্রভো! হে মুকুন্দ! ক্ষুদ্রবুদ্ধিস্বরূপ আমাকে কৃপা কর ॥ ৪ ॥

ভবন্তি ভুবি যে নরাঃ কলিত-দুষ্কুলোৎপত্তয়-
স্ত্বমুদ্ধরসি তানপি প্রচুর-চারু-কারুণ্যতঃ।
ইতি প্রমুদিতান্তরঃ শরণামাশ্রিতস্ত্বামহং
শচীসুত ময়ি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপাম্॥ ৫॥

জগতে যাহারা দুষ্কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তুমি প্রচুর কমণীয় কারুণ্যবশতঃ তাহাদিগকে উদ্ধার করিতেছ। এই সম্বাদদ্বারা অত্যন্ত আনন্দিত অন্তঃকরণে তোমার শরণাগত হইলাম। হে শচীসুত! হে প্রভো! হে মুকুন্দ! অতি মন্দ যে আমি আমাকে কৃপা কর॥ ৫॥

মুখাম্বুজ-পরিস্খলন্মৃদুলবাঙ্মধুলীরস
প্রসঙ্গ-জনিতাখিল-প্রণত-ভৃঙ্গরঙ্গোৎকর।
সমস্ত-জনমঙ্গল-প্রভব-নাম-রত্নাম্বুধে
শচীসুত ময়ি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপাম্॥ ৬॥

তোমার মুখাব্জ হইতে স্খলিত কোমল বাক্য-মকরন্দ দ্রব প্রসঙ্গদ্বারা অখিল ভক্ত ভৃঙ্গদিগের বিস্ময়পদরূপে উদিত হইয়াছ। তুমি সমস্ত জনগণের মঙ্গলপ্রসূ নাম-রত্নের সমুদ্রস্বরূপ। হে শচীসুত! হে প্রভো! হে মুকুন্দ! অত্যন্ত মন্দ যে আমি আমাকে কৃপা কর॥ ৬॥

মৃগাঙ্কমধুরানন-স্ফুরদনিন্দ্র-পদ্মেক্ষণ
স্মিতস্তবক-সুন্দরাধর বিশঙ্কটোরস্তট।
ভুজোদ্ধত-ভুজঙ্গম-প্রভ মনোজ-কোটিদ্যুতে
শচীসুত ময়ি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপাম্॥ ৭॥

তোমার আনন্দ বিস্তারি মুখচন্দ্র হইতে প্রফুল্ল কমল নেত্রদ্বয় স্ফূর্ত্তিলাভ করিতেছে। তোমার মন্দ মন্দ হাস্যযুক্ত সুন্দর অধর ও বিশাল বক্ষঃস্থল শোভা পাইতেছে। উদ্ধত ভুজঙ্গের ন্যায় ভুজদ্বয় নয়নানন্দ বর্দ্ধন করিতেছে। হে কোটিচন্দ্রদ্যুতিমান শচীসুত! হে প্রভো! হে মুকুন্দ! মন্দরূপ আমাকে কৃপা কর॥ ৭॥

অহঙ্কনক-কেতকী-কুসুমগৌরদুষ্টঃ ক্ষিতৌ
ন দোষ লবদর্শিতা বিবিধদোষ-পূর্ণেঽপি তে।
অতঃ প্রবণয়া ধিয়া কৃপণবৎসল ত্বাং ভজে
শচীসুত ময়ি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপাম্॥ ৮॥

হে কনক কেতকী কুসুম গৌর! পৃথিবীমধ্যে কাম-ক্রোধাদি-দোষে আমি দুষ্ট। বিবিধ দোষপূর্ণজনেও তোমার দোষ লব দর্শিত হয় নাই। সমস্ত দোষ ক্ষমা-পূর্ব্বক তুমি দুষ্ট জীবকে উদ্ধার করিতে প্রস্তুত আছ। অতএব আমার সহিত তোমার সম্বন্ধ বিশেষ আছে। নম্রবুদ্ধির দ্বারা আমি তোমাকে ভজন করি। হে কৃপণবৎসল! হে শচীসুত! হে প্রভো! হে মুকুন্দ! এই মন্দজন-স্বরূপ আমাকে কৃপা কর ॥ ৮ ॥

ইদং ধরণিমণ্ডলোৎসব ভবৎপদাঙ্কেষু যে
নিবিষ্ট-মনসো নরাঃ পরিপঠন্তি পদ্যাষ্টকম্।
শচীহৃদয়নন্দন প্রকটকীর্ত্তিচন্দ্রপ্রভো
নিজপ্রণয়নির্ভরং বিতর দেবতেভ্যঃ শুভম্ ॥ ৯ ॥

হে ধরণিমণ্ডলোৎসব! হে শচীনন্দন! হে প্রকটকীর্ত্তিচন্দ্র! হে প্রভো! যে-সকল ব্যক্তি তোমার চরণচিহ্নে নিবিষ্টমনা হইয়া এই পদ্যাষ্টক পাঠ করেন, তাঁহাদিগকে মঙ্গলাত্মক স্বপ্রেম প্রদান কর ॥ ৯ ॥

প্রশ্নোত্তর

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৫শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৪৮ পৃষ্ঠার পর]

১৭। কোন্ গায়ত্রী ও বীজমন্ত্রে কৃষ্ণোপাসনা হয়?

"কামগায়ত্রী—২৪॥ অক্ষরে একটী বেদতন্ত্রমন্ত্র-বিশেষ এবং কৃষ্ণোপাসনায় যে বীজ জপিত হয়, তাহাই কামবীজ।" —অঃ প্রঃ ভাঃ মঃ ৮।১৩৭-১৩৮

১৮। কামগায়ত্রীর স্বরূপ কি?

বেদমাতা গায়ত্রী গোপীজন্মে কৃষ্ণসঙ্গ লাভ করিয়া 'কামগায়ত্রী' হন। নিত্য-সিদ্ধাগণ সম্বন্ধে যে মায়া-কল্পিত ব্রজ-ব্যাপার, তাহা নির্দ্দোষ। কেন না, সে মায়া জড়-মায়া নয়। যোগমায়া চিচ্ছক্তি এই ব্রজ-ব্যাপার কৃষ্ণেচ্ছায় বিধান করিয়াছেন। নিত্যসিদ্ধাগণের সহিত সালোক্য লাভ করত ঐ সকল উপনিষৎ, গায়ত্রী ও দেবীগণও পরকীয়াভাবে কৃষ্ণসেবা করিয়াছিলেন।" —চৈঃ শিঃ ৭।৭

১৯। জড়জগতে পূজিতা দুর্গার কার্য্য কি?

চৌদ্দভুবনাত্মক 'দেবীধাম', তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী—'দুর্গা' তিনি দশকর্ম্মরূপ দশভুজযুক্তা, বীর-প্রতাপে অবস্থিত বলিয়া সিংহবাহিনী; পাপদমনীরূপা মহিষাসুর-

মর্দ্দিনী ; শোভা ও সিদ্ধিরূপ-সন্তানদ্বয়-বিশিষ্টা বলিয়া কার্ত্তিক ও গণেশের জননী ; জড়ৈশ্বর্য্য ও জড়বিদ্যা-সঙ্গিনীরূপ লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মধ্যবর্ত্তিনী ; পাপদমনে বহুবিধ বেদোক্ত-ধর্ম্মরূপ বিংশতি অস্ত্র-ধারিণী ; কাল-শোভা বিশিষ্টা বলিয়া সর্পশোভিনী ; এই সকল আকারবিশিষ্টা **দুর্গা—দুর্গ-বিশিষ্টা**। 'দুর্গ'-শব্দে—কারাগৃহ ; তটস্থশক্তি-প্রসূত জীবগণ কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইলে যে প্রাপঞ্চিক কারায় অবরুদ্ধ হন, তাহার দুর্গার 'দুর্গ'। কর্ম্মচক্রই তথায় 'দণ্ড' ; বহির্ম্মুখ জীবগণের প্রতি এইরূপ শোধন-প্রণালী-বিশিষ্ট কার্য্যই গোবিন্দের ইচ্ছানুরূপ কর্ম্ম ; দুর্গা তাহাই নিয়ত সম্পাদন করিতেছেন। সৌভাগ্যক্রমে সাধুসঙ্গে জীবদিগের যখন সেই বহির্ম্মুখতা দূর হয় এবং অন্তর্ম্মুখতা উদিত হয়, তখন আবার গোবিন্দের ইচ্ছাক্রমে দুর্গাই সেই সেই জীবের মুক্তির কারণ হন। সুতরাং অন্তর্ম্মুখ-ভাব দেখাইয়া কারাকর্ত্রী দুর্গাকে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহার নিষ্কপট কৃপা লাভ করিতে চেষ্টা করা উচিত। ধন, ধান্য, পুত্রের আরোগ্য-প্রাপ্তি ইত্যাদি বরগুলিকে দুর্গার কপট কৃপা বলিয়া জানা উচিত। সেই দুর্গাই দশ-মহাবিদ্যারূপে প্রাপঞ্চিক-জগতে কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ জীবের জন্য 'জড়ীয় আধ্যাত্মিক-লীলা' বিস্তার করেন।"

—ব্রঃ সং ৫।৪৪

২০। **মহামায়া, দুর্গা, কালী প্রভৃতি কি চিচ্ছক্তি ? তাঁহাদের কার্য্য কি ?**

"জগতে মায়াদেবীকে 'দুর্গা', 'কালী' নামে পূজা করিয়া থাকেন। চিচ্ছক্তিই কৃষ্ণের স্বরূপগত শক্তি। মায়া তাঁহারই ছায়া, কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবগণকে শোধন করিয়া ক্রমশঃ কৃষ্ণোন্মুখ করাই মায়ার উদ্দেশ্য। মায়ার দুইপ্রকার কৃপা—অর্থাৎ নিষ্কপট-কৃপা ও সকপট-কৃপা। যে-স্থলে নিষ্কপট-কৃপা করেন, সেখানে স্বীয় বিদ্যা-বৃত্তিতে কৃষ্ণভক্তি দান করেন। যে-স্থলে সকপট-কৃপা, সে-স্থলে জড়ীয় অনিত্য-সুখ দিয়া জীবগণকে চালিত করেন। যে-স্থলে নিতান্ত অননুগ্রহ, সে-স্থলে ব্রহ্ম-নির্ব্বাণে জীবকে নিক্ষেপ করেন, তাহাই জীবের সর্ব্বনাশ॥"

—'শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দা', হঃ চিঃ

২১। **শ্রীকৃষ্ণের পীঠাবরণস্থ দুর্গা ও ভুবন-পূজিতা দুর্গার মধ্যে পার্থক্য কি ?**

"ভগবদ্ধামের আবরণে যে মন্ত্রময়ী দুর্গার উল্লেখ আছে, তিনি—চিন্ময়ী কৃষ্ণদাসী ; ছায়া-দুর্গা তাঁহারই দাসীরূপে জগতে কার্য্য করেন।"

—ব্রঃ সং ৫।৪৪

২২। **ভৌম-গোকুলে ও ভৌম-নবদ্বীপে যোগমায়া কি কার্য্য করেন ?**

"যোগমায়া-বলে শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের যেরূপ ভৌম-গোকুলে জন্মাদি, সেইরূপ যোগমায়া-বলেই শ্রীগৌর-স্বরূপের ভৌম-নবদ্বীপে শচীগর্ভে জন্মাদি-লীলা হইয়া থাকে ; ইহা স্বাধীন চিদ্‌বিজ্ঞান-তত্ত্ব,—মায়াধীন-চিন্তা-প্রসূতা কল্পনা নয়॥"

—ব্রঃ সং ৫।৫

২৩। গোলোকস্থ দুর্গার কার্য্য কি ?

"চিচ্ছক্তিগতা দুর্গা কৃষ্ণের লীলাপোষণ-শক্তি।" —জৈঃ ধঃ ১৪শ অঃ

২৪। শুদ্ধশাক্ত ও শুদ্ধবৈষ্ণবে ভেদ কি ?

"শাক্ত-বৈষ্ণবে আমরা কোন ভেদ দেখি না। চিচ্ছক্তিকে আশ্রয় না করিয়া কেবল মায়াশক্তিতে যাঁহাদের রতি, তাঁহারা শাক্ত হইয়াও বৈষ্ণব নহেন, অর্থাৎ কেবল বিষয়ী। * * * শক্তি দুই ন'ন, **একই শক্তি চিৎস্বরূপে রাধিকা ও জড়স্বরূপে জড়শক্তি।** বিষ্ণুমায়া **নির্গুণ-অবস্থায় চিচ্ছক্তি** এবং **সগুণ-অবস্থায় জড়শক্তি।**" —জৈঃ ধঃ ৯ম অঃ

২৫। পরমেশ্বর বা তাঁহার শক্তি মানিব কেন ?

"ঋতুদিগের গমনাগমনের দ্বারা মেঘাদির উৎপত্তি ও বর্ষণ, লৌহ প্রভৃতি ধাতুর অগ্নি-সংযোগের দ্বারা পর্ব্বত-বিদারণ ও ভূকম্প এবং তিথিযোগে জলের বৃদ্ধি ও হ্রাস—এ সকলই ভগবানের ঈক্ষণ-জনিত নিয়ম বলিতে হইবে। আকর্ষণ বা উত্তাপ কদাচ স্বয়ংসিদ্ধ-গুণ হইতে পারে না। চেতন স্বয়ং বিধাতৃ-স্বরূপ এবং আকর্ষণাদি বিধি-মাত্র; অতএব বিধাতাকে অস্বীকারপূর্ব্বক বিধি স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত নহে।" —তঃ সূঃ, ২২সূঃ

২৬। ভগবানেই বিরুদ্ধ-ধর্ম্মের সামঞ্জস্য কিরূপে হয় ?

"বিরুদ্ধধর্ম্মসামঞ্জস্যং তদচিন্ত্যশক্তিত্বাৎ'।

অর্থাৎ সেই তত্ত্বের অচিন্ত্যশক্তি-প্রযুক্ত সবিশেষ-নির্ব্বিশেষরূপ বিরুদ্ধ-ধর্ম্মদ্বয় সামঞ্জস্যরূপে বর্ত্তমান।" —'শক্তিমত্তত্ত্বপ্রকরণ', আঃ সূঃ ৬

২৭। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বে কিরূপে যুগপৎ বিরুদ্ধ-ধর্ম্মের সমন্বয় সম্ভব হয় ?

"সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে **অবিচিন্ত্য বিরোধ-ভঙ্গিকা** একটী **শক্তি** আছে। সেই শক্তি-**বলেই তাঁহাকে পরস্পর বিরোধী সমস্ত ধর্ম্মই অবিরোধে যুগপৎ নিত্য বিরাজমান।** স্বরূপতা ও অরূপতা, বিভুতা ও শ্রীবিগ্রহ, নির্লেপতা ও ভক্ত-কৃপালুতা, অজত্ব ও জন্মবত্তা সর্ব্বারাধ্যত্ব ও গোপত্ব, সার্ব্বজ্ঞ ও নরভাবতা, সবিশেষত্ব ও নির্ব্বিশেষত্ব প্রভৃতি অনন্ত বিরোধী ধর্ম্মসকল শ্রীকৃষ্ণে সুন্দররূপে আপন আপন কার্য্য করিয়া হ্লাদিনী মহাভাবময়ী শ্রীরাধার সেবা-সাহায্যে নিরন্তর নিযুক্ত আছে।" —শ্রীমঃ শিঃ ৪র্থ পঃ

মায়াতত্ত্ব

১। সত্ত্বগুণ কি মায়িক ও বন্ধনের হেতু ?

"মায়ার নিগড় তিনপ্রকার—সত্ত্বগুণ-নির্ম্মিত নিগড়, রজোগুণ নির্ম্মিত নিগড় ও তমোগুণ-নির্ম্মিত নিগড়। দণ্ড্যজীবসকলকে মায়া যথাযথ

ঐ তিন নিগড়ে আবদ্ধ করেন। জীব সাত্ত্বিকই হউন, রাজসিকই হউন বা তামসিকই হউন, সকলেই নিগড়-বদ্ধ। স্বর্ণ-নিগড়, রৌপ্য-নিগড় ও লৌহ-নিগড়, —ইহারা **ধাতুতে ভিন্ন হইলেও সকলেই নিগড় বই আর ভাল দ্রব্য নয়।**" —জৈঃ ধঃ ১৬শ অঃ

২। কোন্ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মায়ার কোন্ বিষয় ভোগ হয়?

"চক্ষুর্দ্বারা—রূপ, কর্ণের দ্বারা—শব্দ, নাসিকাদ্বারা—গন্ধ, জিহ্বাদ্বারা—রস এবং ত্বকের দ্বারা—মৃদুতা, কাঠিন্য, উষ্ণ, শীতাদি-বিষয়-পঞ্চকের ভোগ বা ভোজন হয়।" —'অত্যাহার', সঃ তোঃ ১০।৯

৩। মায়াবদ্ধ জীবের সুখের স্বরূপ কি?

"কষ্টকর গৃহধর্ম্মে নানাবিধ দুঃখ-তন্ত্রে অতন্দ্রিতভাবে দুঃখের প্রতীকার অনুসন্ধান করিয়া গৃহী 'সুখ পাইলাম' মনে করে। এই সংসারে যাহাকে সুখ বলে, তাহা সুখ নয়, কিছু কিছু দুঃখের প্রতীকারমাত্র।" —'বদ্ধজীবলক্ষণম্', শ্রীভাঃ মাঃ ৮।১৩

৪। ভবসমুদ্রে মায়াবদ্ধজীবের অবস্থা কিরূপ?

"নিজ-কর্ম্ম-দোষ-ফলে, পড়ি' ভবার্ণব-জলে,
হাবুডুবু খাই কতকাল।
সাঁতারি সাঁতারি যাই, সিন্ধু-অন্ত নাহি পাই,
ভবসিন্ধু—অনন্ত বিশাল॥"
—'যামুনভাবাবলী' ১০।১, গীঃ মাঃ

৫। মায়াবদ্ধজীব জন্ম-মৃত্যুর সুখ-দুঃখে অধৈর্য্য হইয়া কি-প্রকার ফল লাভ করে?

"সংযোগ-বিয়োগে যিনি, সুখ-দুঃখ মনে গণি,
তব পদে ছাড়েন আশ্রয়।
মায়ার গর্দ্দভ হ'য়ে, মজেন সংসার ল'য়ে,
ভক্তিবিনোদের সেই ভয়॥"
—'শোকশাতন' ৮।৬, গীঃ মাঃ

৬। মায়িক বিষয়-বৈভব, স্ত্রী-পুত্র-পরিজনে আসক্তি দোষাবহ কেন?

"অর্থকে অনর্থ জান, পরমার্থ দিব্য-জ্ঞান,
হৃদয়ে ভাবহ একবার।
দারা-পুত্র-বন্ধুজন, কেহ নহে নিজ-জন,
মরণেতে কেহ নহে কার॥

তোমার মরণ হ'লে, দেহটী ভাসায়ে জলে,
সবে যাবে গৃহে আপনার।
তবে কেন মিথ্যা আশা, বিষয়-জল-পিপাসা,
যদি কেহ নাহি হৈল কার॥"

—নঃ মাঃ ৭ম অঃ

৭। কেন জীব জন্ম-মরণ-স্রোতে সঞ্চালিত হয়?

"পূর্ণচিদানন্দ তুমি, তোমার চিৎকণ আমি,
স্বভাবতঃ আমি তুয়া দাস।
পরম স্বতন্ত্র তুমি, তুয়াপরতন্ত্র আমি,
তুয়াপদ ছাড়ি' সর্ব্বনাশ॥
স্বতন্ত্র হ'য়ে যখন, মায়া প্রতি কৈনু মন,
স্ব-স্বভাব ছাড়িল আমায়।
প্রপঞ্চে মায়ার বন্ধে, পড়িনু কর্ম্মের ধন্ধে,
কর্ম্মচক্রে আমারে ফেলায়॥
মায়া তব ইচ্ছামতে, বাঁধে মোরে এ জগতে,
অদৃষ্ট নির্ব্বন্ধ লৌহ করে।
সেই ত' নির্ব্বন্ধ মোরে, আনে শ্রীবাসের ঘরে,
পুত্ররূপে মালিনী-জঠরে॥"

—'শোকশাতন' ৮।১-৩, গীঃ মাঃ

৮। কৃষ্ণের কি মায়াস্পর্শ ঘটে?

"যেরূপ ছায়ার সহিত সূর্য্যের সম্ভোগ হয় না, তদ্রূপ মায়ার সহিত কৃষ্ণের সম্ভোগ নাই। সাক্ষাৎ মায়ার সহিত সম্ভোগ দূরে থাকুক, মায়াশ্রিত জীবের পক্ষেও কৃষ্ণসাক্ষাৎকার অত্যন্ত দুরূহ। কেবল কৃষ্ণ-কৃপা-বশতঃই সমাধি-যোগে ভগবৎ-সাক্ষাৎকার জীবের পক্ষে সুলভ হইয়াছে।"

—কৃঃ সং ৩।১৫, অনুবাদ

—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

———

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

অনেক জন্মের পর এই মানব জন্ম লাভ হইয়াছে। সুতরাং ইহা অত্যন্ত দুর্ল্লভ। ইহা অনিত্য, কিন্তু পরমার্থপ্রদ। অতএব ধীর ব্যক্তি যে-পর্য্যন্ত মৃত্যু পুনরায় নিকটস্থ না হয়, সে-পর্য্যন্ত ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া নিঃশ্রেয়ঃ বা চরম কল্যাণলাভের জন্য যত্ন করিবেন। আহার-নিদ্রাদি সকল জন্মেই পাওয়া যায়, কিন্তু পরমার্থ অন্য জন্মে লভ্য নহে। আমাদের যে কোন জন্মই হউক না কেন, বিষয় লাভ হইবেই। মনুষ্যজন্ম লাভ না হইলেও উহা পাওয়া যাইবে।

মনুষ্যজন্মে শ্রেয়ের অনুসন্ধানই কর্ত্তব্য। প্রেয়ের অনুসন্ধান পশুতে করে। মনুষ্য-জাতির বিশেষ—আমরা কাণ দিয়া শুনিতে পারি এবং শ্রুত বিষয়ের আলোচনা করিতে পারি। পশুদের পরস্পর আলোচনার ক্ষমতা নাই। যাহাতে অমঙ্গল হয়, তৎসম্বন্ধে চিন্তা না করিলে সাধারণ নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর ন্যায় বিচার হইয়া যায়। কিন্তু আমাদের বিবেক আছে। দেবজন্ম হইলেও ভোগে উন্মত্ত হইয়া পড়িব—সদসদ্‌বিচার চাপা পড়িবে।

মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। মহাবদান্য-লীলায় তাঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শিক্ষক বলিয়া মহাপ্রভু মহাবদান্য। অন্যান্য শিক্ষকগণ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া বদান্য, কিন্তু মহাপ্রভু শিক্ষকগণেরও শিক্ষক বলিয়া মহাবদান্য। কৃষ্ণ সেবায়ই সন্তুষ্ট হন, এই কথাই মহাপ্রভু বলিয়াছেন। কৃষ্ণের সেবা বাদ দিলে সর্ব্বপ্রকার অসুবিধা। শ্রীগৌরসুন্দরের বিভুত্ব, মহাপ্রভুর কৃপা সুষ্ঠুভাবে জানাইয়াছেন নিত্যানন্দ প্রভু; নিতাইর করুণায়ই সংসার-বাসনা তুচ্ছ এবং গৌরাঙ্গ বলিতেই অঙ্গ পুলকিত হয়। ঈশ্বরকে মানুষ জ্ঞান এবং মানুষকে ঈশ্বর জ্ঞান করিবার চেষ্টা—উভয়ই নারকীয় বিচার; যাহ ভগবান্, নহে, তাহাকে ভগবান্ জ্ঞান এবং ভগবত্তত্ত্বকে ভগবান্ নয় বলা—বিবর্ত্ত।

জগতে যে-সকল বিষয় আমরা জানি না, তাহা জানিবার জন্য ব্যস্ত হই, কিন্তু পরম প্রয়োজনীয় যে কৃষ্ণতত্ত্ব তৎসম্বন্ধে আমরা উদাসীন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় আমরা এই পরম ও চরম প্রয়োজনীয় তত্ত্ব পাই। নিতাইর পাদপদ্ম আশ্রয় করিতে হইবে। নিতাইর পাদপদ্মেরই সেবা করিতে হইবে।

কৃষ্ণপ্রেমময় তিনি সকলকে প্রীতির সহিত আকর্ষণ করেন। তিনি আমাদের সেবা পাইলে আনন্দিত হন। অধোক্ষজ কৃষ্ণের নিরন্তর সুখৈষণার নামই সেবা। সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণের সুখৈষণা ব্যতীত আমাদের আর কোন কার্য্য নাই। কৃষ্ণের নামের

ভজনে ক্রমে রূপের, গুণের, পরিকরের ও লীলার সেবা পাওয়া যাইবে। শ্রীনাম-ভজনই সর্ব্বসিদ্ধি। শ্রীনামভজন ব্যতীত নামীর ভজন হয় না। ইহজগতে নানা-প্রকার শব্দ আমাদের কর্ণে ঝঙ্কৃত হইতেছে, তাহা অপসারিত করিয়া কৃষ্ণের কথা শ্রবণ করিতে হইবে।

জীব কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া মায়া-রাজ্যে পতিত হইয়াছে। পাপ ও পুণ্য—উভয়বিধ কর্ম্মই বন্ধন। জীব কর্ম্মফলে ইন্দ্রত্ব, ব্রহ্মত্ব প্রভৃতি জাগতিক হিসাবে লোভনীয় পদ প্রাপ্ত হয়। এইসকল কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবের দণ্ড। কৃষ্ণভক্তের নিকট ব্রহ্মার পদ অতি তুচ্ছ। পতিত জীব প্রথমে বিরিঞ্চি হইয়াছে। মায়ার ভোক্তা বা কর্ত্তা হইতে গিয়া অনেক জীব ব্রহ্মার পুত্র হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রজা সৃষ্টির ভার প্রাপ্ত হইলেন।

জীব দেহ নহে, জীব আত্মা। জীব জড় নহে, জীব চেতন। আত্মা পরমাত্মার দর্শন পায়। উহার সহিত কথা বলিতে পারে। আত্মাই আত্মাকে দর্শন করে। জীব যথার্থ সদ্‌গুরুর আনুগত্যে ভজনরাজ্যে চরমোন্নতি লাভ করিতে পারে। হরিসেবাফলে প্রাকৃত অভিমান রহিত হইলে জীবের গোলোক প্রাপ্তি হয়। জীব নিষ্কপট সেবাফলে মুক্তগণের, এমন কি, নিত্যমুক্তকুলের সমপর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারেন। তখন এই সংসারের কথা মনে থাকে না।

কর্ম্মকাণ্ডিগণ মুখে বলেন,—"এ সকল কৃষ্ণকেই অর্পণ করিলাম।" কিন্তু তাহাতে কৃষ্ণে অর্পণ করা হয় না। যাঁহারা মনে করেন,—"আমাদের প্রচুর অর্থ, বিদ্যা, বুদ্ধি ও ভক্তি আছে, আমরা কৃষ্ণের জন্য কতই না করিলাম, আমাদের বৈষ্ণবতা বিখ্যাত হইয়া গিয়াছে", তাঁহারা বৈষ্ণব নহেন। নিজেকে বৈষ্ণব-বুদ্ধি করিয়া লোক নরকগামী হয়।

যাহারা ঠাকুরসেবার ছলনায় বিষয়ীর অন্ন গ্রহণ করে, তাহাদের ভজন নষ্ট হইয়া যায়। ঠাকুরের প্রসাদের নামে বিষয়ীর প্রদত্ত উত্তম উত্তম দ্রব্য ভোগ করিলে জিহ্বা ও উদর-লাম্পট্য উপস্থিত হয়।

কৃষ্ণের কথা কর্ণে প্রবিষ্ট হইলে আমরা কৃষ্ণের অনুসন্ধান করি। মায়িক জগতে কৃষ্ণের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। আমরা শুনিয়াছি কৃষ্ণ—নামময়, কৃষ্ণ—রূপময়, কৃষ্ণ—গুণময়, কৃষ্ণ—পরিকরময় ও কৃষ্ণ—লীলাময়। কিন্তু কৃষ্ণ-নামকে সাধারণ শব্দের সহিত সমান জ্ঞান করিতে হইবে না।

ভগবদ্‌বিগ্রহ শ্রীশালগ্রামের সহিত সামান্য শিলার তুলনা, গণ্ডকী শিলাকে পথের শিলার ন্যায় দেখা ভীষণ অপরাধ। ভগবদ্‌বিগ্রহকে প্রস্তর জ্ঞান, আবার প্রস্তরকে ভগবদ্‌বুদ্ধি উভয়ই পরিত্যাজ্য। মহান্ত-গুরুর দেহকে প্রাকৃতবুদ্ধি

করিলে নরকে যাইতে হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের দেহকে চিন্ময় জানিতে পারিলে আমাদের চিন্ময় দেহ হইবে।

অপ্রাকৃত দাস হইতে পারিলে আমাদের মঙ্গল হয়। প্রাকৃত দাস হইলে—প্রকৃতির সেবা করিলে অমঙ্গলের হস্ত হইতে নিস্তার নাই।

———

শ্রীকৃষ্ণ—পরমতত্ত্ব

"মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতিজ্ঞান। জীবেরে কৃপায় কৃষ্ণ কৈল বেদ ও পুরাণ॥" "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ", "বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ"—প্রভৃতি বাক্যদ্বারা প্রমাণিত হয় যে—শাস্ত্রানুশীলনদ্বারাই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। এই শাস্ত্রসমূহই ঈশ্বরের কৃপা বলিলেও কোন প্রকার অসঙ্গতি হয় না। আবার শাস্ত্রমধ্যেই দৃষ্ট হয়—'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো, ন মেধয়া, ন বহুনা শ্রুতেন। সুতরাং ইহা আপাতঃবিরোধী বলিয়া ধারণা জন্মে। 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ'. 'ঈশ্বরের কৃপালেশ হইয়াছে যারে। সেইত ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে॥'—এতাদৃশ বাক্যের সে-স্থলে সার্থকতা কি? সুষ্ঠুভাবে বিচার করিলে উভয়বিধ বাক্যই যে সত্য এবং যুক্তিসঙ্গত তাহা উপলব্ধি হইয়া থাকে। অর্থাৎ শাস্ত্রানুশীলনদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলেও বিজ্ঞান লাভ হয় না; এই বিজ্ঞানলাভে ঈশ্বরকৃপার অপেক্ষা বর্ত্তমান। 'যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ। তথৈব বিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥'—বাক্যে ইহাই স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। ঈশ্বরের কৃপালেশ হইয়াছে যারে—বাক্যটীও ইহারই প্রতিধ্বনি। সুতরাং পরতত্ত্ব-বিচারহেতু শাস্ত্রবাক্য আলোচনার প্রবৃত্তি নিরর্থক হইতে পারে না। কিন্তু নানাবিধ শাস্ত্রের নানাপ্রকার উক্তিকে পরস্পর বিরোধী ও সঙ্গতিহীন বলিয়া বিবেচিত হইলেও প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ মহাজনগণই সত্যাসত্য উপলব্ধি করিয়া থাকেন। যথা—'যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে। একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে॥' সুতরাং তত্ত্বজ্ঞ মহাজনগণই আমাদের শরণ্য। আমাদের আলোচ্য বিষয়টীতেও শ্রীরূপাদি ভগবৎপার্ষদগণের বিচারধারা অবলম্বন হউক।

স্বীয় উপাস্যতত্ত্বকে পরতম তত্ত্বরূপে ধারণা করা নিষ্ঠার পরিচয় হইলেও শাস্ত্র-বিচারে তাহা গ্রাহ্য হয় না। ব্রহ্মবাদীর বিচার অসম্যক্ বলিয়া ভক্তমহাজনগণ উহাকে আদর বা অঙ্গীকার করেন না। জ্ঞানপথিক ব্রহ্মবাদীর বিচারে ব্রহ্মই একমাত্র তত্ত্ব; কৃষ্ণ, নারায়ণ, রাম প্রভৃতি তত্ত্ব কাল্পনিক ও অনিত্য এবং হরেক মালের ন্যায় সকলেরই মূল্য এক। 'সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা'

—বাক্যটীতে ইহা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। অদ্বৈতসিদ্ধি লাভ করিলে কল্পিত উপাস্য লুপ্ত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান লভ্য হইয়া থাকে। এরূপ মতবাদকে বিচার, যুক্তি ও সিদ্ধান্তবলে ভক্তমহাজনগণ বহুলভাবে খণ্ডিত করিয়াছেন। এমন কি, শাঙ্করীয় অদ্বৈতসিদ্ধি তাঁহাদেরই বিচারযুক্তিতে কাল্পনিক ও মিথ্যাবাদে পর্য্যবসিত হইয়াছে, তাহাও সুষ্ঠুভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। আচার্য্য শঙ্কর এবং তাঁহার পূর্ব্বতন আচার্য্যদ্বয় শ্রীগোবিন্দপাদ ও গৌড়পাদ বিদেহগতি লাভের পরবর্ত্তিকালেও আবির্ভূত এবং দৃষ্ট হওয়ায় অদ্বৈতসিদ্ধি একটী অবাস্তব ও ছলনায় পরিণত হইয়াছে। কেবলাদ্বৈতবাদীর ব্রহ্মতত্ত্ব এবং যোগিগণের পরমাত্মতত্ত্বকে পরতম বলিয়া উক্তিও যুক্তি ও শাস্ত্রবচনে খণ্ডিত হইয়াছে। আকাশ হইতে শ্রীনারদের অবতরণকালে তাঁহাকে প্রথমে কেবল জ্যোতিরূপে, তৎপর বিগ্রহবিশিষ্টরূপে এবং সম্পূর্ণ নিকটস্থ হওয়ায় তাঁহাকে নারদরূপে জানই ইহাতে দৃষ্টান্ত। দর্শকের ভূমিকার দূরত্বহেতু একই বস্তুকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্‌রূপে অনুভব হইলেও ব্রহ্ম ও পরমাত্মা মূলতঃ শ্রীভগবৎ-তত্ত্বেরই আশ্রিত বা সাপেক্ষ তত্ত্ব; ভগবত্তত্ত্বের ন্যায় নিরপেক্ষ তত্ত্ব নহে। "ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহম্", "মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়" প্রভৃতি শাস্ত্রপ্রমাণে ইহাই ব্যক্ত হইয়াছে। একটী দীপ হইতে বহুসংখ্যক দীপ প্রজ্বলিত হইয়া সমভাবে প্রকাশিত হইলেও তাহাদের প্রকাশের মূল বিচারে প্রথমটীকেই স্বীকৃত হয়। 'অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে', 'নিত্যো নিত্যানাম্' প্রভৃতি বাক্য প্রমাণরূপে গ্রাহ্য। সুতরাং নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদী, সবিশেষ ব্রহ্মবাদী জ্ঞানী ও পরমাত্মা-নুশীলনকারী যোগিগণের বিচারে আমাদের প্রয়োজন নাই; ভক্তিপথিকগণের বিচার বা শাস্ত্রের সুষ্ঠুবিচারে পরতত্ত্ব কি?—তাহাই আমাদিগের আলোচ্য।

এক্ষণে দশবিধ প্রমাণের মধ্যে কাহাকে শ্রেষ্ঠ হেতু গৃহীত হইবে তাহা বিচারে 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ' ন্যায়ানুসারে আপ্তবাক্য শব্দকেই মূল প্রমাণ বলিয়া ভক্তিবিবেক-গ্রন্থে পূর্ব্বাচার্য্যগণ অঙ্গীকার করিয়াছেন। ইহার যৌক্তিকতা প্রদর্শনার্থ তাঁহাদিগের বর্ণনা—দেহাত্মবাদী লোকায়তিক (নাস্তিক মতাবলম্বী) চার্ব্বাকগণ কেবলমাত্র প্রত্যক্ষকে প্রমাণরূপে স্বীকার করেন। বৈশেষিকগণ—প্রত্যক্ষ ও অনুমান—এই দুই প্রমাণকে স্বীকার করিয়া থাকেন। সাংখ্য-পাতঞ্জল—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম—এই তিন প্রকার প্রমাণকে স্বীকার করেন। নৈয়ায়িকগণ—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ—এই চারপ্রকার প্রমাণকে গ্রহণ করিয়াছেন। মীমাংসকগণ—অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি—এই দুই অতিরিক্ত প্রমাণকেও স্বীকার করিয়াছেন। পৌরাণিকগণ—সম্ভব ও ঐতিহ্য প্রমাণদ্বয়কে অধিকরূপ গ্রহণ করত সাকল্যে

অষ্টবিধ প্রমাণের অনুগত এবং তান্ত্রিকগণ—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি, অনুপলব্ধি, সম্ভব, ঐতিহ্য, চেষ্টা ও আর্ষ—এই দশবিধ প্রমাণকে স্বীকার করিয়াছেন। যথার্থতঃ এই দশবিধ প্রমাণ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দরূপ প্রমাণ তিনটীর অন্তর্ভুক্ত বিষয়ে বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এই প্রমাণত্রয়কেই অঙ্গীকার করিয়াছেন। ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা দোষযুক্ত জীবের প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ অচিন্ত্য ও অলৌকিক বস্তুকে স্পর্শ করিতে বা অনুভব করিতে সক্ষম হয় না। তাহারা যাদুকরের প্রদর্শিত মস্তকছেদন কার্য্যটীকেও রাবণ-প্রদর্শিত মায়ামুণ্ডের ন্যায় সত্যরূপে গ্রহণ করত মিথ্যা জ্ঞানলাভ করে। তদ্রূপ বৃষ্টিপাতজনিত অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে সঞ্চিত ধূমপুঞ্জকে দর্শন করত পর্ব্বতকে বহ্নিমান্ মনে করিয়া সত্যভ্রষ্ট হয়। সুতরাং লৌকিক ব্যাপারেই যখন প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ কার্য্যকরী হয় না তখন অলৌকিক ব্যাপারে ইহাদের নিশ্চয়তা কোথায়? অতএব অপ্রাকৃত ও অলৌকিক ব্যাপারে গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত ভ্রম-প্রমাদাদি দোষচতুষ্টয়বর্জ্জিত অপৌরুষেয় বেদ ও তদনুগত শাস্ত্রবাক্যরূপ শব্দপ্রমাণই মূল প্রমাণ বলিয়া বৈষ্ণবাচার্য্যগণ অঙ্গীকার করিয়াছেন। "তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণং তে"—শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশ সর্ব্বোপরি বর্ত্তমান।

তথাপি বেদানুগ শাস্ত্রসমূহে নানাস্থলে আপাতঃ পরস্পর-বিরোধী বাক্য বর্ত্তমান থাকায় বদ্ধজীব সত্য-তত্ত্বগ্রহণে বিভ্রান্ত হইয়া থাকে। আচার্য্যগণও তজ্জন্য পৃথক্ পৃথক্ মতবাদ প্রদর্শন করত নানারূপ আপাতঃ-বিরোধী বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিলেও মূলতঃ সত্যকেই প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাই পরাভক্তিমান্ জীব গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়েন। "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।"—শ্রীমদ্ভাগবতে ১।৩।২৮ শ্লোক শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বা পরতমতত্ত্বরূপে বিঘোষিত করিলেও অন্যত্র বা অন্যান্য পুরাণমধ্যে আপাতঃ বিরোধিবাক্য এমন কি রামানুজীয় ভক্তগণের উক্তিতেও আপাতঃ-বিরোধের অবকাশ প্রকাশ পায়। অন্য শাস্ত্রের কথা দূরে থাকুক, শ্রীমদ্ভাগবতের—'বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং'' বাক্যটীর যথার্থ ধারণা সকলের পক্ষে একরূপে প্রকাশ পায় না। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—এই তিন তত্ত্বকে যখন একটীই তত্ত্বরূপে শ্লোকটীতে বর্ণিত হইয়াছে, তখন আবার ভগবত্তত্ত্বের শ্রেষ্ঠত্ব কিরূপে সম্ভব হয়?—এই প্রশ্নটী সাধারণতঃ অমীমাংসিত থাকে। পরন্তু মহদ্গণের পারম্পর্য্যে ইহার সত্যতা উপলব্ধ হইয়া থাকে। যথা—দুগ্ধবস্তুর সর্ব্ববিধ গুণ চক্ষুরাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কোন একটী দ্বারা গ্রাহ্য হয় না। এক একটী ইন্দ্রিয় দুগ্ধ-

বস্তুর পঞ্চগুণ এককালে থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র একটীকেই গ্রহণ করে। চক্ষু ইহার বর্ণকে, নাসিকা ইহার সৌগন্ধকে, জিহ্বা ইহার মাধুর্য্যকে, ত্বক ইহার ইষদুষ্ণতাকে কেবলমাত্র গ্রহণ করিতে সমর্থ। ইহারা কেহই একাকী সকলপ্রকার গুণকে গ্রহণ করে না। কিন্তু চিত্ত-তত্ত্বদ্বারা দুগ্ধের সর্ব্ববিধ গুণই এককালে গ্রাহ্য হইয়া থাকে। তদ্রূপ ভক্তি ব্যতীত অন্য পন্থা জ্ঞান-যোগাদিতে ব্রহ্ম ও পরমাত্মারূপে অনুভব ব্যতীত ভগবৎস্বরূপের অনুভব হয় না জ্ঞান-যোগাদিতে শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকর ও ধামাদির অনুভব নাই। 'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।'—ইহাই ব্যক্ত করে। সুতরাং সেই অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্বে সর্ব্ববিধ গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও জ্ঞান ও যোগ পন্থায় তাহার অসম্যক্ ও আংশিক অনুভব হয় মাত্র। অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্বের সম্যক্ বা সাবিক অনুভব হয় না। পক্ষান্তরে ভক্তিপথে অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্বের সকল প্রকার অনুভব—ব্রহ্ম ও পরামাত্মা-বিষয়ক অনুভবও বর্ত্তমান থাকে। পরন্তু ব্রহ্ম ও পরমাত্ম-তত্ত্বে পূর্ণত্বের অভাবহেতু পূর্ণস্বরূপ ভগবত্তত্ত্বই ভক্তগণের আদরণীয় হয়।

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বে যাবতীয় তত্ত্ব—ব্রহ্ম, পরমাত্মা, অংশ, কলা, শক্তি এবং যাবতীয় গুণাদির পরিপূর্ণতা ও আনন্তত্ব বর্ত্তমান বলিয়া তিনি পরতমতত্ত্ব রূপেবর্ণিত হইয়া থাকেন। তাঁহাকে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, পরব্যোমপতি নারায়ণ, পুরুষাবতারত্রয়, লীলাবতার, গুণাবতার, যুগবতার, মন্বন্তরাবতার, শক্ত্যাবেশাবতার, কেশাবতার প্রভৃতি যে কোন ভাবে উক্তির মিথ্যাত্ব নাই। কৃষ্ণই সর্ব্বতত্ত্বের সমাশ্রয় বলিয়া নিজ নিজ ভাবানুরূপ সর্ব্ববিধ রূপে তাঁহাকে দেখা যায়। তাঁহাকে নারায়ণ বলিলে মিথ্যা বলা হয় না বটে পরন্তু ইহা তাঁহার পূর্ণ প্রকাশকে লক্ষ্য করে না, আংশিক প্রকাশকেই মাত্র ব্যক্ত করে। শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।১৪ ১৪ শ্লোকটীতে ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক তাহাই স্পষ্টীকৃত হইয়াছে।—

নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনামাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নর-ভূ-জলায়নাৎ তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া॥

শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষ্ণকে "স্বয়ং" পদটী দ্বারা বারত্রয়ের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই প্রকার উক্তিকে "অভ্যাস" নামক লিঙ্গরূপে গ্রহণ করত শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ব্রহ্মসংহিতার উল্লেখানুসারে শাস্ত্র তাৎপর্য্যজ্ঞাপক লিঙ্গ ছয়টী। যথা—"উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্ব্বতা ফলম্, অর্থবাদোপপত্তি চ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনির্ণয়ে।" ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্", তৃতীয় স্কন্ধে—"স্বয়ন্ত্বনাম্যাতিশয়ঃ" এবং নবম স্কন্ধে "অষ্টমস্তু তয়োরাসীৎ স্বয়মেব হরিঃ কিল"—এই প্রকার স্বয়ং পদটী পুনঃ পুনঃ কথিত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণেরই স্বয়ংরূপত্ব

প্রতিপাদিত হইয়াছে। স্বয়ংরূপ পদের অর্থ—যাঁহার ভগবত্তা হইতে অন্যের ভগবত্তাকে বুঝায়। "দীপ হইতে যৈছে বহু দীপের জ্বলন। মূল এক দীপ, তাহা করিয়ে গণন॥ তৈছে সব অবতারের কৃষ্ণ সে কারণ।" (চৈঃ চঃ আঃ ২।৮৯-৯০)

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু স্বয়ং দাক্ষিণাত্যবাসী শ্রীবৈষ্ণব বেঙ্কটভট্টকে কাব্যশাস্ত্র বিচারদ্বারা এই "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" শ্লোকটীর নিগূঢ়ার্থ জ্ঞাপন করত জীবপ্রতি অপার করুণা প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"—উক্তিটীতে ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাটব-বিপ্রলিপ্সা—এই দোষচতুষ্টয়ের কোনই অবকাশ নাই। "অনুবাদমনুক্ত্বা তু ন বিধেয়মুদীরয়েৎ। ন হ্যলব্ধাস্পদং কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ প্রতিতিষ্ঠতি॥"—বাক্যানুসারে শ্লোকটীতে 'কৃষ্ণস্তু' পদটীতে কৃষ্ণকে অনুবাদ অর্থাৎ পরিজ্ঞাত বিষয় এবং 'ভগবান্ স্বয়ম্' পদে বিধেয় অর্থাৎ অপরিজ্ঞাত বিষয়রূপে যথাযথ অগ্রপশ্চাৎ উক্তি করিয়াছেন। পক্ষান্তরে 'নারায়ণ'কে অগ্রে এবং 'কৃষ্ণ'কে পশ্চাতে অর্থাৎ "ভগবাংস্তু কৃষ্ণঃ স্বয়ম্" এই প্রকার উল্লেখ করেন নাই। অতএব শ্রী-সম্প্রদায়ান্তর্গত বৈষ্ণবগণের মতে কৃষ্ণ নারায়ণের অংশ বা অবতার—এই মতবাদ খণ্ডিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকেই স্বয়ং ভগবান্ বা সর্ব্বাবতারীরূপে বিবেচিত হইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বেঙ্কটভট্টের সহিত রসবিচার দ্বারাও শ্রীকৃষ্ণের পারতমত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। পারব্রতা লক্ষ্মী ঠাকুরাণী নারায়ণের পত্নী হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গম ইচ্ছা করায় তাহাই সুপ্রমাণিত হইয়াছে।—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।১৬।৩৬ শ্লোকে নাগপত্নীগণের শ্রীকৃষ্ণস্তব—

কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা॥

শ্রীলক্ষ্মীঠাকুরাণী শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করিতে কেবলমাত্র ইচ্ছা করেন নাই, পরন্তু শ্রীবৃন্দাবনের পার্শ্ববর্ত্তী বিল্ববনে তপস্যা করিয়াও পাইতেছেন না। এতদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বের পরমোত্তমতা প্রকাশ পায়। বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় এই যে, শ্রীলক্ষ্মীদেবীর চিত্ত শ্রীকৃষ্ণে আকৃষ্ট হইলেও তাঁহার পাতিব্রত্য দুষ্ট হয় নাই; পরন্তু পরিপুষ্ট হইয়াছে। শ্রীনারায়ণ লক্ষ্মীদেবীকে এই কার্য্যের জন্য পরিত্যাগ করেন নাই। "আত্মারামাশ্চ"-শ্লোকে ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটা বিশেষ অবদান। সর্ব্বপ্রকার সেব্য বা উপাস্য তত্ত্ব হইতে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনাই পরম সৌভাগ্য এবং পরম কর্ত্তব্য বলিয়া "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" বাক্যে প্রকাশ পায়। ইহা কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোন তত্ত্বের বলিবার ক্ষমতা হয় নাই। এই কারণেই লক্ষ্মীদেবীর পাতিব্রত্যে কোন হানি হয় নাই। অধিকন্তু "সিদ্ধান্ত-

তত্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ, রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ'—বিচারে লক্ষ্মীদেবীর সতীত্বে কোনই কালিমা স্পর্শ করে নাই। পঞ্চপতি সত্ত্বেও দ্রৌপদীকে সত্যদ্রষ্টা তত্ত্ববিদগণ এই একই কারণে সতী বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন।

এ বিষয়ে আরও লক্ষিতব্য এই যে—স্বয়ং কৃষ্ণ চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তি ধারণ করিতে সক্ষম; কিন্তু বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণকে কৃষ্ণমূর্ত্তি ধারণ করিতে দেখা যায় না। একদা গোবর্দ্ধনে বসন্তকালীয় রাসে শ্রীকৃষ্ণ অনুসন্ধানকারিণী গোপীগণ হইতে নিজকে গোপন রাখিবার নিমিত্ত চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। গোপীগণ সেই চতুর্ভুজ নারায়ণরূপী কৃষ্ণকে দর্শন করিয়াও—"ইনি কৃষ্ণ নহেন" এইরূপ উক্তি করত তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক তাঁহাকে পরিত্যাগ ও তথা হইতে অন্যত্র গমন করিয়াছিলেন। গোপীগণ সেই নারায়ণমূর্ত্তি কৃষ্ণকেও অনাদর প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহাতে আকৃষ্ট হন নাই। ইহাও পরব্যোমপতি শ্রীনারায়ণ হইতে শ্রীকৃষ্ণের পারতমত্বের প্রমাণ।

শ্রীমদ্ভাগবতে ২য় স্কন্ধে নারদের প্রতি ব্রহ্মার উক্তিতে কৃষ্ণকে সিতকৃষ্ণ কেশাংশ-রূপে অবতীর্ণ বলা হইয়াছে। মহাভারতেও অনুরূপ বাক্য পরিদৃষ্ট হয়, যথা—স চাপি কেশৌ হরিরুদ্বহর্ষে শুক্লমেকমপরঞ্চাপি কৃষ্ণম্। তৌ চাপি কেশবাবিশতাং যদূনাং কুলে স্ত্রিয়ৌ রোহিণীং দেবকীঞ্চ॥ তয়োরেকো বলভদ্রো বভূব যোঽসৌ শ্বেতস্তস্য দেবস্য কেশঃ। কৃষ্ণো দ্বিতীয়ঃ কেশবঃ সংবভূব কেশো যোঽসৌ বর্ণতঃ কৃষ্ণ উক্তঃ॥" অর্থাৎ সেই ক্ষীরাব্ধিশায়ী বিষ্ণু শ্বেত ও কৃষ্ণ বর্ণের যে দুইটী কেশ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, তাহা যদুকুলস্ত্রী রোহিণী ও দেবকীতে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। তন্মধ্যে যেটী শুক্লবর্ণ তিনি বলভদ্র এবং কৃষ্ণবর্ণটী শ্রীকৃষ্ণরূপে প্রকটিত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বর্ণেও কৃষ্ণ ছিলেন।—এই শাস্ত্রবাক্য আপাতঃ বিভ্রান্তিকর হইলেও তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহাতে কোনই বিরোধ দর্শন করেন না। স্বয়ং ভগবান্ সর্ব্বাবতারী কৃষ্ণ যৎকালে কৃপাপূর্ব্বক লীলানিমিত্ত অবতরণ করেন তখন যাবতীয় অংশ, কলা প্রভৃতি তত্ত্বও তাঁহার আশ্রয়ে অবতীর্ণ হইয়া স্ব-স্ব কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। এই কারণে শ্রীকৃষ্ণমধ্যে কেশাবতারদ্বয়ের অবতরণেও শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাবতারিত্বে বা পরতমত্বে কোনই বিরোধ হয় না।

শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরের শেষাংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন কিন্তু শ্রীনারায়ণ সর্ব্বযুগে ও নিত্যকাল মহাবৈকুণ্ঠে বর্ত্তমান থাকেন—এবম্প্রকার যুক্তিদ্বারা শ্রীনারায়ণের অংশিত্ব স্থাপনে প্রয়াসী হইলেও 'অবতরণ' পদটীর প্রকৃত অর্থ অনুভব করিতে পারিলে এরূপ ভ্রম বা অজ্ঞান বিদূরিত হয়। অবতরণ বলিলে যে স্থান হইতে তত্ত্বের অবতরণ

সেই স্থানে তত্ত্বটীর বর্ত্তমানতা প্রকাশ পায় না কি ? ইহা অনুভব করিতে বালকও সক্ষম। অথর্ব্ববেদের শিরোভাগ শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিতে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-গোপাল-বিগ্রহ ও গোপালন-লীলা বর্ণিত দেখা যায়। উক্ত শ্রুতিমধ্যেই সৃষ্টির প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মাকে উপদেশ দিতে দেখা যায় এবং তৎপরে ব্রহ্মাও মুনিগণকে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তথায় শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকেও দুর্ব্বাসাকে ভোজন করাইবার আজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার পরিকরগণ যে নিত্যতত্ত্ব তাহা শাস্ত্রসিদ্ধ।

শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি সমস্তই সকলপ্রকার তত্ত্বের তুলনায় সর্ব্বোপরি। পদ্মপুরাণে সহস্র বিষ্ণুনাম এক রামনামের সমান বলিয়া দেখা যায়। আবার ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে তিনসহস্র বিষ্ণুনাম বা তিন রামনাম এক কৃষ্ণনামের সমফলতুল্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের অনন্যসাধারণ গুণচতুষ্টয় বিচারেও তাঁহার পারতমত্ব সর্ব্বসম্মত।

গুণচতুষ্টয়—১। সর্ব্বাদ্ভুতচমৎকার-লীলাকল্লোলবারিধিঃ।
২। অতুল্য মধুরপ্রেমমণ্ডিতপ্রিয়মণ্ডলঃ।
৩। ত্রিজগন্মানসাকর্ষি-মুরলীকলকূজিতঃ।
৪। অসমানোর্দ্ধ-রূপশ্রী-বিস্মাপিত-চরাচরঃ।

সংক্ষেপতঃ লীলামাধুরী, প্রেমমাধুরী, বেণুমাধুরী ও রূপমাধুরী—এই গুণচতুষ্টয় একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই বর্ত্তমান, নারায়ণাদি যাবতীয় তত্ত্বের সমুদয় গুণ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বে পরিপূর্ণভাবে থাকিয়াও উক্ত চারিপ্রকার গুণ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণে বর্ত্তমান ; অন্য কোনও তত্ত্বের তাহা নাই। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অর্জ্জুন এবং শ্রীমদ্ভাগবতে উদ্ধব এই সত্যটী তজ্জন্য যথার্থভাবেই প্রকাশ করিয়াছেন,—

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য, ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥
স্বয়ম্ভসাম্যাতিশয়ত্রাধীশঃ, স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ।
বলিং হরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ, কিরীটকোটীড়িতপাদপীঠঃ ॥

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

মদ

ভক্তির অত্যন্ত বিঘাতক ও ষড়্‌রিপুর অন্যতম 'মদ' শব্দের অর্থ অভিমান বা অহঙ্কার। কেহ কেহ মদকে প্রমত্ততা বা আসক্তি অর্থে ব্যবহার করেন। 'মদ' তমোগুণসম্ভূত বলিয়া ইহার রূপ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। জীব বিবর্ত্ত-বুদ্ধিতে প্রাকৃত বস্তুতে আমিত্ব বুদ্ধি করিয়া তাহাতে প্রমত্ত হইলে উহা 'মদ' নামে অভিহিত হয়। ভাষান্তরে বলা যাইতে পারে, মোহ বা অজ্ঞান যখন 'আমি ধনী' 'আমি মানী' এইপ্রকার অহমিকার আকার ধারণ করে, তখনই তাহার নাম হয় 'মদ'। বিষয়াসক্তি বুদ্ধির বস্তুবিশেষকেও 'মদ' কহে। অহঙ্কারী ব্যক্তি শ্রীভগবান্ হইতে অনেক দূরে অবস্থান করেন। শাস্ত্রে উল্লেখ রহিয়াছে,—'অহঙ্কার-নিবৃত্তানাং কেশব নহি দূরগঃ। অহঙ্কার-যুতানাং মধ্যে পর্ব্বতরাশয়ঃ॥" অর্থাৎ "যাঁহার অহঙ্কার নিবৃত্ত হইয়াছে কেশব তাঁহার সন্নিকটে অবস্থান করেন এবং অহঙ্কারী ব্যক্তির নিকট হইতে তিনি রাশি রাশি পর্ব্বত-ব্যবধানে অবস্থান করেন।" জগতের লোক ধন, রূপ, যৌবন, জড়পাণ্ডিত্য, বিদ্যা, জাতি এবং আরও কত মদে মত্ত রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই মদসমূহ যে তাঁহাদের অমঙ্গলের কারণ, তাহা তাঁহারা তাঁহাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারে না। দুধ কলা দিয়ে সাপকে যতই পোষণ করা হউক না কেন, তাহাতে কেবল যদ্রূপ তাহার বিষই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে; তদ্রূপ মদাভিমানী ব্যক্তির নিকট যতই সদ্ব্যবহার করা হউক না কেন, তাহার অসৎ স্বভাব সে কিছুতেই ছাড়িতে পারে না।

ধন-যৌবন-পাণ্ডিত্যাদির মদ জীবের দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক

জগতে ন্যূনাধিক সকলেই 'মদ'দ্বারা অভিভূত হইয়া সংসারচক্রে সতত ভ্রাম্যমান। শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মসেবা জীবমাত্রেরই একমাত্র বিষয়—তাহা ভুলিয়া তাহারা মায়ার উপাসনা করিতে গিয়া গাঢ়ভাবে বিষয়ে প্রমত্ত হন। দৈবী মায়ার কি প্রভাব, সংসারে পুনঃ পুনঃ দুঃখ-কষ্ট পাইয়াও তাহারা পুনরায় সংসারগর্ত্তে পতিত হইবার আশা কোনমতেই ত্যাগ করিতে পারে না। কৃষ্ণেতর বস্তু বিষয়-ভোগ যাহাদের প্রবল, তাহারা অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া ভক্তবিদ্বেষী হয়, বিষয়ে লুব্ধচিত্ত ব্যক্তি পরবর্ত্তীকালে অধঃপতন লাভ করে। মানবগণ ধন, জন, রূপ, বল, যৌবন ইত্যাদি মায়িক বৈভবজাত পদার্থে অহং ও মমত্ব বুদ্ধি করিয়া সত্যবস্তু হইতে দূরে অবস্থান করেন। ধনই বল, লোকবলই বল, আর স্ত্রী-পুত্রাদি পরিবারবর্গ বল, উহারা কেহই আপনার নয়, মৃত্যুর পরে কেহই সঙ্গে যাইবে না, একাই যাইতে হইবে। এই প্রসঙ্গে শাস্ত্রে রহিয়াছে,—

কি করিবে বিদ্যা, ধন, রূপ, যশ, কুলে।
অহঙ্কার বাড়ি' সব পড়য়ে নির্ম্মূলে॥ (চৈঃ ভাঃ মধ্য ৯।২৩৪)
অহঙ্কার দ্রোহমাত্র বিষয়েতে আছে।
অধঃপাত-ফল তার না জানয়ে পাছে॥ (চৈঃ ভাঃ মধ্য ৯।২৩৬)

রূপাদি মদ কতজনেরই যে অধঃপতনের কারণ হইয়াছে, তাহার অসংখ্য উদাহরণ বিভিন্ন শাস্ত্রের মধ্যে রহিয়াছে। চক্ষুর সম্মুখেও কতই প্রমাণ অহর্নিশ আমরা দেখিতে পাইতেছি। মদাভিমানিগণের মধ্যে কেহ কেহ আবার ভক্তের কৃপায় শ্রেয়ঃলাভ করিয়া জীবন সার্থক করিয়াছেন—তাহাও দেখা যায়। ধনমদে মত্ত রাবণ রামশক্তি সীতাকে হরণ করিবার দুর্ব্বুদ্ধি প্রকাশ করিতে গিয়া স্বর্ণলঙ্কা ধ্বংসের কারণ হইয়াছিলেন। ধনকুবেরের পুত্রদ্বয় নলকুবের ও মণিগ্রীব ধনমদে মত্ত হইলে দেবর্ষি নারদের অভিশাপে বৃক্ষ-যোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রূপমদে মত্ত সুদর্শন বিদ্যাধর অঙ্গিরা গোত্রজাত কুরূপগ্রস্ত ঋষিগণকে স্বীয়-রূপদর্পবশতঃ উপহাস করিয়া সর্পযোনি লাভ করিয়াছিলেন। উর্ব্বশীর যৌবনমদ তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের নিকট পরাভূত হইতে বাধ্য হইয়াছিল। দুর্য্যোধনের 'অহং' অভিমানই কৌরব বংশের ধ্বংসের কারণ বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। মৃত্যু কেন, বার্দ্ধক্য আগমন করিলেই স্বয়ং দেহবলের মদ অন্তর্হিত হইয়া যায়। জড় পাণ্ডিত্যমদের দ্বারা কেহই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারেন না, ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজ পার্ষদ দেবানন্দ পণ্ডিতের দ্বারা শিক্ষা দিয়াছেন। স্থূলবুদ্ধি জড়-অহঙ্কারী ব্যক্তিগণ তাহাদিগের দেহটাকেই 'আমি' বুদ্ধি করিয়া অপরা বিদ্যার জড়পাণ্ডিত্যদ্বারা বৈষ্ণবকে জয় করিবার যে স্পর্দ্ধা প্রকাশ করেন, তাহা তাহাদের মূর্খামির পরিচায়ক।

জাতিমদ ও প্রাকৃতরসমদের দ্বারা মৃত্যুঞ্জয় অসম্ভব

কতকগুলি লোক পুরুষানুক্রমে বিষ্ণু, বৈষ্ণব, ভগবানের পার্ষদ মুনি, ঋষি, ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতের বংশ বলিয়া অভিমান করিয়া ভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ নিষ্কিঞ্চন শুদ্ধ বৈষ্ণবের উচ্চ কুল ও পাণ্ডিত্যের অভাব কল্পনা করেন। এমন কি, তাহারা জড় অভিমানে প্রমত্ত হইয়া শুদ্ধ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিবার স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকেন। গুণময় জগতে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই ত্রিগুণের সাম্যভাব কল্পনা করিতে গেলেই অনর্থ উৎপন্ন হয়। তমঃ, রজঃ গুণাপেক্ষা সত্ত্বগুণের আদর এবং বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মার মুখ হইতে জাত বলিয়া ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা তমঃ ও রজঃগুণ-তিরোহিত বিশুদ্ধ সত্ত্বের উপাসক, আর শুদ্ধসত্ত্বই জীবের স্বরূপ উদ্বোধক। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে গুণ-কর্ম্মানুসারে চারিবর্ণ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা

গীতার "চাতুর্ব্বর্ণং ময়াসৃষ্টং" শ্লোকের মধ্যে প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। জাতিমদে প্রমত্ত হইয়া মূর্খ অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিসকল নিজ অস্থি-চর্ম্মাদিকে ব্রাহ্মণ বলিয়া যে পরিচয় প্রদান করেন, উহা প্রকৃত ব্রাহ্মণতা নহে, উহা ব্রাহ্মণ-ব্রুবতারই পরিচায়ক। ব্রাহ্মণাভিমানী ব্যক্তিগণ গুণানুসারে বেদোক্ত বর্ণবিধানের অবমাননা করিতে গিয়া পরমার্থ-চ্যুত হইয়া ভবচক্রে চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে বাধ্য হন।

আজকাল দেখা যায়, প্রাকৃত সহজিয়াগণ শাস্ত্রের ক্রমপন্থার অনুসরণ না করিয়া বৈষ্ণবী-দীক্ষায় সাবিত্রী সংস্কার ও আশ্রমান্তরে ত্রিদণ্ডাদি গ্রহণ ক্রমপন্থার ছিদ্রান্বেষণ করেন। রাগ ও বিধির অপূর্ব্ব সমাবেশের গূঢ় রহস্য বুঝিতে না পারিয়া তাহারা জড়রসমদে প্রমত্ততাকেই রসিকভক্তের লক্ষণ বলিয়া মনে করেন এবং নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনে ভেদবুদ্ধি করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা ছাড়িয়া দেন। কখনও বা প্রাকৃতরসমদে মত্ত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের নাগরভাবে উপাসনা করিতে গিয়া মাধুর্য্য সমূলে নষ্ট করেন। প্রাকৃত সহজিয়াগণ ভগবান্-কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া ভবসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্মের বৃথাই পরিসমাপ্তি ঘটান।

কর্ম্মমদ ও জ্ঞানমদে মত্ত ব্যক্তিগণ বাস্তবসত্য হইতে বহুদূরে অবস্থিত

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বলিয়াছেন,—"ফলভোগবাদ—কর্ম্মকাণ্ড ও ফলত্যাগবাদ—জ্ঞানকাণ্ড দুইটাই বিষের ভাণ্ড। যাহাদের ঐ বিষদ্বয় ভক্ষণে প্রবল রুচি তাহাদের জীবন অধঃপতিত হয়।" কর্ম্মকাণ্ডমদে মত্ত জনগণ ইন্দ্রিয়তর্পণ-বাসনায় বিষয়ের পশ্চাতে ধাবমান হইয়া জন্মজন্মান্তর লাভ করেন এবং স্বর্ণপিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া তাৎকালিক ইন্দ্রিয়তর্পণে কৃষ্ণসেবাবৈমুখ্য সংগ্রহ করেন। উহা জীবের অধঃপতন-রূপ অনাত্মবুদ্ধি। জ্ঞানিগণ 'মদ' পরিত্যাগ করিতে গিয়া জ্ঞানমদে প্রমত্ত, তজ্জন্য তাহারা সত্যবস্তু ধারণা করিতে অসমর্থ। জড়াসক্তিকে সর্ব্বদুঃখের আকর জানিয়া জ্ঞানিগণের যে জ্ঞানের প্রয়াস, তাহা কখনও শুভ নহে। সেবাবুদ্ধিরহিত হওয়ায় তাহারা ভ্রান্তধারণায় জগতের সমস্ত কিছুই মিথ্যা বলিয়া তাহাদিগকে দূরে নিক্ষেপ করেন। জ্ঞানিগণ "গলায় ছুরি বসাইয়া ফোঁড়ার চিকিৎসার" ন্যায় সর্ব্বদা আত্মধ্বংসকারী কার্য্যেরই পক্ষপাতী। বাস্তব বস্তুর নাম, রূপ, গুণ, লীলা ভক্ত্যালোকে নিয়তই ভক্তের নিকট প্রত্যক্ষ হয়, উহা জ্ঞানীর বৃথা অনুমানের অপেক্ষা করে না।

শ্রীকৃষ্ণ-গুণগানে মত্ততাই পরম পুরুষার্থ

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম গাহিয়াছেন,—"মদ কৃষ্ণগুণ গানে, নিযুক্ত করিব

যথা তথা। আনন্দ করি' হৃদয়, রিপু করি পরাজয়, অনায়াসে গোবিন্দ ভজিব।" জীব যখন মায়ার প্রলোভনে বিমুগ্ধ হইয়া কৃষ্ণের অপ্রাকৃত গুণগান হইতে বিরত হয়, তখন জড়াসক্তিই তাহাকে মায়ার কারাগারে নিত্যকালের জন্য আবদ্ধ করিয়া রাখে। জড়াসক্তিকে ছেদন করিতে হইলে ভগবৎপাদপদ্মে আসক্তির একান্ত প্রয়োজন। একমাত্র কৃষ্ণকীর্ত্তনের দ্বারাই রিপুগণের পরাজয় হইয়া থাকে। বুদ্ধিমান্ ভক্তিসাধক মদ বা অভিমানকে বিনষ্ট না করিয়া মত্ততারূপে শ্রীকৃষ্ণ-গুণ-গানে নিযুক্ত করিয়া সংসার-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হন। শ্রীকৃষ্ণ-গুণগানে প্রমত্ত হইয়া ভক্ত অচিরায় প্রেমসিদ্ধি লাভে ধন্য হইয়া থাকেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতে গজেন্দ্র ভগবানের স্তব করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

একান্তিনো যস্য ন কঞ্চনার্থং, বাঞ্ছন্তি যে বৈ ভগবৎপ্রপন্নাঃ।
অত্যদ্ভুতং যচ্চরিতং সুমঙ্গলং, গায়ন্ত আনন্দসমুদ্রমগ্নাঃ॥ (ভাঃ ৮।৩।২০)

"হে ভগবন্! ভগবৎপাদপদ্মে শরণাগত ঐকান্তিক ভক্তগণ কিছুই কামনা করেন না, তাঁহারা অতি অদ্ভুত ও সুমঙ্গলময় শ্রীহরিচরিত গানে প্রমত্ত হইয়া আনন্দরসসাগরে নিমগ্ন হইয়া থাকেন।" যোগ-জ্ঞান ক্লেশজনক পন্থাবলম্বনে রিপু সকলকে পরাভূত করিবার প্রচেষ্টার দ্বারা আনন্দের ধ্বংস অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। ভক্তগণ কখনও ঐ ক্লেশজনক পন্থার পথিক নহেন। তাঁহারা আত্মার সাহজিক ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মদাদি রিপুসকলকে অনায়াসে শ্রীগোবিন্দের ভজনে নিয়োগ করিয়া নিখিলকাল আনন্দের সমৃদ্ধির চেষ্টায় ব্যস্ত থাকেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মে এ দীনের

পুষ্পাঞ্জলি

তুমি অতি ধন্যা তিথি,　　শারদ-পূর্ণিমা-তিথি,
পরমার্থ-প্রদায়িনী।
প্রকটিয়া বর্ষ প্রতি,　　শিষ্যগণে গুরু-স্মৃতি,
গুরুভক্তি-প্রদায়িনী॥
তাই হেন শুভক্ষণে,　　সায়াহ্নে গ্রহণ-কালে,
শিষ্যগণে কাঁদাইলা।
নিত্যধামে বিচরণে,　　গুরু মোর অন্তর্দ্ধানে,
ভৌমলীলা সম্বরিলা॥

ভৌমলীলা সম্বরণ, চিল্লীলা প্রদর্শন,
আবির্ভাব-তিরোধান।
হেন লীলামৃত পান, জীবের সকল ত্রাণ,
পাবে কৃষ্ণের চরণ॥
ভগবানের জন্মতিথি, শ্রীগুরুর বিরহ-তিথি,
দুইত' ভকতি-মূল।
যাজিলে জীবন অতি, ধন্য হয় বাড়ে ভক্তি,
শাস্ত্র-সিদ্ধান্তমূল॥
ঈশ্বর—বিষয়-তত্ত্ব, শ্রীগুরু-আশ্রয়-তত্ত্ব,
লীলা-বিলাসে অভেদ।
গুরু-কৃষ্ণ-এক তত্ত্ব, সর্ব্বশাস্ত্রে এই তত্ত্ব,
দু-এ নাহি ভেদ॥
আবাহন-বিসর্জ্জন, বৈষ্ণবের অনুক্ষণ,
অশাস্ত্রীয় এ বিচার।
আবির্ভাব-তিরোধান, বৈষ্ণবের আচরণ,
বেদ-সিদ্ধান্ত-বিচার॥
শ্রীগুরুর চিৎতনু, মর্ত্ত্যবুদ্ধি করি' মৈনু,
অপরাধ হয় সার।
শুদ্ধভক্তি আচরিনু, হেন বুদ্ধি পাসুরিনু,
চিদ্‌বুদ্ধি আবিষ্কার॥
বিষ্ণুর চরণ-জল, গঙ্গা আদি যত জল,
স্পর্শে আনে পবিত্রতা।
বৈষ্ণবের চরণ-জল, প্রেমভক্তি দিতে বল,
কৃষ্ণে শুদ্ধভক্তি-দাতা॥
গুরু-কৃষ্ণে মর্ত্ত্যজ্ঞান, চিৎ-জড়ে সমজ্ঞান,
এ ত' অশাস্ত্র-বিচার।
এসব কুশাস্ত্র জ্ঞান, যেবা করে অধ্যয়ন,
ভকতি খর্ব্ব তাহার॥
নিরীশ্বর শূন্যবাদ, জগন্মিথ্যা বৌদ্ধবাদ,
প্রকৃতি—কার্য্য-কারণ।
নিরাকার ব্রহ্মবাদ, শ্রীশঙ্করের মায়াবাদ,
যা আসুরিক মনন॥

গুরু মোর জ্ঞান-ভাণ্ড,　　কুমত ঐ করে খণ্ড,
স্থাপিল (কৃষ্ণ)—সর্ব্বকারণ।
যতেক পাষণ্ডী খণ্ড,　　বাক্যবাণে করে খণ্ড,
শুদ্ধভক্তি করিল স্থাপন ॥
জ্ঞান-কর্ম্মে নাহি মিলে,　　ভক্তিপথে অবহেলে,
কৃষ্ণেরে পাওয়া যায়।
কৃষ্ণভক্তি গুরু বিনে,　　নাহি সাধ্য কোনকালে,
ভক্তিচিত্তে ভজ তায় ॥
অনন্ত কৃষ্ণের শক্তি,　　তার মধ্যে তিন শক্তি,
হ্লাদিনী, জীব ও মায়া।
জীব-স্বরূপে তটস্থাশক্তি,　　হ্লাদিনী (কৃষ্ণের) মূলশক্তি,
বহিরঙ্গা শক্তি—মায়া ॥
জীবের তটস্থা শক্তি,　　প্রভাবে ঐ মায়াশক্তি,
মায়া-পাশ সদা রয়।
গুরুপদে হলে ভক্তি,　　জীবে ধরে মহাশক্তি,
মায়ারে করিতে জয় ॥
মুই অতি অর্ব্বাচীন,　　কেবল ভকতিহীন,
নাহি ভজন-সাধন।
গুরুপ্রিয়-জনাধীন,　　থেকে যেন কাটে দিন,
দুঃসঙ্গ করি বর্জ্জন ॥
তুমি অনাথের পতি,　　এই মোর অনুভূতি,
জীবের জীবন-সার।
তুমি অগতির গতি,　　তোমা ছাড়া নাহি গতি,
করুণা কর এবার ॥

—শ্রীহরিপ্রিয় দাসাধিকারী

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-জয়ন্তী

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৫শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৩৬ পৃষ্ঠার পর]

পূঃ পঃ—পরমেশ্বর অণু হইতেও অণু এবং মহান্ হইতেও সুমহান। তিনি—স্বরাট্, বিরাট্, ভূমাপুরুষ। তিনি জীবের অন্তরে, বাহিরে, দূরে ও নিকটে বর্ত্তমান। (শ্বেঃ শ্বঃ উঃ ৩।২০)। হে কৃষ্ণ! আপনি এই সমস্ত দেখাইয়াছেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হ্যাঁ, এই সমস্তও আমি দেখাইয়াছি। আমি অণু হইতেও অণু, পরীক্ষিতের জীবন রক্ষার জন্য উত্তরার গর্ভে প্রবেশ করিয়াছি। (পরীক্ষিতের দৃষ্ট সেই মূর্ত্তি তাহার মনেও ছিল, ভূমিষ্ঠ হইয়া সে সেই মূর্ত্তির অনুসন্ধান বা পরীক্ষা করিত বলিয়া তাহার নাম হইল পরীক্ষিত) ভাঃ। আমি মহান্ হইতেও সুমহান, ভূমা, স্বরাট্, বিরাট্রূপ বা বিশ্বরূপ (গীঃ ১১ অঃ) ত্রিলোকবিজেতা বীর অর্জ্জুনকে দেখাইয়াছি। আমি আত্মতত্ত্বজ্ঞের নিকটে অজ্ঞের বহুদূরে এবং ভক্তের অন্তরে ও বাহিরে বর্ত্তমান।

পূঃ পঃ—ঈশ্বর "অজ, নিত্য, শাশ্বত", তাঁহার জন্ম নাই। (কঃ উঃ ১।২।১৮) হে কৃষ্ণ! আপনি ত' জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। গর্ভ-যন্ত্রণা পাইয়াছেন। কেহ কেহ বলেন,—"পঞ্চভূতের ফান্দে, ব্রহ্ম পড়ি' কান্দে" ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—যাঁহারা মনে করে যে—ভগবান্ জন্মগ্রহণ করিলে কিছু কমা হইয়া যান, তাঁহারা সব ভ্রান্ত। আর "পঞ্চভূতের ফান্দে, ব্রহ্ম পড়ি' কান্দে" ইহাত' মোহগ্রস্তগণের দারুণ প্রলাপোক্তি। আমি "অজ ঈশ্বর" হইয়াও জন্মগ্রহণ করি, এইটিই আমার অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। অজ ভগবানের সহিত কেহ প্রেম করিতে পারে না। কাজেই সকলকে প্রেমসেবা প্রদানের জন্য এবং দুষ্টদমন, শিষ্টপালন ও ধর্ম্মস্থাপনের জন্য আমি জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি। (গীঃ ৪।৮)। তবে আমি যে গর্ভযন্ত্রণা বা ত্রিতাপজ্বালা ভোগ করি না তাহা দেখাইবার জন্য শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম চতুর্ভুজে ধারণ করিয়া এবং কিরীট, কুণ্ডল, হার, কৌস্তুভমণি, বৈজয়ন্তীমালা ও বিবিধ বসন, ভূষণ, রত্নালঙ্কারে সুশোভিত হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি। (ভাঃ ১০।৩।৯)। এই প্রকার জন্ম মানুষে বা অন্য কোন প্রাণীতে কখনও সম্ভব হয় না বা ভবিষ্যতে হইবেও না। মানুষ পিতামাতা ছাড়া জন্মগ্রহণ করিতেই পারে না, কিন্তু আমি পারি, প্রহ্লাদকে রক্ষার সময় স্তম্ভ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া সেই মহাসুর হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়া ত্রিলোকে শান্তিবিধান করিয়াছি। (ভাঃ) কাজেই আমার জন্ম-কর্ম্ম যাহা কিছু সর্ব্বদিব্যম্ অর্থাৎ অপ্রাকৃত

চিন্ময় ব্যাপার, ইহা যেদিন তুমি আমার ভক্তের কৃপায় বুঝিতে পারিবে, সেইদিন তোমাকেও আর জন্ম-মৃত্যু-মালা, ত্রিতাপজ্বালা বা গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না।

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥
জন্ম কর্ম্ম চ দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥ (গীঃ ৪।৮-৯)

পৃঃ পঃ—হে কৃষ্ণ! আপনি এই সমস্ত অদ্ভুত কর্ম্মসকল করিয়াছেন। তবে পরমেশ্বর হইতে হইলে ছোট খাটো যে সমস্ত ঈশ্বর (দেবতারা) আছেন, তাঁহাদিগকে জয় করিতে হয়। আপনি বাহুবলে সমস্ত দেবতাগণকে জয় করিয়াছেন কি?

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হ্যাঁ, তাহাও আমি করিয়াছি। ১। গুরুদক্ষিণায় আমি যমকে জয় করিয়াছি। (ভাঃ) ২। পিতা নন্দকে মোচনকালে আমি বরুণকে জয় করিয়াছি। (ভাঃ) ৩। খাণ্ডববন দহনকালে আমি অগ্নিকে জয় করিয়াছি। (মঃ ভাঃ) ৪। গোবর্দ্ধন ধারণকালে এবং পারিজাত হরণকালে দেবরাজ ইন্দ্রকে আমি দুইবার জয় করিয়াছি। (ভাঃ ও মঃ ভাঃ) ৫। গো-বৎস হরণকালে লোক পিতামহ সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাকে আমি জয় করিয়াছি। (ভাঃ) ৬। মহাদেবকেও আমি-২।৩ বার জয় করিয়াছি। পারিজাত হরণকালে, ঊষা-অনিরুদ্ধের মিলনকালে এবং নকল অবতার নিধনকালে, এই তিনবার আমি মহেশ্বরকে জয় করিয়াছি। যাঁহারা নকল অবতার সাজিবে, তাঁহারা যদি গোবর্দ্ধন ধারণাদি কর্ম্মসকল করিতে না পারেন, তাহা হইলে সুদর্শন কচ্ করিয়া গলাটি কাটিয়া ফেলিবে। আর "অহং ব্রহ্মাস্মি" ও "সোঽহং" মন্ত্র জপ করিতে করিতে আমার আসনদখল করিবার চেষ্টা করিলে, সুদর্শন কচ্ করিয়া মুণ্ডটি ছেদন করিয়া ফেলিবে। সেইজন্য বলিতেছি যে,—সাধু সাবধান! কলিকালে অনেক নকল অবতার হইয়াছে।

একবার পৌণ্ড্রক নামে একটী অসুর 'নকল অবতার' সাজিল। সূত্রধরের কৃপায় চতুর্ভুজ হইল, অনেক ভক্ত জুটিয়া গেল। কাশীরাজের ন্যায় অনেক বড় বড় লোক ভক্ত হইল। সেইসঙ্গে ভোলানাথও সুর ধরিল, হ্যাঁ তুই অবতার। তখন সেই অসুরের অহঙ্কারের আর সীমা রহিল না। সে দ্বারকায় আমার নিকট পত্র লিখিয়া পাঠাইল। হে কৃষ্ণ! তুমি বাসুদেব নাম পরিত্যাগ কর এবং চক্রাদি অস্ত্রসকল পরিত্যাগ করিয়া আমার ভজনা কর, আমিই একমাত্র "বাসুদেব অবতার"।

আমি পত্রের উত্তর দিলাম যে,—সুদর্শন অস্ত্রসকল এখানে ফেলিলে তুমি দেখিতে পাইবে না, কাজেই তোমার সম্মুখে গিয়া ফেলিয়া আসিব। সেই অবতারকে দেখিবার জন্য আমি একাকীই কাশীপ্রদেশে গমন করি। আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য নকল অবতার প্রস্তুত হইল। তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য সমস্ত সৈন্য লইয়া কাশীরাজ অগ্রসর হইল। ভক্তকে সাহায্য করিবার জন্য স্ব-গণ সহিত শঙ্করও অগ্রসর হইলেন। আমি সেই চতুর্ভুজ অবতারকে দেখিয়া খুব হাসিলাম এবং কহিলাম—বা সুন্দর অবতার হইয়াছ! এই আমি বাসুদেব নাম ও সুদর্শন অস্ত্রসকল ফেলিয়া বাড়ী চলিয়া যাইতেছি। তুমি ভগবান্ হইয়া সুখে থাক। প্রথমে এই সুদর্শন ফেলিলাম,—এখন তুমি তোমার কর্ত্তব্য পালন কর। সুদর্শন প্রথমেই নকল অবতারের গলাটি কচ্ করিয়া কাটিয়া, কাশীরাজের মুণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। সমস্ত সৈন্য ধ্বংস করিল এবং কাশীপুরী পোড়াইয়া ছারখার করিয়া দিল। বীরভদ্র, নন্দী, ভৃঙ্গি, কার্ত্তিক, গণেশ, কালী, তারা, দুর্গা, ভৈরবী, কোটবী, পার্ব্বতী প্রভৃতি সুদর্শনের দাপট (বিক্রম) সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাণের ভয়ে সকলে মুক্তকেশে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। মহাদেব ক্রোধ করিয়া পাশুপত অস্ত্র ছাড়িলেন, কিন্তু নিমেষমধ্যে সুদর্শন পাশুপতকে ধ্বংস করিয়া বিশ্বনাথের গলা কাটিবার জন্য অগ্রসর হইতে লাগিল। শঙ্কটে পড়িয়া শঙ্কর ভাবিলেন যে যাহার নিকট দুর্ব্বাসা মুনি পলাইয়া রক্ষা পায় নাই, কাজেই আমি আর কোথায় বা পলাইব; এই চিন্তা করিয়া শিব আমার শরণাপন্ন হইয়া স্তব করিতে লাগিল।

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে।
প্রণত ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

আমি তাঁহাকে অভয়প্রদান করিয়া কহিলাম যে,—হে শঙ্কর! তুমি এই কাশীপুরী ও দুষ্টসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া, আমার অন্তিমে পরম নির্জ্জনস্থান একাম্র-কাননে (ভুবনেশ্বরে) বসবাস কর। তোমার প্রার্থনায় সেখানেও আমি "অনন্ত বাসুদেব" রূপে (কৃষ্ণ-বলরাম) বর্ত্তমান থাকিব। আমার নির্ম্মাল্যের দ্বারা তোমার (ভুবনেশ্বরের) নিত্যপূজা হইবে। (মঃ ভাঃ)

পূঃ পঃ—বাপ্‌রে বাপ, হে কৃষ্ণ! আপনি এত সমস্ত করিয়াছেন। তাহা হইলে আপনি নিশ্চয়ই ভগবান্ বা পরমেশ্বর; তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। তবে একটী কথা এই যে—আপনি যখন পরমেশ্বর ভগবান্, সকলের আরাধ্য বা পূজ্য; তখন সকলের দ্বারা অগ্রপূজা পাইয়াছেন কি? সকলে যদি পূজা করে, তবেত' আপনি ভগবান্, নতুবা কিসের ভগবান্?

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হ্যাঁ, তাহাও আমি পাইয়াছি, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞসভায়। সেই সভায় সমস্ত দেবতাগণ, মুনি-ঋষিগণ, যোগিগণ, জ্ঞানিগণ এবং সমস্ত রাজন্যবর্গ উপস্থিত ছিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—এই সভায় অগ্রপূজা কে পাইবেন? যথাযথভাবে লোকপূজার ভারপ্রাপ্ত এবং জ্যোতিষশাস্ত্রে সুপণ্ডিত সহদেব কহিল,—এই সভায় শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র অগ্রপূজা পাইবার উপযুক্ত পাত্র, অতএব তিনিই অগ্রপূজা পাইবেন। সহদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীষ্মদেব তাহাকে সাধু সাধু বলিয়া সমর্থন করিলেন। ইহাতে সকলেই সন্তুষ্ট হইল, কেবলমাত্র শিশুপাল ইহার প্রতিবাদ করিয়া সে আমার নিন্দা করিতে লাগিল। তখন আমি সকলকে কহিলাম যে,—ইহার মাতার অনুরোধে আমি ইহার শত অপরাধ ক্ষমা করিয়াছি; কিন্তু অদ্য ১০১টী অপরাধ হইয়াছে, আর আমি ইহাকে ক্ষমা করিব না। আমার সুদর্শনচক্র এখনই শিশুপালের মস্তক ছেদন করিবে। সেইজন্য বলিতেছি যে,—যদি কেহ আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অগ্রপূজা পাইবার কোন ব্যক্তি এখানে উপস্থিত থাকেন, তিনি শিশুপালকে রক্ষা করুন। আবার বলিতেছি যে,—তিনি যদি একা রক্ষা করিতে সমর্থ না হন, তাহা হইলে সকলে মিলিয়া একযোগে তাহাকে রক্ষা করুন। কিন্তু আমার ভয়ে কেহই অগ্রসর হইল না, শিশুপালের মস্তক কাটা গেল। (মঃ ভাঃ)

মদ্ভয়াদ্বাতিবাতোঽয়ং সূর্য্যস্তপতি মদ্ভয়াৎ।
বর্ষতীন্দ্রোদহত্যগ্নির্মৃত্যুশ্চরতি মদ্ভয়াৎ॥ ভাঃ ৩।২৫।৪২)

পৃঃ পঃ—বাপ্‌রে বাপ্, কি নিদারুণ, যেন সাক্ষাৎ যম। হে কৃষ্ণ! আপনি যখন ভারতের আদর্শ সম্রাট্ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের দ্বারা সকলের সম্মুখে ভগবান্ বলিয়া অগ্রপূজা পাইয়াছেন, তখন আপনি নিশ্চয়ই পরব্রহ্ম, পরমেশ্বর বা স্বয়ং ভগবান্, তাহাতে আর সন্দেহ কি। তবে আর একটুখানি কথা এই যে—কোন শাস্ত্র আপনাকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন কি? শাস্ত্রে যদি স্বীকার না করে তাহা হইলে, তাহাকে ভগবান্ বলা যাইবে না।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হ্যাঁ, তাহাও করিয়াছে—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" (ভাঃ ১।৩।২৮)। এই রকম একটী বাক্য অন্য কোন শাস্ত্রে এবং অন্য কাহারও উদ্দেশে বর্ণিত হয় নাই। সর্ব্বশাস্ত্রেই আমার মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥ (ব্রঃ সং ৫।১)

শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পরমেশ্বর, তিনি সচ্চিদানন্দ শ্রীবিগ্রহবিশিষ্ট। সমস্ত অনাদিতত্ত্বেরও আদি তিনি এবং সর্ব্বকারণের কারণও তিনি, যেহেতু তিনি স্বয়ং ভগবান্।

"তস্মাদ্ কৃষ্ণ এবপরদেবস্তং ধ্যায়েৎ তং
রসেৎ তং ভজেৎ তং যজেৎ ॥"

(অথর্ব্ববেদান্তর্গত গোঃ ভাঃ উপনিষদ্)

"কৃষ্ণ এব পরমদেবঃ ভগবান্ গোপগোপী সেব্য।
বৃন্দারাধিত বৃন্দাবনাধিনাথ সঃ একইব ঈশ্বরঃ।
তস্য দ্বিতীয়তনু নারায়ণঃ অখিল ব্রহ্মাণ্ডাধিপতিরিতি ॥

(ঋক্ পরিশিষ্ট)

শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পরমদেবতা, তাঁহার ধ্যান করিতে হইবে, তাঁহার রস অর্থাৎ প্রীতি বা প্রেম করিতে হইবে, তাঁহার ভজন করিতে হইবে, তাঁহার যজন অর্থাৎ পূজার্চ্চন করিতে হইবে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পরমদেবতা, তিনি গোপ-গোপীগণের দ্বারা সেবিত, তিনি বৃন্দাকর্ত্তৃক আরাধিত, তিনি বৃন্দাবনের প্রাণনাথ, তিনিই একমাত্র পরমেশ্বর। তাঁহার দ্বিতীয় তনু শ্রীনারায়ণ অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি।

ব্রহ্মবিদ্ যং বদেদ্ব্রহ্ম পরমাত্মেতি যোগিভিঃ।
ভগবান্ কথ্যতে ভক্তৈঃ স মূর্ত্তিঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ (অত্রিস্মৃতি)

ব্রহ্মবিদ্‌গণ যাঁহাকে ব্রহ্ম বলেন, যোগিগণ যাঁহাকে পরমাত্মা বলেন এবং ভক্তগণ যাঁহাকে ভগবান্ বলেন, তিনিই মূর্ত্তিমান্ লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ।

বেদে রামায়ণে চৈব ভারতে পুরাণে তথা।
আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে ॥ (হরিবংশ)

বেদে, রামায়ণে (বাল্মীকি), মহাভারতে, পুরাণাদি সর্ব্বশাস্ত্রেই আদি, মধ্য ও অন্তে শ্রীহরিই গীত হইয়াছে।

বিপক্ষ—হে কৃষ্ণ! আপনাকে শত শত প্রণাম। আর আমাদের কোন সন্দেহ নাই। বেশী সন্দেহ করিতে গেলে, সুদর্শনের দ্বারা গলা কাটা যাইবার ভয় আছে। কাজেই আপনি সর্ব্ববাদিসম্মত পরব্রহ্ম, পূর্ণব্রহ্ম, পরমেশ্বর, স্বয়ং ভগবান্। 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্'—শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র স্বয়ং ভগবান্।" (ভাঃ) (গীতা) বেদ-বেদান্ত শাস্ত্র হইতে ভগবানকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া দিলেন। কাজেই সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সকলের আরাধ্য বস্তু। [ক্রমশঃ]

—শ্রীজগদ্বন্ধুদাস ব্রহ্মচারী

কে চোর ?

এক সময়ে একটা পল্লীতে চোরের বড় উৎপাত হইয়াছিল। পল্লীবাসীরা অনেক চেষ্টা করিয়াও চোর ধরিতে পারিলেন না। গৃহস্থ সজাগ হইলে চোর পলায়ন করে, আর গৃহস্থের চীৎকারে গ্রামের লোকেরা আসিয়া অনেক অনুসন্ধান করিয়াও চোরের কোন নিদর্শন পান না। তখন গ্রামের যিনি প্রধান ব্যক্তি তিনি কোন বুদ্ধি স্থির করিতে না পারিয়া যাঁহার যাঁহার বাড়িতে চুরি হইয়াছিল, তাঁহাদের প্রত্যেককে স্বতন্ত্রভাবে ডাকাইয়া সকল বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহার মধ্যে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই প্রশ্ন করিলেন যে, চোর ধরিবার জন্য কে কে উদ্যোগী ছিল। সেই সকল সঙ্কলন করিয়া তিনি জানিলেন একটী লোক প্রত্যেক ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া চোর সন্ধানে ব্যস্ত ছিল।

তখন তাঁহার মনে একটী সন্দেহ উপস্থিত হইল। কাহাকেও কিছু না বলিয়া গ্রামের চৌকীদারকে সেই লোকটীর বাড়ীর নিকট থাকিয়া রাত্রি দশটার পর হইতে প্রত্যহ তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতে আদেশ দিলেন এবং নিজেও মধ্যে মধ্যে বাহির হইয়া চৌকীদার নিজ কর্ত্তব্য পালনে অযত্ন করে কিনা, দেখিতে লাগিলেন।

একদিন চৌকীদার নিশীথ রাত্রিতে লোকটীকে একটী গাঁথি হাতে করিয়া বাহির হইতে দেখিল। সে দূর হইতে তাহার সঙ্গ লইল। পরে দেখিল একটী গৃহের মাটীর দেওয়ালে সে আস্তে আস্তে গাঁথি মারিয়া ছিদ্র করিল, ক্রমে সেই ছিদ্র বড় করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। তখন সে এমন জায়গায় দাঁড়াইল, যেখান হইতে সে ছিদ্র (সিঁদ) ও গৃহের দরজা দুইটীই লক্ষ্য করিতে পারে। খানিক পরে বাড়ীর মধ্য হইতে "চোর চোর" শব্দ হইল। চোরও তাড়াতাড়ি দরজা দিয়া বাহিরে আসিয়া জঙ্গলের ভিতর গেল। ততক্ষণে গৃহস্বামী আলো জ্বালিয়া গ্রামবাসিগণকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন। চোরটী সেই অবসরে জঙ্গলের অন্যদিকে পথে পড়িয়া দেখিল, অনেক লোক জড় হইয়াছে। সেও 'কি হয়েছে, কি হয়েছে' বলিয়া তাহাদের সহিত যোগদান করিল। তৎপর তাহাদের সহিত 'চোর চোর' বলিয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। পথে চৌকীদারকে দেখিয়া তাহাকেই ধরিয়া চীৎকার করিতে লাগিল,—"চোর ধরিয়াছি, চোর ধরিয়াছি।" তাহার চীৎকারে আকৃষ্ট হইয়া অন্যান্য লোকেরাও আসিলেন ও চৌকীদারকে দেখিয়া নানা বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন ও তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত, এমন সময় গ্রামের পঞ্চায়েৎ প্রধান উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে নিবারণ

করিলেন ও চৌকীদারকে নিভৃতে লইয়া গিয়া তাহার নিকট সমস্ত কথা শুনিলেন। পরে আরও দুই একজনের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহাদিগকে তদন্তের সময় ঐ লোকটীর (চোরের) মুখের ভাব লক্ষ্য করিতে উপদেশ দিলেন। পরে সকলকে লইয়া চৌকীদার নির্দ্দিষ্ট জঙ্গলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সেই লোকটী কেবল বলিতেছিল,—"অন্ধকারে জঙ্গলে কেন যাবেন, ওখানে লতার (সাপের) বড় ভয়—ওখানে চোর লুকিয়ে থাকতে পারে না" তাহা সত্ত্বেও যখন সকলে অগ্রসর হইতেছেন, তখন সে ক্রমে পশ্চাদ্‌গামী হইয়া পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার আকৃতি দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হইল, সে ভীত হইয়া পড়িয়াছে। পরে গৃহস্থের অপহৃত পেটিকা (বাক্স) ও ঐ লোকটীর গাঁথি চৌকীদার বাহির করিল। আনুসঙ্গিক প্রমাণাদি যোগে কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না যে, সেই লোকটীই চুরি করে। তাহার বাড়ীতে খানাতলাসী করিয়া অনেক অপহৃত দ্রব্য বাহির হইল। তাহার সমুচিত দণ্ডও সে রাজদ্বারে পাইল।

আধুনিক সমাজেও এইরূপ অনেক চোরের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। তাহারা সমাজের সরল লোকগুলিকে প্রতারণা করিয়া তাহাদের কষ্টার্জ্জিত অর্থের অংশ ভূতক পাঠক-গুরু ব্যবসায়িরূপে গ্রহণ করিয়া নিজেরা স্ত্রী-পুত্রের পরিপালন ও মনোরঞ্জন করিতেছেন, আর যাঁহাদের অর্থ, তাঁহাদিগকে পরমার্থ-বিরত করিয়া নিজেরাও অধঃপতিত হইতেছেন ও তাঁহাদের আত্মীয় সাজিয়া তাঁহাদের সর্ব্বনাশ করিতেছেন। তাঁহারা অঘ-বক-বকীপূতনার ন্যায় কৃষ্ণের হিতৈষীসজ্জায় কৃষ্ণ-বিদ্বেষী। তাঁহাদের যথার্থ আকার যখন শুদ্ধভক্তগণ প্রতারিত জনগণের মঙ্গলোদ্দেশ্যে লোক-সমক্ষে দেখাইয়া দিবার যত্ন করিতেছেন, তখন তাঁহারা ভদ্র-লোক সাজিয়া "ঐ চোর, ঐ চোর" করিয়া শুদ্ধভক্তগণকে চোর সাজাইবার বিফল চেষ্টা করিতেছে। তাঁহারা লোককে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন যে, তাঁহারাও যেমন পয়সা লইয়া পাঠাদি ও গুরুগিরি করে, ইঁহারাও (শুদ্ধভক্ত) তেমনই লোকের নিকট অর্থ সংগ্রহ করিয়া মঠাদি চালাইতেছেন, তাহা হইলে ইঁহারাও দোষী। কলির ধারাই এই যে, চোর সাধুকে চোর বলিয়া ধরাইয়া দিবে। তুলসীদাস এই কথা অনেকদিন পূর্ব্বেই বলিয়া গিয়াছেন,—

"চোরকো ছোড়ে সাধ্‌কো বাঁধে, পথিককো লাগায় ফাঁসি।
ধন্য কলিযুগ তেরি তামাশা, দুঃখ লাগে আওর হাসি॥"

সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ আপনারাই বিচার করুন। পরমার্থ বিক্রয়ের বস্তু নহে। ফুরণ করিয়া বা না করিয়া অর্থলাভেরই আশাতে পাঠাদি ব্যবহার ও গুরুগিরি করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়া সেই অর্থ যদি ভগবৎসেবায় না লাগাইয়া

গৃহিণীর মনোরঞ্জন করা হয়, তাহা হইলে যে অর্থ দিয়া আপনি হরিসেবা করিবেন, তাহা গৃহিণী ঠাকুরাণীর অলঙ্কার ও সস্ত্রীক পাঠক মহাশয়ের শয়নের জন্য, পালঙ্কের জন্য লাগিয়া অনর্থ কেনা হইল, ইহাতে পরমার্থ হইল না। শুদ্ধভক্তগণ ভিক্ষালব্ধ অর্থে প্রচারকেন্দ্র মঠ রক্ষা করিয়া সংসার-বাসনা ছাড়িয়া নিত্য হরিসেবাই করিতেছেন। 'কে চোর', তাহার বিচার করিয়া আপনারা দণ্ড বিধান করুন।

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[শিলং, তাং ১৩।৫।১৯৯৩]

হরিকথা আলোচনার পূর্ব্বে ভগবান্ শ্রীহরি কে, তাঁর কথাই বা কি—তা নিয়ে দু-একটী কথা আলোচনার প্রয়োজন। হরি তিনি—যিনি জগতের সমস্ত জীবাত্মার দুঃখ-কষ্ট হরণ করেন, যিনি জীবের বাসনারূপ হৃদয়গ্রন্থি হরণ করেন। "হরতি হৃদয়গ্রন্থিং বাসনারূপমিতি হরিঃ।" হরি-শব্দের সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন। আমাদের সংসারে যতকিছু দুঃখ-কষ্ট আছে, জ্বালা-যন্ত্রণা আছে, বিপদ-আপদ আছে, সবকিছু যিনি অনায়াসে দূরে সরিয়ে দিতে পারেন, তিনি হলেন হরি। এই হরির এক নাম হল 'দুঃখাপহারী ভগবান্'।

আপনারা যদি দ্বারকার দিকে যান, তাহলে শুনতে পাবেন এই দুঃখাপহারী ভগবানের নামটা। ওখানে কৃষ্ণের নাম হল 'রণছোড়রায়'। 'রণ' মানে দুঃখ। দুঃখ অপনোদনকারী যে তত্ত্ববস্তু, তিনি হলেন ভগবান্ শ্রীহরি। তাহলে এককথায় দেখা যাচ্ছে—যিনি জীবের যাবতীয় দুঃখ-ক্লেশ হরণ করেন, দুঃখ-কষ্ট বিনাশ করেন, তিনি হলেন ভগবান্ শ্রীহরি। আবার এক জায়গায় হরি-শব্দের আরও ভাল ব্যাখ্যা দেখা যাচ্ছে। সেখানে বলছেন,—যিনি দুঃখ-কষ্ট সব সরিয়ে দিয়ে সমস্ত জীবকে প্রেমানন্দ দান করেন, তিনি হলেন হরি। এইটী হল হরি-শব্দের সব থেকে ভাল ব্যাখ্যা। সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্, অনন্ত শক্তিমান্ ভগবান্, তাঁর পক্ষে সবটাই সম্ভবপর।

আমরা তাঁর কাছে কিছু কামনা-বাসনা নিয়ে অগ্রসর হই; তাতে আপত্তি নাই, নিষ্কাম হয়ে অগ্রসর হই; তাতেও কিছু আপত্তি নাই। সবকিছু ছেড়ে দিয়ে তাঁর করুণাপ্রার্থী হই, তাতেও তাঁর আপত্তি নাই। তবে তিনি যখন Supreme Guardian তখন তাঁর নিশ্চয় বিবেচনা আছে। বদ্ধজীব এ সংসারে কি কষ্ট পাচ্ছে, কি জাতীয় কষ্ট সেটা এবং সেই কষ্টের হাত থেকে তাদের কি করে রেহাই হবে, এটা সেই প্রেমময় ভগবানের সবই জানা আছে, যেহেতু তিনি

সর্ব্বোপরি Guardian। তথাপি মানুষ আমরা অনেক কিছু জানি না, বুঝি না, ভুলবুঝাবুঝির মধ্যে আছি। ভাবি এ সংসারে অর্থ না হলে চলবে না, তাঁর কাছে কেউ অর্থ চেয়ে ফেললেন, তাঁর কাছে কেউ মান-সম্মান চেয়ে ফেললেন। কীর্ত্তনের ভিতর শুনলেন লাভ-পূজা প্রতিষ্ঠাশার কথা। একজন উন্নততম সাধক-সাধিকা তিনি অন্য সবকিছু ছাড়তে পারেন, পেরেছেন, কিন্তু লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা ছাড়তে পারছেন না। ভয়ঙ্কর জিনিষ! যা একজন সৎ ব্যক্তি—সতী, একজন সাধু ব্যক্তি—সাধ্বী পেরে উঠছেন না। জীবের হৃদয়ে অনন্ত কামনা-বাসনা, সব ছেড়ে দিয়ে যদি আমরা শ্রীকৃষ্ণভজন করি তাহলে লাভ আছে। ভাগবতে এক জায়গায় বলছেন,—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥

কেউ নিষ্কামভাবে এগোচ্ছেন, কেউ সকামভাবে এগোচ্ছেন—আমার কিছু চাই। দেবদেবীর কাছে প্রার্থনা মন্ত্র আছে—'ধনং দেহি যশো দেহি' ইত্যাদি। ভগবানের কাছে কি চাইব?—ভগবান্ নিজেই যা শিখিয়ে দিয়েছেন। তাতে বলছেন,—পার্থিব জগতের কোন বস্তু আমার কাছে প্রার্থনা কর না। যদি প্রার্থনা কর তাহলে ভুল হবে। তোমাদের আমি সৃষ্টি করেছি, তোমাদের জন্য সব ব্যবস্থা রেখেছি, ওজন্য চিন্তা-ভাবনা নাই। তাহলে কি চাইতে হবে?—

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য সিদ্ধনম্॥

উপনিষদের বাণী। এ জগতে যা কিছু আছে দেখছ তোমরা, সবই আমি সৃষ্টি করেছি। আমি ছাড়া অন্য কারও শ্রেষ্ঠ পরিচয় নাই। 'নারায়ণময়ং জগৎ'—এ দৃষ্টিটা সকলের হবে না। ঈশ্বরসৃষ্ট যত বস্তু আছে, সব বস্তুগুলো দেখে তার স্রষ্টার চিন্তা আসা স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা সে চিন্তা করি না। ভগবান্ ওখানে বলছেন—'ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বম্'—এ জগতে যা কিছু আছে, সবই আমার সৃষ্টি। 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা'—সৃষ্টি যদি আমি তোমাদের করেছি তাহলে তোমাদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থাটাও আমি রেখেছি, একটু হাত-পা নাড়লেই পাবে। তারপরে কি বলছেন?—তোমরা যার যতটুকু প্রাপ্য সেটুকু নেবে, তার বেশী নিও না, বেশী নিলে দায়ে পড়তে হবে। ত্যাগধর্ম্ম-সহকারে গ্রহণ কর অর্থাৎ নীতি-আদর্শ পালন কর, গ্রহণ কর। এর ভিতরে কিন্তু একটা সুন্দর চিন্তা-ভাবনা আছে। ত্যাগধর্ম্ম-সহকারে গ্রহণ করা মানে কি? গীতার মধ্যে বুঝিয়েছেন কথাটা,—

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তেস্তেন এব সঃ॥

ভয়ঙ্কর কথা! গীতার মধ্যে বলেছেন কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে—আমার দেওয়া জিনিষ যদি আমাকে না দিয়ে তোমরা খাও, তাহলে তোমাদের পাপের দায়ে পড়তে হবে। নিষেধনামা জারি করে দিয়েছেন। এখন ঐ শ্লোক দেখে অনেকে উল্টোপাল্টা অর্থ করে নিচ্ছেন। আমি যা খাই তাই দেব। কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা ত' সমান নয়। কেউ নিরামিষাশী, কেউ আমিষাশী। আমিষ দ্রব্য দিলে কি তিনি খাবেন? না, ঐ বিচার চলছে না।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥

সবকিছু ভগবানকে অর্পণ করার কথা আছে। তাহলে আমি কেমন অর্পণ করব? ভগবান্ যে জাতীয় বস্তু গ্রহণ করেন, ঠিক সেই জাতীয় বস্তু আমাকে দিতে হবে। আমি যেটা খাই সেটা দেব, ওটা কথা নয়। আমি যা চিন্তা করছি, ভাবনা করছি, ওটা ঠিক নয়। ভগবান্ যে ভাবনা ভেবে রেখেছেন অনন্ত বিশ্ব সৃষ্টির পর জীবকল্যাণের জন্য, সেই চিন্তা-ভাবনা নিয়ে যদি আমরা চলি, তাহলে আমাদের কল্যাণ—একথা বুঝানো হয়েছে শাস্ত্রে। ওখানে আমাদের নিজস্ব বিচার চলবে না। Universal law যেটা, সেটা আমাদের মেনে চলতে হবে। Indian legislature এ যত আইন আছে, পাশ্চাত্ত্যের বড় বড় দেশে যত আইন আছে, আইনসভা আছে, এগুলো এল কোথা থেকে? আমাদের এখানে Indian penal code এর যত আইন আছে অধিকাংশ আইনগুলি আমাদের শাস্ত্র থেকে নেওয়া হয়েছে। বিধি-নিষেধাত্মক আইনগুলো ত' সব ঋষিনীতি। ঋষিনীতি থেকে আইনগুলো হয়েছে। কিন্তু সেই ঋষিগণকে আমরা জানি না, চিনি না, বুঝি না। কে তাঁরা? তাঁদের সঙ্গে আমাদের কি পরিচয়? এই মনুষ্যগোষ্ঠীর উপরে তাঁদের যে অবদান, স্নেহাশীর্ব্বাদ, শুভাশীর্ব্বাদ, শুভেচ্ছা কতটা আমরা তা বুঝতে শিখি না। চিনি না তাঁদের, নামই জানি না। যারা আজকাল পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত তাদের যদি প্রশ্ন করা যায়—তোমার পাশ্চাত্ত্যের কিছু মনীষিদের নাম কর। অনায়াসে তা তারা বলে দেবে। ভারতীয় আর্য্য-ঋষিগণের কিছু নাম কর, যাঁরা সমাজ পরিচালনা করেছেন, আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করেছেন। বলতে পারবে না। কিন্তু ওদিকে কেণ্ট, ডারউইন, প্লেটো প্রভৃতির নাম সব মুখস্থ করে বসে আছে, আর আমাদের দেশের নামকরা নামকরা ঋষি—

যাঁরা স্মৃতিশাস্ত্র লিখেছেন সমাজ-পরিচালকরূপে, তাঁদের নাম তারা জানে না। কিন্তু পাশ্চাত্যদেশের যে-সব মনীষি আমাদের ভারতীয় আর্য্য-ঋষিগণের বিচারানুসারে যে যাঁর Theory নিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন, তাঁরা শিষ্যত্ব স্বীকার করেছেন সেই সেই ঋষির কাছে অবিসংবাদিতভাবে। লজ্জা করেন নাই। আমরা কিন্তু সে-সব ঋষির কোন পরিচয় জানি না। সমালোচনাটা আমরা শিখছি, কিন্তু তাঁদের স্নেহ-মমতা আমরা বুঝি না, ওটা শিখায় নাই ত' আমাদের। মনু, অত্রি, যাজ্ঞবল্ক্য, উসনা, অঙ্গিরা, যম, সম্বর্ত্ত, আপস্তম্ব, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, সাংখ্য, লেখিতা, দক্ষ, গৌতম, বশিষ্ঠ ইত্যাদি ঋষিগণ সমাজকল্যাণ চিন্তা করেছেন। এদের নাম শুনেছি, কিন্তু মনে রাখি না, দরকার নাই। শাস্ত্র যদি আমরা আলোচনা করি ঠিক ঠিক ভাবে, তাহলে দেখব এঁদের যে স্নেহ-মমতা সমাজের প্রতি তার তুলনা নাই। সে ঋণ আমরা কোনদিন শোধ করতে পারব না।

এ সংসারে বাস করি আমরা। আমাদের প্রত্যেকটী মানুষের ছয়টী ঋণ হয়। দেবতাগণের কাছে ঋণ, ঋষিগণের কাছে ঋণ, প্রাণীজগতের কাছে ঋণ, আত্মীয়-স্বজনগণের কাছে ঋণ, নৃঋণ, পিতৃঋণ। এই ছয়টা ঋণ আমাদের সবসময় হয়। যদি আমরা ভাবি, চিন্তা করি এখানে আর আমরা থাকব না, এ সংসারে Straggle করে থাকা বড় কষ্ট, এখান থেকে তাড়াতাড়ি চলে যেতে পারলে ভাল—'যঃ পলায়তি স জীবতি', শাস্ত্র তখন বলে দিয়েছেন—যদি এ ব্যবস্থা নিতে হয় তাহলে ধার-দেনাগুলো সব শোধ করতে হবে—এই ছয়টা ঋণ শোধ করতে হবে। আর এর সঙ্গে আছে কি?—আমার অনন্ত কামনা, অনন্ত বাসনা। "পূর্ণেষু পূর্ণেষু পুনর্নবাণাম্। উৎপতয়ো সন্তি মনোরথানাম্।" মনোরথের শেষ নাই, আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার শেষ নাই। বিষ্ণুপুরাণে বলছেন—মনোরথানাং ন সমাপ্তিরস্তি।" "বর্ষায়তেনাপি তথাব্ধ লক্ষৈঃ"—হাজার হাজার নয়, লক্ষ লক্ষ। দু-চারটে কামনা-বাসনা যদি পূরণ হয় ত' আবার দশ-বিশটা এসে যায় Bubbles —বুদ্বুদের ন্যায়। তাহলে কি করব আমরা? যদি এখানে থাকতে না চাই তাহলে ছয়টা ঋণ শোধ করতে হবে—এটা একটা ব্যাপার; আর একটা জিনিষ হচ্ছে আমাদের যে কামনা-বাসনা আছে এই পার্থিব জগতে, সেগুলো সব বন্ধ করতে হবে। না, চাই না, চাই না। তবে এখান থেকে যাওয়া চলবে একটা নির্দ্দিষ্ট সময় আছে সেই সময়ে। সে সময় কত?—তার কোন ঠিক নাই। জন্মগ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে চলে যেতে পারি আমি, ১০-২০ বৎসর থাকতে পারি, আবার ৯০-১০০ বৎসরও থাকতে পারি। বিশেষ করে এই কলিযুগের মানুষের আয়ু কত?—'বর্ষশতম্'। শতবর্ষ পরমায়ু।

দ্বাপরযুগে কৃষ্ণ এলেন। তিনি কত'দিন ছিলেন জগতে?—১২৫ বৎসর ছিলেন। কিন্তু তিনি ত' ভগবান্, তাঁর কথা বাদ দেওয়া হোক। আমরা সাধারণ বদ্ধ জীব, আমাদের কথা ধরা যাক। আমরা কি করব? আমাদের ত' জমার ঘর কম। যাঁদের জমার ঘর খুব বেশী তাঁদের তাড়াতাড়ি Higher promotion, আর অন্যান্য সকলের ত' আইনমাফিক বিলম্বিত হবে। কি করব আমরা? কাজ অনেক, সময় কম। সত্যযুগের লোক হাজার হাজার বৎসর পরমায়ু পেয়েছেন। তাঁরা তপস্যা করে ভগবানকে লাভ করেছেন। ত্রেতাযুগের লোকের কিছু পরমায়ু কমল, তাঁরা যাগ-যজ্ঞের দ্বারা ভগবানকে লাভ করেছেন। দ্বাপরযুগের লোকের আবার কিছু পরমায়ু কমল। তাঁরা পূজা-অর্চ্চনের দ্বারা বিশেষ করে ভগবানকে লাভ করেছেন। আর আমাদের আয়ু ত' শতবর্ষ লেখা আছে কেতাবী ভাষায়—'আয়ুঃ বর্ষশতম্'। কিন্তু শতবর্ষ এখন বেঁচে যাওয়া খুবই কষ্টকর। শাস্ত্র এইজন্য বলছেন,—"জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।" "জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা রবে?" "অদ্য বা অব্দশতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুব।"

জীবন-সমাপ্তি-কালে করিব ভজন, এবে করি গৃহসুখ।
কখন একথা নাহি বলে বিজ্ঞ-জন, এ দেহ পতনোন্মুখ॥
আজি বা শতেক বর্ষে অবশ্য মরণ, নিশ্চিন্ত না থাক ভাই।
যত শীঘ্র পার, ভজ শ্রীকৃষ্ণ-চরণ, জীবনের ঠিক নাই॥
সংসার-নির্ব্বাহ করি' যা'ব আমি বৃন্দাবন।
ঋণত্রয় শোধিবারে করিতেছি সুযতন॥
এ আশায় নাহি প্রয়োজন।
এমন দুরাশা-বশে যা'বে প্রাণ অবশেষে,
না হইবে দীনবন্ধু-চরণ সেবন॥
যদি সুমঙ্গল চাও, সদা কৃষ্ণনাম গাও।
গৃহে থাক, বনে থাক, ইথে তর্ক অকারণ॥

তুমি ঘরে থাক; আর ঘরের বাইরে থাক, যেখানেই থাক না কেন, তোমার পরিবেশটাকে নিয়ে চলতে হবে। এই ত' কথা। তাহলে কি করব?—কলিজীবের পক্ষে ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে নাম-সঙ্কীর্ত্তন। 'নাম-সঙ্কীর্ত্তন কলৌ পরমোপায়।'

(ক্রমশঃ)

শ্রীপুরুষোত্তমধামে

শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রত-উদ্‌যাপন

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ও তদধীনস্থ ভারতব্যাপী গৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা জগদ্‌গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজানুকম্পিত শ্রীসমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে বর্ত্তমান বর্ষে শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সহিত শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রত পালন করা হইয়াছে।

অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের প্রকটকালে মাত্র একবার শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রত পালিত হইয়াছিল। সুদীর্ঘকাল অতীত হওয়ার পর শ্রীসমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ ও সহ-সভাপতি ও সম্পাদক শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের ঐকান্তিক বাসনাপূর্ত্তির জন্য শ্রীসমিতির সুযোগ্য ও শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবায় আত্ম-নিবেদনকারী শ্রীপাদ কমলাপতি প্রভু ও অন্যান্য সেবকবৃন্দের সমবেত প্রচেষ্টায় এই বৎসর পুরুষোত্তম-মাসে (স্মার্ত্তমতে মলমাস) শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রত-পালনের জন্য সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থভক্তবৃন্দসহ প্রায় ৭০ জন যাত্রী ৩০শে শ্রাবণ, ১৪০০ বঙ্গাব্দ (ইং ১৫।৮।১৯৯৩), রবিবার শ্রীসমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে যাত্রা করিয়া পুরীধামে সমিতির অন্যতম শাখামঠ শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠে উপস্থিত হন। 'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা'র সম্পাদক পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ, শ্রীপাদ কৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী ও অন্যান্য ব্রহ্মচারিগণ যোগদান করিয়া পরিক্রমার মাধ্যমে শ্রীহরিকথা কীর্ত্তনের দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দবর্দ্ধন করেন।

মথুরামণ্ডল হইতে প্রায় ৩০/৪০ জন মঠবাসী ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দসহ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ ৩১শে শ্রাবণ, সোমবার (ইং ১৬।৮।৯৩) শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করেন। খড়গপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে পুরীধামে শুভপদার্পণকারী জগদ্‌গুরু শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুগৃহীত প্রপূজ্যচরণ শ্রীমদ্ভক্তিজীবন জনার্দ্দন গোস্বামী মহারাজ বিশেষ বিশেষ দিনে সমিতির প্রচারে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধভাবে ব্রতপালনকারী ভক্তবৃন্দের

নিকট শ্রীপুরুষোত্তম-ধাম-মাহাত্ম্য, শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাকথা বর্ণনমুখে প্রচুর হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

২ পুরুষোত্তম, ২ ভাদ্র, ১৯শে আগষ্ট, বৃহস্পতিবার শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউর দক্ষিণ প্রকোষ্ঠে জগদ্‌গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের অর্চ্চামূর্ত্তি প্রকটিত হন। এই বিশেষ উৎসবানুষ্ঠানে পুরীধামে অবস্থিত বিভিন্ন গৌড়ীয় মঠের আচার্য্যবর্গ, সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীবৃন্দ ও অন্যান্য গৌরভক্তগণ এবং শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের কতিপয় পাণ্ডা যোগদান করিয়া শ্রীল গুরুপাদপদ্মের অতিমর্ত্ত্য চরিতকথা ও তাঁহার অসাধারণ গুরুভক্তির কথা শ্রবণ-কীর্ত্তন করেন। উক্ত সভায় প্রপূজ্যচরণ শ্রীমদ্ভক্তিজীবন জনার্দ্দন গোস্বামী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ বক্তৃতা প্রদান করেন। সভা সমাপনান্তে উপস্থিত সকলকে চতুর্ব্বিধ সুস্বাদু প্রসাদদ্বারা আপ্যায়ন করা হয়।

ব্রতমাস উপলক্ষে বিভিন্ন দিবসে শ্রীমৎ হরিজন মহারাজ, শ্রীমৎ বৈষ্ণব মহারাজ, শ্রীমৎ সন্ন্যাসী মহারাজ, শ্রীমৎ পর্য্যটক মহারাজ, শ্রীমদ্ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীপাদ কৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী ও অন্যান্য ব্রহ্মচারীবৃন্দ শ্রীপুরুষোত্তম-মাস-মাহাত্ম্য, শ্রীকৃষ্ণলীলা-কথা, শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিরহোদ্দীপক লীলাকথা স্ব-স্ব-চিন্তাধারানুযায়ী বর্ণন করিয়া পরিক্রমাকারী ভক্তবৃন্দের প্রীতি উৎপাদন করেন। শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের আদেশে শ্রীশুভানন্দ ব্রহ্মচারী, ভাগবতভূষণ প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্ণে ও অপরাহ্ণে শ্রীমদ্ভাগবত-পারায়ণ করেন। তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ কণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক অপূর্ব্ব তত্ত্বদর্শনপূর্ণ কথা শ্রবণ করিয়া সমাগত শ্রোতৃবৃন্দ আহ্লাদিত ও উৎফুল্লিত হন।

প্রত্যহ প্রাতঃকালে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে "শ্রীসনাতন-শিক্ষা" পাঠক্রমে অন্বয়-ব্যতিরেকভাবে সংসারী জীবের একান্ত মঙ্গলকর বহুমুখী বিচার উপস্থাপিত করিয়া শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু মহাপ্রভুকে যে তিনটী প্রশ্ন করিয়াছিলেন তাহার অবতারণা করেন।—

"কে আমি, কেনে আমায় জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি কেমনে 'হিত' হয়॥"

ইহার পূর্ব্বে সনাতন প্রভু নিজের পরিচয় দৈন্য-সহকারে ব্যক্ত করিয়াছেন,—

"নীচ জাতি, নীচ সঙ্গী, পতিত অধম।
কু-বিষয়কূপে পড়ি' গোঙাইনু জনম॥"

বদ্ধজীবের মঙ্গলার্থেই শ্রীসনাতন প্রভুকে নিত্যসিদ্ধ জ্ঞান করিয়া মহাপ্রভু বলিলেন,—

প্রভু কহে, —কৃষ্ণ-কৃপা তোমাতে পূর্ণ হয়।
সব তত্ত্ব জান, তোমার নাহি তাপত্রয়॥
কৃষ্ণভক্তি ধর তুমি, জান তত্ত্বভাব।
জানি' দার্ঢ্য লাগি' পুছে সাধুর স্বভাব॥
যোগ্যপাত্র হও তুমি ভক্তি প্রবর্ত্তাইতে।
ক্রমে ক্রমে সব তত্ত্ব শুন কহিয়ে তোমাতে॥
জীবের 'স্বরূপ' হয় কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'।
কৃষ্ণের 'তটস্থাশক্তি', ভেদাভেদ-প্রকাশ॥

শ্রীল মহারাজজীর সর্ব্বশেষ অভিমত —'অথাতঃ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' এবং শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর 'কে আমি, কেনে আমায়, জারে তাপত্রয়' ইত্যাদি প্রায় একই তাৎপর্য্যপর বিচার। বক্তৃতামুখে শ্রীল মহারাজ গভীর আবেগপূর্ণভাবে চারি সম্প্রদায়ের আচার্য্যবর্গের বিচার, শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদের বিচার এবং পরিশেষে শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্ব' দর্শনের গুরুগম্ভীর আলোচনা করিয়াছেন।

সায়াহ্নে পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে "শ্রীমহাপ্রভু-রামানন্দ সংবাদ' কীর্ত্তনমুখে গৌরসুন্দরের উন্নতোজ্জ্বলরসের কথা রামানন্দমুখে শ্রবণ করিয়া ভক্ত-ভগবানের যে ভাব উদয় হইয়াছিল, তাহা পরিবেশন করত ভাবে ও ভাষায় আপ্লুত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সমবেত ভক্তবৃন্দ প্রত্যহ অর্থাৎ ব্রত-সমাপ্তির পূর্ব্বদিবস পর্য্যন্ত শ্রীল নারায়ণ মহারাজের শ্রীমুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু-কর্ত্তৃক 'সাধ্য-সাধন'-জিজ্ঞাসা ও শ্রীরায়-রামানন্দের উত্তরদান প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণলীলারসের উন্নত বিচার ও তত্ত্বদর্শন শ্রবণ করিয়া স্ব-স্ব জীবন ধন্য মনে করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণলীলা-রস আস্বাদন কে করিবে এবং কাহার শ্রবণের অধিকার?—এতৎপ্রসঙ্গে বহু আলোচনা করিয়া তিনি শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন। শ্রীল মহারাজের শ্রীমুখে উচ্চারিত শ্লোকের দুই-একটী উল্লেখ করিতেছি,—

প্রভু কহে,—"পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।"
রায় কহে,—"স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়॥"
বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষকারণম্॥

প্রভু কহে,—"এহো বাহ্য, আগে কহ আর।"
রায় কহে,—"কৃষ্ণ-কর্ম্মার্পণ—সর্ব্বসাধ্যসার॥"
জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সম্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥
প্রভু কহে,—"এহো হয়, আগে কহ আর।"
রায় কহে,—"প্রেমভক্তি—সর্ব্বসাধ্যসার॥"
কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং জন্মকোটিসুকৃতৈর্নলভ্যতে॥
কৃষ্ণ-প্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয়।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি-তারতম্য বহুত আছয়॥
ইহাঁর মধ্যে রাধার প্রেম—'সাধ্যশিরোমণি'।
যাঁহার মহিমা সর্ব্বশাস্ত্রেতে বাখানি॥
রায় কহে,— তবে শুন প্রেমের মহিমা।
ত্রিজগতে রাধা-প্রেমের নাহিক উপমা॥

শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রত সমাপ্তির পূর্ব্বদিবসে শ্রীল নারায়ণ মহারাজ, শ্রীল হরিজন মহারাজ ও শ্রীশুভানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভু হরিকথার মাধ্যমে বিরহ-সূচক বিদায়বাণী পরিবেশনপূর্ব্বক শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়কে নয়নবারির দ্বারা অভিষিক্ত করিয়া সভাকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের সেবার আদর্শ আপনাদের পথ-প্রদর্শক হউক ও আমাদিগকে সেবায় অনুপ্রাণিত করুক—এই প্রার্থনা জানাইয়া সভার কার্য্য তথা শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রতের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

"কৃপা করি' কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিল সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা কৈল সঙ্গভঙ্গ॥"

শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

॥ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)
ফোন—২৪৭

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।
৩০শে অগ্রহায়ণ, ১৪০০ ; ইং ১৬।১২।৯৩

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

ব্যাসকুল-শ্রবণসজ্যারাধা-বেদান্তবিদ্বাশ্রিতেষু—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে নবদ্বীপধামস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে আগামী ২রা গোবিন্দ, ৫০৭ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ই ফাল্গুন, ১৪০০ (ইং ২৮।২ ৯৪) সোমবার শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অন্তরঙ্গ প্রিয়পার্ষদবর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভ আবির্ভাব মাঘী-কৃষ্ণা তৃতীয়া-তিথি** হইতে ব্যাসাভিন্ন জগদ্‌গুরু নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভ প্রকটবাসর মাঘী-কৃষ্ণা পঞ্চমী** ৬ঠা গোবিন্দ, ১৭ই ফাল্গুন (ইং ২।৩।৯৪) বুধবার পর্য্যন্ত **শ্রীশ্রীব্যাসপূজা** ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক অর্থাৎ কৃষ্ণপঞ্চক, ব্যাসপঞ্চক, মধ্বাদি-পঞ্চক, আচার্য্য-পঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক গুরু-পঞ্চক, তত্ত্বপঞ্চকের পূজা, হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবেন। প্রত্যহ শ্রীহরিকীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, বক্তৃতা, স্তব-পাঠ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-শংসন ও অঞ্জলি প্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান ও বিশেষ অঙ্গ।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

বৈয়াসক্যানুগত্যাভিলাষী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য ঃ—১৫ই ফাল্গুন, সোমবার ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে যথারীতি মঙ্গলারতি তদনন্তর শ্রীগুরুমহিমাসূচক বন্দনাদি, মহাজন-গীতি কীর্ত্তন, পূর্ব্বাহ্নে শ্রীশ্রীপূজা-পঞ্চকাদি, অঞ্জলিপ্রদান ও মধ্যাহ্নে বিশেষ ভোগারতি এবং মহাপ্রসাদ বিতরণ ; অপরাহ্নে বিশেষ সভা কীর্ত্তন এবং শ্রীগুরুমহিমাসূচক ভক্ত্যঞ্জলিরূপ-প্রবন্ধাদি পাঠ ও বক্তৃতা।

১৬ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীগুরুতত্ত্ব ও শ্রীব্যাস-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এবং সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অবদান সম্পর্কে ভাষণ।

১৭ই ফাল্গুন, বুধবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান ; অপরাহ্নে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধাদি পাঠ এবং সন্ধ্যারতি অন্তে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীব্যাসদেবের সম্বন্ধে আলোচনা।

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪৫শ বর্ষ | ১৭ নারায়ণ, গর্ভোদশায়ী, ৫০৭ শ্রীগৌরাব্দ | ২৯ পৌষ, শুক্রবার, ১৪০০, ইং ১৪/১১/৯৪ | ১১শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীবৃন্দাদেব্যষ্টকম্

[শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিতম্]

শ্রীশ্রীবৃন্দাদেব্যৈ নমঃ

গাঙ্গেয়-চাম্পেয়-তড়িদ্‌বিনিন্দিরোচিঃ-প্রবাহ-স্নপিতাত্মবৃন্দে!
বন্ধূক-রম্ভু-দ্যুতি-দিব্যবাসো বৃন্দে! নুমস্তে চরণারবিন্দম্॥ ১॥

হে অত্যুজ্জ্বল-রক্তবর্ণ-বসনধারিণি বৃন্দে! তুমি স্বীয় পরম সুন্দর অঙ্গকান্তি-দ্বারা স্বর্ণ, চম্পকপুষ্প ও সৌদামিনীকেও তিরস্কার করিতেছ এবং তদ্দ্বারা স্বজনগণ অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তগণকে অভিষিক্ত করিতেছ; তোমার শ্রীচরণারবিন্দে নমস্কার করি॥ ১॥

বিম্বাধরোদিত্বর-মন্দহাস্য-নাসাগ্র মুক্তাদ্যুতি-দীপিতাস্যে!
বিচিত্র-রত্নাভরণাশ্রিয়াঢ্যে! বৃন্দে! নুমস্তে চরণারবিন্দম্॥ ২॥

হে বৃন্দে! তোমার বিম্ব-সদৃশ রক্তবর্ণ অধরোদ্গত মৃদু-মধুর হাস্য ও নাসিকাগ্রবর্ত্তী মুক্তা-কান্তিদ্বারা ত্বদীয় বদনমণ্ডল পরিশোভিত হইয়াছে এবং তুমি বিচিত্র রত্নাভরণে সৌন্দর্য্যান্বিতা হইয়াছ; তোমার শ্রীচরণ-পদ্মে নমস্কার করি ॥ ২ ॥

সমস্ত-বৈকুণ্ঠ-শিরোমণৌ শ্রীকৃষ্ণস্য বৃন্দাবন-ধন্য-ধাম্নি।
দত্তাধিকারে বৃষভানু-পুত্র্যা বৃন্দে! নুমস্তে চরণারবিন্দম্ ॥ ৩ ॥

হে বৃন্দে! বৃষভানুরাজ-নন্দিনী শ্রীরাধিকা নিখিল-বৈকুণ্ঠ-সমূহের শিরোমণি ও অশেষ-গুণ-সমন্বিত পরম পবিত্র শ্রীকৃষ্ণ-ধাম শ্রীবৃন্দাবনে তোমাকে অধিকার প্রদান করিয়াছেন; তোমার শ্রীপাদসরোজে নমস্কার করি ॥ ৩ ॥

ত্বয়াজ্ঞয়া পল্লব-পুষ্প-ভৃঙ্গ মৃগাদিভির্মাধব-কেলিকুঞ্জাঃ।
মধ্বাদিভির্ভান্তি বিভূষ্যমাণা বৃন্দে! নুমস্তে চরণারবিন্দম্ ॥ ৪ ॥

হে বৃন্দে! তোমারই আদেশে শ্রীবৃন্দাবনে পত্র-পুষ্প, ভ্রমর, মৃগ, ময়ূর, শুক-সারী প্রভৃতি পশু-পক্ষিগণে ও চির-বসন্তে শ্রীকৃষ্ণের কেলিকুঞ্জসমূহ বিভূষিত হইয়া পরম শোভা পাইতেছে; তোমার শ্রীপদারবিন্দে প্রণাম করি ॥ ৪ ॥

ত্বদীয়-দূত্যেন নিকুঞ্জ-যূনো-রত্যুৎকয়োঃ কেলি-বিলাস-সিদ্ধিঃ।
ত্বৎ-সৌভগং কেন নিরুচ্যতাং তদ্ বৃন্দে! নুমস্তে চরণারবিন্দম্ ॥ ৫ ॥

হে বৃন্দে! তোমার দূতীত্বের চাতুর্য্য-প্রভাবেই বিলাস-বাসনাময়ী শ্রীরাধা-কৃষ্ণের কেলি-বিলাস সম্পন্ন হইয়া থাকে, অর্থাৎ তুমিই দূতীরূপে শ্রীরাধা-গোবিন্দের সুদুর্ঘট মিলন সম্পাদন করাইয়া, তাঁহাদিগের লীলাবিলাসের সহায়তা করিয়া থাক; অতএব এ সংসারে তোমার সৌভাগ্যের সীমা বর্ণনা করিতে কে সক্ষম হইবে? তোমার শ্রীপাদপদ্মে নমস্কার করি ॥ ৫ ॥

রাসাভিলাষো বসতিশ্চ বৃন্দাবনে ত্বদীশাঙ্ঘ্রি-সরোজ-সেবা।
লভ্যা চ পুংসাং কৃপয়া তবৈব বৃন্দে! নুমস্তে চরণারবিন্দম্ ॥ ৬ ॥

হে বৃন্দে! কৃষ্ণভক্তগণ তোমার কৃপায় শ্রীরাসলীলা-দর্শনাভিলাষ, শ্রীবৃন্দাবনে বাস ও ত্বদীয় প্রাণবল্লভ শ্রীরাধা-মাধবের চরণ-সেবা লাভ করিয়া থাকেন; তোমার শ্রীপদ-কমলে নমস্কার করি ॥ ৬ ॥

ত্বং কীর্ত্ত্যসে সাত্বত-তন্ত্রবিদ্ভির্লীলাভিধানা কিল কৃষ্ণ-শক্তিঃ।
তবৈব মূর্ত্তিস্তুলসী নৃলোকে বৃন্দে! নুমস্তে চরণারবিন্দম্ ॥ ৭ ॥

হে বৃন্দে! শ্রীনারদাদি ভক্তগণ-বিরচিত তন্ত্র-সমূহে সুনিপুণ পণ্ডিতগণ তোমাকে শ্রীকৃষ্ণের লীলাশক্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং এই নরলোকে সুপ্রসিদ্ধ বৃক্ষ-

রূপিণী শ্রীতুলসীদেবী হইতেছেন তোমারই মূর্ত্তি ; তোমার শ্রীচরণ-পঙ্কজে অভিবাদন করি ॥ ৭ ॥

ভক্ত্যা বিহীনা অপরাধ-লক্ষৈঃ ক্ষিপ্তাশ্চ কামাদি-তরঙ্গ-মধ্যে ।
কৃপাময়ি ! ত্বাং শরণং প্রপন্না বৃন্দে ! নুমস্তে চরণারবিন্দম্ ॥ ৮ ॥

হে কৃপাময়ি দেবি ! আমরা ভক্তিহীন বলিয়া শত শত অপরাধ-প্রযুক্ত ভব-সমুদ্রের কাম-ক্রোধাদি-রূপ ভীষণ তরঙ্গ-মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি ; অতএব তোমার শরণাগত হইলাম, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই সুদুস্তর ভবজলধি হইতে উদ্ধার কর ; তোমার শ্রীচরণ-সরোজে নমস্কার করি ॥ ৮ ॥

বৃন্দাষ্টকং যঃ শৃণুয়াৎ পঠেদ্ বা বৃন্দাবনাধীশ-পদাব্জ-ভৃঙ্গঃ ।
স প্রাপ্য বৃন্দাবন-নিত্যবাসং তৎ-প্রেমসেবাং লভতে কৃতার্থঃ ॥ ৯ ॥

যে ব্যক্তি বৃন্দাবনাধিপতি শ্রীরাধা-গোবিন্দের চরণ-কমলের ভৃঙ্গ-স্বরূপ হইয়া শ্রীবৃন্দাদেবীর এই অষ্টক পাঠ বা শ্রবণ করেন, তিনি শ্রীবৃন্দাবনে নিত্যবাস প্রাপ্ত হইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমসেবা লাভ করত কৃতার্থ হইয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

প্রশ্নোত্তর

জীবতত্ত্ব

১। জীবের স্বরূপ, পতন ও নিত্য-সেবা-প্রাপ্তির ইতিহাস কি ?

"জীব—চিৎকণস্বরূপ। তাঁহার কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা-দোষ হইলে তিনি মায়িক-জগতে মায়ার আকর্ষণ-শক্তিদ্বারা বিক্ষিপ্ত হন ; বিক্ষিপ্ত হইবামাত্র দুর্গা তাঁহাকে কয়েদীর পোষাকের ন্যায় পঞ্চভূত ও পঞ্চতন্মাত্র এবং একাদশ ইন্দ্রিয়-সংযুক্ত একটী স্থূলদেহে আবদ্ধ করিয়া কর্ম্মচক্রে নিক্ষেপ করেন। জীব তাহাতে ঘূর্ণীয়মাণ হইয়া সুখ-দুঃখ, স্বর্গ-নরকাদি ভোগ করেন। এতদ্ব্যতীত স্থূলদেহের ভিতর মনো-বুদ্ধি-অহঙ্কার-রূপ একটী লিঙ্গদেহও দেন। জীব এক স্থূল-দেহ ত্যাগ করিয়া সেই সূক্ষ্মবৎ লিঙ্গ-দেহে অন্য স্থূল-দেহকে আশ্রয় করেন। মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের অবিদ্যা-দুর্ব্বাসনাময় লিঙ্গ-দেহ দূর হয় না। লিঙ্গদেহ দূর হইলে বিরজায় স্নান করিয়া জীব হরিধামে গমন করেন। এই সমস্ত কার্য্যই দুর্গা গোবিন্দের ইচ্ছাক্রমে করিয়া থাকেন।"　　—ব্রঃ সং ৫।৪৪

২। জীবের বিভিন্ন অবস্থা কি কি ?

"মায়াবদ্ধ জীবগণ পাঁচপ্রকার অবস্থায় অবস্থিত অর্থাৎ ঐ সকল অবস্থাক্রমে স্থলবিশেষে জীব 'আচ্ছাদিত-চেতন', 'সঙ্কুচিত-চেতন', 'মুকুলিত-চেতন', 'বিকচিত-চেতন' ও 'পূর্ণবিকচিত-চেতন'।" —জৈঃ ধঃ ১৬শ অঃ

৩। জীবের শুদ্ধাবস্থা ও বদ্ধাবস্থা কিরূপ।

জীবের দুইটী অবস্থা—অর্থাৎ শুদ্ধাবস্থা ও বদ্ধাবস্থা। শুদ্ধ অবস্থায় জীব কেবল চিন্ময়। তখন তাহার জড়সম্বন্ধ থাকে না। শুদ্ধ অবস্থাতেও জীব অণু-পদার্থ। সেই অণুত্ব-প্রযুক্ত জীবের অবস্থান্তর প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বৃহচ্চৈতন্য-স্বরূপ কৃষ্ণের স্বভাবতঃ অবস্থান্তর নাই। তিনি বস্তুতঃ বৃহৎ, পূর্ণ, শুদ্ধ ও সনাতন। জীব বস্তুতঃ অণু, খণ্ড, অশুদ্ধ হইবার যোগ্য এবং অর্ব্বাচীন। কিন্তু ধর্ম্মতঃ জীব বৃহৎ, অখণ্ড, শুদ্ধ ও সনাতন। জীব যতক্ষণ শুদ্ধ, ততক্ষণই তাহার স্বধর্ম্মের বিমল পরিচয়। জীব যখন মায়া-সম্বন্ধে অশুদ্ধ হন, তখনই তিনি স্বধর্ম্ম-বিকার-প্রযুক্ত, অবিশুদ্ধ, অনাশ্রিত ও সুখ-দুঃখ-পিষ্ট। জীবের কৃষ্ণদাস্য-বিস্মৃতি হইবা-মাত্রই সংসারগতি আসিয়া উপস্থিত হয়।

জীব যতক্ষণ শুদ্ধ থাকেন, ততক্ষণ তাঁহার স্বধর্ম্মের অভিমান। তিনি আপনাকে কৃষ্ণদাস বলিয়া অভিমান করেন। মায়া-সম্বন্ধে অশুদ্ধ হইলেই সেই অভিমান সঙ্কুচিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে। মায়া-সম্বন্ধে জীবের শুদ্ধস্বরূপ লিঙ্গ ও স্থূলদেহে আবৃত হয়।

বিশুদ্ধ প্রেমই শুদ্ধজীবের স্বধর্ম্ম। সুখ-দুঃখ-রাগ-দ্বেষরূপে সেই প্রেম বিকৃত-ভাবে লিঙ্গ-শরীরে উদিত হয়। ভোজন, পান ও জড়সঙ্গ-সুখরূপে সেই বিকার অধিকতর গাঢ় হইয়া স্থূল শরীরে দেখা দেয়। এখন দেখুন, জীবের নিত্যধর্ম্ম কেবল শুদ্ধ-অবস্থায় প্রকাশ পায়। বদ্ধ-অবস্থায় যে ধর্ম্মের উদয় হয়, তাহা নৈমিত্তিক। নিত্যধর্ম্ম স্বভাবতঃ পূর্ণ, শুদ্ধ ও সনাতন।" —জৈঃ ধঃ ২।১৪-১৫

৪। অনাদি-বহির্ম্মুখতা কাহাকে বলে?

"কৃষ্ণের দাস্যই জীবের নিত্যধর্ম্ম। তাহা ভুলিয়া জীব মায়াবশ হইয়া পড়ে, সুতরাং তখন হইতেই জীব—কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ। মায়িক জগতে আগমনের সময় হইতেই যখন বহির্ম্মুখতা লক্ষিত হয়, তখন মায়িক জগতের কালের মধ্যে জীবের পতনের ইতিহাস নাই। এইজন্যই 'অনাদি-বহির্ম্মুখ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। বহির্ম্মুখতা ও মায়া-প্রবেশকাল হইতেই জীবের নিত্যধর্ম্ম বিকৃত হইয়াছে।"
—জৈঃ ধঃ ১।১১-১২

৫। আচ্ছাদিত-চেতন কাহাকে বলে?

"বৃক্ষ, তৃণ ও প্রস্তরগতিপ্রাপ্ত জীবসকল আচ্ছাদিত-চেতন; ইহাদিগের চেতন-ধর্ম্মের পরিচয় লুপ্তপ্রায়।" —জৈঃ ধঃ ১৬শ অঃ

৬। সঙ্কুচিত-চেতন কাহারা ?

"পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, মৎস্যাদি জলচর, কীটপতঙ্গ—ইহারা সঙ্কুচিত চেতন।"

—জৈঃ ধঃ ১৬শ অঃ

৭। বদ্ধ মনুষ্যের কি কি অবস্থা ?

"নরদেহে বদ্ধজীবের তিনটী অবস্থা লক্ষিত হয়—মুকুলিত-চেতন, বিকচিত-চেতন ও পূর্ণবিকচিত-চেতনাবস্থা।"　　—জৈঃ ধঃ ১৬শ অঃ

৮। মুকুলিত-চেতন, বিকচিত-চেতন ও পূর্ণবিকচিত-চেতন যথাক্রমে কাঁহারা ?

"নীতিশূন্য ও নিরীশ্বর নৈতিক—এই দুইপ্রকার মানবই মুকুলিত-চেতন, সেশ্বর-নৈতিক ও সাধন-ভক্তই বিকচিত-চেতন এবং ভাবভক্ত মানবই পূর্ণবিকচিত-চেতন।"　　—জৈঃ ধঃ ১৬শ অঃ

৯। মায়ার ত্রিগুণের বন্ধনে কোন্ কোন্ জীব কিভাবে আবদ্ধ ?

"সাত্ত্বিক-অহঙ্কার-বিশিষ্ট জীবসকল উচ্চলোকবাসী দেবতা, তাহাদের পদদ্বয়ে সাত্ত্বিক বা স্বর্ণনিগড়-প্রযুক্ত ; রাজস-জীবসকল দেবতা ও মনুষ্য-ভাবমিশ্র, তাহাদের পদে রৌপ্য বা রাজস-নিগড়-প্রযুক্ত ; তামস-জীবসকল পঞ্চ-মকারীয় জড়ানন্দে মত্ত, তাহাদের পদে তামসিক বা লৌহ-নিগড় প্রযুক্ত আছে।"

—জৈঃ ধঃ ১৬শ অঃ

১০। জীবের চিন্ময়-সত্তায় কি জন্ম-মৃত্যু আছে ?

"জন্মই রজঃ ; অনাদি চিন্ময় সত্তায় জন্ম-ধর্ম্মরূপ রজঃ নাই, বিনাশ-ধর্ম্মরূপ তমঃও নাই, তাহা নিত্য বর্ত্তমান।"　　—'নাম-মাহাত্ম্য-সূচনা', হঃ চিঃ

১১। চিন্ময় আত্মার বদ্ধদশা-জনিত ক্লেশ আছে কি ?

"এই জড়-দেহই জীবের কারাগার। আত্মা কখনই সঙ্কীর্ণ পদার্থ নহেন ; কিন্তু জড়-দেহের সম্বন্ধে প্রকৃতির স্বভাব যে জড়তা ও দুঃখ, তাহা ভোগ করিতেছেন।"　　—তঃ সূঃ, ২৩ সূঃ

১২। রুদ্র-ব্রহ্মাদি দেবতার স্বরূপ কি ?

"শিব ও ব্রহ্মার মাতৃগর্ভে জন্ম নাই। সামান্য পঞ্চাশ গুণের বিন্দু বিন্দু লইয়া যে জীবনিচয় হয় ; তন্মধ্যে ব্রহ্মা ও শিব গণ্য না হইলেও বিভিন্নাংশ। এই পঞ্চাশটী গুণ তাঁহাদের অধিক পরিমাণে থাকায় এবং ততোধিক আর পাঁচটী গুণের অংশ থাকায়, তাঁহারা প্রধান দেবতা বলিয়া উক্ত। গণেশ ও সূর্য্য প্রায় তদ্রূপ বলিয়া ব্রহ্মকোটি-মধ্যে উপাসিত হন। অন্য সকল দেবতাই জীবকোটি-মধ্যে গণ্য। দেবতাগণ সকলেই কৃষ্ণের বিভিন্নাংশ। তাঁহাদের গৃহিণীসকলও চিচ্ছক্তির বিভিন্নাংশ। কৃষ্ণাবির্ভাবের পূর্ব্বেই ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে কৃষ্ণ-তুষ্টির জন্য জন্মগ্রহণ করিতে আজ্ঞা দেন।"　　—জৈঃ ধঃ ৩২শ অঃ

১৩। শম্ভু কি কি ভাবে কি কি কার্য্য করেন ?

"বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ" ইত্যাদি ভাগবত-বচনের তাৎপর্য্য এই যে, সেই শম্ভু স্বীয় কালশক্তিদ্বারা গোবিন্দের ইচ্ছানুরূপ দুর্গাদেবীর সহিত যুক্ত হইয়া কার্য্য করেন। তন্ত্রাদি বহুবিধ শাস্ত্রে জীবদিগের অধিকার-ভেদে ভক্তি-লাভের সোপান-স্বরূপ ধর্ম্মের শিক্ষা দেন। গোবিন্দের ইচ্ছামতে মায়াবাদ ও কল্পিত আগম প্রচারপূর্ব্বক শুদ্ধভক্তির সংরক্ষণ ও পালন করেন। শম্ভুতে জীবের পঞ্চাশগুণ প্রভূতরূপে এবং জীবের অপ্রাপ্ত আরও পাঁচটী মহাগুণ আংশিকরূপে আছে। সুতরাং শম্ভুকে 'জীব' বলা যায় না ; তিনি—'ঈশ্বর', তথাপি 'বিভিন্নাংশগত'।"

—ব্রঃ সং ৫।৭৫

১৪। শম্ভু কি কৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্র তত্ত্ব ? সদাশিব ও রুদ্র-তত্ত্বে পার্থক্য কি ?

"শম্ভু কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ অন্য একটী 'ঈশ্বর' নন। যাহাদের সেরূপ ভেদ-বুদ্ধি, তাহারা—ভগবানের নিকট অপরাধী। শম্ভুর ঈশ্বরতা—গোবিন্দের ঈশ্বরতার অধীন। সুতরাং তাঁহারা বস্তুতঃ অভেদ-তত্ত্ব। অভেদ-তত্ত্বের লক্ষণ এই যে, দুগ্ধ যেরূপ বিকার-বিশেষ যোগে দধিত্ব লাভ করে, তদ্রূপ বিকার-বিশেষ-যোগে ঈশ্বর পৃথক্-স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াও 'পরতন্ত্র' ; সে স্বরূপের স্বতন্ত্রতা নাই। মায়ার তমো-গুণ, তটস্থ শক্তির স্বল্পতা-গুণ এবং চিচ্ছক্তির স্বল্প হ্লাদিনী-মিশ্রিত সম্বিদ্‌গুণ বিমিশ্রিত হইয়া একটী বিকার-বিশেষ হয়। সেই বিকার-বিশেষ-যুক্ত স্বাংশ-ভাবাভাস-স্বরূপই ঈশ্বর জ্যোতির্ম্ময় শম্ভুলিঙ্গরূপ 'সদাশিব' এবং তাঁহা হইতে রুদ্রদেব প্রকট হন।"

—ব্রঃ সং ৫।৪৫

১৫। ব্রহ্মা ও শম্ভু কেন আধিকারিক দেবতা ?

"প্রজাপতি ও শম্ভু—মহাবিষ্ণুর বিভিন্নাংশ, অতএব আধিকারিক-দেববিশেষ।"

—ব্রঃ সং ৫।১৫

১৬। শিবলিঙ্গের তাৎপর্য্য কি ?

"নিমিত্তই মায়া অর্থাৎ যোনি এবং উপাদানই শম্ভু অর্থাৎ লিঙ্গ।"

—ব্রঃ সং ৫।৮

১৭। রুদ্র (ভব বা ভৈরব) ও রুদ্রাণী (ভবানী বা ভৈরবী)—ইঁহারা কি তত্ত্ব ?

"তৎপ্রতিফলিত (মহাবিষ্ণুর প্রতিফলিত) জ্যোতিঃর আভাস-রূপই শম্ভু-লিঙ্গ। তাহাই রমা-শক্তির ছায়ারূপা মায়ার প্রসব-যন্ত্রে সংযুক্ত হয়। তখন মহত্তত্ত্বরূপ কামবীজের আভাস আসিয়া সৃষ্টি-কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়।

—ব্রঃ সং ৫।৮

১৮। ব্রহ্মা ও রুদ্র অপরা শক্তির সহিত কেন বিলাস করেন ?

"বিভিন্নাংশগত প্রজাপতি ও শম্ভু—উভয়েই ভগবত্তত্ত্ব হইতে পৃথগভিমান-বশতঃ চিচ্ছক্তির ছায়া-বিশেষ সাবিত্রী ও উমারূপা স্বীয় স্বীয় অপরা শক্তির সহিত বিলাস করেন।"　　—ব্রঃ সং ৫।১৭

১৯। শম্ভু-তত্ত্বটী কি ? শিব-শক্তির মিলন-তাৎপর্য্য কি ?

"মূলতত্ত্বে ভগবত্তত্ত্ব—পৃথগভিমান-শূন্য সর্ব্বসত্ত্বময়। মায়িক জগতে যে বিভিন্নাভিমানরূপ লিঙ্গের অর্থাৎ চিহ্নিত পৃথক্ সত্তার উদয় হয়, তাহা সেই শুদ্ধ সত্তারই মায়িক প্রতিফলন এবং তাহাই আদি-শম্ভুরূপে রমাদেবীর বিকার-রূপ মায়িক-যোন্যাত্মক আধারতত্ত্বে মিলিত ; সে-সময়ে শম্ভু—কেবল দ্রব্য-ব্যূহাত্মক উপাদান-তত্ত্ব মাত্র। আবার যে-সময়ে তত্ত্ব বিকাশ ক্রমে প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হয়, তখন ভ্রূদেশ-জাত শম্ভুতত্ত্বেও বিকাশরূপ রুদ্রতত্ত্ব উদিত হয় ; তথাপি সকল অবস্থায়ই শম্ভুতত্ত্ব—অহঙ্কারাত্মক।"　　—ব্রঃ সং ৫।১৬

২০। ব্রহ্মা ও রুদ্র পরস্পর কি তত্ত্ব ?

"ব্রহ্মা—রজোগুণোদিত স্বাংশ-প্রভাব-বিশিষ্ট বিভিন্নাংশ এবং শম্ভু—মায়ার তমোগুণোদিত স্বাংশ-প্রভাব-বিশিষ্ট বিভিন্নাংশ।"　　—ব্রঃ সং ৫।৪৬

২১। ব্রহ্মা কি পরমেশ্বর-তত্ত্ব ? শম্ভু কি তত্ত্ব ?

"ব্রহ্মা—সাধারণ জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু সাক্ষাৎ ঈশ্বর নন। * * শম্ভুতে ব্রহ্মাপেক্ষা ঈশ্বরতা অধিক পরিমাণে আছে।"

—ব্রং সং ৫।৪৯

২২। গণেশের স্বরূপ কি ?

"গণেশ—একটী শক্ত্যাবিষ্ট আধিকারিক দেবতা। গোবিন্দের কৃপায়ই তাঁহার সমস্ত মহিমা।"　　—ব্রঃ সং ৫।৫০

২৩। সূর্য্য কি স্বতন্ত্র ঈশ্বর ?

"সূর্য্য জড় তেজঃসমষ্টি একটী মণ্ডলের অধিষ্ঠাতা ; সুতরাং একজন আধিকারিক দেবতা। গোবিন্দের আজ্ঞায়ই সূর্য্য স্বীয় সেবা-কার্য্য করেন।"

—ব্রঃ সং ৫।৫২

২৪। শিবাদি আধিকারিক দেবতা হইতে বিষ্ণুর কি বৈশিষ্ট্য ?

"ঈশ্বরের বিভিন্নাংশসকল স্বতঃই শুদ্ধসত্ত্ব হইলেও অবিদ্যা-সংযোগে মায়ার রজঃ ও তমোধর্ম্মে মিশ্র হইয়াছেন ; গিরীশাদি দেবগণ জীবাপেক্ষা অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ হইলেও বদ্ধজীবের মায়িক ধর্ম্মাভিমানরূপ অভিমান-সংযোগে রজস্তমোমিশ্র হওয়াতে মিশ্রসত্ত্ব-মধ্যে তাঁহারা গণ্য হইয়াছেন। শুদ্ধসত্ত্ব ঈশ্বর স্বীয় অচিন্ত্যশক্তি-

বলে প্রপঞ্চে বিষ্ণুরূপে অবতীর্ণ হইয়াও সর্ব্বদা মায়ার ঈশ্বর, মায়া তাঁহারই পরিচারিকা।"

—'নাম-মাহাত্ম্য-সূচনা', হঃ চিঃ

২৫। জীব জড়জগৎ হইতে উচ্চ পদার্থ ও তাহার প্রভু কিরূপে হইল?

"জীব চিৎকণ, চিদ্বস্তুতে যে ধর্ম্ম আছে, তাহা জীব স্বতরাং লাভ করিবে। চিদ্বস্তুতে স্বতন্ত্রতারূপ একটী ধর্ম্ম নিহিত আছে। নিত্যধর্ম্ম হইতে বস্তুকে বিচ্ছেদ করা যায় না; অতএব জীবে যে-পরিমাণ অণু, তাঁহার স্বতন্ত্রতা-ধর্ম্ম সেই পরিমাণে অবশ্য থাকিবে। এই স্বতন্ত্রতা ধর্ম্ম-প্রযুক্ত জীব জড়জগৎ হইতে উচ্চ পদার্থ এবং জড়-জগতের প্রভু হইয়াছেন।" —জৈঃ ধঃ ১৬শ অঃ

(ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

কৃষ্ণকে মাপিতে গেলে তাঁহাকে পাওয়া যাইবে না। তিনি আমার প্রাকৃত জ্ঞানের অধীন নহেন যে, তাঁহাকে মাপিয়া লইব। **He is unapprochable by our present senses.** এই অধোক্ষজ কৃষ্ণেরই সেবা করিতে হইবে।

কৃষ্ণের কথা শ্রবণ করিতে হইবে, কৃষ্ণ কি জিনিষ জানিতে হইবে। শ্রুত বিষয় কীর্ত্তন করিতে হইবে। কীর্ত্তন-প্রভাবে স্মরণ হইবে। নিরন্তর কৃষ্ণের অনুশীলন করিতে হইবে।

আমরা যদি শ্রীধামে অবস্থিত হইয়া, শ্রীধামের ভজন করি, শ্রীধামোৎপন্ন বস্তুর দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করি, তাহাতে আমাদের জীবন ভক্তির অনুকূল চেষ্টা-বিশিষ্ট হয়। বিলাসবৈভবে মত্ত না হইয়া যদি শ্রীধামে বাস করি, নিরন্তর শ্রীনাম মুখে উচ্চারণ করি, হরিভজন করি, তাহা হইলে অচিরেই শ্রীগৌর ও শ্রীগৌরজনের কৃপালাভ করিতে পারিব। যেখানে ভক্তগণ শ্রীধামের কথা নিরন্তর কীর্ত্তন করেন, সেইসকল স্থানকে আমি ধাম ছাড়া আর অন্য কিছু বোধ করিতে পারি না। সেইসকল স্থান গৌড়মণ্ডলেরই অন্তর্গত, শ্রীধাম নবদ্বীপেরই চিদ্বিলাস-ক্ষেত্র। শ্রীনামের কিরণ প্রতিফলিত, উদ্ভাসিত কণজ্ঞানে আমি অন্যত্র বাস করি। শ্রীধামের প্রভা, কিরণ, প্রতিফলন—শ্রীধামই। মহাবিষ্ণুত্রয়ের অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র—প্রত্যেক জীবহৃদয়, প্রত্যেক পরমাণু; স্বতরাং সর্ব্বত্রই শ্রীধাম। এই শ্রীধামের

কেন্দ্রস্থল শ্রীমায়াপুর ব্রহ্মার হৃদয়; ব্রহ্মা এইস্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের পত্নী –শ্রী, ভূ ও নীলা বা লীলা। শ্রী-ই কমলা, গৌর-নারায়ণের দক্ষিণে বিরাজিতা। প্রেমভক্তি-স্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া বামদেশে শোভিতা। লীলা বা দুর্গাশক্তি ধামময়ী হইয়া সম্বন্ধ-জ্ঞান প্রতিপাদ্য লীলাপুরুষোত্তমের পাদপদ্মালিঙ্গিতা। শ্রীনামের স্ফূর্ত্তি শ্রীধামের স্ফূর্ত্তির সহিত প্রকটিত হয়।

সর্ব্বত্রই সত্যবিষয়ের দ্বিবিধ প্রচারক—অনুকূল ও প্রতিকূল। ভগবদনুগৃহীত পঞ্চ-রসের রসিক ব্রজবাসিগণ ভগবানের অনুকূল সেবক—প্রচারক; অঘ, বক, পূতনা, কংস, জরাসন্ধ প্রভৃতি কৃষ্ণের প্রতিকূল প্রচারক। অঘ-বক-পূতনাগণ কৃষ্ণকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিলেও তাঁহাকে বিনাশ করিতে পারে নাই। তাহারা ব্যতিরেকভাবে কৃষ্ণের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছে। তদ্রূপ স্বার্থান্ধ ধামবিদ্বেষিগণ নিত্যচিন্ময় ধামের কখনও বিনাশ করিতে পারিবে না। পরন্তু তাহারা ব্যতিরেকভাবে শ্রীধাম প্রচারে সহায়তাই করিবে। উহা বিনাশযোগ্য বস্তুই নহে। বিষ্ণুবিদ্বেষী অসুরগণ নির্ব্বিশিষ্ট গতিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ ধামবিদ্বেষিগণের কথাও নির্ব্বিশিষ্ট গতি লাভ করিবে; তাহাদের কোনও কথা থাকিবে না। ছন্নাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের শুদ্ধকথা ও তদ্রূপ-বৈভব শ্রীধামের বিরুদ্ধে প্রচারকারী অচিরেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

সঙ্গ অর্থাৎ সম্যগ্‌রূপে গমন করেন যিনি, তাঁহাকেই সঙ্গী বলে। যাঁহারা অণুক্ষণ সঙ্গ করিলেন না, তাঁহাদিগকে সঙ্গী বলা যায় না। সঙ্গী অর্থে পার্ষদ।

যিনি সর্ব্বদা হরিসেবা-তৎপর, তাঁহার সঙ্গ ছাড়া অন্য কিছু করিব না, হরি-ভজনই মনুষ্য জীবনের সার্থকতা, সুতরাং কালবিলম্ব না করিয়া এই মুহূর্ত্ত হইতে হরিভজন করিতে থাকিব,—এইরূপ দৃঢ় উৎসাহ ও নিশ্চয়তা লইয়া আমাদিগকে মনুষ্যজীবনের চরম কল্যাণসাধনে ব্রতী হওয়া আবশ্যক। আমরা যদি কালবিলম্ব করি, তবে অন্য লোক আমার নিকট আসিয়া দুষ্ট পরামর্শ দিবার সুযোগ ও সময় পাইবে।

যদি শুদ্ধ বৈষ্ণবের নিকট শ্রবণ করা হয়, তাঁহার নিকট শ্রীনামগ্রহণ করিয়া নিরন্তর কীর্ত্তন করা হয়, তাহা হইলে অপস্মৃতি বিদূরিত হয় এবং নিরন্তর কৃষ্ণের স্মৃতি হইয়া থাকে। কীর্ত্তনপ্রভাবেই স্মরণ হয়। সরলান্তঃকরণে নিরন্তর সঙ্কীর্ত্তন করিতে হইবে। আমার বাস্তবদেহ আছে—এই স্মৃতি যদি না জাগে, তাহা হইলে অপস্মৃতি থাকিয়াই গেল।

শ্রবণ—সম্বন্ধ, কীর্ত্তন—অভিধেয় ও স্মরণ—প্রয়োজন। শ্রবণ ব্যতীত সম্বন্ধের উদয় হয় না। সম্বন্ধ স্থির না হইলে অভিধেয় ও অভিধেয় স্থির না হইলে

প্রয়োজন-বিচার সুষ্ঠু হয় না। সদ্‌গুরুমুখে শ্রীচৈতন্যবাণী অনুক্ষণ শ্রবণ করিয়া তাহা অপরের নিকট কীর্ত্তন করিতে হইবে। এই কীর্ত্তনই অভিধেয়। কীর্ত্তনে নিজের শ্রবণ হইয়া থাকে, আবার কীর্ত্তন-প্রভাবেই স্মরণ হয়। হরিকীর্ত্তনের দ্বারা অধোক্ষজের সর্ব্বক্ষণ নিশ্ছিদ্র সেবা সম্ভব। শত শত জন্ম অর্চ্চন করিলে প্রাকৃত-বুদ্ধির অবসান হয় এবং শ্রীনামের কৃপা পাওয়া যায়। শ্রীহরিকীর্ত্তনকারীর অন্য সাধন নাই। সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন করিতে হইবে; কীর্ত্তন যদি হয়, তাহা হইলে তৎপ্রভাবে স্মরণ হইবে। সর্ব্বতোভাবে সেব্যবস্তুর সহিত আমাদের সংস্পর্শ আছে। ধ্যানের দ্বারা যে অনুভূতি আসে, তাহা গৌণ। যাহা শ্রবণ করি নাই, তদ্বিষয়ে মনগড়া যে কীর্ত্তন, তাহা প্রাকৃত। যাহা শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট হইতে শ্রবণের সৌভাগ্য হয়, তাহা অনুকীর্ত্তন করিলেই অপ্রাকৃত স্মরণ আসিবে।

মনুষ্য-জনের সার্থকতাই গৌরভক্তের ভৃত্য হওয়া। মনুষ্য-জন্মের একমাত্র প্রয়োজনই গৌরানুগত্যে কৃষ্ণসেবা। যাহারা ইহা বুঝিতে পারে না, তাহারাই কৃষ্ণবিমুখ হইয়া নিজ অমঙ্গল আনয়ন করে।

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবচরণে যাঁহার প্রেমাধিক্য, তিনিই ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবচরণে প্রীতিরহিত ব্যক্তির কৃষ্ণপ্রসাদ লাভ করা সম্ভব নহে। হরি-গুরু-বৈষ্ণবই শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবকে জানিতে পারেন। ইতর জনগণ উঁহাদিগকে জানিতে পারে না; যেহেতু উহারা কিছু হরি-গুরু-বৈষ্ণব নহে। ভক্তকৃপা না হইলে ভক্ত-চরিত্রের আপাত-দর্শনে কাহারও সর্ব্বনাশ হয়, আবার কেহ বা অপরাধ না করিয়া অপরাধ হইতে দূরে থাকেন। মূর্খ অনধিকারী ব্যক্তি বৈষ্ণবের সহিত অবৈষ্ণবের সমদৃষ্টি-ফলে নরকে গমন করে। তাহারা বৈষ্ণবের মধ্যেও অসতের দুরাচার লক্ষ্য করে। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে বৈষ্ণব এইরূপ দুরাচারী নহেন। যাহারা সাবধানে অভিন্ন-নিত্যানন্দ শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ পাঠ করে না ও ভক্তগণের অলৌকিক চরিত্র বুঝিতে পারে না, তাহাদের অমঙ্গল ঘটে। কিন্তু প্রকৃত ভগবদ্ভক্তকে ভগবান্ দিব্যবুদ্ধি প্রদান করেন বলিয়া বিপৎপ্রতিম ব্যাপার-সমূহ উপস্থিত হইলেও তাঁহাদের অমঙ্গল লাভ ঘটে না।

সাধুকে সেব্যবস্তু জানিতে হইবে। সাধুর প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইলে শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তির উদয় হয়। গুরু-বৈষ্ণবের নিকট unconditional surrender করিতে হইবে। সাধুকে সেবা করিতে না পারিলে কাহারও সুবিধা হইবে না। শ্রীগুরু-মুখপদ্ম-বিনিঃসৃতা বাণী প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তির সহিত নিরন্তর শ্রবণ করিতে হইবে। গুরুদেবের কৃপা হইলে সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইবে। শ্রীগুরুকৃপাই ভগবানের কৃপা। শ্রীগুরুদেবের কৃপা ব্যতীত জীবের গত্যন্তর নাই।

আমরা যদি ভক্তের চরিত্র সেবোন্মুখ হইয় দেখিবার সুযোগ পাই, তাহা হইলে কৃষ্ণেতর বিষয়ে আর বাসনা থাকে না। অক্ষজজ্ঞানে মাপা ধর্ম্মটা জীবের অসুবিধা ঘটায়।

হরিভজনের কথা শুনিয়াও ইচ্ছাপূর্ব্বক ভোগ চালাইব—ইহা পাষণ্ডী ভোগী-দিগের বিচার। কিন্তু কোমলশ্রদ্ধ প্রবর্ত্তক বা সাধকের পক্ষে প্রথম প্রথম কিছু অনর্থ দৃষ্ট হইলেও তাঁহারা যে আপাত ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর কার্য্যকেই নিত্যকর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করেন, বাস্তবিক তাহা নহে। ভগবান্ বলিয়াছেন,—"আমার কথায় যাহার শ্রদ্ধা হইয়াছে, তাহাদের ঐ ইতরচেষ্টারূপ দ্যূতপানাদি সঙ্গটী নিশ্চয়ই ক্রমে ক্রমে দূর হইয়া যাইবে।" যাহার হৃদয়ে কৃষ্ণ বাস করেন, তাহার অন্য সকল কামনা নষ্ট হইয়া যায়।

মহাবদান্যতার পরাকাষ্ঠা

পঞ্চশত বর্ষপূর্ব্বে তদানীন্তন নবদ্বীপনগরে এক নিষ্কলঙ্ক মহৎ ব্রাহ্মণকুলে দেবোপম পিতামাতার গৃহে দুইটী সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাহারা স্বীয় গুণবন্ত কুলের ধর্ম্ম বর্জ্জন করত অতি শৈশব হইতেই পানাসক্ত হইয়াছিল। শিশুদ্বয়ের অতীব দৌর্জ্জন্য দর্শন করিয়া পিতামাতা তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া-ছিলেন। তাহারা ক্রমশঃ মদ্যপসঙ্গহেতু স্বতন্ত্র এবং মদ্যাসক্ত হইয়া নানাবিধ পাপকর্ম্মে লিপ্ত থাকিত। সমস্ত নদীয়াবাসী তাহাদের দর্শনে ভীতিগ্রস্ত হইতেন; বিশেষতঃ তাহারা গৃহদাহকর্ম্মে অত্যন্ত অভ্যস্ত ছিল। মদ্য-মাংস এমন কি গোমাংসাদি-ভক্ষণ ও চুরি-ডাকাতি প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার কুকর্ম্মই তাহাদের স্বাভাবিক আচরণ হইয়াছিল। তৎকালে কৃপাসিন্ধু শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীহরিদাস ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য-দেবের আদেশানুসারে সমস্ত নদীয়াবাসীর দ্বারে দ্বারে ভিক্ষারূপে শ্রীকৃষ্ণভজন করিতে উপদেশ প্রদান করিতেছিলেন। নগরবাসী সকলে শ্রীকৃষ্ণভজন করুন—ইহা ব্যতীত অন্য কিছুই তাঁহারা ভিক্ষা করিতেন না। তাঁহাদের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ—

একদিন আচম্বিতে হৈল হেন মতি।
আজ্ঞা কৈল নিত্যানন্দ হরিদাস-প্রতি॥
"শুন শুন নিত্যানন্দ শুন হরিদাস।
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ॥

প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
'বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥'
ইহা বই আর না বলিবা, বলাইবা।
দিন-অবসানে আসি' আমারে কহিবা॥
তোমরা করিলে ভিক্ষা, যেই না বলিব।
তবে আমি চক্রহস্তে সবারে কাটিব॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এবম্বিধ আদেশ শ্রবণ করত বৈষ্ণবমণ্ডলে পরম উল্লাসের সঞ্চার হইয়াছিল এবং এই আদেশ সকলে অঙ্গীকার করেন। নিত্যানন্দেচ্ছু ব্যক্তির ইহাই শিরোধার্য্য বিষয়। অন্যথা, অদ্বৈতবাদীর সর্ব্বনাশরূপ আত্মধ্বংস বা লয় প্রাপ্য হইয়া থাকে।—

আজ্ঞা শুনি হাসে সব বৈষ্ণবমণ্ডল।
অন্যথা করিতে আজ্ঞা কা'র আছে বল?
হেন আজ্ঞা, যাহা নিত্যানন্দ শিরে বহে।
ইথে অপ্রতীত যার, সে সুবুদ্ধি নহে॥
করয়ে অদ্বৈত-সেবা, চৈতন্য না মানে।
অদ্বৈত তাহারে সংহারিবে ভাল মনে॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট প্রচার ও শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত 'ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত'—বাক্যটী একতাৎপর্য্যপর।—

দোহান সন্ন্যাসিবেশ—যান যা'র ঘরে।
আথেব্যথে আসি' ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ করে॥
নিত্যানন্দ-হরিদাস বলে,—"এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ-শিক্ষা॥"
এই বোল বলি' দুইজন চলি' যায়।
যে হয় সুজন, সেই বড় সুখ পায়॥

প্রচারের মুখ্য-গৌণ-ফল—ভক্তি ও সুকৃতি। কিন্তু অনধিকারী ও কপটীর ইহাই মৃত্যুস্বরূপ—ভুক্তি।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও হরিদাস ঠাকুর তাঁহাদের প্রচারকার্য্যের বিবরণ বা হিসাব-নিকাশ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে প্রত্যহই প্রদান করিতেন। প্রচারকগণ ভগবদভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মের আজ্ঞাবাহী। তাহাদের ভোক্তাভিমানে ভিক্ষালব্ধ কোন দ্রব্যাদিই আত্মসাৎ বা নিজভোগে লাগান কর্ত্তব্য নহে।—

এইমত ঘরে ঘরে বুলিয়া বুলিয়া।
প্রতিদিন বিশ্বম্ভরস্থানে কহে গিয়া॥

এই প্রকার প্রচার চলাকালে নিত্যানন্দ প্রভু ও হরিদাস ঠাকুর এক দিবস পথিমধ্যে মহাদস্যুপ্রায় দুই প্রমত্ত মদ্যপকে দর্শন করেন। তাহারা মদ্যপানে বিহ্বল হইয়া পথিমধ্যে গড়াগড়ি দিতেছে, কখনও বা পরস্পরকে অকথ্য গালিগালাজ করিতেছে। উভয়ে উভয়ের কেশাকর্ষণ করত পরস্পরকে কিল, চড়—প্রহার করিতেছে। কখনও বা পরম প্রীতিভরে পরস্পরের গলদেশ ধারণ করিতেছে। লোকমুখে তাহাদের পরিচয় জ্ঞাত হইয়া নিত্যানন্দ প্রভু তাহাদের দুঃখে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। তাহাদের পরিণাম চিন্তা করত অধিকতর মর্ম্মাহত হইয়া করুণাসিন্ধু নিত্যানন্দপ্রভুর দয়ার্দ্রচিত্তে তাহাদের উদ্ধার ও মঙ্গলের চিন্তার উদ্রেক হইল। তিনি বিচার করিলেন,—

"পাতকী তারিতে প্রভু কৈলা অবতার।
এমত পাতকী কোথা পাইবেন আর ??
লুকাইয়া করে প্রভু আপনা প্রকাশ।
প্রভাব না দেখে লোকে—করে উপহাস॥
এ দুইয়েরে প্রভু যদি অনুগ্রহ করে।
তবে সে প্রভাব দেখে সকল সংসারে॥
তবে হও নিত্যানন্দ—চৈতন্যের দাস।
এ দুইয়েরে করাও যদি চৈতন্য-প্রকাশ॥
এখন যেমন মত্ত, আপনা না জানে।
এইমত হয় যদি শ্রীকৃষ্ণের নামে॥
'মোর প্রভু' বলি' যদি কাঁদে দুইজন।
তবে সে সার্থক মোর যত পর্য্যটন॥
যে যে জন এ দুয়ের ছায়া পরশিয়া।
বস্ত্রের সহিত গঙ্গাস্নান করে গিয়া॥
সেই সব জন যদি দেখি এ দোহাঁরে।
গঙ্গাস্নান মানে, তবে আশা মোর পূরে॥

পরম দয়াল শ্রীনিত্যানন্দ এই প্রকার বিচার করত হরিদাস ঠাকুরকে তাহাদের উদ্ধারের কি উপায় চিন্তা করিতে বলিলেন। ভক্তকৃপা ব্যতীত এরূপ পাতকীর উদ্ধারের পথ নাই। "বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়। এহেন পামর প্রতি হইবে সদয়॥" অতএব তুমি যদি ইহাদের মঙ্গলচিন্তা কর, তবে ইহারা উদ্ধার হইতে পারে। তোমার সঙ্কল্প ভগবান্ কখনও অপূর্ণ রাখেন না। তোমাকে মুলুকপতির কিঙ্করেরা যখন বাইশ বাজারে প্রহার করিয়াছিল, তখনও তুমি সেই কিঙ্করগণের মঙ্গলচিন্তা করায়, মহাপ্রভু তাহাদিগকে বিনাশ করেন নাই।—

এতেক চিন্তিয়া প্রভু হরিদাস-প্রতি।
বলে,—"হরিদাস, দেখ দোঁহার দুর্গতি॥
ব্রাহ্মণ হইয়া হেন দুষ্ট ব্যবহার।
এ দোঁহার যমঘরে নাহিক নিস্তার॥
প্রাণান্তে মারিল তোমা যে যবনগণে।
তাহারও করিলা তুমি ভাল মনে মনে॥
যদি তুমি শুভানুসন্ধান কর মনে।
তবে সে উদ্ধার পায় এই দুইজনে॥
তোমার সঙ্কল্প প্রভু না করে অন্যথা।
আপনে কহিলা প্রভু এই তত্ত্বকথা॥"

'নাদেব দেবমর্চ্চয়েৎ'—ভক্ত এবং ভগবান্ উভয়েই পরস্পরের স্বভাবাদি ভালভাবে অবগত থাকেন। তজ্জন্য শ্রীহরিদাস প্রভু দৈন্যভরে কহিলেন,—

হরিদাস প্রভু বলে,—"শুন মহাশয়।
তোমার যে ইচ্ছা, সেই প্রভুর নিশ্চয়॥
আমারে ভাণ্ডাও, যেন পশুরে ভাণ্ডাও।
আমারে সে তুমি পুনঃ পুনঃ যে শিখাও॥"

শ্রীহরিদাসমুখে এই সুসত্যকথা শ্রবণ করত নিত্যানন্দ প্রভুর চাতুর্য্য হরিদাসের নিকট ব্যক্ত হইয়াছে জানিয়া, নিত্যানন্দ প্রভু আনন্দিত হইলেন এবং সহাস্যে তাঁহাকে আলিঙ্গন করত করুণার্দ্রচিত্তে অমায়ায় বলিলেন,—

হাসি' নিত্যানন্দ তানে দিলা আলিঙ্গন।
অত্যন্ত কোমল হই' বলেন বচন॥
"প্রভুর যে আজ্ঞা লই' আমরা বেড়াই।
তাহা কহি এই দুই মদ্যপের ঠাঁই॥
সবারে ভজিতে 'কৃষ্ণ' প্রভুর আদেশ।
তার মধ্যে অতিশয়-পাপীরে বিশেষ॥
বলিবার ভার মাত্র আমা দোঁহাকার।
বলিলে না লয় যবে—সেই ভার তাঁর॥"

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর এই উক্তিটী অতীব গম্ভীর। নিষ্কপট সেবকগণের নিকট ইহার মহত্ত্ব প্রকাশ পাইয়া থাকে। 'গুরোরাজ্ঞা হ্যবিচারণীয়া"—এই শাস্ত্রবাক্য ইহাতে পরিব্যক্ত। সাধারণ বিচারে বা অনুন্নত শিষ্যের বুদ্ধিতে যে কার্য্য কখনই সম্ভবপর হইবার নহে, তাহা শ্রীগুরুদেব আদেশ করিলেও কর্ত্তব্য নহে—শিষ্যের

এবম্প্রকার বিচার এতদ্বারা খণ্ডিত হইয়াছে। শিষ্যের বিচারে অসম্ভব হইলেও গুর্ব্বাদেশে তাহাই কর্ত্তব্য বা পালনীয়। সাধারণ বিচারে জগাই-মাধাইয়ের ন্যায় পাতকীকে কৃষ্ণনাম বা হরিভজন উপদেশ করা নিরর্থক বা নিষ্ফল বিবেচিত হইলেও, শ্রীগুরুসেবক আপন-বিচার পরিত্যাগ করত শ্রীগুরুদেবের আদেশানুসারেই কার্য্য করিবেন।

অতএব প্রভুদ্বয় জগাই-মাধাই সমীপে গমন করিতে লাগিলেন। সজ্জন ব্যক্তিগণ যাইতে নিষেধ করিতে লাগিলেন।—

সাধুলোকে মানা করে,—"নিকটে না যাও।
নাগাল পাইলে পাছে পরাণ হারাও॥
আমরা অন্তরে থাকি পরাণ-তরাসে।
তোমরা নিকটে যাও কেমন সাহসে?
কিসের সন্ন্যাসিজ্ঞান ও-দুয়ের ঠাঁই?
ব্রহ্মবধে-গোবধে যাহার অন্ত নাই॥"

'বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়'—সজ্জনগণ জাগতিক-ব্যাপারে বিজ্ঞ হইলেও পারমার্থিক বা ভক্তির বিজ্ঞান ধারণা করিতে অক্ষম। সমর্পিতাত্মা শিষ্যরা শ্রীগুরুদেবের সেবায় নিজ প্রাণকেও উৎসর্গ করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুসেবার জন্য তাঁহারা হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ করিয়া থাকেন। ইহা দুঃসাহস নহে, ইহাই প্রকৃত ভক্ত বা সেবকের পবিত্র স্বভাব। 'না গণি আপন-সুখ, সবে বাঞ্ছি তার সুখ'—ইহাই তাৎপর্য্য।

তথাপিহ দুইজন 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি'।
নিকটে চলিলা দোহেঁ মহা-কুতুহলী॥
শুনিবারে পায় হেন নিকট থাকিয়া।
কহেন প্রভুর আজ্ঞা ডাকিয়া ডাকিয়া॥
"বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন প্রাণ॥
তোমা-সবা লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার।
হেন কৃষ্ণ ভজ, সব ছাড় অনাচার॥"

প্রভুদ্বয় জগাই-মাধাইকে কৃষ্ণ-ভজন করিতে এবং অনাচার পরিত্যাগ করিতে বলিলেন। অনাচার পরিত্যাগ-জন্য কোনও চেষ্টার কি প্রয়োজন? কৃষ্ণভজন করিতে করিতে অনাচারও আপনা হইতেই দূরীভূত হইবে। 'ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র' বাক্যানুসারে অনাচার-ত্যাগ স্বতঃই হইয়া থাকে না কি?

আরও শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায়—"বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ…।" শ্লোকটীতে ইহাই উক্ত হয় নাই কি ?

পরন্তু, এই বিচার অবলম্বন করিলে আমাদের প্রভুদ্বয়ের "সব ছাড় অনাচার" —উক্তির সার্থকতা থাকে না। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুও স্বয়ং জগাই-মাধাইকে এবম্বিধ একই আদেশ প্রদান করিয়াছেন, দেখা যায়—

প্রভু বলে,—"তোরা আর না করিস্ পাপ।
জগাই-মাধাই বলে, "আর নারে বাপ॥"

অধিকন্তু, "তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে" শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্যও একই উপদেশমূলক। 'শাস্ত্র' পদটীর উৎপত্তিগত বিচারে 'শাসনবাক্য' বুঝায়। অর্থাৎ পাপ বা অনাচারে বদ্ধজীবের স্বাভাবিক আসক্তি ও রুচি। ইহাকে পরিত্যাগ করা কষ্টকর হইলেও পরিত্যাগই কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ-বাক্যকে শাস্ত্র বলে। পাপাসক্ত ও অনাচারী যোষিৎসঙ্গীর পক্ষে "শ্রদ্ধান্বিতঃ" বাক্যের উদ্দিষ্ট শ্রদ্ধা জন্মগ্রহণ করিতে পারে না। ঐ শ্রদ্ধালাভে বাধাকেই পাপ বা অনাচার বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহাকে বর্জ্জন করাই প্রাথমিক কর্ত্তব্য। পাপ বা অনাচার দূর করিলে শ্রদ্ধার উদয় সম্ভব হয়। "যাবৎ পাপৈস্ত মলিনং হৃদয়ং তাবদেব হি ন শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধিঃ স্যাৎ, সদ্বুদ্ধিঃ সদ্‌গুরৌ তথা।" তজ্জন্য এই অনাচার বা পাপকর্ম্ম বর্জ্জনের চেষ্টা বা যত্ন প্রাথমিক কর্ত্তব্য এবং ইহা আধ্যক্ষিক চেষ্টাদ্বারা সম্ভবপর হইতে পারে। ইহা ভক্তিতত্ত্বের ন্যায় অপ্রাকৃত তত্ত্ব নহে।

শ্রীনামগ্রহণেও একই নিষেধ-বাক্য বর্ত্তমান। অপরাধ ত্যাগ করত নামগ্রহণ করার আদেশ দেখা যায় অপরাধযুক্ত নামদ্বারা অপরাধ দূরীভূত হয় না। নামাভাস বা শুদ্ধ নামেই এই ক্ষমতা বর্ত্তমান। পরন্তু এই নামাভাস বা শুদ্ধ নাম আধ্যক্ষিকতায় লভ্য হয় না। "স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ"। ইহা কৃপাসাপেক্ষ তত্ত্ব। শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিই এই কৃপার পাত্র হন; অনাচারী নহে। তজ্জন্য এই অনাচার সাধক চেষ্টা করিয়া দূর করিবেন।

ভক্তি জন্মিলে বৈরাগ্য স্বতঃ লভ্য হয় বটে, কিন্তু ভক্তিলাভের মূল—'শ্রদ্ধা'। "আদৌ শ্রদ্ধা"। এই শ্রদ্ধালাভের বাধাই পাপ ও অনাচার। চেষ্টাদ্বারাই সাধক ইহাকে দূর করিবেন। আচার্য্যগণেরও ইহাই আচরিত ধর্ম্ম।

"অশ্রদ্দধানে বিমুখে অপ্যশৃণ্বতি যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ"—বাক্যে ইহাই পরিব্যক্ত। উদারতা বা বদান্যতার মুখোশে কনকাদিলোভে প্রাকৃত সহজিয়ার আচরণ আচার্য্যগণের চরিত্রে প্রকাশ পায় না। "মাগুর মাছের ঝোল, ভরযুবতীর কোল, আর হরি হরি বোল"—মতবাদকে আচার্য্যগণ ধিক্কৃত করিয়াছেন। "কৃষ্ণ-

ভক্তি বলবান্, পাপ কেটে করে খান খান"—বাক্যদ্বারা নামবলে পাপ-বুদ্ধিকে লক্ষ্য করে না। পরন্তু "আর নারে বাপ"—বুদ্ধিকেই লক্ষ্য করে। মৃগারি নামক ব্যাধকে শ্রীনামোপদেশকালে প্রথমেই শ্রীনারদ ব্যাধকে তাহার ধনুকখানি ভগ্ন এবং স্ত্রী-সম্ভোগ বন্ধ করিয়া বাণপ্রস্থ-আশ্রমী করিয়াছিলেন। শ্রীনারায়ণ পূজার পূর্ব্বেই বাহ্য-শৌচকার্য্য বিহিত আছে। অপবিত্র-গাত্রে শ্রীনারায়ণসেবার ব্যবস্থা নাই। স্ত্রীসঙ্গীকে অসাধু বলা হইয়াছে। স্ত্রীসঙ্গ-স্পৃহাকে পরিত্যাগ করাইবার জন্যই বিবাহ-ব্যবস্থা। পরস্ত্রী-সঙ্গদ্বারা স্ত্রীসঙ্গ-স্পৃহাকে চরিতার্থ করিতে শাস্ত্রে বিধান নাই। ইহা সর্ব্বতোভাবে চেষ্টাদ্বারা বর্জ্জনীয়। "বৈরাগী হইয়া করে স্ত্রী-সম্ভাষণ। দেখিতে না পারো মুই তাহার বদন॥" —শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই উক্তিকে বদান্যতার ছলে অবহেলা করিলে অপরাধ আক্রমণ করে। পরস্ত্রীগমন দূরে থাক্, স্ত্রীসম্ভাষণও ত্যাগীর পক্ষে অধঃপাত।

হে নামপ্রভো! আমি ইন্দ্রিয়ের হস্ত হইতে নিজশক্তিতে মুক্ত হইতে সক্ষম নহি। আপনি অনন্ত শক্তিমান্, আপনার শরণাগত হইলাম; আপনি আমাকে রক্ষা করুন—এরূপ প্রার্থনাযুক্ত নামোচ্চারণকে "নামবলে পাপবুদ্ধি" বলা সঙ্গত নহে। যেহেতু, এক্ষেত্রে শ্রীনামের প্রতি শ্রদ্ধার হানি হয় নাই। পরন্তু, পাপকর্ম্ম বা ভোগপ্রবৃত্তি চরিতার্থজন্য পাপাচরণ করিব এবং নামোচ্চারণ করিয়া পাপের ক্ষালন করিতে থাকিব—এরূপ বুদ্ধিকেই নামাপরাধরূপে গণ্য হইয়াছে। বাহ্যতঃ ত্যাগ করিলেও বস্তুতঃ মানস-আসক্তি পরিত্যক্ত হয় না। পরন্তু শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া শ্রীনামের শরণাপন্ন ব্যক্তিই পাপপ্রবৃত্তি হইতে রক্ষা পায়। "বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিঃ" শ্লোকের "শ্রদ্ধান্বিতো" এবং "হৃদ্রোগম্" পদদুইটীতে ইহাই প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে হৃদয়স্থিত কামকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, স্থূল ইন্দ্রিয়স্থিত কামকে লক্ষ্য করে নাই। অর্থাৎ যাহাদের স্থূল ইন্দ্রিয় বিদমিত হইলেও সূক্ষ্মভাবে হৃদয়মধ্যে অবস্থিত কাম দূরীভূত হয় নাই—এরূপ অর্থই প্রকাশিত হইয়াছে। ব্রজবধূগণের রাসাদিলীলা শ্রবণের দ্বারা তাঁহাদের ঐ হৃদয়স্থিত সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত কামবৃত্তিও বিনাশ পাইবে—ইহাই তাৎপর্য্য। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন, —"হৃদ্রোগরূপং কামমিতি ভগবদ্বিষয়কঃ কামবিশেষো ব্যবচ্ছিন্নঃ তস্য প্রেমামৃতরূপত্বেন তদ্বৈপরীত্যাৎ।" ইহা প্রেমামৃতরূপ ভগবদ্বিষয়ক কাম, প্রাকৃত কাম নহে। এই অপ্রাকৃত কাম বদ্ধজীবের কাম হইতে অবশ্যই ভিন্ন। তিনি আরও জানাইয়াছেন,—"অতএব শ্রদ্ধান্বিত ইতি শাস্ত্রাবিশ্বাসিনং নামাপরাধিনং প্রেমাপি নাঙ্গীকরোতি।" শ্রদ্ধান্বিত-শব্দে শাস্ত্রে অবিশ্বাসী নামাপরাধীকে লক্ষ্য করে না।

শ্রদ্ধায় বা হেলায় একবার কৃষ্ণনামদ্বারা মনুষ্যমাত্রেই উদ্ধার হয়—

স্কন্দপুরাণ—"সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা।
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥"

এস্থলে "হেলা" পদে নিন্দাগর্ভ হেলাকে উদ্দেশ করে নাই; ইহা স্তুতিগর্ভ হেলা জানিতে হইবে। ইহা শাস্ত্রবিশ্বাস বা শ্রদ্ধার উপর প্রতিষ্ঠিত।

সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠ-নামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকস্থ হেলা বা পরিহাস পদকেও স্তুতিগর্ভ জানিতে হইবে। পদ্মপুরাণোক্ত—

নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা।
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যম্॥
তচ্চেদ্দেহদ্রবিণজনতা লোভপাষণ্ডমধ্যে।
নিক্ষিপ্তং স্যান্ন ফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র॥

শ্লোকটীতে স্পষ্টভাবে একই তাৎপর্য্য প্রকাশিত। পাষাণে পতিত বীজ, যতই উত্তম হউক, তাহাতে অঙ্কুরোদ্গম যেরূপ সম্ভবপর হয় না, তদ্রূপ শ্রীনামে সর্ব্বশক্তি বর্ত্তমান থাকিলেও অপরাধ বা অশ্রদ্ধাযুক্ত পাত্রে তাহা কার্য্যকরী হয় না; শ্রদ্ধা বা নিরপরাধের অপেক্ষা রাখে।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীহরিদাস ঠাকুর মদমত্ত দুইজনকে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আদেশ জ্ঞাপন করিলেন। ইহাতে তাহারা অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া ভূমি হইতে মস্তক উত্তোলনপূর্ব্বক আরক্তলোচনে তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল এবং সন্ন্যাসিমূর্ত্তি তাঁহাদিগকে দর্শন করত 'ধর' 'ধর' শব্দে তর্জ্জনসহকারে তাঁহাদিগের প্রতি ধাবিত হইল। দূরস্থ দর্শকবৃন্দ ইহা অবলোকন করত বলিতে লাগিলেন,—হায়, হায়, সন্ন্যাসিদ্বয় আমাদের নিষেধ অগ্রাহ্য করায় আজ কি ভয়ানক বিপদে পতিত হইলেন। কৃষ্ণ ইহাঁদের রক্ষা করুন। পাষণ্ডিগণ সাধুদ্বয়ের প্রতি আক্রমণ দর্শন করত মনে আনন্দ অনুভব করিল এবং নারায়ণ ভণ্ডদিগকে আজ সমুচিত শাস্তি দিতেছেন—বলিতে লাগিল। দস্যুদ্বয় পলায়নপর প্রভুদ্বয়ের সন্নিকটস্থ হইয়াও তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে সক্ষম হইল না। নিত্যানন্দপ্রভু হরিদাস প্রভুকে বলিলেন,—ওহে বৈষ্ণবঠাকুর! আজ প্রাণরক্ষা হইলে হয়। হরিদাস ঠাকুরও কৌতুকসহকারে বলিলেন,—আর কথায় প্রয়োজন নাই; তোমার বুদ্ধিমত কার্য্য করায় আজ অযথা প্রাণ নষ্ট হইল। সুরাপানে প্রমত্ত ব্যক্তিকেও তুমি কৃষ্ণভজন করিতে উপদেশ দিবে, এক্ষণে সমুচিত ফল লাভ হইতেছে। প্রাণ রক্ষা করা মহা কঠিন হইল। এইরূপ আলাপন করিতে করিতে প্রভুদ্বয় সহাস্যে ধাবমান হইলেন।

স্থূলদেহভারাক্রান্ত দস্যুদ্বয় তর্জ্জন-গর্জ্জনসহকারে তাঁহাদের অনুধাবন করিতে লাগিল এবং প্রভুদ্বয়কে বলিতে লাগিল,—ওহে ভ্রাতঃ! ক্ষণমাত্র স্থির হও, পশ্চাদ্দিকে আমাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। আজ জগা-মাধার কবল হইতে পরিত্রাণ নাই।

ত্রাসে ধায় দুই প্রভু বচন শুনিয়া।
'রক্ষ কৃষ্ণ, রক্ষ কৃষ্ণ, গোবিন্দ' বলিয়া॥
হরিদাস বলে,—"আমি না পারি চলিতে।
জানিয়াও আসি আমি চঞ্চল-সহিতে॥
রাখিলেন কৃষ্ণ কাল-যবনের ঠাঁই।
চঞ্চলের বুদ্ধে আজি পরাণ হারাই॥"
নিত্যানন্দ বলে,—"আমি নহি যে চঞ্চল।
মনে ভাবি' দেখ, তোমার প্রভু সে বিহ্বল॥
ব্রাহ্মণ হইয়া যেন রাজ-আজ্ঞা করে।
তান-বোলে বুলি সব প্রতি ঘরে ঘরে॥
কোথাও যে নাহি শুনি,—সেই আজ্ঞা তান।
'চোর, চঙ্গ' বই লোক নাহি বলে আন॥
না করিলে আজ্ঞা তান সর্ব্বনাশ করে।
করিলেও আজ্ঞা তান এই ফল ধরে॥
আপন প্রভুর দোষ না জানহ তুমি।
দুইজনে বলিলাম,—দোষভাগী আমি॥"

প্রভুদ্বয় এরূপ ব্যাজস্তুতি-জনিত আনন্দিত হইলেও পশ্চাদ্ধাবনরত দস্যুদ্বয়কে দর্শন করত উদ্বেগাপন্ন হইলেন এবং দ্রুতবেগে পথ অতিক্রম করত নিজপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের ভবনে প্রবেশ করিলেন। মদ্যপদ্বয় প্রভুদ্বিগের দর্শন না পাইয়া পরস্পর হুড়াহুড়ি করিতে লাগিল। মাদকঘোরে তাহারা কোথায় ছিল, বর্ত্তমানে কোথায় উপস্থিত হইয়াছে—কিছুই অনুভব করিতে পারিল না। প্রভুদ্বয়ও পশ্চাদ্ভাগে দৃষ্টিপাত করিয়া দস্যুদ্বয়ের দর্শন পাইলেন না। তখন উভয়ে নিরুদ্বেগে হাস্য করিতে করিতে প্রভু বিশ্বম্ভরের সমীপে উপস্থিত হইলেন। সনকাদি ভক্ত-বেষ্টিত শ্বেতদ্বীপপতির ন্যায় নিজতত্ত্বকথা আলোচনারত শোভমান শ্রীমন্মহাপ্রভু বিরাজ করিতেছিলেন। হেনকালে প্রভুদ্বয় তাঁহাকে তদ্দিবসীয় প্রচার-বৃত্তান্ত নিবেদনমুখে জগাই-মাধাইয়ের বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন। শ্রীনিবাস ও গঙ্গাদাস প্রভুদ্বয় নিকটে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারাও জগাই-মাধাইয়ের দৌর্জ্জন্য,

দুষ্কর্ম্ম ও অধঃপাতের সাক্ষ্য প্রদান করিলেন। তচ্ছ্রবণে মহাপ্রভু উত্তেজিতভাবে বলিলেন,—

প্রভু বলে,—"জানোঁ জানোঁ সেই দুই বেটা।
খণ্ড খণ্ড করিমু আইলে মোর হেথা॥"
নিত্যানন্দ বলে,—"খণ্ড খণ্ড কর তুমি।
সে দুই থাকিতে কোথা' না যাইব আমি॥
কিসের বা এত তুমি করহ বড়াই।
আগে সেই দুইজনে গোবিন্দ বলাই॥
স্বভাবেই ধার্ম্মিকে বলয়ে 'কৃষ্ণ'নাম।
এই দুই বিকর্ম্ম বই নাহি জানে আন॥
এ দুই উদ্ধারোঁ যদি দিয়া ভক্তি-দান।
তবে জানি 'পাতকি-পাবন' হেন নাম॥
আমাকে তারিয়া যত তোমার মহিমা।
ততোধিক এ দু'য়ের উদ্ধারের সীমা॥"

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বৈষ্ণবভূষণরূপ দৈন্য এবং জগাই-মাধাই প্রতি মহাবদান্যতা-সূচক কারুণ্যবাক্য শ্রবণ করত শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর হৃদ্‌গত অভিপ্রায় অবগত হইয়া সহাস্যে উত্তর প্রদান করিলেন,—

হাসি বলে বিশ্বম্ভর হইল উদ্ধার।
যেই ক্ষণে দর্শন পাইল তোমার॥
বিশেষে চিন্তহ তুমি এতেক মঙ্গল।
অচিরাতে কৃষ্ণ তার করিব কুশল॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এতাদৃশ শ্রীমুখবাক্য শ্রবণ করত সর্ব্ববৈষ্ণবগণ পরমানন্দে শ্রীহরিধ্বনি করত জয়দান করিলেন এবং জগাই-মাধাই উদ্ধার হইল বলিয়া নিশ্চিতভাবে ধারণা করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দগুণে আপ্লুত হইয়া হরিদাস ঠাকুর আর নির্ব্বাক থাকিতে সক্ষম হইলেন না। বাল্যলীলা-বিভাবিত শ্রীনিত্যানন্দের মহিমাবর্ণনে তন্ময় হইয়া তাঁহার লীলার ব্যাজস্তুতি করিতেছেন।—

"চঞ্চলের সাথে প্রভু আমারে পাঠায়।
'আমি থাকি কোথা, সে বা কোন্ দিকে যায়?'
বর্ষাতে জাহ্নবী-জলে কুম্ভীর বেড়ায়।
সাঁতার এড়িয়া তা'রে ধরিবারে যায়॥
কূলে থাকি' ডাক পাড়ি' করি হায় হায়।
সকল গঙ্গার মাঝে ভাসিয়া বেড়ায়॥

যদি বা কূলেতে উঠে বালক দেখিয়া।
মারিবার তরে শিশু যায় খেদাড়িয়া॥
তার পিতা-মাতা আইসে হাতে ঠেঙ্গা লৈয়া।
তা' সবা পাঠাই আমি চরণে ধরিয়া॥
গোয়ালার ঘৃত-দধি লইয়া পলায়।
আমারে ধরিয়া তারা মারিবারে চায়॥
সেই সে করয়ে কর্ম্ম—যেই যুক্তি নহে।
কুমারী দেখিয়া বলে,—মোরে বিবাহিয়ে॥
চড়িয়া ষাঁড়ের পীঠে মহেশ বোলায়।
পরের গাভীর দুগ্ধ দুহি' দুহি' খায়॥
আমি শিখাইসে গালি পাড়য়ে তোমারে।
'কি করিতে পারে তোর অদ্বৈত আমারে?'
'চৈতন্য' বলিস্ যারে 'ঠাকুর' করিয়া।
সে বা কি করিতে পারে আমারে আসিয়া?
কিছুই না কহি আমি ঠাকুরের স্থানে।
দৈবযোগে আজি রক্ষা পাইল পরাণে॥
মহা-মাতোয়াল দুই পথে পড়ি' আছে।
কৃষ্ণ-উপদেশ গিয়া কহে তার কাছে॥
মহাক্রোধে ধাইয়া আইল মারিবার।
জীবন-রক্ষার হেতু—প্রসাদ তোমার॥"

শ্রীহরিদাসমুখে নিত্যানন্দ-মহিমা শ্রবণ করত শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুও প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। ইহাই ভক্তগণের স্বভাব।—

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্ত পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥

ভাবাবিষ্ট শ্রীঅদ্বৈত প্রভু বলিতে লাগিলেন,—

হাসিয়া অদ্বৈত বলে,—"কোন চিত্র নহে।
মদ্যপের উচিত—মদ্যপ-সঙ্গ হয়ে॥
তিন মাতোয়াল সঙ্গ একত্র উচিত।
নৈষ্ঠিক হইয়া কেনে তুমি তার ভিত?
নিত্যানন্দ করিবে সকলে মাতোয়াল।
উহান চরিত্র মুই জানি ভালে ভাল॥
এই দেখ তুমি—দিন দুই তিন ব্যাজে।
সেই দুই মদ্যপ আনিব গোষ্ঠীমাঝে॥" (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শুভাবির্ভাব-তিথিতে—

আঁধারে আচ্ছন্ন ছিল গগন মণ্ডল।
চতুর্দ্দিক ঘিরে ছিল যত দুষ্ট খল॥
জ্ঞানের ভাণ্ডার যেন করি' অবরোধ।
অকর্ম্মণ্য ক'রে রাখে চিন্তা-শক্তি-বোধ॥
জড়জীব হতাশায় দিক ভ্রষ্ট হয়।
প্রেমের অমৃতবাণী পায় না আশ্রয়॥
কল্যাণের পথগুলি সহায়তা বিনে।
সত্যকে, শুভকে নিতে পারেনা-কো চিনে॥
তিরিশে ফাল্গুন, তেরশো পঞ্চান্ন সালে।
শ্রীগৌরচন্দ্রের পুতঃ আবির্ভাবকালে॥
মঠের অধ্যক্ষ 'শ্রীকেশবে'র কৃপায়।
গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ক্ষেত্রে নূতন অধ্যায়॥
'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা' হয় সংযোজন।
আমাদের সকলের আরাধনা-ধন॥
আজ তার পুতঃ পঁয়তাল্লিশ বরষে।
গৌড়ীয়-পার্ষদাদি অতিশয় হরষে॥
সমাদরে সু-রক্ষিত রাখা বাণীগুলি।
অন্তরের অন্তঃস্থলে সশ্রদ্ধায় তুলি॥
পাঠ যেন করি তাহা ভক্তিসহকারে।
অমৃতের স্বাদ পেতে নিত্য বারে বারে॥

—শ্রীবলাইচাঁদ ঘোষ সেবা-সুহৃদ্
সাংবাদিক পি, টি, আই

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা-জয়ন্তী

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৫শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৮৮ পৃষ্ঠার পর]

বিশ্বের সমস্ত দার্শনিক মতবাদসমূহকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে,—১। জড়বাদ, ২। চিন্মাত্রবাদ ও ৩। চিদ্বিলাস।

১। জড়বাদ—জড়বাদের অপর নাম প্রকৃতিবাদ। প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া যত দার্শনিক মতের সৃষ্টি হইয়াছে, সে সমস্তই জড়বাদ। স্থূল হইতে সূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্ম হইতে স্থূলের অভিযানকারিগণ জড়বাদী। শ্রুতিনির্দ্দিষ্ট ঈশ্বরের সম্বন্ধ-রাহিত্য সমস্ত মতবাদ জড়বাদের অন্তর্গত। জৈমিনী প্রোক্ত কর্ম্মতত্ত্ব অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কামাত্মক ত্রৈবর্গ, অর্থাৎ ঈশ্বরে অর্পণরহিত বিশ্বে যত ধর্ম্ম, কর্ম্ম সব জড়-বাদের অন্তর্গত। পূর্ব্ব মীমাংসা, সাঙ্খ্য, ন্যায়, বৈশেষিক প্রভৃতি মতবাদসমূহ জড়বাদের অন্তর্গত। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জ্ঞান জড়বাদের অন্তর্গত। অপরাবিদ্যার অনুশীলনকারিগণ জড়বাদী। কর্ম্মকাণ্ডিগণ জড়বাদী।

২। চিন্মাত্রবাদ—চেতনের বিলাসরাহিত্যকে চিন্মাত্রবাদ বলা হয়। "ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ", "ব্রহ্ম নিরাকার জ্যোতিঃস্বরূপ" প্রভৃতি। অষ্টবক্রাদি মুনিগণ এবং ইহাদের অনুগামী গৌড়পাদ, শঙ্করাদি বৈদান্তিকগণ চিন্মাত্রবাদী। জড়ের অতিরিক্ত, বিশেষ রহিত চেতন সম্বন্ধীয় মতবাদকে চিন্মাত্রবাদ বলা হয়। এই মতে নিত্য তত্ত্ব ব্রহ্ম স্বীকার করা হইয়াছে, কিন্তু ব্রহ্মের পরিচয় নাই। উপাস্য দেবতা, উপাসনাকারী এবং উপাসনার নিত্য অস্তিত্ব না থাকায়, ইহা চিন্মাত্রবাদের অন্তর্গত। অবিদ্যা বা অতিবিদ্যার অনুশীলনকারিগণ চিন্মাত্রবাদী। অপরোক্ষ-জ্ঞান চিন্মাত্রবাদের অন্তর্গত। জ্ঞানকাণ্ডিগণ চিন্মাত্রবাদী।

৩। চিদ্বিলাস—চেতনের বিলাসকে চিদ্বিলাস বলা হয়। এই মতে—অণু হইতেও অণু এবং মহান হইতেও সুমহান্ অর্থাৎ স্বরাট্, বিরাট্, ভূমা বা বিভুকে ক্রোড়ীভূত করিয়া নিত্য মধ্যমাকারে প্রেমের আস্পদরূপে নিত্য নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর ও ধাম-সমন্বিত উপাস্য বস্তুর সচ্চিদানন্দঘন, চিন্ময় শ্রীবিগ্রহত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। তিনি "লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। উপাসক শ্রীহরির অণু অংশ জীবেরও নিত্যসত্তা (পার্ষদতনু) স্বীকার করা হইয়াছে। উপাসনায় 'সদা' শব্দ প্রয়োগ থাকায় (ঋগ্বেদ ১।২২ ২৩) ভগবান্ শ্রীহরির সহিত ভক্তের নিত্যকাল যে প্রেমের খেলা, তাহাকে চিদ্বিলাস কহে। অধোক্ষজজ্ঞান ও অপ্রাকৃত জ্ঞান চিদ্বিলাসের অন্তর্গত। ব্রহ্মবিদ্যা বা পরাবিদ্যার অনুশীলনকারিগণ চিদ্বিলাসী। ভক্তগণ চিদ্বিলাসী।

বিশ্বে যত উপাসনা প্রণালী সৃষ্টি হইয়াছে বা অনন্ত ভবিষ্যতে সৃষ্টি হইবে, তাহাকেও তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রকৃতি, ক্লীব ও পুরুষ। জড়বাদের উপাস্য প্রকৃতি চিন্মাত্রবাদের উপাস্য ক্লীব এবং চিদ্বিলাসের উপাস্য দেবতা পুরুষ।

১। উপাস্যবস্তু প্রকৃতি এবং উপাসকও যদি প্রকৃতি হয়, তাহা হইলে সমজাতীয়তা হেতু আনন্দের উৎস হয় না। আনন্দ পুরুষ ও প্রকৃতির সমবায় আকাঙ্ক্ষা করে। আর উপাস্য বস্তু প্রকৃতি এবং উপাসক যদি পুরুষ হয়, তবেত' উপাসকের চিত্ত আকৃষ্ট হয়। এই মতবাদ সমীচীন নহে, কেননা—প্রকৃতি-শব্দে ভোগ্যা এবং পুরুষ-শব্দে ভোক্তার ইঙ্গিত প্রদান করে। কাজে কাজেই ভোগ্যা বস্তু কখনও উপাস্য দেবতা হইতে পারেন না।

২। উপাস্য বস্তু ক্লীব এবং উপাসকও যদি ক্লীব হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রকারের সমজাতীয়তা হেতু আনন্দের উৎস হয় না। উভয়ের ইন্দ্রিয় না থাকায় রসের আস্বাদনও সম্ভবপর নহে। আর উপাস্য-বস্তুকে ক্লীব রাখিয়া, উপাসক পুরুষ বা প্রকৃতি হইয়াও কোন লাভ নাই। কেননা—উপাসনা অর্থে উপাস্যের প্রীতিবিধানই বুঝাইয়া থাকে। "ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ গচ্ছতি নো মনো ন বিদ্মো ন বিজানী নো যথৈতদনুশিষ্যাৎ। অন্যদেব তদ্ বিদিতাদথো অবিদিতাদধি ইতি শুশ্রুম পূর্ব্বেষাং যে ন স্তদ্ব্যাচচক্ষিরে॥" (কেন উঃ ১।৩) ব্রহ্মে চক্ষুর গতি নাই অর্থাৎ চক্ষু যাইতে সমর্থ নহে, বাক্য গমন করে না, মনও স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয় না। আমরা তাঁহাকে বিদিত নহি; আচার্য্যের শিষ্যবৃন্দ-সমীপে এই ব্রহ্মতত্ত্ব যে-প্রকারে উপদেশ দেন, তাহাও বোধগম্য করিতে সমর্থ হই না। তিনি কি সূক্ষ্ম? কি স্থূল? সকল পদার্থ হইতে ভিন্ন। যাঁহারা অস্মৎ সকাশে এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই প্রাচীন আচার্য্যবৃন্দের নিকট এই কথা শ্রবণ করিয়াছি।

বস্তুতঃপক্ষে ক্লীবের কোন উপাসনাই নাই। সেইজন্য ইহারা সাধকের হিতের নিমিত্ত আপনরুচি অনুযায়ী নিরাকারের একটী মূর্ত্তি (শিব, শক্তি, গণেশ, বিষ্ণু ও সূর্য্য) কল্পনা করিয়া উপাসনা করেন। এই কল্পিত বস্তুর উপাসনার দ্বারা নিত্যবস্তু যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার কৃপা কখনই লাভ হইবে না। ইহাদিগকে মায়াবাদী বলা হয়। মায়াবাদী কৃষ্ণের চরণে অপরাধী, সেইজন্য—"মায়াবাদ দোষ যার হৃদয়ে পশিল। কুতর্কে হৃদয় তার বজ্রসম ভেল॥ ধিক্ তার কৃষ্ণসেবা শ্রবণ-কীর্ত্তন। কৃষ্ণ অঙ্গে বজ্র হানে তাঁহার স্তবন॥" (শঃ গঃ)

৩। উপাস্য বস্তু পুরুষ এবং উপাসকও যদি পুরুষ হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত

প্রকারের সমজাতীয়তা হেতু রসের উদয় হয় না। কাজেই উপাস্যবস্তু পুরুষ এবং উপাসক প্রকৃতি হইলে, রসচমৎকারিতা তথায় প্রকাশ পায়। ইহা শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্মতও বটে।

চিদ্বিলাসের উপাস্য দেবতা পুরুষ—ব্রহ্ম, পরব্রহ্ম, পূর্ণব্রহ্ম, সনাতন, পরমানন্দ-লক্ষণ পরতত্ত্ব, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। ব্রহ্ম কি নীরস? সুখা রুখা? নিরাকার? নিষ্ক্রিয় নিরঞ্জন? ক্লীব মাত্র?—না, তিনি সরস, রসস্বরূপ। "রসো বৈ সঃ", "রসং হেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি। কো হেবানাৎ কঃ প্রাণাৎ যদেষ আকাশ আনন্দ ন স্যাৎ॥" (তৈঃ উঃ ২।৭।১)। সেই পরম তত্ত্বই রসস্বরূপ, সেই রসস্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়া জীবগণ আনন্দলাভ করেন। কেই বা শরীর ও প্রাণ চেষ্টা প্রদর্শন করিত, যদি সেই পরমতত্ত্ব আনন্দস্বরূপ না হইতেন। তিনিই সকলকে আনন্দ দান করেন। কাজেই সেই রস বা আনন্দস্বরূপ হইয়াও আজ তিনি—"লীলা কৈবল্যম্"। (ব্রঃ সূঃ ২।১।৩৩) ব্রহ্মলীলার জন্য জগৎ সৃষ্টি করিলেন এবং জগতের সেই সমস্ত আনন্দপ্রার্থী জীবসকলকে রস বা আনন্দ প্রদানের জন্য—"রসময়", "আনন্দময়" (ব্রঃ সূঃ ১।১।১২) প্রেমময়, প্রেমাস্পদরূপে পুরুষশিরোমণি লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ হইয়াছেন।

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্॥ (ভাঃ ১০।১৪ ৩২)

তিনি ক্ষর পুরুষ ও অক্ষর পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ উত্তম পুরুষ বা পুরুষোত্তম বলিয়া লোকে ও বেদে প্রসিদ্ধ। (গীঃ ১৫।১৬-১৯)। লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই পুরুষ শিরোমণি। তাঁহাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা তাঁহার সমান কোন পুরুষ নাই। (গীঃ ৭।৭)। তাঁহার লীলা-মাধুর্য্য, প্রেম-মাধুর্য্য, বেণুমাধুর্য্য ও রূপমাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া, তাঁহাকে পাইবার জন্য শ্রীদেবী বেলবনে তপস্যা করিয়াছেন। (ভাঃ)

পরমেশ্বরের একটী নাম "অচ্যুত" (শ্রীকৃষ্ণ) গীঃ ১২১। "স্বরূপ সামর্থেন ন চ্যুতো ন চ্যবতে ন চবিষ্যতে, ইত্যচ্যুতঃ শাশ্বতং শিবমচ্যুমিতি শ্রুতেরিতি।" স্বরূপ সামর্থে তিনি কখনও চ্যুত হন নাই, এখনও চ্যুত নহেন, ভবিষ্যতেও চ্যুত হইবেন না। এই নিমিত্তই তাঁহার নাম অচ্যুত। শ্রুতিতেও তাঁহাকে শাশ্বত মঙ্গলময় অচ্যুত বলা হইয়াছে। (বিষ্ণুসহস্রনাম ভাষ্য)।

পরমেশ্বর অমৃত বস্তু—"সচ্চিদানন্দাত্মকঃ কৃষ্ণঃ। কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো নশ্চ নিবৃত্তিবাচকঃ। বিষ্ণুস্তদ্ভাবযোগাচ্চ কৃষ্ণো ভবতি শাশ্বতঃ। মৃতং মরণং তদ্রহিতং বপুরস্যেতি অমৃত বপুঃ।" (বিঃ সঃ নাঃ ভাষ্য)

সাধক ধ্যান করিবে কার? ধ্যেয় বস্তুর স্বরূপ কি? তিনি কি সাকার?

কিম্বা নিরাকার? অথবা মরণশীল বস্তু? সাধকের এই সংশয় নিরাশ করিতেছেন।

"ধ্যানাচ্চ" (ব্রঃ সূঃ ৪।১।৮) ধ্যানাচ্চ-ধ্যানরূপত্ব হেতুকত্ত। উপাসনা ও ধ্যান একার্থক, উপবেশন করিয়াই ধ্যান করার বিধি শাস্ত্রে দেখা যায়, সুতরাং উপবিষ্ট হইয়াই ধ্যান বা উপাসনা করিবে।

বিবর্ত্তবাদী বা মায়াবাদী বলিতেছেন যে,—"ধ্যেয় ব্রহ্ম নিরাকার", কাজেই তাঁহার ধ্যান সম্ভব নহে। সেই কারণ সাধকের হিতের নিমিত্ত নিরাকার ব্রহ্মের একটী সাকার মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া সস্তিকাসন বা পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া পূজার্চ্চন ধ্যানাদি করা উচিত, "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপঃ কল্পনম্।" কেননা ব্যবহারিক স্তরে মায়াশক্তি বা উপাধিবিশিষ্ট ব্রহ্মই ঈশ্বর। সেই সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর অনন্তগুণবিশিষ্ট, শ্রুতিতে যেখানে সাকার ব্রহ্মের কথা আছে, তাহা উপাসনার সুবিধার জন্য কল্পিত। অনন্তগুণবিশিষ্ট যে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর তাহা মায়া বিজৃম্ভিত ; সুতরাং সৃষ্ট জগতের ন্যায় স্রষ্টা ঈশ্বরও মিথ্যা মায়ামাত্র।"

এই সূত্রটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বিপক্ষমতের উত্তরে বলা হইতেছে যে, মায়িক ঈশ্বরের ভজনদ্বারা মায়া কখনও জয় হয় না, মায়াধীশের ভজনদ্বারাই মায়া জয় করা যায়, এ কথা গীতা বলেন (গীঃ ৭।১৪)। আর কল্পিত মিথ্যাবস্তুর উপাসনাদ্বারা, কখনও সত্যবস্তু ভগবান্ শ্রীহরিকে লাভ করা যায় না, এ কথা দুগ্ধপোষ্য শিশুগণও বুঝিতে পারে। আর মায়ামুক্ত পুরুষগণ মায়িক বস্তুর উপাসনা করিবে, ইহা ত' বিকৃত মস্তিষ্কের কথা। অভক্তের নিকট তিনি চিরকালই নিরাকার। আর যিনি ভক্তিকে আশ্রয় করিয়াছেন, সেই ভক্তের নিকট তিনি ত্রিগুণাতীত সচ্চিদানন্দ শ্রীবিগ্রহরূপে নিত্যকাল প্রকাশিত। হিরণ্যকশিপুর নিকট তিনি নিরাকার, কিন্তু ভক্ত প্রহ্লাদের নিকট তিনি নিত্য সাকার। প্রহ্লাদ সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি দর্শন করিতেছেন, ইহাকে সনাতন ধর্ম্ম কহে। সনাতন ধর্ম্মে কল্পনা-জল্পনার কোন কথা নাই।

"মুক্তাশ্চ লীলয়া বিগ্রহং পরিগৃহ্য নমন্তীত্যনুষঙ্গঃ।" মুক্তগণ যদি স্বেচ্ছায় বিগ্রহ ধারণ করিয়া শ্রীভগবানকে নমস্কার বিধান অর্থাৎ ভক্তি করেন, তবে সেই অনন্ত অচিন্ত্য অতীন্দ্রিয় গুণশালী নিত্য শুদ্ধ বদ্ধ মুক্তস্বভাব সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত "ব্রহ্ম" কি করিয়া মায়া বিজৃম্ভিত পারমার্থিক সত্যসত্তাহীন বস্তু হন? আর মায়ামুক্তগণ কেনই বা মায়িক উপাধিকযুক্ত মিথ্যাবস্তুর ভজন করিবেন? মুক্তপুরুষগণের মুক্তাবস্থায় ভজনবিষয়ে বহু বেদ, উঃ, শ্রুঃ, সূত্র, সূক্ত প্রভৃতির প্রমাণ পাওয়া যায়। "মুক্তাঽপি হ্যনমুপাসতে" (সৌপর্ণ শ্রুঃ) মুক্তগণও তাঁহাকে

উপাসনা করেন। "মুক্তাঃপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে" (সর্ব্বজ্ঞ সূক্ত) মুক্তপুরুষগণও লীলায় বিগ্রহ ধারণ করিয়া ভগবানের ভজন করিয়া থাকেন।

জৈমিনি আচার্য্য বলেন,—মুক্ত জীবের যেমন মন আছে, তেমনিই শরীর ও ইন্দ্রিয়ও আছে। কারণ, শ্রুতিতে এবিষয়ে নানাপ্রকার উক্তি দেখা যায়। (ব্রঃ সূঃ ৪।৪।১১)। উড়ুলোমি আচার্য্য বলেন,—মুক্তদিগের চিন্ময় দেহ আছে, সেই দেহদ্বারা তাঁহারা ভোগ করেন, ইহাকেই মুক্তি বলা হয়। মুক্তদিগের চিন্ময় দেহের সংসারত্ব নাই। (ঐ)। বাদরি আচার্য্য বলেন—মুক্তদিগের চিন্ময়দেহ ভিন্ন অন্য দেহ নাই। (ঐ)।

"বেদান্তদর্শনের উপসংহারে দৃষ্ট হইতেছে যে—জীব মুক্তির পরে লীলাতনু বা পার্ষদতনু লাভ করিয়া রসময়, আনন্দময়, প্রেমময় ভগবান্ শ্রীহরির সেবার দ্বারা অনিমাদি ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্ত হয় এবং শ্রীহরি যে যে সুখ ভোগ করিয়া থাকেন, তাঁহার ভক্তও সেবার দ্বারা সেই সেই সুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, ইহা অতি সুস্পষ্ট। কাজেই বেদান্ত বলিতে নিরাকার ব্রহ্মে জীবাত্মার লয় কল্পনা করারূপ আত্মহত্যা মহাপাপ মানবসমাজে থাকা উচিত নহে।"

"তস্যাভিধ্যানাৎ" ধ্যানসমন্বিত অর্চ্চনাদিক্রিয়ার অভ্যাসদ্বারাই তাঁহার প্রকাশ হইয়া থাকে। বিগ্রহ ভিন্ন ধ্যান ঘটে না, তাই গোপালতাপনী শ্রুতিতে ব্রহ্মকে সৎপুণ্ডরীক নয়ন, নবনীরদবপু, বিদ্যুদ্বস্ত্র, দ্বিভুজ, বনমালা বিভূষিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঈশ্বরের দেহ-দেহীর ভিন্নতা নাই,—"দেহ-দেহী বিভেদেন নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ।" (শ্রেঃ ও পুরাণ)

'নাম', 'বিগ্রহ', 'স্বরূপ'—তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাহি—তিন চিদানন্দ-রূপ॥ (চৈঃ চঃ)

জীবকে কৃপা করিবার জন্য ভগবান্ শ্রীহরি পাঁচ প্রকারে নিত্য প্রকাশিত—পর, ব্যূহ, বৈভব, অন্তর্য্যামী ও অর্চ্চাবিগ্রহ। ১। পরাবস্থায় রাধাগোবিন্দরূপে গোলোকে বা লক্ষ্মীনারায়ণরূপে বৈকুণ্ঠে অবস্থিত। তিনি পরব্যোম নিত্যধামে অবস্থিত, আর আমরা আছি ইতরব্যোম দেবীধামে। কাজেই কি করিয়া আমরা তাঁহার কৃপা পাইব। তাই তিনি একটু বিস্তার হইলেন।

২। ব্যূহ—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। দ্বারকায় আদি চতুর্ব্ব্যূহ এবং বৈকুণ্ঠে দ্বিতীয় চতুর্ব্ব্যূহ। কিন্তু ইহারাও সেই নিত্যধামে অবস্থান করেন। তাই আমরা তাঁহার কৃপারজ্জু হাতে পাই না। সেইজন্য তিনি একটু নীচে নামিলেন।

৩। বৈভব—অবতারগণ, তিনি আমাদের উদ্ধারের জন্য যুগে যুগে অবতার হইয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলেও সকল জীবের পক্ষে তাঁহার দর্শন-স্পর্শনের সুযোগ হয় না। তাই আর একটু নীচে নামিলেন। (ক্রমশঃ)

—শ্রীজগদ্বন্ধু দাস ব্রহ্মচারী

মাৎসর্য্য

ছয় রিপুর মধ্যে মৎসরতা বা মাৎসর্য্যই সর্ব্বপ্রধান। কেহ কেহ বলেন যে,—অন্য রিপুগুলি মৎসরতার সহচর, আবার কাহারও মতে—অপর রিপুগুলি মৎসরতার অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ কায়ব্যূহ মাত্র। মৎসরতার অপগমে অন্য রিপুবর্গের নাশ হয় বলিয়া অন্য রিপুগুলি মৎসরতার সহচর। মাৎসর্য্যকে ভীষণ কালকূট-সদৃশ বিবেচনা করাই সমীচীন। রিপু অর্থে শত্রু। শত্রুর ধর্ম্মই অনিষ্টসাধন করা। কৃষ্ণবহির্ম্মুখ বদ্ধজীবের আত্মেন্দ্রিয়তর্পণপর রিপুপঞ্চক প্রবল হইয়া একত্রিত হইলে মাৎসর্য্যরূপে পরিণত হয়। মাৎসর্য্য ভক্তি বা ভজনের সর্ব্বাধিক অন্তরায় এবং ইহা চিত্তে অবস্থান করিলে শ্রীভগবানের ভজনাধিকার হইতে অবশ্যই বঞ্চিত হইতে হয়। "পরোৎকর্ষাসহনং মাৎসর্য্যম্" অপরের উৎকর্ষ সহ্য করিতে না পারা, উহা ভাল না লাগা বা মনটি বিমর্ষ হইয়া আসা—এইপ্রকার অতি হীন, সঙ্কীর্ণ বা কদর্য মনোবৃত্তির নামই 'মাৎসর্য্য'। 'উৎকর্ষ' বলিতে নিজাপেক্ষা অপরের অধিক ধন, প্রতিপত্তি, বিদ্যা প্রভৃতি থাকাকে বুঝায়। যেক্ষেত্রে নির্ম্মৎসর ব্যক্তির নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠজনে শ্রদ্ধা ভক্তি, সমজনে প্রীতি, মৈত্রী ও কনিষ্ঠজনে স্নেহ, কৃপার উদয় হইয়া থাকে, সেইক্ষণে মাৎসর্য্যপরায়ণ ব্যক্তির আপনা হইতে শ্রেষ্ঠজনের প্রতি গুণে দোষারোপ, সমজনে স্পর্দ্ধা ও কনিষ্ঠজনে ঘৃণা বা তাচ্ছিল্য প্রকাশ পাইয়া থাকে। মাৎসর্য্যপরায়ণ জনের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠাশার বা যশঃলাভের বাসনারও উদয় হয়। তাহারা 'হস্তীমূর্খের' ন্যায় নিজের শক্তি উপলব্ধি করিতে না পারিয়া নিজকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করিতে গিয়া লোকের নিকট হেয় হন। মাৎসর্য্য নামক চণ্ডালের ঔরসে এবং প্রতিষ্ঠাশা নাম্নী পিশাচীর গর্ভে হিংসা ও অসূয়া—এই যমজ সন্তানের জন্ম হয়। ইহাদের তাণ্ডবনর্ত্তনে হৃদয়ের সদ্বৃত্তিসমূহ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর প্রেমভক্তিচন্দ্রিকার 'কৃষ্ণসেবা কামার্পণে' ত্রিপদীতে যে কামক্রোধাদি ছয় রিপুকে ভজনের স্থানে স্থানে নিযুক্ত করিবার উপদেশ করিয়াছেন তাহা সত্যই অতি অপূর্ব্ব। কিন্তু তিনি ষড়্‌রিপুর অন্যতম মাৎসর্য্যকে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত বা তাহার শোধনার্থে কোন ব্যবস্থাই দিলেন না। ষড়্‌রিপুর স্থান নিরূপণের উপদেশ করিয়াও তিনি মাৎসর্য্যের ক্ষেত্রে আশ্চর্য্যরূপে নীরব থাকিলেন। কারণ, অন্যান্য কামক্রোধাদি রিপুগণ মাৎসর্য্য সংযুক্ত হইলেই তাহাদের রিপুত্ব হয়। মাৎসর্য্যবিহীন হইলে তাহারা আর রিপু না হইয়া পরমবন্ধু ও ভক্ত্যঙ্গরূপে পরিণত হয়। কাম মাৎসর্য্যযুক্ত হইলে ঘৃণিত 'কাম'

বলিয়া গণ্য হয়, আর মাৎসর্য্যবিহীন হইলে সেই কাম শ্রীভগবৎসেবায় নিযুক্ত হইবার ও ভগবৎসেবার উপযুক্ত হয়। কাম কামদেবের সেবায় লাগিয়া পরমোপাদেয় ভক্ত্যঙ্গরূপে শোভমান হয়। ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ—রিপুচতুষ্টয়ও কৃষ্ণভক্তিরসভাবিত-মতি ক্রয়ের মূল্যরূপে পরিণত হয়, যাহা কোটিজন্মার্জ্জিত সুকৃতি অপেক্ষাও সুদুর্ল্লভ ও অত্যন্ত মূল্যবান্। এইপ্রকার সকল রিপুই ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত হইলে তাহাদের মাৎসর্য্য-সঙ্গবিহীন শুদ্ধাবস্থায় পরমোপাদেয়ত্ব সাধিত হয়। তাই মাৎসর্য্য রিপুটিকে সর্ব্বপ্রথমে বিনাশ না করিলে ভজনে কোনরূপেই অধিকার লাভ করা যাইবে না।

জাগতিক ভালবাসার মূলে মৎসরতার সহচররূপে স্বার্থপরতা প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করে, তাহার প্রেরণায় নিজ ছিদ্রটীকে কেহ সহসা অন্যের নিকট স্বার্থহানির ভয়ে ব্যক্ত করিতে পারে না, মৎসরগণ ইহা বুঝিয়াও বুঝে না। মৎসরগণ যাবতীয় গর্হিত কার্য্য যেমন পরদ্রব্য অপহরণ, পরস্ত্রী হরণ, মিথ্যাভাষণ, জীবহত্যা, সাধুনিন্দা, ভগবৎবিদ্বেষ, গৃহব্রত-পালন, অসৎশাস্ত্র প্রণয়ন, কপটভক্তি প্রচার প্রভৃতি করিতে আদৌ পশ্চাৎপদ হন না, বরং তত্তৎ কার্য্যসাধনের জন্য তাহারা সতত লালায়িত থাকে ও তাহা নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইলে আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করে। ভগবৎ-সুখতাৎপর্য্যবিহীন পরশ্রীকাতরতা বা পরসুখ অসহনশীল স্বার্থপর মানবগণ স্ব-সুখবিধানার্থ হিংসাকে আশ্রয় করে। হিংসাবৃত্তি প্রকট হইলে তৎসহচর অন্য রিপুপঞ্চক একে একে মৎসরতাপূর্ণ হৃদয়ে আবির্ভূত হয় ও তাহাদের তাণ্ডব নৃত্যফলে সেই মূঢ় মানবগণ ক্রমশঃ প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে করিতে নরকাভিমুখে গমন করিতে বাধ্য হয়। নিরহঙ্কার পুরুষ-গণের পুণ্যকীর্ত্তি প্রভৃতি দর্শন করিয়া তাহাদের হৃদয় ঈর্ষানলে দগ্ধ ও ইন্দ্রিয়গ্রাম বিবশ হয়। অসুরগণ যেমন শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্যলাভে অসমর্থ হইয়া কেবল শ্রীহরির দ্বেষ করিয়া থাকে, তদ্রূপ মৎসরগণ নির্ম্মৎসরগণের ন্যায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে না পারিয়া তাহাদের বিদ্বেষ করিয়া থাকে।

প্রকৃত ব্রাহ্মণ-হৃদয়ে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেব্যরূপে সর্ব্বদা অধিষ্ঠান করায় উহাতে নিজ জড়েন্দ্রিয়-তর্পণবাঞ্ছা-জনিত মাৎসর্য্য, ঈর্ষা বা দ্বন্দ্বভাব থাকিতে পারে না। যেস্থানে তাহা বর্ত্তমান, সেস্থানে অচ্যুতাশ্রয়তার অভাবে নিশ্চয়ই "ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্‌ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ" (ভাঃ ১১।৫।৩) অর্থাৎ স্বস্থান হইতে ভ্রষ্ট বা অধঃপাত ঘটে। এই প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের জামাতা অমোঘকে বলিয়াছিলেন,—

সহজে নির্ম্মল এই 'ব্রাহ্মণ'-হৃদয়।
কৃষ্ণের বসিতে এই যোগ্যস্থান হয়॥

'মাৎসর্য্য'-চণ্ডাল কেনে ইহাঁ বসাইলে।
পরম পবিত্র স্থান অপবিত্র কৈলে॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৫।২৭৪-২৭৫)

যাহারা কৃষ্ণের কীর্ত্তন ছাড়িয়া জড়রসে মত্ত রহিয়াছেন, তাহাদের হৃদয় মৎসরতায় পরিপূর্ণ বুঝিতে হইবে। তাই জগদ্‌গুরু শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ 'মনঃশিক্ষা'তে বলিয়াছেন,—

মৎসরতা বশে, তুমি জড়রসে,
মজেছ ছাড়িয়া কীর্ত্তন সৌষ্ঠব।

যাহারা ভোগ-মোক্ষ নিরাকাঙ্ক্ষী তাহারা স্বার্থপরতার পরিবর্ত্তে পরার্থপর হন। 'পর'-শব্দে শ্রেষ্ঠ এবং শ্রীভগবানই অসমোর্দ্ধ্ব তত্ত্ব অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বস্তু। পরার্থপর ভক্তগণ ভগবৎ-সুখান্বেষী এবং নির্ম্মৎসর। তাঁহারা একমাত্র বাস্তববস্তু ভগবানকেই জীবনসর্ব্বস্ব বলিয়া জানেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ১।১।২ শ্লোকে "ধর্ম্ম প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমোনির্ম্মৎসরাণাং সতাম্" মাৎসর্য্যহীন সর্ব্বভূতে দয়াশীল সাধুগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম শুদ্ধ ভক্তিযোগ নিরূপিত হইয়াছে। ইহার অনুশীলন-ফলে ত্রিতাপ ও তাঁহার মূলকারণস্বরূপ অবিদ্যার খণ্ডনকারী পরমানন্দ-অনুভব-কারক অবিনাশী অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের অনুভব হয় এবং অচিরে অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন অনুশীলনকারীর হৃদয়ে অবরুদ্ধ হন। ভগবত্তত্ত্ব হৃদয়ে অবরুদ্ধ হইবামাত্রই তাহার সমস্ত পাপ ভস্মীভূত হইয়া যায়। যাবৎ না কাহারও হৃদয়ে শ্রীভগবান্ অবরুদ্ধ হন, তাবৎ পর্য্যন্ত স্ত্রী-পুত্রাদি সাধকের হৃদয়ে অবশ্যম্ভাবীরূপে বর্ত্তমান থাকে। সেই ব্যক্তি কখনও নির্ম্মৎসর হইতে পারে না।

নির্ম্মৎসর সাধুগণ নিজকে 'তৃণাদপি সুনীচ' মনে করেন, নিজ যোগ্যতা সর্ব্বতোভাবে ভক্ত ও ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করেন ও 'সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি মানে।' তাহাতে স্ব-সুখতৎপরতা না থাকায় উহাকে মৎসরতার অভিব্যক্তি বলা যায় না। কারণ তাহাতে ভগবৎ-সুখান্বেষণ প্রবৃত্তিই পূর্ণভাবে বিদ্যমান, তাহাতে মৎসরতার পূতিগন্ধ আদৌ থাকিতে পারে না। ভগবৎসেবার জন্য জীবের শুদ্ধস্বরূপে যে অহৈতুকী প্রবৃত্তি স্বতঃসিদ্ধরূপে সদা বর্ত্তমান আছে তাহা মৎসরতাদুষ্ট কামনার সহিত কখনই সমপর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারে না।

মাৎসর্য্যকে হৃদয় হইতে বিতাড়িত করা ব্যতীত জীবের মঙ্গলের অন্য কোন উপায় নাই। মৎসরতাকে খর্ব্ব করিতে যে-সকল সামাজিক কিম্বা নৈতিক নিয়ম বা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষপ্রাপক সকাম উপাসনার বিধি মৎসরগণ কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে তদ্দ্বারা উহার উপশম না হইয়া বরং বৃদ্ধিই সাধিত হয়। মাৎসর্য্যকে হৃদয় হইতে

দূরীভূত করিবার একমাত্র উপায়—উদারতা এবং সরলপ্রাণে সকলের প্রীতি সম্পাদন করা। কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান বুদ্ধিতে জীবমাত্রেরই প্রতি যথাযোগ্য সম্মান দান—"জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান।" অন্যাভিলাষ শূন্য হইয়া ভগবন্নামোচ্চারণ ও তাঁহার গুণকীর্ত্তন দ্বারাই মৎসরতা পরিত্যাগ করা সম্ভব। এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতে (ভাঃ ১।৬।২৭) দেবর্ষি নারদ বলিয়াছেন,—

নামান্যনন্তস্য হতত্রপঃ পঠন্ গুহ্যানি ভদ্রাণি কৃতানি চ স্মরন্।
গাং পর্য্যটংস্তুষ্টমনাঃ গতস্পৃহঃ কালং প্রতীক্ষন্নমদো বিমৎসরঃ॥

"আমি লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীঅনন্তদেবের নামসমূহ অনবরত উচ্চারণ এবং রহস্যময় শুভ ভগবল্লীলা-চেষ্টাসমূহ স্মরণ করিতে করিতে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলাম এবং সন্তুষ্টচিত্তে সকলপ্রকার বাঞ্ছা ত্যাগ করিয়া নিরহঙ্কার ও নির্ম্মৎসর হইলাম।"

ভোগ বা মোক্ষপর মানবগণ মাৎসর্য্যক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত হইয়া যে হিংসাজাল বিস্তার করে, অজ্ঞানান্ধতাবশতঃ স্বীয়বলে তাহা ছিন্ন করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। সুকৃতিবলে যাঁহারা সদ্‌গুরুর শ্রীচরণে প্রপন্ন হইয়াছেন, জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হওয়ায় কেবলমাত্র তাহারাই মাৎসর্য্যের ভীষণ আকার সন্দর্শন করিতে ও তন্নির্ম্মিত জাল ছেদন করিতে সমর্থ হন। বাস্তবিকপক্ষে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবচরণে শুদ্ধ নিষ্কপটপূর্ণ শরণাগতিই মাৎসর্য্য হইতে পরিশুদ্ধির উপায়। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবগণ কৃপা করিয়া শরণাগতকে মাৎসর্য্য রাক্ষসীর কবল হইতে উদ্ধার করিয়া কৃষ্ণসেবা করিবার দুর্ল্লভ সুযোগ প্রদান করেন। এই কলিকালে বিশ্বাসপূর্ব্বক ভক্তি-সহকারে গুরুবৈষ্ণবগণের শ্রীমুখে শ্রীচৈতন্যলীলা শ্রবণ করিলেই জীবের মাৎসর্য্য বিদূরিত হয়।

চৈতন্যচরিত শুন শ্রদ্ধা-ভক্তি করি'।
মাৎসর্য্য ছাড়িয়া মুখে বল 'হরি' 'হরি'॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৯।৩৬১)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

———

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

শুভাবির্ভাব-বাসরে দীনের

আর্ত্তি-প্রসূনাঞ্জলি

তব কৃপা বিনা প্রভো ! এ ভব-সংসার ।
অতীব দুস্তর, নাহি হ'তে পারি পার ॥
তাই তব কৃপা আমি মাগি বারে বার ।
এ ভব-সংসার হতে মোরে কর পার ॥
ওহে দয়াময় ! পরম করুণাময় ।
এ দীন দাসের প্রতি হওগো সদয় ॥
তব কৃপা হলে জীব কৃষ্ণ-কৃপা লভে ।
তব কৃপা বিনা তাহা কভু না সম্ভবে ॥
সুদুস্তর সংসার-অর্ণব পারাবারে ।
তুমি গুরু কর্ণধার ডাকি বারে বারে ॥
উত্তাল তরঙ্গ এই সমুদ্র গম্ভীর ।
তাহাতে আছয়ে কত হাঙ্গর-কুম্ভীর ॥
উদ্বেলিত উচ্ছলিত জলধি অগাধ ।
ঊর্ম্মিমালা তাহাতেই সদা সাধে বাধ ॥
কেমনে তরণী মোর পরপারে যাবে ।
বিষম সংশয় মোর মনে সদা জাগে ॥
ওহে কর্ণধার তোমা ডাকি বারে বার ।
এ ঘোর সংসার হতে মোরে কর পার ॥
জীর্ণ মোর তরী, শীর্ণ মোর চিত্ত-মন ।
নাহি মোরে শ্রীকৃষ্ণের কৃপারূপ কণ ॥
এ হেন বিপদে মোর গুরু কর্ণধার ।
কৃপা করি পার কর এ ভব সংসার ॥
জানি আমি সর্ব্বতো নাহি কৃপার যোগ্য ।
তবু কৃপা মাগি আজি সে মোর সৌভাগ্য ॥

পঙ্গু গিরি লঙ্ঘে মূক বাচালতা পায়।
সর্ব্বস্বার্থ সিদ্ধ হয় শ্রীগুরু-কৃপায়॥
এহেন গুরুর কৃপা যাঁর প্রতি হয়।
ভববন্ধ খণ্ডে তাঁর কৃষ্ণভক্তি হয়॥
বহুজন্ম অন্তে এই মানব-জনম।
লভিয়াছি পুণ্যবলে সৌভাগ্য-কারণ॥
কি কব দুর্ভাগ্য সে ভক্তিহীন জীবন।
বৃথা মাত্র বহি ফিরি ভারবাহী যেমন॥
দেহাত্ম-বুদ্ধি সে তো সদা হৃদে জাগে।
'অহং-মম'-ভাবাবলী যায় আগে ভাগে॥
'কালস্য কুটিলা গতিঃ' অতীব প্রবল।
ভক্তিপথে বিঘ্নকারী অধিক সবল॥
ভজনের অন্তরায়—যত সব ব্যাধি।
কেমনে উপেক্ষা করি তোমারে আরাধি??
সুস্থ দেহ-মন-বল ভজন-সম্বল।
যেন আরাধিতে পারি চরণকমল॥
হেন আশা করি গুরুপ্রেষ্ঠ-জনে বরি।
জন্মে জন্মে সেবি যেন গুরু-বৈষ্ণব-হরি॥
শ্রীগুরু-চরণপদ্ম হৃদে করি আশ।
শ্রীগুরু-বন্দনা করে এ অধম দাস॥

—শ্রীগৌরাঙ্গপদ ব্রহ্মচারী, কীর্ত্তন-সুধাকর

———

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৫শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৯৫ পৃষ্ঠার পর]

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতা মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥
ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য কেশবম্॥

নাম-সঙ্কীর্ত্তনের কথা বলেছেন। কিন্তু আমরা ত' এইসব **Process, Procedure** ঠিক মানতে চাচ্ছি না। উল্টোপাল্টা কথা সব আসছে আমাদের সামনে। কিন্তু শাস্ত্রে ত' কথাগুলো বলা আছে।

বেদ বিভাগ করলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। তিনি কিন্তু মানুষ নন, বিষ্ণু। কোথায় আছে? "শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ ব্যাসো নারায়ণ স্বয়ম্।" নারায়ণ এসে বেদবিভাগ করছেন। আদৌ বেদ ত' এক। পরে বেদত্রয়ী, তৎপরে চতুর্ব্বেদ—ঋক, সাম, যজু, অথর্ব্ব। বেদ বিভাগ করে দেখলেন এ কেউ বুঝবে না, কারোর মাথায় ঢুকবে না। তখন তিনি ব্যাখ্যা আরম্ভ করেছেন। উপনিষদ্—বেদের শিরোভাগ। উপনিষদ্ রচনা করতে করতে ব্যাখ্যা আরম্ভ করলেন। ব্যাখ্যা করতে করতে হয়ে গেল ১১৮০ খানা উপনিষদ্। ১১৮০ খানা উপনিষদ্ আলোচনা করা জীবনে কি সম্ভব? কেউ কি আলোচনা করবে? তাকে আবার **Minimise**—সংক্ষেপ করেছেন ১০৮ খানা। ১০৮ খানাও আলোচনা করতে পারবে না। আবার সংক্ষিপ্ত করলেন তাকে ১২ খানা। যার তালিকা—**List** দেওয়া আছে,—

ঈশ কেন কঠ প্রশ্ন মুণ্ড মাণ্ডুক্য তৈত্তিরী।
ঐতরেয়শ্চ ছান্দোগ্য বৃহদারণ্যক তথা॥

এই দশখানা এবং এর সঙ্গে শ্বেতাশ্বতর ও কৌশিতকী—এই বারখানা উপনিষদ্ যদি আলোচনা করা যায়, তাহলে বেদের অর্থ মোটামুটি বুঝা যাবে। তারপর দেখলেন এও বুঝতে পারবে না। তখন বেদান্ত দর্শন, মহাভারত, অষ্টাদশ পুরাণ, অষ্টাদশ উপপুরাণ রচনা করলেন। তাতেও তিনি সন্তুষ্ট নন। এও বুঝবে না এরা। অত্যন্ত মানসিক কষ্ট পাচ্ছেন বেদব্যাস। জীবকল্যাণের জন্য কি করা যায়? এরা ত' কিছু বুঝতে পারছে না। ঠিক সেই অবস্থায় নারদঋষির কাছে হাজির হয়েছেন বেদব্যাস। এই যে আপনি কিছুক্ষণ পূর্ব্বে বললেন,—বেদব্যাস বিষ্ণু ভগবান্, তাহলে কেন তিনি নারদঋষির কাছে যাবেন?—শাস্ত্রে যে আইন-গুলো আছে, সেই আইনগুলো ভগবান্ হলেও রেহাই নাই। তাঁকেও দেখাতে

হচ্ছে। Guardian যদি সন্তানের সামনে নীতি-আদর্শ রক্ষা না করেন, তাহলে সন্তানরা শিক্ষা পাবে না। ভগবান্ Supreme Guardian হলেও কি হবে, তাঁকেও খাটতে হচ্ছে, কষ্টকর পরিশ্রম স্বীকার করতে হচ্ছে। গীতায় কি বললেন কৃষ্ণ ?—

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥

আমি যদি কর্ম্ম না করি, তাহলে এ জগৎ উচ্ছন্নে যাবে, কেউ কিছুই বুঝবে না, কেউ কিছুই করবে না। তাহলে Guardianকেও খাটতে হয়। তা ভগবান্ Supreme Guardian হলেও তাঁকে কষ্টকর পরিশ্রম করতে হচ্ছে লোকশিক্ষার জন্য।

আজকাল সমাজে আমরা বহু উল্টোপাল্টা কথা শুনতে পাচ্ছি। কেউ বলছেন —কর্ম্মই ধর্ম্ম। ভাল কথা, কথাটা কিন্তু ভুল নয়। সুদূরপ্রসারী তার ব্যাখ্যা। কেবল কথাটা বলে শেষ করলে হবে না, তার ব্যাখ্যা চাই। সব কর্ম্মই কি ধর্ম্ম হবে? চোর চুরি করে, তা ত' একটা কর্ম্ম। সে মনে করছে চুরি করে আমি বড়লোক হব, চুরি করে আমি বাঁচব। এটাকে কি ধর্ম্ম বলে মানা হবে? আর একজন সাধু তিনি বলছেন যে,—আমি নীতি-আদর্শ পালন করে জীবিকা নির্ব্বাহ করব, জীবনযাপন করব। এই দুটো নীতি-আদর্শ কোথায় এসে মিলছে? ব্যাখ্যাটা কি হবে? তাহলে চোরের ধর্ম্ম আর সাধুর ধর্ম্ম দুটো এক ত'? যারা ব্যাখ্যাদাতা তাদের কাছে ব্যাখ্যা চাওয়া হোক। যুক্তি দিয়ে যখন কথা বলা হবে তখন সব কর্ম্মই ধর্ম্ম তা ত' কেউ মানবেন না। অথচ বলা হচ্ছে কর্ম্মই ধর্ম্ম! সঙ্গে সঙ্গে ব্যাখ্যা দেওয়া হোক কোন্ কর্ম্ম ধর্ম্ম। সেটারও ত' চাই ব্যাখ্যা। গীতার মধ্যে ব্যাখ্যা দেওয়া আছে।—

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥

'যজ্ঞ' মানে 'বিষ্ণু ভগবান্'। তাঁর প্রীতিকামনায় ধর্ম্মাচরণ কর। সেটাই হল বাস্তব কর্ম্ম, সেটাই হল বাস্তব ধর্ম্ম, সেটাই হল বাস্তব ভক্তি। 'অন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ'—যদি ভগবানের প্রীতিকামনায় সংসারে কর্ম্মাচরণ না কর, তাহলে তোমাকে বদ্ধদশা আরও বেশী চেপে বসবে। ভয়ঙ্কর কথা! তাহলে ঐ কর্ম্ম করে তোমাকে আরও বেশী বন্ধনের মধ্যে পড়তে হবে। সেটা কি ব্যাপার? ভাগবতের মধ্যে উদাহরণ দিয়েছেন,—

মাকড়সা গৃহস্থের ঘরের কোণায় কোণায় জাল তৈরী করে তার থুথু (লালা)

থেকে সুতা বের করে। তাতে মাকড়সা কিন্তু বদ্ধ হয় না, অন্যান্য পোকামাকড়-গুলো ধরা পড়ে। এই মাকড়সা জাতীয় যারা তারা কারা?—তাঁরা হলেন মুক্তজীব। তাঁরা সংসারে থেকেও সংসারের কালিমা তাঁদের স্পর্শ করে না। আর একরকম পোকা আছে, সেও তার থুথু (লালা) থেকে সুতা বের করে গুটী তৈরী করে। শেষে তার মধ্যে সে জড়িয়ে পড়ে। পরে তাকে সেদ্ধ করে মারা হয়। তার নাম হল পেশস্কৃৎ কীট বা গুটীপোকা। এক কর্ম্ম করে একজন মুক্ত, আর এক কর্ম্ম করে একজন বদ্ধ এবং তার জীবন শেষ। তাহলে সব কর্ম্মের ফল কি এক হবে, না সব কর্ম্ম এক হবে?—না, তা হবে না। এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন গীতায়। অর্জ্জুনকে বলছেন কৃষ্ণ—এই রকম ধরণের কর্ম্ম কর, তাহলে তোমার উদ্ধার। সবটাকে Hotchpotch—জগাখিচুড়ি পাকিয়ে ফেললে হবে না। সব সমান একথা বললে হবে না। চোর আর সাধুর বৃত্তি যখন সমান হচ্ছে না, সদসৎ বৃত্তি যখন সমান হচ্ছে না, তাহলে সব সমান বলবে কি করে? কেউ কি প্রমাণ করতে পারেন সব সমান?

আজকাল সব সমানের বাজার পড়েছে, কথায় কথায় সকলের মুখে শুনি সব সমান। ক্লাস থ্রী আর ক্লাস ফোর কি সমান, ক্লাস ফোর যা ক্লাস টেন্ তাই কি? জিজ্ঞাসা করি আমি। শ্রেণীহীন সমাজ, বড় বড় কথা সব রাজনৈতিক দলগুলো বলছে। আমি তাদের কাছে ব্যাখ্যা চাই—ব্যাখ্যা করুন আপনারা শ্রেণীহীন সমাজ কাকে বলে? কথাটা কি রকম?—'সোনার পাথরবাটী'! হয় সোনার বাটী বলুন, নয় পাথরবাটী বলুন। সোনার পাথরবাটী আবার কি? কেউ বলছেন কাঁঠালের আমসত্ব। কাঁঠালের আমসত্ব আবার কি? হয় কাঁঠালের সত্ব বলুন, নতুবা আমের সত্ব বলুন। যত সব বাজে কথা। এর কি কোন অর্থ হয়? বর্ত্তমান বাজারে এইসব চলছে। এখানে উপাস্য নির্ণয় নাই, উপাসনা নির্ণয় নাই। কি করে কি হবে? আবার ধর্ম্মজগতের যেটা সব থেকে ভাল কথা সেগুলোও তারা বলছেন।

এক জায়গায় একজন রাজনৈতিক নেতা বক্তৃতা করছিলেন। বক্তৃতার শেষে যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করে বললাম যে, আপনি এখনই বললেন সাম্য, স্বাধীনতা, মৈত্রীর কথা। একথা কোথায় পেলেন? একথা কি আপনার রাজনীতির মধ্যে আছে? চুপ করে থাকলেন। আমি বললাম, চুপ করে থাকলেন কেন, উত্তর দিন। আপনি যে সাম্য, স্বাধীনতা, মৈত্রীর কথা বললেন, ওটা কি আপনাদের বলবার অধিকার আছে?—নাই, রাজনীতিতে ওকথা নাই। তাহলে কথাটা কোথা থেকে এল?—শাস্ত্র থেকে এল, ঋষিগণের বিচারে এল, ভগবান্

বলেছেন। সাম্যবাদ কি করে আমি করব? আমি সকলকে সমানভাবে দেখব এটা কিভাবে হবে? মূর্খ ও পণ্ডিত—দুজনকে এক বলব? ধনী-গরীব—দুজনকে কি এক বলব? চোর আর সাধু—দুজনকে কি এক বলব? কিভাবে আমি সাম্যবাদ স্থাপন করব? এসব কথাগুলোর রাজনীতিবিদরা উত্তর দিতে পারছেন না। এই সাম্য, স্বাধীনতা, মৈত্রী কথা তিনটে আত্মধর্ম্ম থেকে এসেছে। কেবল-মাত্র আত্মধর্ম্মে সাম্যবাদ, অন্য কোনভাবে সাম্যবাদ আসতে পারে না, হতে পারে না। রাজনীতির ক্ষেত্রে বলছেন—Equal distribution, Co-existence, করছেন কি আপনারা? যে পার্টির লোক সেই পার্টির লোককেই সাহায্য দেওয়া হচ্ছে, অন্যরা বঞ্চিত হবে। তাহলে কি করে প্রমাণ হবে? আত্মকেন্দ্রিক কথাগুলো। আত্মার স্বরূপ বিচার করে কথাগুলো বলা হয়েছে। প্রত্যেক শরীরে জীবাত্মার অধিষ্ঠান। এইখানে সাম্যবাদের কথা এসেছে। ওটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন না ত' কেউ। অথচ কথাগুলো বাজারে খুব চলছে। তাহলে কি করব আমরা? সময় ত' আমাদের খুব কম। 'Time is short art is long'—একথা ত' সব দেশে আছে। আমাদের সনাতন শাস্ত্রেও কথাটা বুঝানো আছে। 'অনন্তপারং কিল শব্দশাস্ত্রম্'।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস এত শাস্ত্র প্রণয়ন করলেন, বেদ বিভাগ করলেন, কিন্তু মনে শান্তি পাচ্ছেন না তিনি। শেষকালে নারদ ঋষির কাছে গিয়ে হাজির। কে তিনি?—ভগবান্। ভগবানের কি যত দায় পড়েছে? উপরওয়ালা Guardian ত' তিনি, তাই তাঁর চিন্তা-ভাবনা বেশী। এখানকার Guardian যাঁরা—মা, বাবা—তাঁরা হলেন Whole time nearest guardian। তারপর পিতৃপুরুষগণকে, স্কুল-কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বলা হয়েছে Part time guardian। Spiritual side এ মুনি-ঋষিগণকে বলা হয়েছে Part time spiritual guardian। আর ভগবানকে কি বলা হয়েছে?—ভগবানকে বলা হয়েছে Whole time spiritual guardian। শাস্ত্রে এগুলো সুন্দরভাবে বুঝানো আছে। আমি ত' কোন Guardian-কে অস্বীকার করতে পারি না। না পারি বাবা-মাকে অস্বীকার করতে, না পারি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অস্বীকার করতে, না পারি সাধু-গুরু-বৈষ্ণবগণকে অস্বীকার করতে, না পারি ভগবানকে অস্বীকার করতে। সবাইকে মেনে নিতে হচ্ছে যাঁর যেমন Portfolio।

কৃষ্ণভজন যিনি করেন, তিনি কি কোন দেবদেবীকে অবজ্ঞা করেন? আজ এ নিয়ে ভয়ঙ্কর গণ্ডগোল সমাজে, ধর্ম্মজগতে। এক দল আর এক দলকে বলছেন—ওরা কিছু মানেন না, ওরা কিছু মানেন না। কিন্তু যারা কিছু বোঝেন না,

তারা ওকথা বলেন। আর য'রা বোঝেন জিনিসটা তারা প্রতিবাদ করতে যাচ্ছেন না, কারণ তারা মনে করেন ওদের মগজে কিছু ঢোকে না।

গ্রীষ্মের দারুণ নিদাঘ, প্রচণ্ড গরম। গাছপালা সব জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে। সেই সময় যদি একটু জল নিয়ে পাতায় পাতায় ছিটিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে গাছটা বাঁচবে ত' ?—বাঁচবে না। তাহলে কি করতে হবে ?—গাছের গোড়ায় (মূলে) জল ঢালতে হবে, পাতায় পাতায় না ছিটালেও হবে। জিনিসটা ভাগবতে বুঝানো আছে।

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথাচ সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥

উদাহরণ দিয়ে বুঝানো হল—গাছের গোড়ায় জল ঢালতে হবে, তাহলে গাছ বাঁচবে গরমের সময়। তা না হলে জ্বলে-পুড়ে শেষ হয়ে যাবে।

"মূলেতে সিঞ্চিলে জল, শাখা-পল্লবের বল,
শিরে বারি নহে কার্য্যকর ॥"

এখন এই গোড়াটা (মূল) কে ? আপনারা ত' গীতা পড়েন। "ঊর্দ্ধমূলমধঃ-শাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্। ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥"—এই যে শ্লোক রয়েছে, সেখানে মূল কে ?—স্বয়ং ভগবান্। তাহলে কেন খাটতে যাব। কিন্তু কিছু লোকের ধারণা কি জানেন ?—তাঁরা মনে করেন কি জানি কোন্ দেবদেবী অসন্তুষ্ট হয়ে যাবেন, সেজন্য সকলের পায়েতে একটু ফুল-চন্দন দিয়ে রাখি। এটা ত' সন্দেহবাদের কথা। ভগবান্ যার দিকে আছেন, তার বিরোধী কি কেউ আছে ?—কেউ নাই, আইনতঃ হতে পারে না। মালিক যেদিকে, সেইদিকেরই জয় হবে। গীতায় আছে, অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র প্রশ্ন করেছেন সঞ্জয়ের কাছে —এই যে যুদ্ধ হতে চলেছে, এতে কোন্ দলের জয় হবে ? সঞ্জয়ের উত্তরটা কি এসেছে গীতার শেষের দিকে ?—

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতিধ্রুবা নীতির্মতির্ম্মম ॥

যে দলে ভগবান্ কৃষ্ণ আছেন, যে দলে ধনুর্দ্ধর পার্থ (অর্জ্জুন) আছেন, সেই দলের জয় হবে। "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ।" এগুলো ত' সবাই বুঝতে পারি আমরা কম-বেশী। অথচ কাজের বেলায় বুঝতে চাচ্ছি না। যখন ক্ষেত্র উপস্থিত হচ্ছে তখন সব fail করে বসে আছি আমরা। তাহলে কি হবে ? সময় আমাদের খুব কম। ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকাতে হচ্ছে, কিন্তু করবার, বুঝবার অনেক কিছু আছে। কি করব তাহলে ?—মূলেতে জল সিঞ্চন করতে হবে। ক্ষুধা

লেগেছে, তখন কি করব ? একটা বোকা লোক কয়েকটা ভাত নিয়ে কানে, নাকে, চোখে গুজে দিচ্ছে, ক্ষুন্নিবৃত্তি হবে ত' ? ক্ষুধার শান্তি হবে ত' ? সবাই ত' বললেন না, না। কিন্তু করছে ত' আজকালকার দুনিয়ায়। বোকা ত' ! মুখে আহার দিলে কিন্তু সব ঠিক আছে। বুঝি না আমরা। Eshops Fables এর মত বাংলাতেও গল্প আছে।—

এক সময় সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ Strike করল মুখের বিরুদ্ধে। বলল—মুখ ব্যাটা কেবল বসে বসে খাবে, আর আমরা খেটে খেটে মরব। হবে না তা। কর Strike। শেষকালে তারা ত' কেঁদে মরে আর কি। মুখে আহার নেই ত' সব ইন্দ্রিয়গুলি চুঁই চুঁই করছে। কলিকালের লোক আমরা, অন্নগত প্রাণ। তাহলে কে কাকে জব্দ করবে ? সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ জব্দ হয়ে গেল মুখে আহার দিচ্ছে না বলে। "প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথাচ সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥" তাহলে কি করব ?—যেখানে দরকার সেইখানেই কাজটা সারতে হবে। গণ্ডগোল করলে হবে না। সময় খুব কম। শাস্ত্র আলোচনা করলে মোটামুটি সব বুঝতে পারা যাবে। তাও নিজেরা পড়ে সব বুঝতে পারা যায় না। কেন ? মাষ্টার মশায়রা বসে আছেন কিজন্য ?—ছেলেমেয়েদের বুঝাবার জন্য স্কুল-কলেজে বসে আছেন। শিক্ষক-শিক্ষিকা না হলে চলবে না। Spiritual sideএ ঠিক একই কথা। সেখানেও একই রকম ধরণের Spiritual guardian এর প্রয়োজন হচ্ছে। যাঁর নাম সদ্‌গুরু। সদ্‌গুরুর প্রয়োজন আছে শিখাবার জন্য। উদাহরণটা এক।

অনন্ত যদি শাস্ত্র হয়, 'স্বল্পং তথায়ুঃ' আয়ু আমাদের খুব কম। কে কতদিন বাঁচব আমরা তার কোন Guarantee নাই। অহঙ্কার কিন্তু পুরা—আমি এতদিন বাঁচব। হঠাৎ একটা Accident হয়ে গেল, সব শেষ। যত আশা-ভরসা ছিল সব শেষ। তাহলে আমার আশা-আকাঙ্ক্ষা কোথায় গেল ? নিশ্বাসে নাহি বিশ্বাস। বহু কবির কথার মধ্যে উল্টোপাল্টা কতকগুলো কথা আছে আমরা শুনতে পাই। অনেকে উল্টোপাল্টা ব্যাখ্যাও দেন। "মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।" আবার কোন কবি বলছেন,—"মরণরে তুহু মোর শ্যাম সমান।" আবার একজন কবি বলছেন—"এই মাত্র ভিক্ষা দাও হরি। আজ যেন একেবারে মরি॥" দুঃখের কথা ! আছে ত' অনেক কথা, কিন্তু আমি কোন্ বিচারটা নিয়ে চলব ? আমার জন্য কতটুকু ? সেইখানে বলছেন,—তোমার যখন পরমায়ু খুব অল্প, তখন সংক্ষিপ্ত ব্যবস্থা নাও। আবার এর ভিতরে 'বহবশ্চ বিঘ্নাঃ'—বাধা-বিপত্তি আমাদের জীবনে কম নয়। আবার বাধা-বিপত্তি কোথায়

বেশী হয় ?—'শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নাঃ'। যখন আমি আত্মকল্যাণসূচক ব্যবস্থা নিতে যাই, তখন যেন বাধার পর বাধা। অন্য সময় বোধ হয় বাধা-বিপত্তি কম। আর যখন ধর্ম্মযাজন করতে যাই, তখন বাধার পর বাধা। এটা কি ব্যাপার ?—ভগবানের পরীক্ষা। এতে ঘাবড়ে যেতে নাই। কিসের পরীক্ষা ?—ধৈর্য্য-স্থৈর্য্যের পরীক্ষা। ধৈর্য্য-স্থৈর্য্যের পরীক্ষায় আমরা পাস করব, না ফেল করব ? পাস ত' করতেই হবে। সব সময় আমরা জপ করছি—আমি বোধ হয় ফেল করব, আমি বোধ হয় ফেল করব। ফেল করে বসে আছি। শাস্ত্র শিখাচ্ছেন—তুমি ফেল করবে এটা, জপ করবে না। আমি সবসময় পাস করব, আমি সবসময় পাস করব—এটা মনে করবে, তাহলে ঠিক পাস করবে। ধৈর্য্য রাখবে, অধ্যবসায় রাখবে তাহলে তুমি নিশ্চয় পাস করবে।

বাধা-বিপত্তি অনেক, তাহলে কি করব ?—'সারং ততো গ্রাহ্যম্।' সময় যখন খুব কম, তখন সারসঙ্কলন করতে হবে আমাকে। আবার এমন সারসঙ্কলন করতে গেলাম যে তাতে কিছু হল না—এরূপ যেন না হয়। ফাঁকি দিয়ে পরীক্ষায় পাস করার Sugession, Made Easy প্রভৃতি কত কি বেরিয়েছে বাজারে। মূল বই পড়ল না ছাত্রছাত্রীরা। এইসব বই পড়ে কোনরকমে পাস করে, ফলে পূর্ণজ্ঞান হয় না। সারসঙ্কলন মানে মূল বিষয়বস্তু ঠিক রেখে তত্ত্বালোচনা।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত হইয়াছে
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামি-বিরচিত
'মায়াবাদের জীবনী'র ইংরাজী সংস্করণ

LIFE STORY
OF IMPERSONALISM (MAYAVAD)
OR
VICTORY OF VAISHNAVISM
(VAISHNAVA VIJAYA)

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।	অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥	হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪৫শ বর্ষ | ১৭ মাধব, বাসুদেব, ৫০৭ শ্রীগৌরাব্দ | ১২শ সংখ্যা
৩০ মাঘ, রবিবার, ১৪০০, ইং ১৩/২/৯৪

সানুবাদং

শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনাষ্টকম্

[শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

শ্রীগোবর্দ্ধনায় নমঃ

নীলস্তম্ভোজ্জ্বল-রুচিভরৈর্মণ্ডিতে বাহুদণ্ডে
চ্ছত্রচ্ছায়াং দধদঘরিপোর্লব্ধ-সপ্তাহবাসঃ।
ধারাপাত-গ্লপিতমনসাং রক্ষিতা গোকুলানাং
কৃষ্ণপ্রেয়ান্ প্রথয়তু সদা শর্ম্ম গোবর্দ্ধনো নঃ॥ ১॥

নীল-স্তম্ভের ন্যায় উজ্জ্বল কান্তি-মণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণের ভুজদণ্ডে যিনি ছত্রশোভা ধারণ করিয়া ছিলেন, এবং ঐ অঘাসুর-হন্তার হস্তে যিনি সপ্তাহকাল বাস করিয়াছিলেন, মেঘবৃন্দের অবিরল বারিবর্ষণে ব্যাকুলিত গোকুল ও গোপকুলের রক্ষক সেই গিরিরাজ গোবর্দ্ধন সর্ব্বদা আমাদিগের মঙ্গল বিস্তার করুন॥ ১॥

ভীতো যস্মাদ্‌পরিগণয়ন্ বান্ধব-স্নেহবন্ধান্
সিন্ধাবদ্রিস্তরিতমবিশৎ পার্ব্বতী-পূর্ব্বজোঽপি।
যস্তং জম্ভদ্বিষমকুরুত স্তম্ভ-সংভেদশূন্যং
স প্রৌঢ়াত্মা প্রথয়তু সদা শর্ম্ম গোবর্দ্ধনো নঃ ॥ ২ ॥

পার্ব্বতীপূর্ব্বজ মৈনাক-পর্ব্বতও যে ইন্দ্র হইতে অত্যন্ত ভীত হইয়া স্বীয় বান্ধব-গণের স্নেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক শীঘ্র সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছেন, সেই জম্ভশত্রু ইন্দ্রেরও যিনি গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছেন, সেই প্রগল্‌ভচেতা গোবর্দ্ধন আমাদিগের কুশল বিস্তার করুন ॥ ২ ॥

আবিষ্কৃত্য প্রকট-মুকুটাটোপমঙ্গঃ স্থবীয়ঃ
শৈলোঽস্মীতি স্ফুটমভিদধত্তুষ্টি-বিস্ফারদৃষ্টিঃ।
যস্মৈ কৃষ্ণঃ স্বয়মরসয়দ্বল্লবৈর্দত্তমন্নং
ধন্যঃ সোঽয়ং প্রথয়তু সদা শর্ম্ম গোবর্দ্ধনো নঃ ॥ ৩ ॥

অহঙ্কারযুক্ত অতি স্থূলতর কায় বিস্তার করিয়া "আমি শৈলরাজ গোবর্দ্ধন"—ইহা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে পর্ব্বতরাজের প্রতি গোপ-গোপীগণ-কর্ত্তৃক প্রদত্ত চতুর্ব্বিধ অন্ন ভোজন করিয়াছিলেন, সেই ধন্যতম গিরিবর গোবর্দ্ধন সদা আমাদিগকে মঙ্গল বিস্তার করুন ॥ ৩ ॥

অদ্যাপূর্জ্জ-প্রতিপদি মহান্ ভ্রাজতে যস্য যজ্ঞঃ
কৃষ্ণোপজ্ঞং জগতি সুরভি-সৈরিভী-ক্রীড়য়াঢ্যঃ।
শস্পালম্বোত্তম-তটতয়া যঃ কুটুম্বং পশূনাং
সোঽয়ং ভূয়ঃ প্রথয়তু সদা শর্ম্ম গোবর্দ্ধনো নঃ ॥ ৪ ॥

অদ্যাবধি কার্ত্তিকমাসের প্রতিপৎ-তিথিতে যাঁহার শ্রীকৃষ্ণ-প্রকটিত অন্নযজ্ঞ হইয়া থাকে এবং গৃহপালিত গো-মহিষাদি যাঁহাতে ক্রীড়া করে, বহু নির্ঝর-বারি-সিঞ্চনোৎপন্ন অভিনব তৃণ ধারণবশতঃ যিনি পশুগণের কুটুম্ব-স্বরূপ হইয়াছেন, সেই গোবর্দ্ধনগিরি আমাদের মঙ্গল আবিষ্কার করুন ॥ ৪ ॥

শ্রীগান্ধর্ব্বা-দয়িতসরসী-পদ্মসৌরভ্য-রত্নং
হৃত্বা শঙ্কোৎকরপরবশৈরস্বনং সঞ্চরদ্ভিঃ।
অন্তঃক্ষোদ-প্রহরিককুলেনাকুলেনানুযাতৈ-
র্বাতৈর্জুষ্টঃ প্রথয়তু সদা শর্ম্ম গোবর্দ্ধনো নঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের পদ্ম-সৌরভরূপ রত্ন অপহরণের নিমিত্ত যিনি অত্যন্ত শঙ্কাকুল, অতএব নিঃশব্দ এবং বারিবিন্দু-স্বরূপ প্রহরিগণ-কর্ত্তৃক অনুধাবিত

অর্থাৎ স্নিগ্ধ সুশীতল পবন-পরিসেবিত, সেই গোবর্দ্ধন সর্ব্বদা আমাদিগের মঙ্গল বিস্তার করুন ॥ ৫ ।

কংসারাতেস্তরিবিলসিতৈরাতরানঙ্গ-রঙ্গৈ-
রাভীরীণাং প্রণয়মভিতঃ পাত্রমুন্মীলয়ন্ত্যাঃ ।
ধৌত-গ্রাবাবলিরমলিনৈর্মানসামর্ত্ত্যসিন্ধো-
র্বীচিত্রাতৈঃ প্রথয়তু সদা শর্ম্ম গোবর্দ্ধনো নঃ ॥ ৬ ॥

যাঁহার তরঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের নিকট নাবিক হইয়া নৌকা-পণ গ্রহণ করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ-সমর্পিতাত্মা আভীরীদিগের প্রণয়বর্দ্ধনকারিণী সেই মানসী-গঙ্গার তরঙ্গমালায় যাঁহার শীলাসমূহ ক্ষালিত হইতেছে, সেই গিরিরাজ আমাদের কল্যাণ বিস্তার করুন ॥ ৬ ॥

যস্যাধ্যক্ষঃ সকল-হঠিনাঃ নাদদে চক্রবর্ত্তী
শুল্কং নান্যদ্ব্রজমৃগদৃশামর্পণাদ্বিগ্রহস্য ।
ঘট্টস্যোচ্চৈর্মধুকররুচস্তস্য ধাম-প্রপঞ্চৈঃ
শ্যামপ্রস্থঃ প্রথয়তু সদা শর্ম্ম গোবর্দ্ধনো নঃ ॥ ৭ ॥

মরকত শিলা-নির্ম্মিত ঘট্টপ্রদেশের কান্তিতে যাঁহার সানুদেশ শ্যামবর্ণ হইয়াছে এবং সকল ঘট্টস্থিত জনগণের অধ্যক্ষ শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার ঘট্টের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নায়ক হইয়া গোপীগণের দেহার্পণ ভিন্ন অন্য কোন পণ গ্রহণ করেন নাই, সেই গোবর্দ্ধনগিরি সদা আমাদিগের মঙ্গল বিস্তার করুন ॥ ৭ ॥

গান্ধর্ব্বায়াঃ সুরত-কলহোদ্দামতা বাবদূকৈঃ
ক্লান্ত-শ্রোত্রোৎপল-বলয়িভিঃ ক্ষিপ্ত-পিঞ্ছাবতংসৈঃ ।
কুঞ্জৈস্তল্পোপরি পরিলুঠদ্বৈজয়ন্তী-পরীতৈঃ
পুণ্যাঙ্গশ্রীঃ প্রথয়তু সদা শর্ম্ম গোবর্দ্ধনো নঃ ॥ ৮ ॥

যে কুঞ্জে কর্ণোৎপল ম্লান হইয়া পতিত রহিয়াছে এবং মৃণাল-বলয়, ময়ূরপুচ্ছ-নির্ম্মিত কর্ণভূষণ যে-স্থানে পতিত এবং শয্যোপরি বৈজয়ন্তী-মালাও বিলুণ্ঠিত, শ্রীরাধার প্রণয়-মাধুর্য্য প্রকাশকারী সেই কুঞ্জসমূহে যাঁহার মনোহর শোভা হইয়াছে, সেই গিরিবর গোবর্দ্ধন আমাদিগের মঙ্গল বিস্তার করুন ॥ ৮ ॥

যস্তুষ্টাত্মা স্ফুটমনুপঠেচ্ছুদ্ধয়া শুদ্ধয়ান্ত-
র্মেধ্যঃ পদ্যাষ্টকমচটুলঃ সুষ্ঠু গোবর্দ্ধনস্য ।
সান্দ্রং গোবর্দ্ধনধর-পদদ্বন্দ্বশোণারবিন্দে
বিন্দন্ প্রেমোৎকরমিহ করোত্যদ্রিরাজে স বাসম্ ॥ ৯ ॥

যিনি শুদ্ধান্তঃকরণ ও সুদৃঢ় শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া শ্রীগোবর্দ্ধনের এই মনোহর পদ্যাষ্টক পাঠ করেন, তিনি শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্মযুগলে গাঢ়তর প্রেমভক্তি লাভ করিয়া গোবর্দ্ধন-গিরিতে বাস করেন ॥ ৯ ॥

প্রশ্নোত্তর

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৫শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪০৮ পৃষ্ঠার পর]

২৬। স্বতন্ত্রতাই যখন অসুবিধা-জনক, তখন জীবকে পরমেশ্বর স্বতন্ত্রতা দান করিলেন কেন ?

'স্বতন্ত্রতা' একটী রত্নবিশেষ। * * জীবকে যদি স্বতন্ত্রতা না দেওয়া হইত, তাহা হইলে জীব জড়বস্তুর ন্যায় হেয় ও তুচ্ছ হইত।" —জৈঃ ধঃ ১৬শ অঃ

২৭। জীব যে স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিয়া থাকে, তজ্জন্য কি পরমেশ্বর দোষী ?

"স্বাধীনতার অসদ্ব্যবহারে জীবের যে কষ্ট, তাহা ঈশ্বর-দত্ত বলা যায় না এবং ঈশ্বরকে তজ্জন্য কোনপ্রকার দোষ দেওয়া যায় না। বিধিলঙ্ঘনের দ্বারা যে ক্লেশ পাইতে হয়, তজ্জন্য বিধাতা কখনই দোষী নহেন। বিধাতা যদি জীবকে ঐ অনর্থ-গ্রহণে বাধ্য করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার বৈষম্য দোষ হইত। জীব যদি নিজ-স্বাধীনতার দ্বারা স্বীয় পরানুরাগকে আরও দৃঢ় করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার উৎকর্ষ হইত; কিন্তু স্বাধীনতা না পাইলে তাঁহার উৎকর্ষের উপর কোন অধিকার হইত না। পরমেশ্বর জীবকে এরূপ অপূর্ব্ব স্বাধীনতা দেওয়ায় জীবের প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাই বলিতে হইবে। স্বাধীনতার অসদ্ব্যবহারে যে পতন দৃষ্ট হয়, তাহা কেবল জীবকে সংস্কার করত উদ্ধার করিবার জন্যই হইয়াছে, বলিতে হইবে।" —তঃ সূঃ, ২০ সূঃ

২৮। তটস্থ-স্বভাব কাহাকে বলে ?

"তট' জলের জোরে কাটিয়া গিয়া নদী হয়, আবার ভূমির দৃঢ়তা লাভ করিলে ভূমি হইয়া পড়ে। জীব যদি কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টি করেন, তবে তিনি কৃষ্ণশক্তিতে দৃঢ় হন; যদি মায়ার প্রতি দৃষ্টি করেন, তবে কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হইয়া মায়ার জালে পড়িয়া আবদ্ধ হন। এই স্বভাবই 'তটস্থ-স্বভাব'।" —জৈঃ ধঃ ১৫শ অঃ

২৯। জীব ও পরমেশ্বর কি কখনও এক হইতে পারে ?

"মায়াধীশ ঈশ্বর মায়াদ্বারা এই জড়বিশ্ব সৃজন করিয়াছেন। সেই জড়-বিশ্বে ঈশ্বর হইতে ভিন্ন জীব-নামক একটী তত্ত্ব মায়াকর্ত্তৃক আবদ্ধ হইয়াছেন। মায়া—একটী পরমেশ্বরের শক্তি এবং মায়াধীশ পুরুষই—পরমেশ্বর। এবম্ভূত জীব কোন অবস্থাতেই ঈশ্বরের সহিত অভেদ নহে।"　　—শ্রীমঃ শিঃ ৬ষ্ঠ পঃ

৩০। ভগবানের অংশ কয় প্রকার?

"ভগবানের অংশ দুই প্রকার অর্থাৎ স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ। চতুর্ব্যূহ অবতারগণ—সকলেই স্বাংশ-বিস্তার। জীবই—বিভিন্নাংশ। স্বাংশ ও বিভিন্নাংশে ভেদ এই যে, স্বাংশগণ কৃষ্ণতত্ত্বের সহিত অভিন্ন অভিমানে সর্ব্বদা সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন এবং কৃষ্ণেচ্ছাতেই তাঁহাদের ইচ্ছা, কোন স্বতন্ত্রতা নাই। বিভিন্নাংশগণ কৃষ্ণতত্ত্ব হইতে নিত্য ভিন্নাভিমানী, স্বীয় ক্ষুদ্র স্বরূপানুসারে অতিশয় ক্ষুদ্রশক্তি-বিশিষ্ট এবং কৃষ্ণেচ্ছা হইতে তাহাদের ইচ্ছা পৃথক্।"　　—শ্রীমঃ শিঃ ৬ষ্ঠ পঃ

৩১। পরমেশ্বরের অংশ বলিতে কি বুঝায়?

"ঈশ্বর অবিভাজ্য চিদ্বস্তু, অতএব কাষ্ঠ-পাষাণের ন্যায় খণ্ড খণ্ড করিয়া তাঁহাকে 'অংশ' করা যায় না। সেরূপ অংশ হইলে মূল বস্তুই খর্ব্ব হয়। অতএব এক দীপ হইতে বহু দীপ যেরূপ জ্বালিত হয়, সেরূপ উপমার অংশ কথঞ্চিৎ স্বীকার করা যায়। জড়ীয় দৃষ্টান্ত সম্যক্ হয় না। চিন্তামণি নিজে অবিকৃত থাকিয়া যেরূপ স্বর্ণ প্রসব করে, সেরূপ দৃষ্টান্তও আংশিক-মাত্র। ঈশ্বরের অংশ দুই প্রকার,—এক প্রকার অংশের নাম—স্বাংশ এবং অন্যপ্রকার অংশের নাম—বিভিন্নাংশ। স্বাংশ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, মহাদীপ হইতে অন্য মহাদীপ উৎপন্ন হইয়া পূর্ব্ব-মহাদীপের সর্ব্বপ্রকার শক্তি প্রাপ্ত হয়, তথাপি পূর্ব্ব-দীপ পূর্ণরূপে থাকে। এই স্বাংশ-লক্ষণ পুরুষাবতার ও লীলাবতারে আছে। বিভিন্নাংশ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, চিন্তামণি হইতে যে ক্ষুদ্র মণি ও স্বর্ণ হয়, তাহা চিন্তামণির মহাশক্তি প্রাপ্ত হয় না, কিছু কিছু তদ্ধর্ম্ম অণু-অংশে প্রকাশ পায়। ব্রহ্মাদি সকল জীব ইহার কার্য্যে উৎপন্ন হইয়া চিন্তামণির অনুগত না থাকিলে বিকৃত হয়, স্ব-স্ব কার্য্যের দায়িত্ব ও অস্বাতন্ত্র্য লাভ করে। তবে কোন কোন বিভিন্নাংশে অধিকগুণ শক্তি হয় এবং কোন কোন বিভিন্নাংশে অত্যল্প হয়। বিভিন্নাংশ কখনই চিন্তামণির প্রভূত ধর্ম্ম পায় না।"

—'জীবতত্ত্বং', শ্রীভাঃ মাঃ ৭।২

৩২। জীব কি সর্ব্বময় কর্ত্তা?

"জীব—হেতু-কর্ত্তা এবং ঈশ্বর—প্রয়োজক-কর্ত্তা। জীব নিজ-কর্ম্মের কর্ত্তা হইয়া যে ফলভোগের অধিকারী হন এবং যে ভাবি-কর্ম্মের উপযোগী হন, সেই সকল ফলভোগ ও কার্য্যকরণে প্রয়োজক-কর্ত্তা হইয়া ঈশ্বরের কর্তৃত্ব আছে। ঈশ্বর—ফল-দাতা, জীব—ফল-ভোক্তা।"　　—জৈঃ ধঃ ১৬শ অঃ

৩৩। জীব কি নিত্য না অনিত্য বস্তু ?

"জীবকে নিত্যও বলা যায় এবং অনিত্যও বলা যায়। জীবের কারণই পরমেশ্বরের শক্তি এবং ঐ শক্তি নিত্য, অনাদি ও অনন্ত ; অতএব কারণ-গুণের অবলম্বনে জীবের নিত্যতা স্বীকার করা যায়। ** এই অনাদি অনন্ত শক্তির পরিণাম যে জীব, তিনি কারণ-গুণে নিত্য, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী। অতএব যদি কখনও জীবকে লয় করিবার জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা হয়, তবে লয় অবশ্যই হইতে পারিবে ; এজন্য জীবকে অনিত্যও বলা যায়।"

—তঃ সূঃ, ১২ সূঃ

৩৪। জীব কি পূর্ণব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে ?

"জীব ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও পূর্ণব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন না, যেহেতু ব্রহ্ম স্বয়ং নির্ব্বিকার ও অপরিণত ; কিন্তু পরব্রহ্মের জীবশক্তি হইতে জীব নিঃসৃত হইয়া পরিণামকে লাভ করিতেছেন। এজন্য জীব ও ব্রহ্মে কোন এক বিশেষ বিষয়ে ভেদ আছে।"

—তঃ সূঃ, ১৩ সূ

৩৫। কোন্ সময় জীব শান্তি লাভ করিতে পারে ?

"জীব যে-কাল-পর্য্যন্ত স্বীয় কর্ম্মফল ভোগ করিতে থাকেন, সে-পর্য্যন্ত তাঁহার শান্তি নাই, যেহেতু তিনি স্বয়ং দুর্ব্বল, অক্ষম ও অসম্পূর্ণ ; কিন্তু যখন তিনি ঈশ্বরের শরণাপন্ন হন, তখন তাঁহার আর শোক থাকে না।" —তঃ সূঃ, ১৩সূ

৩৬। ভগবদ্বহির্ম্মুখ কাহারা ?

"কৃষ্ণভক্তির স্বরূপ যাঁহাদের চিত্তে উদয় হয় নাই, তাঁহারা জ্ঞান-কর্ম্মের আশ্রয়ে সর্ব্বদা দম্ভবিশিষ্ট থাকেন। অতএব তাঁহারাই ভগবদ্বহির্ম্মুখ। বহু দেবসেবী, ধর্ম্মী, নির্ভেদজ্ঞান-পিপাসু মায়াবাদী ও বেদশাস্ত্র-বিরোধী নাস্তিক প্রভৃতি ব্যক্তিগণ ভগবদ্বহির্ম্মুখ।" —'তত্ত্বৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন', সঃ তোঃ ১১।৬

৩৭। বিষয়ী কর্ম্মী ও জ্ঞানীর চেষ্টায় পার্থক্য কি ? কোন্ সময় জীব অন্তর্ম্মুখ হয় ?

"এই দেহের ইন্দ্রিয়-তর্পণই বিষয়-চেষ্টা। পরকালে ইন্দ্রিয়তর্পণই কর্ম্মীর চেষ্টা। নিজের সমস্ত কষ্ট দূরীকরণই জ্ঞানীর চেষ্টা। এই তিন পদ অতিক্রম করিয়াই জীব অন্তর্ম্মুখ হয়।" —'ভজন-প্রণালী', হঃ চিঃ

৩৮। বহির্ম্মুখ লোকের বিচার কি ?

"বহির্ম্মুখ লোক মনে করে—'আমরা বুদ্ধিবলে শিল্প-বিজ্ঞানাদি উন্নতি করিয়া আমাদের সুখ বৃদ্ধি করিতেছি।' বস্তুতঃ সকলেই কৃষ্ণের ইচ্ছায় হইয়া থাকে—একথা একবারও স্মরণ করে না।" —'অহংমম ভাবাপরাধ', হঃ চিঃ

৩৯। কাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানে না? জীবের নাস্তিকতাদ্বারা ঈশ্বরের কি কোন ক্ষতি হয়?

"যে-সমস্ত লোক বাল্যকাল হইতে কুতর্ক শিক্ষা করেন, তাঁহারা ক্রমশঃ কুসংস্কার-পরবশ হইয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানেন না; তাহাতে তাঁহাদের ক্ষতি বই আর ঈশ্বরের ক্ষতি কি হইতে পারে?"　　—চৈঃ শিঃ ১।১

৪০। আধ্যক্ষিকতাদ্বারা কি ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধ হয়?

"কতকগুলি দুর্ভাগা লোক ঈশ্বর বিশ্বাস করেন না; তাঁহাদের জ্ঞানময় চক্ষু মুদ্রিত আছে। জড়চক্ষে ঈশ্বরের আকার দেখিতে না পাইয়া মনে করেন—ঈশ্বর বলিয়া কেহ নাই। জন্মান্ধ লোকেরা যেরূপ সূর্য্যের আলোককে উপলব্ধি করে না, তদ্রূপ নাস্তিকেরা ঈশ্বর-বিশ্বাস করিতে অক্ষম হইয়া উঠে।"

—চৈঃ শিঃ ১।১

৪১। কোন্ সময় জীবের স্বরূপের পরিচয় পাওয়া যায়?

"ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি যেমত ভস্মে পরিচিত নন, ভস্ম অপসৃত হইলে স্বীয় উত্তাপ ও আলোকদ্বারা পরিচিত হন, সেইরূপ জীবের স্থূল ও লিঙ্গ-সত্তা অপসৃত হইলেই জীবের স্বরূপের পরিচয় পাওয়া যায়। স্থূল ও লিঙ্গরূপ ভস্মের দুই স্তর জীবরূপ অগ্নিকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে। যে-পর্য্যন্ত সেই দুই স্তর দূরীকৃত না হয়, সে-পর্য্যন্ত কি জীবের কোন পরিচয় নাই? হ্যাঁ আছে। ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির নিকট বসিলে যেরূপ স্বল্প পরিমাণ উত্তাপ পাওয়া যায়, সেইরূপ উক্ত দুই স্তর-আচ্ছাদিত জীবও কিয়ৎপরিমাণে নিজ-পরিচয় দিয়া থাকেন।"

—'জ্ঞান', সঃ তোঃ ৮।৭

৪২। জীবের আরোপিত সংসার কিরূপ?

"জীব লিঙ্গশরীরকে আমি মনে করিয়া নিজের মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার-গঠিত একটী নূতন শরীর কল্পনা করিয়াছেন। সেই লিঙ্গ-শরীর সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞান ও পদার্থ-বিজ্ঞানকে সম্মান করত নিজ-সম্পত্তি বলিয়া ভ্রান্ত হইতেছেন। আবার ভূতময় স্থূলদেহে অহংজ্ঞান-প্রযুক্ত আমি 'অমুক ভট্টাচার্য্য' বা 'অমুক সাহেব' মনে করিয়া কতই রঙ্গ করিতেছেন! কখনও মরেন, কখনও জন্মগ্রহণ করেন, কখনও সুখে ফুলিয়া উঠেন, কখনও বা দুঃখে শুকাইয়া যান! ধন্য পরিবর্ত্তন! ধন্য মায়ার খেলা! পুরুষ হইয়া একটী মহিলাকে বিবাহ করিতেছেন! আবার স্ত্রীলোক হইয়া একটী পুরুষের হস্ত ধারণ করত একটী প্রকাণ্ড সংসার পত্তন করিতেছেন! সংসারে গুরুজনের সেবা, পাল্য-জনকে পালন, রাজাকে ভয় এবং শত্রুকে ঘৃণা করিতেছেন! কুলবধূ হইয়া কতই লজ্জা ও লোক-নিন্দার ভয় করিতেছেন! এই

ছায়াবাজীর সংসারে মিথ্যা-সম্বন্ধে জড়ীভূত হইয়া আপনার নিজ-পরিচয় হইতে কতদূরে পড়িয়া আছেন! এবম্বিধ আরোপিত সংসারে অবস্থিত জীবের কি দুর্দ্দশা! কতকগুলি সংসারের আরোপিত বিধিকে স্বীয় স্বামী জ্ঞান করিয়া নিত্যপতি কৃষ্ণকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন!" —'প্রীতি', সঃ তোঃ ৮।৯

৪৩। অবৈষ্ণব কাহারা?

"ভক্তি-বিরহিত পণ্ডিত, ধনী, বলবান্, ব্রাহ্মণ, রাজা, প্রজা—সকলেই অবৈষ্ণব।" —'বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ', সঃ তোঃ ১০।২

৪৪। সদ্‌বিচারের ফল কি?

"পশু ও মানবের ভেদ এইমাত্র যে, পশুরা সদ্বিচারশূন্য এবং মানবগণ ঐ বিচারে সমর্থ। আত্মবোধই সদ্বিচারের ফল।" —চৈঃ শিঃ ২।২

৪৫। নিরীশ্বর-মানব কি পশু হইতে শ্রেষ্ঠ?

"সেশ্বর না হইলে নর-জীবন (যতদূর সভ্য হউক না কেন, যতদূর জড়বিজ্ঞান-সম্পন্ন হউক না কেন, যতদূর নৈতিক হউক না কেন) কখনই পশুজীবন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না।" —চৈঃ শিঃ ১।১

৪৬। কে 'মনুষ্য'-পদ-বাচ্য নহে?

"জগৎ কি, আমি কে? কে-ই বা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, আমার কর্ত্তব্য কি এবং তাহা করিয়া আমার কি হইবে?—এরূপ বিবেক যাহার নাই, সে মনুষ্য-মধ্যেই পরিগণিত নয়।" —চৈঃ শিঃ ২।২

৪৭। ভাগ্যের স্রোতে সত্তাকে বিসর্জ্জন করিলে কি গতি হয়?

"যাঁহারা মৃত মৎস্যের ন্যায় ভাগ্যের স্রোতে আপনাদের সত্তাকে বিসর্জ্জন করেন, তাঁহারা এই ভবসমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে কখনও জোয়ারে অগ্রগত ও ভাঁটায় পশ্চাৎগত হইতে থাকেন, অভিলষিত স্থানে কদাচ পৌঁছিতে পারেন না।" —চৈঃ শিঃ ৩।১

৪৮। বদ্ধজীবের লক্ষণ কি?

"নরকস্থ হইয়াও পুরুষ দেহত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না; নরকে নিবৃত্তি লাভ করিয়া দেবমায়া বিমোহিত হইয়া থাকে।" —'বদ্ধজীবলক্ষণম্', শ্রীভাঃ মাঃ ৮।১০

(ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

সাধুসঙ্গে সর্ব্বদাই বাস করিতে হইবে ; তাঁহার নিকট ভগবৎ-কথা শুনিতে হইবে। হরিকথা কীর্ত্তন করিলে অপরেও শুনিতে পারে। সুতরাং কীর্ত্তনেই আত্মমঙ্গল ও শ্রবণকারীর মঙ্গল—নিজের উপকার ও পরের উপকার যুগপৎ হইয়া থাকে। কীর্ত্তনে ত্রিবিধ সেবা হইয়া থাকে—কীর্ত্তনই হরিসেবা, নিজের শ্রবণে হরিসেবা, অপরকে শ্রবণের সুযোগ দান হরিসেবা, তদ্ব্যতীত কীর্ত্তনপ্রভাবেই স্মরণ হইয়া থাকে ; সুতরাং স্মরণে হরিসেবাও ঐ সঙ্গে হয়।

সবসময়ই কীর্ত্তন চাই। অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গ যাজন করিতে হইলে, কীর্ত্তন সহযোগেই করিতে হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রবণ করিতে হইবে এবং শ্রুতবাণী শুশ্রূষুর নিকট কীর্ত্তন করিতে হইবে, অশ্রদ্ধের নিকট নহে। অসৎসঙ্গ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর ভগবৎ-প্রসঙ্গ শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে হইবে। বৈষ্ণবাপরাধ হইতে বিশেষ সতর্ক থাকিতে হইবে। আমি পাকা বৈষ্ণব, আমি বৈষ্ণবকে চিনিতে পারি, এইপ্রকার অহঙ্কার যখন হয়, তখন ভজন হইতে বিচ্যুতি ঘটে।

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কখনও উদ্দেশ্যবিহীন কার্য্য করেন না। ভক্তের উদ্দেশ্য কৃষ্ণচন্দ্রের ইন্দ্রিয়তর্পণ, তাঁহার সকল কার্য্যের ফলই ভোগ করিবেন ভগবান্। ভগবান্ প্রাকৃত-দর্শনের অতীত, কিন্তু চিদিন্দ্রিয়বিশিষ্ট। মায়াবাদী ও গৃহব্রত উভয়েই দুঃসঙ্গ। নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর উহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। সাধুসঙ্গ-ফলে প্রেয়োবিচার শ্রেয়ের সহিত মিলিত হয়, তখনই ভূতশুদ্ধি হয়। সাধুর নিকট মর্ম্মান্তিক আঘাত লাভ ব্যতীত জীবের প্রেয়োবিচার যায় না। সাধুসঙ্গে অনর্থ-নিবৃত্তিক্রমে শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তির উদয়। শ্রদ্ধা—সাধন, রতি—ভাব ও ভক্তি—প্রেমভক্তি।

বিষয়-পিপাসা বা পাপ-প্রবৃত্তিকে আদরের সহিত গ্রহণ করিতে হইবে না। পাপাচরণ দূরের কথা, নৈতিক পুণ্যময় আচরণকেও গর্হণ করিতে করিতে শরণাগত হইয়া হরিভজন করিলে মঙ্গল করতলগত হইবে। জগাই ও মাধাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্ম আশ্রয় করার পর আর কোন পাপ করেন নাই।

প্রভু বলে,—"তোরা আর না করিস্ পাপ।"
জগাই-মাধাই বলে,—"আর নারে বাপ॥"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য ১৩।২২৫)

হরিভজনই পরম প্রয়োজন—এইরূপ বিচারকারী ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির দুর্গতি

বুঝিতে পারেন। হরিভজন করিলে নিত্য-জীবন লাভ হয়। যাঁহারা হরিভজন করেন, তাঁহারা মরেন না। ভক্তের কাম-ক্রোধাদি রিপু থাকে না। বহির্ম্মুখগণ রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ ইত্যাদির জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে। হরিভজনের প্রবৃত্তি থাকিলে ইন্দ্রিয় ও বিষয়কে জোর করিয়া দমন করিবার চেষ্টার দরকার নাই, যেহেতু অকপটে হরিভজন আরম্ভ হইলে ভগবৎকৃপায় ইন্দ্রিয়ের বিষদাঁত সহজেই ভাঙ্গিয়া যায়। মায়াবদ্ধ অতিবৃদ্ধেরও বিষয়েতে মোহ আছে। হরিভজনকারীর নিকট "বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে",—তিনি জগৎকে দুঃখপূর্ণ দেখেন না।

জীব যখন নিষ্কপটে শ্রীভগবানের শ্রীচরণে আত্মনিবেদন জ্ঞাপন করেন, তখন শ্রীভগবান্ মহান্ত-গুরুরূপে আবির্ভূত হন। মহান্তগুরুর নিকট দিব্যজ্ঞান লাভ না করিলে কেহ অধোক্ষজ-সেবাধিকার প্রাপ্ত হইতে পারেন না। আবার অধোক্ষজ-সেবা ব্যতীত আত্মপ্রসাদ লাভ অসম্ভব। অক্ষজবস্তুর সেবায় মনেনেন্দ্রিয়-তর্পণ হয়, আত্মপ্রসাদ লাভ হয় না।

শ্রীবিষ্ণুর সুদর্শনচক্রের অনুগ্রহে যাঁহার বাস করেন, কুদর্শন তাঁহাদিগকে আচ্ছন্ন করিতে পারে না। বৈষ্ণবদের দাস না হইয়া অবৈষ্ণবের শুদ্ধবৈষ্ণবরূপে গ্রহণ করিলে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হৃষীকেশের সেবা হইবার পরিবর্ত্তে হৃষীকের সেবা হয়, ভক্তি প্রতিহতা হন।

চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা-কথা যে পরিমাণে যাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তিনি সেই পরিমাণে চৈতন্যের সেবায় লুব্ধ হইয়াছেন। যিনি পূর্ণভাবে সেই পরিপূর্ণ চেতনবিগ্রহের কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার সেবায় পূর্ণভাবে নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র ষোলকলাবিশিষ্ট পরিপূর্ণ বস্তু, সুতরাং তাঁহার চেতনময়ী কথা জীবের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে জীবকে ষোলআনা তাঁহার পাদপদ্মে আকৃষ্ট করিবেই করিবে। যিনি আংশিকভাবে তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি শ্রীচৈতন্যের পাদপদ্মে আংশিকভাবে নিজেকে প্রদান করিয়াছেন। যতদিন পর্য্যন্ত না জীব দেহ, গেহ, পুত্র-কলত্র, কায়মনোবাক্য—যথাসর্ব্বস্বদ্বারা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের সেবায় নিরন্তর উন্মত্ত হইয়াছেন, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহার ষোলআনা শ্রীচৈতন্যের কথা শ্রবণ হয় নাই জানিতে হইবে।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্র পরম পরিপূর্ণ চেতনবস্তু। যিনি এই চৈতন্যচন্দ্রকে ভজনা না করিবেন, তাঁহার উপদেশ যাঁহার কর্ণদ্বারে প্রবিষ্ট না হইবে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই অচেতন বস্তু। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দয়া যিনি বিচার করিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছেন, তাঁহার নিরন্তর চৈতন্যচরণকমল-সেবা ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ মুহূর্ত্তের জন্যও হৃদয়ে উদিত হইতে পারে না।

মহাবদান্যতার পরাকাষ্ঠা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৫শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪২১ পৃষ্ঠার পর]

"শুনিব সকল চৈতন্যের কৃষ্ণভক্তি।
কেমনে নাচয়ে গায়, দেখোঁ তান শক্তি॥
দেখে কালি সেই দুই মদ্যপ আনিয়া।
নিমাই-নিতাই দুই নাচিবে মিলিয়া॥
একাকার করিবেক এই দুই জনে।
জাতি লই' তুমি আমি পলাই যতনে॥"

সদাশিব অদ্বৈতপ্রভু নিজ ইষ্ট-তত্ত্বের অনন্ত কারুণ্যগুণ-স্মরণে আবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। তাঁহার স্বাভাবিক প্রলয়ঙ্করী ক্রোধ ব্যাজস্তুতিরূপে প্রকাশিত হইল। ইহা দর্শন করত হরিদাস ঠাকুর পরানন্দে হাস্য করিতে লাগিলেন এবং মদ্যপদ্বয়ের উদ্ধার সুনিশ্চিত তাহা অবগত হইলেন। শ্রীল অদ্বৈত প্রভুর ব্যাজস্তুতি এতই গম্ভীর যে তাহা পাপিষ্ঠগণ কখনই বুঝিতে সক্ষম হয় না। প্রেমাবস্থার অভেদ বা সাম্য এবং তামসিক সাম্য দিবারাত্রের ন্যায় ভেদযুক্ত তাহা তমোগুণাসক্ত জগতের বোধগম্য হইলেও অরুচিকর। শ্রীল অদ্বৈতপ্রভু প্রেমাবর্ত্তে প্রবাহিত হইয়া পড়িলেন; তাঁহার জাত-পাত-বিচার প্রেমসিন্ধুতে হাবুডুবু খাইতে লাগিল। ইহাকে বর্ত্তমান রাজনৈতিক জাতপাতভেদহীনতা বলিলে অজ্ঞতা প্রকাশ পাইবে। শ্রীভগবানে আবিষ্টতা এবং ভগবানের মায়াশক্তিতে আবিষ্টতা একই তত্ত্ব হইতে পারে না। একটী চেতনের পূর্ণতম বিকাশ, অন্যটী চেতনের তমোগুণাচ্ছন্নতা। এমন কি অদ্বৈতবাদীর ব্রহ্মানন্দ বা কৈবল্য তত্ত্বও প্রেমভক্তের নিকট "নরকায়তে" বলিয়া বিচারিত হইয়া থাকে।

তমোগুণাপন্ন মদ্যপদ্বয় জগাই ও মাধাই প্রমত্তাবস্থায় নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্নানঘাটে সমুপস্থিত হইল। সেই মহাতীর্থকে কেন্দ্র করত সর্ব্বত্র অপকর্ম্ম সাধনে নিযুক্ত হইল। ভদ্রাভদ্র, ধনীদরিদ্র সকলের ইহাতে অতীব ভীতির সঞ্চার হইল। নিশাভাগে আর কেহই গঙ্গাস্নানে যাইতে সক্ষম হইলেন না। মদ্যপদ্বয় সমস্ত রাত্রি জাগ্রত থাকিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভবনের সন্নিকটে অবস্থান করত ভক্তগণের সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিত, কখনও বা মৃদঙ্গ-করতাল-বাদ্যের সহিত মদ্যের বিক্ষেপে নিজেরাও নৃত্য করিত। এরূপে জড়ানন্দে প্রমত্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ মদ্যপান ও নৃত্যগীতে বিহ্বল থাকিত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও ভক্তগণের কীর্ত্তনকে তাহারা মঙ্গলচণ্ডীর গীত বলিয়া ধারণা করিত। কদাচিৎ মহাপ্রভুর দর্শন পাইলে তাঁহাকে সম্ভ্রমসহকারে বলিত—নিমাই পণ্ডিত! মঙ্গলচণ্ডীর

গান ভালই হইতেছে, পালাটা যেন সম্পূর্ণ করা হয়। আমাদের দেখিবার খুবই ইচ্ছা হয়, বিনিময়ে আমরা যেখানে যাহা কিছু দ্রব্য প্রাপ্ত হইব সমস্তই প্রদান করিব। "আদৌ শ্রদ্ধা"—এই গুণটী তাহাদের মধ্যে আবির্ভূত হইল—এরূপ বিবেচনা করা অসঙ্গত নহে। তথাপি মাদকোন্মত্ততা প্রযুক্ত তাহাদের ঐ শ্রদ্ধাকেও সজ্জনগণ বিশ্বাস করিতেন না এবং তাহাদিগকে দূরতঃ পরিত্যাগ করিতেন।

একদিবস শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু নগরে প্রচারান্তে নিশাভাগে শ্রীনাম-কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রত্যাগমনকালে জগাই-মাধাইয়ের সম্মুখীন হইলেন। তাহারা 'কেরে, কেরে' বলিয়া তাঁহার প্রতি রোষ প্রকাশ করিল। প্রত্যুত্তরে নিত্যানন্দ প্রভু বলিলেন,—'আমি মহাপ্রভুর বাড়ী যাইতেছি।' মদ্যপানে হৃতজ্ঞান জগাই-মাধাই জিজ্ঞাসা করিল—তোর নাম কি? প্রভু বলিলেন—'অবধূত।' ইহাতে মাধাই ক্রুদ্ধ হইয়া ভগ্ন মদ্যভাণ্ডদ্বারা তাঁহার মস্তকদেশে আঘাত করিল; মস্তক হইতে দরদরধারে রক্ত নির্গত হইতে লাগিল। তথাপি করুণাসিন্ধু নিত্যানন্দ গোবিন্দ নামোচ্চারণ করত তাহার প্রতি করুণা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই রক্তধারা দর্শন করত জগাই মর্ম্মাহত হইল এবং মাধাই পুনর্ব্বার আঘাত করিতে উদ্যত হইলে তাহার হস্তধারণ করত প্রতিরোধ করিল। সে জগাইকে বলিল,—

"কেনে হেন করিলে নির্দ্দয় তুমি দৃঢ়।
দেশান্তরী মারিয়া কি হৈবা তুমি বড় ??
এড় এড় অবধূতে, না মারিহ আর।
সন্ন্যাসী মারিয়া কোন্ ভাল বা তোমার ??"

লোকমুখে এই ঘটনা শ্রবণ করত শ্রীমন্মহাপ্রভু সপার্ষদে অকুস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং জগাই ও মাধাইয়ের মধ্যস্থলে রক্তধারাপ্লুত নিত্যানন্দ প্রভুকে তাহাদের প্রতি হাস্য করিতে দর্শন করিলেন। তাঁহার শ্রীমুখে বিন্দুমাত্র দুঃখ বা ক্রোধের প্রকাশ দেখিতে পাইলেন না; করুণাঘনমূর্ত্তিরূপে তাঁহাকে দর্শন করিলেন। মহাপ্রভু বাহ্যতঃ ক্রোধান্বিত হইয়া 'চক্র, চক্র, চক্র' শব্দোচ্চারণপূর্ব্বক চক্রকে আহ্বান করিলে কুদর্শন বিনাশকারী সুদর্শন চক্র তৎক্ষণাৎ সমুপস্থিত হইলেন। জগাই-মাধাইয়ের দিব্যজ্ঞান লাভ হইল। নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর চরণে তাহাদের জন্য প্রাণভিক্ষা করিলে মহাপ্রভু শান্তভাব প্রকাশ করিলেন। নিত্যানন্দের প্রতি জগাইয়ের সেবাবৃত্তির পরিচয় অবগত হইয়া মহাপ্রভু আনন্দসহকারে প্রথমে জগাইকে প্রেমালিঙ্গন করিলেন। যে বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ ঘটে তাঁহার অনুগ্রহ ব্যতীত অপরাধমুক্তি ও প্রেমলাভ অসম্ভব লীলামুখে তাহা শিক্ষা প্রদান-জন্য মহাপ্রভু মাধাইকে শ্রীনিত্যানন্দচরণে শরণ গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন।

'জগাই রাখিল',—হেন বচন শুনিয়া।
জগায়েরে আলিঙ্গিলা প্রভু সুখী হৈয়া॥
জগায়েরে বলে,—"কৃষ্ণ কৃপা করু তোরে।
নিত্যানন্দ রাখিয়া কিনিলি তুঞি মোরে॥
যে অভীষ্ট চিত্তে দেখ,—তাহা তুমি মাগ'।
আজি হৈতে হউ তোর প্রেমভক্তিলাভ॥"

*　　*　　*

প্রভু বলে,—"জগাই, উঠিয়া দেখ মোরে।
সত্য আমি প্রেম-ভক্তি দান দিল তোরে॥"
চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধর।
জগাই দেখিল সেই প্রভু বিশ্বম্ভর॥
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হঞা পড়িল জগাই।
বক্ষে শ্রীচরণ দিলা চৈতন্য-গোঁসাই॥

*　　*　　*

আথেব্যথে মাধাই বসন এড়িয়া।
পড়িল চরণ ধরি' দণ্ডবৎ হৈয়া॥

*　　*　　*

মোরে অনুগ্রহ কর,—লঙ তব নাম।
আমারে উদ্ধার করিবারে নাহি আন॥"
প্রভু বলে,—"তোর ত্রাণ নাহি দেখি মুঞি।
নিত্যানন্দ-অঙ্গে রক্ত পাড়িলি সে তুঞি॥"
মাধাই বলয়ে,—"ইহা বলিতে না পার।
আপনার ধর্ম্ম প্রভু আপনি কেনে ছাড়?
বাণে বিন্ধিলেক তোমা যে অসুরগণে।
নিজ পদ তা' সবারে তবে দিলে কেনে?"
প্রভু বলে,—"তাহা হৈতে তোর অপরাধ।
নিত্যানন্দ-অঙ্গেতে করিলি রক্তপাত॥
আমা হৈতে এই নিত্যানন্দ-দেহ বড়।
তোর স্থানে এই সত্য কহিলাম দঢ়॥"

*　　*　　*

প্রভু বলে,—"অপরাধ কৈলে তুমি বড়।
নিত্যানন্দচরণ ধরিয়া গিয়া পড়॥"

* * *

বিশ্বম্ভর বলে,—"শুন নিত্যানন্দরায়।
পড়িল চরণে, কৃপা করিতে যুয়ায়॥
তোমার অঙ্গেত যেন কৈল রক্তপাত।
তুমি সে ক্ষমিতে পার, পড়িল তোমাত॥"
নিত্যানন্দ বলে,—"প্রভু, কি বলিব আমি?
বৃক্ষদ্বারে কৃপা কর—সেহ শক্তি তুমি॥
কোন জন্মে থাকে যদি আমার সুকৃত।
সব দিলুঁ মাধাইরে,—শুনহ নিশ্চিত॥
মোর যত অপরাধ, —কিছু দায় নাই।
মায়া ছাড়, কৃপা কর—তোমার মাধাই॥"

নিত্যানন্দ প্রভুর এই বাক্যে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় যে, মহাপ্রভু স্বয়ং **জগাই-মাধাইয়ের প্রতি মূল-অনুগ্রহকর্ত্তা**। নিত্যানন্দ প্রভু তাহা সম্যক্ বিদিত বলিয়াই মায়া ছাড়িবার বা আত্মগোপন না করিবার জন্য তাঁহাকে প্রার্থনা জানাইলেন। মহাপ্রভুও অমায়ায় তাঁহার হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিলেন এবং নিত্যানন্দ প্রভুকে বলিলেন,—

বিশ্বম্ভর বলে,—"যদি ক্ষমিলা সকল।
মাধাইরে কোল দেহ, হউক সফল॥"

নিত্যানন্দ প্রভু এরূপে আদিষ্ট হইয়া মাধাইকে সানন্দে আলিঙ্গন করিলেন।—

প্রভুর আজ্ঞায় কৈল দৃঢ় আলিঙ্গন।
মাধাইর হইল সর্ব্ব বন্ধনমোচন॥
হেনমতে দুইজনে পাইল মোচন।
দুইজনে স্তুতি করে দু'য়ের চরণ॥
প্রভু বলে,—"**আর তোরা না করিস্ পাপ।**"
জগাই-মাধাই বলে,—"**আর নারে বাপ।**"
প্রভু বলে,—"শুন শুন তোরা দুই জন।
সত্য সত্য আমি তোরে করিলাম মোচন॥
কোটি কোটি জন্মে যত আছে পাপ তোর।
আর যদি না করিস, সব দায় মোর॥
তো দোঁহার মুখে মুঞি করিব আহার।
তোর দেহে হইবেক মোর অবতার॥"

প্রভুর শুনিয়া বাক্য জগাই-মাধাই।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হই' পড়িল তথাই॥

এইরূপে বিগতমোহ জগাই-মাধাই আনন্দসিন্ধুমধ্যে নিমজ্জিত হইলে মহাপ্রভু তাহাদিগকে উত্তোলনপূর্ব্বক নিজ ভবনে আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন এবং তাহাদের সহিত কীর্ত্তন করিবেন বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সাধককে নিজ-চেষ্টাদ্বারা পাপ ও অপরাধ হইতে মুক্ত হইতে হইবে—ইহাই মহাপ্রভুর লীলায় শিক্ষা প্রদত্ত হইয়াছে। সর্ব্বোপরি শ্রীমহাপ্রভু দ্বিতীয়-স্বরূপে শ্রীনিত্যানন্দরূপে চিদ্বল প্রদান করত অর্থাৎ দিব্যজ্ঞান প্রদান করত জীবকে মায়া বা অজ্ঞান হইতে পরিত্রাণ করেন। চিদ্বলাধার শ্রীবলদেবই শ্রীগুরুতত্ত্বরূপে এই কার্য্য সাধন করেন। তাঁহারই শক্তি লাভ করত জীব মোহমুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রেমলাভে যোগ্য হয়েন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাণী—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥
ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেৎ তং ভক্ত্যৈকয়েশং **গুরুদেবতাত্মা**॥

শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটীতে "গুরুদেবতাত্মা" বাক্যের সার্থকতা ইহাই সুব্যক্ত করিয়াছে।

অনন্তর মহাপ্রভু বলিলেন,—

ব্রহ্মার দুর্ল্লভ আজি এ দোঁহারে দিব।
এ দোঁহারে জগতের উত্তম করিব॥
এ দুই-পরশে যে করিল গঙ্গাস্নান।
এ দোঁহারে বলিবে সে গঙ্গার সমান॥
নিত্যানন্দ-প্রতিজ্ঞা অন্যথা নাহি হয়।
নিত্যানন্দ-ইচ্ছা এই জানিহ নিশ্চয়॥

শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুদেবের সঙ্কল্প স্বয়ং ভগবান্ সর্ব্বথা রক্ষা করিয়া থাকেন।"

বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়।
এ হেন পামর প্রতি হইবেন সদয়॥

—এই বাক্যে একই প্রতিধ্বনি। অতঃপর বিষ্ণুকিঙ্করগণ সুযোগ্য সাধককে বৈকুণ্ঠে আনয়ন করিয়া থাকেন। অন্যের পক্ষে সে স্থানে প্রবেশ করা অসম্ভব।

জগাই-মাধায়ে সব বৈষ্ণবে ধরিয়া।
প্রভুর বাড়ীর অভ্যন্তরে গেলা লৈয়া॥

আপ্তগণ সাম্ভাইলা প্রভুর সহিতে।
পড়িল কপাট, কারো শক্তি নাই যাইতে ॥

এক্ষণে ভক্তের নিত্যলীলা-প্রবেশ বলিতে হইয়াছে। সঙ্কীর্ত্তনরাস-বর্ণনায় শ্রীশ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গোলোকের মাধুর্য্য প্রকোষ্ঠের নিত্যরাসলীলা জগতে প্রকট করিয়াছিলেন। তিনিই ঔদার্য্যবিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেবরূপে গোলোকের ঔদার্য্য প্রকোষ্ঠসহ সংকীর্ত্তন রাসলীলা প্রকট করিয়াছেন। জগাই-মাধাই প্রভুদ্বয়কে সেই সঙ্কীর্ত্তনরাসস্থলীতে সেবা প্রদান করত ঔদার্য্যলীলায় মহাবদান্যতার পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করিতেছেন। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর স্বীয় দিব্যদর্শনে তাহারই বর্ণনা দিতেছেন।—

বসিল আসিয়া মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
দুই পাশে শোভে নিত্যানন্দ-গদাধর ॥
সম্মুখে অদ্বৈত বৈসে মহাপাত্ররাজ।
চারিদিকে বৈসে সব বৈষ্ণবসমাজ ॥
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, প্রভু হরিদাস।
গরুড়, রামাই, শ্রীনিবাস, গঙ্গাদাস ॥
বক্রেশ্বর পণ্ডিত, চন্দ্রশেখর আচার্য্য।
এ সব জানেন চৈতন্যের সব কার্য্য ॥
অনেক মহান্ত সব চৈতন্য বেড়িয়া।
আনন্দে বসিলা জগাই-মাধাই লইয়া ॥
লোমহর্ষ, মহা-অশ্রু, কম্প সর্ব্ব-গায়।
জগাই মাধাই দোঁহে গড়াগড়ি যায় ॥
কার শক্তি বুঝিতে চৈতন্য-অভিমত।
দুই দস্যু করে দুই মহাভাগবত ॥
তপস্বী সন্ন্যাসী করে পরম পাষণ্ড।
এইমত লীলা তান অমৃতের খণ্ড ॥
ইহাতে বিশ্বাস যা'র, সেই কৃষ্ণ পায়।
ইথে যার সন্দেহ, সে অধঃপাতে যায় ॥
জগাই-মাধাই দুই জনে স্তুতি করে।
সবার সহিত শুনে গৌরাঙ্গসুন্দরে ॥

মহাপ্রভুর কৃপায় শ্রীমন্মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দপ্রভু তত্ত্বতঃ কোন্ বস্তু জগাই-

মাধাই প্রভুদ্বয় তাহা দর্শন করিলেন। শুদ্ধা সরস্বতী তাঁহাদের জিহ্বায় অধিষ্ঠিত হওয়ায় তাঁহারা ঔদার্য্যবিগ্রহদ্বয়ের যথাযথ মহিমা কীর্ত্তনে যোগ্যতা লাভ করত বর্ণনা করিতেছেন,—

"জয় জয় মহাপ্রভু জয় বিশ্বম্ভর।
জয় জয় নিত্যানন্দ—বিশ্বম্ভর-ধর॥
জয় জয় নিজনাম-বিনোদ আচার্য্য।
জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যের সর্ব্বকার্য্য॥
জয় জয় জগন্নাথ মিশ্রের নন্দন।
জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যশরণ॥
জয় জয় শচীপুত্র করুণার সিন্ধু।
জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যের বন্ধু॥
জয় রাজপণ্ডিত-দুহিতা প্রাণেশ্বর।
জয় নিত্যানন্দ কৃপাময় কলেবর॥
সেই জয় প্রভু—তুমি যত কর কাজ।
জয় নিত্যানন্দচন্দ্র বৈষ্ণবাধিরাজ॥
জয় জয় শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর।
প্রভুর বিগ্রহ—জয় অবধূতবর॥
জয় জয় অদ্বৈতজীবন গৌরচন্দ্র।
জয় জয় সহস্রবদন নিত্যানন্দ॥
জয় গদাধর-প্রাণ, মুরারি-ঈশ্বর।
জয় হরিদাস-বাসুদেব-প্রিয়কর॥
পাপী উদ্ধারিলে যত নানা অবতারে।
পরম অদ্ভুত—তাহা ঘোষয়ে সংসারে॥
আমা দুই পাতকীর দেখিয়া উদ্ধার।
অল্পত্ব পাইল পূর্ব্ব মহিমা তোমার॥
অজামিল-উদ্ধারের যতেক মহত্ত্ব।
আমার উদ্ধারে সেহো পাইল অল্পত্ব॥
সত্য কহি,—আমি কিছু স্তুতি নাহি করি।
উচিতেই অজামিল মুক্তি-অধিকারী॥
কোটি ব্রহ্ম বধি' যদি তব নাম লয়।
সত্য মোক্ষ-পদ তার—বেদে সত্য কয়॥

হেন নাম অজামিল কৈলা উচ্চারণ।
তেঞি চিত্র নহে অজামিলের মোচন॥
বেদ-সত্য স্থাপিতে তোমার অবতার।
মিথ্যা হয় বেদ তবে, না কৈলে উদ্ধার॥
মোরা দ্রোহ কৈলুঁ প্রিয় শরীরে তোমার।
তথাপিও আমা-দুই করিলে উদ্ধার॥
এবে বুঝি' দেখ প্রভু, আপনার মনে।
কত কোটি অন্তর আমরা দুই জনে॥
'নারায়ণ'-নাম শুনি' অজামিল-মুখে।
চারি মহাজন আইলা, সেই জন দেখে॥
আমি দেখিলাম তোমা—রক্ত পাড়ি' অঙ্গে।
সাঙ্গোপাঙ্গ, অস্ত্র, পারিষদ সব সঙ্গে॥
গোপ্য করি' রাখিছিলা এ সব মহিমা।
এবে ব্যক্ত হইল প্রভু, মহিমার সীমা॥
এবে সে হইল বেদ—মহাবলবন্ত।
এবে সে বড়াই করি' গাইব অনন্ত॥
এবে সে বিদিত হইল গোপ্য গুণগ্রাম।
'নির্লক্ষ্য-উদ্ধার'—প্রভু, ইহার সে নাম॥
যদি বল—কংস-আদি যত দৈত্যগণ।
তাহারাও দ্রোহ করি' পাইল মোচন॥
কত লক্ষ্য আছে তথি, দেখ নিজ মনে।
নিরন্তর দেখিলেক সে নরেন্দ্রগণে॥
তোমা সনে যুঝিলেক ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মে।
ভয়ে তোমা নিরবধি চিন্তিলেক মর্ম্মে॥
তথাপি নারিল দ্রোহপাপ এড়াইতে।
পড়িল নরেন্দ্র-সব বংশের সহিতে॥
তোমারে দেখিয়া নিজ জীবন ছাড়িলা।
তবে কোন্ মহাজনে তারে পরশিলা॥
আমার পরশে এবে ভাগবতগণে।
ছায়া ছুঞি' যেই জন কৈলা গঙ্গাস্নানে॥
সর্ব্বমতে প্রভু, তব এ মহিমা বড়।
কাহারে ভাণ্ডিব, সবে জানিলেক দঢ়॥

মহাভক্ত গজরাজ করিল স্তবন।
একান্ত শরণে দেখি' করিলা মোচন॥
দৈবে সে উপমা নহে অসুরা পুতনা।
অঘ-বক-আদি যত কেহ নহে সীমা॥
ছাড়িয়া সে দেহ তারা পাইল দিব্যগতি।
বেদ বিনে তাহা দেখে কাহার শকতি??
যতেক করিলা তুমি পাতকি-উদ্ধার।
কারো কোনরূপ লক্ষ্য আছে সবাকার॥
নির্লক্ষ্যে তারিলা ব্রহ্মদৈত্য দুইজন।
তোমার কারুণ্য সবে ইহার কারণ॥
বলিয়া বলিয়া কাঁদে জগাই-মাধাই।
এমত অপূর্ব্ব করে চৈতন্য-গোঁসাই॥

এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শনে সমবেত বৈষ্ণবগণ যোড়হস্তে দণ্ডায়মান হইয়া স্তুতি করিতে লাগিলেন। এই দুই মদ্যপ যে স্তুতি করিল তাহা মহাপ্রভুর কৃপা ব্যতীত কাহারও যোগ্যতা হইতে পারে না।

প্রভু বলে,—"এ দুই মদ্যপ নহে আর।
আজি হৈতে এ দুই সেবক আমার॥
সবে মিলে অনুগ্রহ কর এ দু'য়েরে।
জন্মে জন্মে আর যেন আমা না পাসরে॥
যেরূপে যাহার ঠাঁই আছে অপরাধ।
ক্ষমিয়া এ দুই প্রতি করহ প্রসাদ॥"

মহাপ্রভুর বাক্য শ্রবণ করত জগাই-মাধাই সর্ব্ববৈষ্ণবের চরণ ধারণ করিলেন। মহাভাগবতগণও দুইজনকে আশীর্ব্বাদ করিলেন; জগাই-মাধাই সর্ব্ব অপরাধ হইতে মুক্ত হইলেন।

প্রভু বলে,—উঠ উঠ জগাই-মাধাই।
হইলা আমার দাস আর চিন্তা নাই॥

অতঃপর জগাই-মাধাইয়ের সমস্ত পাপ নিজ শরীরে গ্রহণ করত স্বীয় গৌর-দেহ কালিমাচ্ছন্নরূপে প্রকাশ করিলেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু মহাপ্রভুর প্রচ্ছন্ন-লীলাকে মর্য্যাদা প্রদান করত চতুরতাসহকারে বলিলেন,—তুমি গোকুলচন্দ্ররূপে প্রকাশ পাইতেছ। প্রভুও নিজ ভঙ্গিমায় বলিলেন,—

প্রভু বলে,—"কালা দেখ দুইর পাতকে।
কীর্ত্তন করহ—সব যাউক নিন্দকে॥"

মহাপ্রভুর আদেশে মহোল্লাসে সঙ্কীর্ত্তন-রাস আরম্ভ হইল—

নাচে প্রভু বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ-সঙ্গে।
বেড়িয়া বৈষ্ণব সব যশঃ গায় রঙ্গে॥
নাচয়ে অদ্বৈত—যাঁর লাগি অবতার।
যাঁহার কারণে হইল জগৎ-উদ্ধার॥
কীর্ত্তন করয়ে সবে দিয়া করতালি।
সবাই করেন নৃত্য হয়ে কুতূহলী॥
প্রভু-প্রতি মহানন্দে কারো নাহি ভয়।
প্রভু-সঙ্গে কত লক্ষ ঠেলাঠেলি হয়॥
সবেই পরমানন্দ দেখিয়া প্রকাশ।
কাহারো না ঘুচে কৃষ্ণাবেশের উল্লাস॥
যাঁ'র অঙ্গ পরশিতে রমা ভয় পায়।
সে প্রভুর অঙ্গ-সঙ্গে মদ্যপ নাচয়॥
দুই দস্যু দুই মহাভাগবত করি'।
গণের সহিত নাচে গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি॥

অতঃপর মহাপ্রভু নৃত্যাবেশে উপবিষ্ট হইলে সকল ভক্তগণও তাঁহার চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিলেন। সকলের অঙ্গ ধূলি-ধূসরিত হইলেও সকলেই নিজকে নির্ম্মল জ্ঞান করিতেছিলেন। মহাপ্রভু সহাস্যে বলিলেন,—

এ দু'য়েরে পাপী হেন না করিহ মনে।
এ দুয়ের পাপ মুঞি দহিলুঁ আপনে॥
সর্ব্বদেহে মুঞি করোঁ, বোলোঁ, চলোঁ, খাঙ।
তবে দেহপাত, যবে মুঞি চলি যাঙ॥
যেই দেহে অল্প দুঃখে জীব ডাক ছাড়ে।
মুঞি বিনা সেই দেহ পুড়িলে না নড়ে॥
তবে যে জীবের দুঃখ—করে অহঙ্কার।
মুই করোঁ, বলোঁ, বলি' পায় মহা-মার॥
এতেকে যতেক কৈল এই দুই জনে।
করিলাম আমি, ঘুচাইলাম আপনে॥

সর্ব্বজীবদেহে যাবৎ মহাপ্রভু পরমাত্মারূপে অবস্থান করেন, তাবৎকালের জন্য জীব কার্য্যক্ষম হয়, তিনি জীবদেহ ত্যাগ করিলে জীবের কার্য্যক্ষমতা থাকে না।—এই যুক্তিতে পাপকর্ম্মও মহাপ্রভু করিয়া থাকেন। জগাই-মাধাইয়ের

শরীরে তিনি অবস্থান করত তাহাদের কৃত পাপ তাঁহার দ্বারাই কৃত ; জগাই-মাধাইয়ের কৃত নহে বলিয়া ভক্তগণকে জগাই-মাধাইকে পাপী বলিয়া ধারণা করিতে নিষেধ করিলেন। মহাপ্রভুর এই উক্তিটি সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করা অতীব কঠিন। আপাতঃ বিচারে —ভগবদিচ্ছা ব্যতীত বৃক্ষ হইতে একটী পত্রও স্খলিত হয় না।

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥"

এইরূপ বাক্যগুলিও অনুরূপ বিচারের পোষক বলিয়া মনে হয়। পরন্তু ইহা জ্ঞানী ও ভক্তগণপক্ষে ভিন্নপ্রকার তাৎপর্য্যজ্ঞাপক। জ্ঞানীপক্ষীয় বিচার—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥

ভক্তপক্ষীয়বিচার—শুদ্ধ জীবাত্মা কর্ত্তাভিমানশূন্য এবং ভগবদিচ্ছাধীনবিধায় তাঁহাদ্বারা কৃতকর্ম্মকে ভগবৎকৃত বলিয়াই বিবেচিত হইয়া থাকে। শ্রীঅম্বরীষ মহারাজের চরিত্রে ইহাই প্রকাশিত। "অদন্যত্তে ন জানন্তি" অর্থাৎ "মচ্চিকীর্ষিত-মেবাম্বরীষেণ কৃতম্"—ইহাই বৈষ্ণবাচার্য্যগণের বিচার এই বিচার সম্পূর্ণ শরণাগত ভক্তপক্ষীয় ; সাধারণ জীব-সম্বন্ধীয় নহে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৫শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৫ পৃষ্ঠার পর]

Summary ও Substance এক জিনিষ নয়। পাঠ্যবিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ ও তার সংক্ষিপ্তসার পৃথক্ অবস্থা। বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়টুকুই সংক্ষিপ্তাবস্থা। আমাদের সময়ের অভাব হলে সার-সঙ্কলন করে থাকি। অপ্রয়োজনীয় বিষয় বর্জ্জন ও অত্যাবশ্যক বিষয় গ্রহণ নিষেধ ও বিধি নামে অভিহিত। ইহা গৌণ ও মুখ্য-রূপেও সংজ্ঞা লাভ করে। 'সার-সঙ্কলন' অর্থে সার-সংগ্রহ, প্রধান প্রধান বিষয়বস্তুর মর্ম্ম আহরণ। 'সার'-শব্দের বহুবিধ অর্থ হতে পারে। শ্রেষ্ঠাংশ-রহস্যই সারবস্তু বা 'সদ্বস্তু'।

শ্রীভগবান্ সারবস্তু বা সদ্বস্তু। তিনি সৎ, চিৎ, আনন্দময় বাস্তব বস্তু। তাঁরই অনুশীলনকে সার-সঙ্কলন বলা যায়। এ সংসারে তিনি পরম রহস্যময় বস্তু।

তিনি আমাদের নিকট শ্রেষ্ঠ, বল, ভরসা। সুতরাং আমরা 'সারগ্রাহী'—পল্লবগ্রাহী হয়ে সর্ব্বদা মনুষ্যজন্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করব। 'ভারবাহী' হয়ে অপরের বোঝা (Burden) বা উদ্বেগের কারণ হয়ে আমাদের এ জগতে থাকবার ইচ্ছা নাই। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু 'ভারবাহী' গর্দ্দভের সহিত অতাত্ত্বিক জনগণের তুলনা করেছেন। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণনাম-মহিমা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমাদের জানিয়েছেন,—

"আবিষ্ট হইয়া প্রভু করেন ব্যাখ্যান। সূত্র-বৃত্তি-টীকায়, সকল হরিনাম॥
প্রভু বলে,—সর্ব্বকাল সত্য কৃষ্ণনাম। সর্ব্বশাস্ত্রে 'কৃষ্ণ' বই না বলয়ে আন॥
আগম-বেদান্ত-আদি যত দরশন। সর্ব্বশাস্ত্রে কহে 'কৃষ্ণপদে ভক্তিধন'॥
মুগ্ধ সব অধ্যাপক কৃষ্ণের মায়ায়। ছাড়িয়া কৃষ্ণের ভক্তি অন্যপথে যায়॥
কৃষ্ণের ভজন ছাড়ি' যে শাস্ত্র বাখানে। সে অধম কভু শাস্ত্রমর্ম্ম নাহি জানে॥
শাস্ত্রের না জানে মর্ম্ম অধ্যাপনা করে। গর্দ্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি' মরে॥
পড়িয়া-শুনিয়া লোক গেল ছারে-খারে। কৃষ্ণ-মহামহোৎসব বঞ্চিলা তাহারে॥"

শ্রীনিমাই-গৌরহরি অধ্যাপনকালে হরিনামই সমগ্র সূত্র-বৃত্তি ও টীকার একমাত্র তাৎপর্য্যরূপে ব্যাখ্যা করেছেন। শব্দের বিবৃৎকৃটী ও অজ্ঞরূঢ়ী ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। শ্রীগৌরসুন্দর বিবৃৎকৃঢ়ি-ব্যাখ্যার দ্বারা শ্রীনামের বাচ্য-বাচকত্ব অভিন্ন বলে জানিয়েছেন। শ্রীনাম বাচকস্বরূপে অপ্রাকৃত শ্রীনামী পরব্রহ্মের দর্শনের সুযোগ দান করেন। যাহারা ভারবাহী, তাহাদের শাস্ত্রান্তরে 'জীবন্মৃত', 'জীবঞ্চব' বা 'শ্বসঞ্চব' বলে উল্লেখ করেছেন। তাদের কোনদিনই বাস্তব তত্ত্বদর্শন আলোচনার অবসর হয় না। শাস্ত্র তাদিগকে মায়ামোহিত, মুগ্ধ বা তত্ত্ব-বঞ্চিত বলে দুঃখপ্রকাশ করেছেন। যারা প্রাকৃত দুষ্কৃতিবশে সর্ব্বশাস্ত্রের তাৎপর্য্য—'কৃষ্ণভজন' পরিত্যাগ করে শাস্ত্রাদির ভক্তিপর ব্যাখ্যা করেন না বা ভক্তিপ্রতিকূল কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি অভক্তিকেই উপায় ও অর্থ-কামাদিকে উপেয়রূপে ব্যাখ্যা করেন, তারা শাস্ত্রের প্রকৃত রহস্য, তাৎপর্য্য বা অভিপ্রায় অবগত নন।

গুরু যদি Personified, তত্ত্বদর্শন ঠিক হচ্ছে না; বৈষ্ণব যদি Personified, তত্ত্বদর্শন ঠিক হল না। Universal good qualities —সদ্‌গুণ, সদ্ভাব নিয়ে শাস্ত্রে আলোচনা হয়েছে। সেই জিনিষটা যাঁর ভিতরে যতটা প্রকাশ, তাঁকে সেই-ভাবে ততটা স্বীকার করা হয়। তত্ত্বদর্শনটা এইভাবে বুঝানো আছে। মাথায় আমার কিছু ঢোকে না, বোকা আমি। কম সময়ে আমরা কিভাবে তত্ত্বদর্শন লাভ করব? দার্শনিক পরিভাষায় ঐ তত্ত্বদর্শনকে বলছেন—Ontology, আর জড়দর্শনটাকে বলছেন—Morphology। Ontology—তত্ত্ববিজ্ঞান নিয়ে চলব

আমরা—এই উপদেশ আমাদের শাস্ত্রে দেওয়া আছে। এটাই আমাদের বিশেষ বুঝবার বিষয়। গল্পটা বলা হল Morphology, তার শিক্ষাটা হল Ontology। শাস্ত্রে এই বিচারগুলি দেখিয়েছেন।

সময় যখন আমাদের কম, তুমি সেরূপ ব্যবস্থা নাও। 'সারং ততো গ্রাহ্যম্ অপাস্য ফল্গুঃ।' হাবিজাবি চিন্তা দূরে সরিয়ে দাও, দরকার নাই। তবে ভাল-মন্দের বিচারটা কিন্তু বুঝতে হবে। যদি ওটা আমার ভিতরে না থাকে, তাহলে আমি খারাপটাকে ছাড়ব কি করে এবং ভালটাকে নেব কি করে? সাধুসঙ্গ কোন্‌টা যদি আমার জানা না থাকে, তাহলে কি করে সাধুসঙ্গ গ্রহণ করব? সাধুর উপদেশ নেব কি করে? সাধুর কাছে বসব কি করে? আবার অসাধু—Dishonest কে, তাও আমাকে জানতে হবে, শিখতে হবে; তা না হলে আমি তাকে ছাড়ব কি করে? দুটো পাশাপাশি রেখে শিখতে হবে, জানতে হবে। ও সম্বন্ধে আমার পূর্ণ অভিজ্ঞান থাকা চাই। আমি জানি না, বুঝি না বললে হবে না।

"Ignorance is no law।" আমার অজ্ঞতার জন্য আমিই দায়ী হব। সেই অজ্ঞতার জন্য আমি কখনও ক্ষমা পাব না। আইন তার নিজস্ব পথেই চলে। আমাকে ঐ আইনানুসারেই চলতে হবে। আমার জন্য পৃথক্ ব্যবস্থা নাই, যা আমাকে দোষ-ত্রুটীর হাত থেকে রেহাই দিতে পারে।

President এর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি অনেক সময় খুনী আসামীকে ক্ষমা করতে পারেন। কিন্তু এটা ত' একটা বিশেষ ক্ষেত্র—Exceptional case। আমি বলব,—একটা Honourable exception। বিশেষ বিধি বিশেষ ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হয়। সাধারণ বিধি বা নিয়ম সাধারণ ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হবে, ইহাও আইনের ব্যাপার। Benefit of Doubt বা সন্দেহের অবকাশে অনেক সময়ে আসামী নিষ্কৃতি লাভ করে। কিন্তু যদি কেহ সে সুযোগ হতে বা President এর দায়-দাক্ষিণ্য হতে বঞ্চিত হয়, তখন সে-ক্ষেত্রে তার পরিত্রাণের অন্য কোন উপায় নাই।

বাচ্চা ছেলে আগুনে হাত দিলে তার হাতটা পোড়ে কেন? বাচ্চা ত' জানে না। তার হাতটা ত' পোড়া উচিত নয়। কিন্তু হাতটা পুড়ে গেল যে, এটা আইনের কথা। আমার অজ্ঞতা আমাকে ক্ষমা করে না। আমি উল্টোপাল্টা করলে আমার Punishment—সাজা হয়, খেসারত দিতে হয়। এই হল আইন। কম-বেশী একটু তাও হয় না। আগুনে হাত দিলে বাচ্চাটাও পুড়বে, বয়স্করাও পুড়বে। অগ্নিদেব ত' ক্ষমা করছেন না।

বাচ্চা বলে কি অগ্নিদেব তাকে রেহাই দিচ্ছেন ?—না, তা নয়। হাত পুড়ে যাচ্ছে। আইনে এ সমস্ত কথাগুলো আছে, এগুলো আমাকে শিখতে হবে। সার-সঙ্কলন করতে হবে, অসারবস্তু পরিত্যাগ করতে হবে। কি রকম ?—'হংসৈর্যথা ক্ষীরমিবাম্বুমধ্যাৎ।' আপনারা পরীক্ষা করে দেখবেন, রাজহাঁসকে যদি দুধে-জলে মিশিয়ে দেন, তাহলে দুধটা খেয়ে ফেলবে, জলটা পড়ে থাকবে। কেমন সার-সঙ্কলন করে রাজহংস! ঐরকম ধরণের সার-সঙ্কলন করা শিখতে হবে প্রত্যেক সাধক-সাধিকাকে। তা না হলে সাধন-ভজন হবে না। কিন্তু নিজের সাহায্যে ত' হবে না শিক্ষক-শিক্ষিকার দরকার। পারমার্থিক ক্ষেত্রেও সদ্‌গুরুর প্রয়োজন। উপদেশকের প্রয়োজন, শিক্ষাগুরুর প্রয়োজন সাধন-ভজন ক্ষেত্রে। উপাস্য যদি স্বয়ং ভগবান্ হন, সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ হন, তাহলে তাঁকে নিরাকার, নির্ব্বিকার, নিঃশক্তিক বলব না। মা-বাবা সামনে থাকতে যদি মা-বাবাকে অস্বীকার করা হয়, তাহলে মা-বাবা সন্তুষ্ট হন না। তেমনই ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা সবই থাকা সত্ত্বেও যিনি অস্বীকার করে যাচ্ছেন, তার ভগবদ্ভজন হবে না, হরিভজন হবে না। তাঁর আকার আছে। কি আকার ?—'যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্য গুণস্বরূপম্।"—শ্যামসুন্দর আকার কোথা থেকে বলছেন আপনি ?—আমি দেবোপনিষদ্ থেকে বলছি—"জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপম্ অতুল শ্যামসুন্দরম্, দ্বিভুজং শ্যামসুন্দরম্।' এই ত' ভগবানের আকারের কথা লেখা আছে। তিনি ভক্তকে ভালবাসেন ?—হ্যাঁ, ভালবাসেন। তিনি ভক্তের সঙ্গে কথা বলেন ?—হ্যাঁ, কথা বলেন। তাঁর পা আছে ? তিনি চলেন ?—হ্যাঁ, হাজার হাজার মাইল দূরে গিয়ে সাক্ষী দিয়ে এলেন। এখনও সেই মন্দির খালি পড়ে আছে বৃন্দাবনে। তাঁর হাত আছে ?—হ্যাঁ, আছে। প্রমাণ ?—গিরিরাজের যখন পূজা হচ্ছে ভগবান্ হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে নিচ্ছেন সব। তাঁর হাত না থাকলে তিনি হাত বাড়িয়ে নিচ্ছেন কি করে ? ভক্তের উপাহৃত দ্রব্য তিনি গ্রহণ করছেন আদর সহকারে, যত্ন সহকারে। এই লাইন দুটো গীতার মধ্যে আছে, ভাগবতের মধ্যেও আছে।—পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।

তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥

ভাগবতের দশম স্কন্ধের ৮০ অধ্যায়ের মধ্যে আছে। একই বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন ত'। কেন আছে সব জায়গায় ? এটা common factor কেন ? Universal Truth, Axiomatic Truth, সেইজন্য আছে। এগুলোকে ত' অস্বীকার করা যাবে না। তাহলে রাজহংসের মত আমাকে হতে হবে সার-সঙ্কলনের জন্য। সেটা আমার নিজের চেষ্টাতেই হবে ?—না, তোমার চেষ্টা থাকবে, কিন্তু

আর একটা জিনিসের পরে তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে। কি সেটা?—ভগবৎ-কৃপা, ভগবৎ-করুণা। এই করুণাকে বলছেন—causeless mercy—অহৈতুকী করুণা। আমি চেষ্টা করতে পারি, ভগবান্ আমাকে দয়া নাও করতে পারেন। কিন্তু করতে পারেন এই বিচার নিয়েই আমি সাধন ভজন-পথে অগ্রসর হব। বাচ্চা যদি কান্নাকাটি করে তাহলে নিশ্চয় মা-বাবা ছুটে গিয়ে কোলে নিয়ে তাকে সান্ত্বনা দেয়। এটা যদি সম্ভব হয় তাহলে নিখিল বিশ্বের সবই ত' ভগবানের বাচ্চা। যদি কেউ কান্নাকাটি করতে থাকেন ভগবানের নাম করে, তাহলে চুপ করে বসে থাকার উপায় নাই। ছুটে যেতে হয় তার কাছে, কোলে নিতে হয় এবং সান্ত্বনা দিতে হয়। একথা গীতা-ভাগবতে পরিষ্কারভাবে বুঝানো আছে।—ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।

কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥
অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥

অনন্যচিত্ত, এদিক ওদিক করছে অস্থির চিত্ত, এর পায়ে ফুল-চন্দন দেব, না ওর পায়ে দেব? সন্দেহ আছে। হবে না। সন্দেহ দূরে সরে যাওয়া চাই, তা না হলে হবে না। গীতায় কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কি বললেন?—তিন রকম লোকের কোন মঙ্গল হবে না। তারা কারা?—

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকে ঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ॥

প্রথমতঃ—Ignorance—অজ্ঞান ভাব থাকলে হবে না। দ্বিতীয়তঃ—অশ্রদ্ধা, তৃতীয়তঃ—'সংশয়াত্মা'—ভগবান্ আছেন, কি নাই; ভগবান্ তাঁর ভক্তকে ভালবাসেন কি না সংশয়—এই তিনরকম লোকের কোন কল্যাণ হতে পারে না। তাহলে এই তিনটীকে ছাড়তে হবে সাধন-ভজন পথে অগ্রসর হতে গেলে। অজ্ঞতা এবং অশ্রদ্ধা থাকলে হবে না, আবার সংশয় ভাবও ছেড়ে দিতে হবে। শ্রদ্ধা করে এগোতে হবে। 'শ্রদ্ধা' মানে কি? শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ব্যাখ্যা দিয়েছেন,—

'শ্রদ্ধা'-শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়॥

এর থেকে আর ভাল ব্যাখ্যা শাস্ত্রে কোথাও নাই। তিনি সহজ-সরল পয়ারে বলে দিলেন। বহু সংস্কৃত শ্লোক আছে, তার সহজ-সরল পয়ারে ব্যাখ্যা। "কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়॥" কৃষ্ণনাম করব কেন? কৃষ্ণকে ডাকব কেন? আরও ত' সব অনেক পড়ে আছে। পঞ্চাশটী গুণ বিন্দু বিন্দু মাত্রায় যাদের মধ্যে আছে, তাদের বলে জীবাত্মা। ৫৫টী গুণ অধিক মাত্রায় যাঁদের মধ্যে আছে তাঁদের বলে ব্রহ্ম-শিবাদি দেবতা। ৬০টী গুণ যাঁর মধ্যে আছে, তাঁকে বলে বিষ্ণু

বা নারায়ণ। ৬২½ টী গুণ যাঁর মধ্যে আছে, তাঁকে বলা হয় মর্য্যাদাপুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র। পূর্ণ ৬৪ গুণের অধীশ্বর যিনি, তিনি হলেন ভগবান্ কৃষ্ণ। তাহলে সবলকে আমি এক করব কি করে? নারায়ণ তত্ত্ব থেকে পূর্ণত্বের বিচার। কৃষ্ণ কি নারায়ণ নন? অবতার যাঁরা আছেন, তাঁরা কি নারায়ণ নন? যাঁরা অবতার এসেছেন, enlisted হয়েছেন, হবেন, সেটাও লেখা আছে শাস্ত্রে। এর বাইরে হবে না কিছু। রামা, শাম্যা, যদু, মধুকে অবতার বললাম, তা হবে না কিন্তু। এটা শাস্ত্রের Theory। বুদ্ধদেব এসেছেন, কল্কি ভগবান্ আসবেন।

ততদিন কি আমরা বেঁচে থাকব? সে ত' কলির শেষ। ৪,৩২,০০০ বৎসর কলি পরমায়ু। শেষের দিকে ভগবান্ কল্কিদেব আসবেন। সব কচুকাটা হয়ে যাবে। সেই সময়টার জন্য অপেক্ষা করব, না নিজে সাধন-ভজন করে চলে যাব? সময় নষ্ট করা ত' চলবে না। ভগবানের সাধন-ভজন ছাড়া যে সময় সবই নষ্ট। এ হল সব খরচের খাতা। আর ভগবানের নাম-জপ করা, ভগবানের চিন্তা-ভাবনা করা, সদ্‌গ্রন্থ আলোচনা করা ইত্যাদি হল Positive side, fixed deposit। সনাতন ধর্ম্মযাজী যাঁরা তাঁরা বোকা নন। কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলে দিচ্ছেন—আমি তোমাকে যে সনাতন ধর্ম্মতত্ত্ব উপদেশ দিচ্ছি, এতে তোমার লোকসানের সম্ভাবনা নাই। গীতার মধ্যে পড়েছেন আপনারা—'নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি'। এই সনাতন ধর্ম্ম এখান থেকে আরম্ভ করতে হবে, ওখানে শেষ করতে হবে, এরকম কোন কথা নয়। যখনই তুমি বুঝবে, যখনই তুমি শুনবে, তখনই সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ কর। কালবিলম্ব কর না। 'তূর্ণং যতেত' —একটুও সময় নষ্ট করবে না। 'প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে'—সনাতন ধর্ম্ম যাজন করলে তোমার লাভ হবে, সবটাই তোমার fixed deposit। 'স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।' এই সনাতন ধর্ম্ম, আত্মধর্ম্ম যদি তুমি জীবনে অল্প সামান্যও Practice কর, তাহলে মহান্ ভয় থেকে তুমি রক্ষা পাবে। এ সংসারে যত ভয় আছে, সব থেকে বড় ভয়টা কি?—মৃত্যুভয়। মৃত্যুঞ্জয় হওয়া যায় না। মৃত্যুঞ্জয় শুধু শিবঠাকুরের নাম না কি?—না, না, বহু মৃত্যুঞ্জয় বসে আছেন। শিবঠাকুরের একটা বিশেষ নাম মৃত্যুঞ্জয়। ভগবানেরও একনাম মৃত্যুঞ্জয়। ভগবানের বিষ্ণুসহস্রনামের মধ্যে দুরকম নাম আছে—মুখ্যনাম ও গৌণনাম। ভগবান্ মুখ্যনামগুলি নিজের জন্য Reserve করলেন, আর গৌণনামগুলি দেবতাদের নামকরণ করলেন। রাধাদেবী কি করলেন?—তিনিও তাঁর মুখ্যনাম-গুলি নিজের জন্য Reserve রাখলেন এবং গৌণনামগুলি সব দেবীগণকে বিভাগ করে দিলেন। মাথায় ঢোকে না আমাদের এগুলো সব কোথা থেকে কি এল।

জয় জয় রাধেজীকো শরণ তোহারি।
ঐছন আরতি যাঁউ বলিহারি।
বেষ বানাওত প্রিয় সহচরী।
রতন সিংহাসনে বৈঠল গৌরী॥

রাধারাণীর আরতির মধ্যে ত' 'গৌরী' এসে গেছেন। এখানে 'গৌরী' হলেন মূল রাধারাণী। তাঁরই নাম ত' ওটা। ঐ নামটা কাকেও দেওয়া হয়েছে। তাহলে ধার করা নাম ওটা। অন্যেরই নাম ওটা। শাস্ত্রের Theory তে এগুলো বলা আছে।

একজন প্রশ্ন করেছিলেন,—ব্রহ্মা, শিব কি একজন একজন। বললাম না, অনন্তকোটী বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, আর অনন্তকোটী তার Officer। ভয়ানক ব্যাপার, শুনে অবাক! এত শিব? এত ব্রহ্মা?—বললেন হ্যাঁ, আমাদের এখানকার চার মাথাওয়ালা ব্রহ্মা ভগবানকে দর্শন করতে গেছেন। গিয়ে জয়-বিজয়কে একটু খবর দিতে বললেন। জয়-বিজয় গিয়ে বললেন,—একজন এসেছেন চারমাথাওয়ালা। ওঁর ভিতরে অহঙ্কার রয়েছে যে উনিই ব্রহ্মা। ভগবান্ তাঁর অহঙ্কারটা বুঝতে পেরে জানতে চাইলেন—কোন্ ব্রহ্মা এসেছেন? জয়-বিজয় আবার ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করছেন,—আপনি কোন্ ব্রহ্মা? তখন ব্রহ্মার সন্দেহ আরও ঘনীভূত। ব্রহ্মা বললেন,—তোমরা গিয়ে বল চতুঃসনের পিতা ব্রহ্মা। ভগবান্ করেছেন কি—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যত ব্রহ্মা আছেন সকলকে Call করেছেন। স্মরণ করার সঙ্গে সঙ্গে সবাই এসে গেছেন। এসে একদিক থেকে ঢুকছেন আর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম করে অন্যদিক দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছেন। আর আমাদের চার মাথাওয়ালা ব্রহ্মা এক কোণার দিকে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে সব লীলা গুটিয়ে নিলেন ভগবান্। তখন ভগবান্ জিজ্ঞাসা করলেন,—কি, তুমি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? ব্রহ্মা বললেন,—প্রভু! কি দেখলাম এটা? ভগবান্ বললেন,—ভেল্‌কি দেখলে না কি? যা দেখেছ ঠিকই দেখছ। এই রকম ব্যাপার। দশমাথা, একশ মাথা, পাঁচশ মাথাওয়ালা ব্রহ্মা সব। তোমার যে চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ড তার জন্য চারমাথা দেওয়া হয়েছে। তাহলে এদের ব্রহ্মাণ্ড কত বড়, যার জন্য দশ, একশ, পাঁচশ মাথার দরকার হয়েছে। তখন আমাদের ব্রহ্মা বললেন,—ঠাকুর! তোমার লীলা বোঝা ভার! তুমি আমাকে পূর্ণজ্ঞান দিয়েছিলে, কিন্তু আমি পূর্ণজ্ঞান নিয়েও তোমার তত্ত্বদর্শন জানতে পারলাম না, বুঝতে পারলাম না। ঠাকুর! তুমি আমাকে ক্ষমা কর। 'দেবাঃ ন জানন্তি কুতো মনুষ্যঃ।'

যোগিগণ যাঁ'রে ধ্যানে নাহি পায়।
সে হরি বঞ্চিত হলে কি হবে উপায় ??

ভাগবতে বর্ণনা আছে. কৃষ্ণকে প্রণাম করছেন,—

যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিত তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ॥

তাহলে আমাদের কি অহঙ্কার আছে? যোগি-ঋষি-মুনিগণ যাঁকে ধ্যানে পাচ্ছেন না, ব্রহ্মা-শিবাদি-বন্দিত পাদপদ্ম সেই ভগবান্। যাঁর আজ্ঞা বহন করছেন শিবঠাকুর। কি করছেন?—ভগবানের পাদধৌত বারি ভগীরথ প্রার্থনা করেছেন। ভগবানের কমণ্ডলুতে ধর ছিল, সেখান থেকে ছেড়ে দিয়েছেন। তার বেগ কেউ সহ্য করতে পারছেন না। তখন শিবঠাকুরকে বলা হয়েছে। শিবঠাকুরের মাথার জটায় বহুকাল পাক খেয়েছেন সেই বিষ্ণুপাদধৌত বারি গঙ্গা। গঙ্গাদেবীর তিনটে নাম—স্বর্গে অলকনন্দা, মর্ত্যে ভাগীরথী—ভগীরথের নামানুসারে বিশেষ নাম, যখন পাতালে গেছেন তিনি তখন ভোগবতী-নামে পরিচিত হয়েছেন। পিতামহ ভীষ্মদেব শরশয্যায় শুয়ে আছেন, খুব পিপাসার্ত্ত। অর্জ্জুনকে বললেন,—আমাকে জল দাও। অর্জ্জুন বাণ সংযোজন করলেন, পাতাল থেকে ভোগবতী গঙ্গা এসে তাঁর মুখে পড়তে লাগল। এর থেকে Tube well system আবিষ্কার হয়েছে। গঙ্গা ত্রিপথগামী। শাস্ত্রে ত' সব লেখা আছে। অহঙ্কার কারও নাই। তথাপি অহঙ্কার করে মরি আমরা।

কৃষ্ণ বলছেন,—আমি ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেছি, রুদ্রকে সৃষ্টি করেছি, সকল দেবদেবীকে সৃষ্টি করেছি, কিন্তু এরা আমাকে কেউ বুঝে উঠতে পারছে না।

প্রজাপতিঞ্চ রুদ্রঞ্চ অহমের সৃজামি বৈ।
তৌ হি মাং বিজানীতো মম মায়া বিমোহিতো॥

আমার মায়ায় বিমোহিত হয়ে এরা আমাকে বুঝতে পারছে না, চিনতে পারছে না। তাহলে ব্যাপার কি? ভুল বুঝাবুঝি হচ্ছে, যুদ্ধ আরম্ভ করে দিচ্ছে। আসামের প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে যুদ্ধ হয়েছিল। সেখানে যাদব সৈন্য সব এসেছে। বাণাসুরের পুরী আক্রমণ করেছে। যুদ্ধ চলছে। এই বাণাসুর হচ্ছে শিবঠাকুরের শিষ্য। বাণাসুরের সহস্র বাহু। সুদর্শন চক্র হাতগুলো সব কেটে দিচ্ছে দেখে শিবঠাকুর কৃষ্ণের পায়ে পড়ে গেছেন। ঠাকুর, তুমি কি আমার শিষ্যটাকে মেরে ফেলবে? কৃষ্ণ বললেন,—দেখ, ও যদি তোমার শিষ্য

(ছেলে) হয়, তাহলে সম্পর্কে ত' আমার নাতি হয়। তুমি কি মনে কর আমি নাতির প্রতি অবিচার করব? কিন্তু ঠিক ঠিক তোমার পুত্র হওয়া চাই, শুধু মুখে ত' বললে হবে না। বাণাসুর হল প্রহ্লাদের নাতি। আমি প্রহ্লাদকে নৃসিংহাবতারে আশীর্ব্বাদ করেছিলাম—তোমার বংশে তোমারই পিতার মৃত্যু হয়েছে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট অভিশাপানুসারে, অতঃপর তোমার বংশে আর কেউ মারা যাবে না। সেটা আমার মনে আছে; কিন্তু তুমি ভুলে গেছ। ও ত' আমার বধ্য নয়। ওকে মারব না আমি। তবে ও খুব দাম্ভিক, অহঙ্কারী হয়ে পড়ছে। আমার নাম দর্পহারী মধুসূদন, আমি কারও অহঙ্কার রাখি না, সেজন্য ৯৯৬ খানা হাত কেটে দিলাম। চারখানা হাত রেখে সুদর্শন চক্র ফিরে গেল। তাহলে কেউ যদি সত্যি সত্যি ভগবানের ভক্ত হন, কেউ যদি তাঁর একান্ত ভক্ত শিব-ঠাকুরের অনুগত ভক্ত হন, সেখানে কোন অসুবিধা নাই। কিন্তু শিবানীর ক্ষেত্রে দেখেছেন আপনারা—মূর্ত্তি রয়েছে, ছবি রয়েছে মুণ্ডমালিনী শিবানী। বলুন ত' ঐ মুণ্ডগুলো কাদের, যেগুলো নিয়ে তিনি মালা করেছেন?—ভগবদ্বিরোধী যারা তাদের মুণ্ড। তারা ভগবানকে মানে নাই, শিব-শিবানীকেও মানে নাই, অথচ মুখে বলছে আমি তোমার ভক্ত। ঐ মায়ের হাতে সেই অসুর, দৈত্য দানবগুলো সব মরে গেল।

শিবানীর বিবাহ হয় নাই, বরমাল্য হস্তে দাঁড়িয়ে আছেন। বলুন ত' কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন তিনি?—কন্যাকুমারীতে। কারণ কি?—শিবের গলায় পরাবেন বলে মালা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, কিন্তু বিবাহ হয় নাই। বিবাহ রদ করে দিয়েছেন। সব দেবদেবী এসে বললেন,—শিবানীর বিবাহ হয়ে গেলে আর অসুর দলন হবে না, অসুরগুলো আর মারা যাবে না। সেইজন্য বিবাহ সে সময় বন্ধ হয়ে গেল। ভগবানের কাছে নালিশ। ভগবান্ সর্ব্বসমর্থ, বললেন ব্যবস্থা নিচ্ছি আমি। বিবাহের লগ্ন ছিল ৩-৩০ মিনিটে অর্থাৎ ভোর রাত্রে। কৈলাস থেকে আসছেন শিব। আসতে আসতে তখন বোধ হয় দুটো বেজেছে, সেই সময় মোরগ ডেকে উঠল। শিব তখন বললেন,—লগ্ন শেষ, ফিরে গেলেন তিনি, আর বিবাহ হল না। আবার তাঁদের দুজনের বিবাহ দিয়েছেন, একটা জায়গায়—মাদুরায়। সেখানে রাধাকৃষ্ণ হাজির, পৌরহিত্য করছেন ব্রহ্মা। স্কন্দপুরাণে ইতিহাস আছে।

ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্, তাঁর পক্ষে কোনটা অসুবিধা নয়, সবটাই সম্ভব। সেই প্রেমময় ভগবান্ কে? তাঁকে জানতে হবে, বুঝতে হবে। তাঁর সাধনা করতে হবে। সেই কথা শাস্ত্রে লেখা আছে। তিনি নিঃশক্তিক নন—সর্ব্বশক্তিমান্।

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ সম্বন্ধে দুই-চারিটী কথা

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ৪৫শ বর্ষ ৮ম সংখ্যায় (আশ্বিন, ১৪০০) প্রকাশিত 'প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভে' গোসাইগাঁও আসাম নিবাসী টি, কে, রায় মহাশয়ের প্রেরিত প্রশ্নের উত্তর পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রদান করিয়াছেন। রায় মহাশয় জড়বিজ্ঞানকে বাস্তব সত্য এবং বৈদিক শাস্ত্রকে ঋষিদের কাল্পনিক কাহিনী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এই প্রসঙ্গে দুই চারিটী কথা জ্ঞাপন করিতে চাই।

অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়া জড়বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত বলিয়া তাহা কখনও বাস্তব সত্য অর্থাৎ Absolute Truth-এর প্রকাশক হইতে পারে না। তাই বিখ্যাত বিজ্ঞানী Jeans তাঁহার "Jean's Mysterious Universe গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"Every conclusion is quite frankly speculative and uncertain. We are not in contact with ultimate reality. অর্থাৎ বিজ্ঞানের প্রত্যেক কথা আন্দাজমাত্র ও অনিশ্চিত। আমরা সত্যের সন্ধান পাই নাই " এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত পদার্থবিদ Thomson তাঁহার G. R. O. Thomson's Atom গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"Science does not present to be a bed rock of truth. It is a partial abstract kind of knowledge. It is not concerned with truth or anything ultimate. অর্থাৎ জড় বিজ্ঞানে সনাতন সত্যের স্থান নাই। সূক্ষ্মজগতের সহিত বিজ্ঞানের কোন সম্বন্ধ নাই। বিজ্ঞানে কেবল আংশিক সত্য আছে।" বিজ্ঞানী Russel তাঁহার 'Bertrand Russel's Relativity' গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"Science does not aim at immutable truths. অর্থাৎ সত্যকে জানা বিজ্ঞানের লক্ষ্য নহে।" বিজ্ঞানী Eddingtonও 'Science & Religion' গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"Reason is not infalliable when practised by a blundering intelligence. অর্থাৎ মানুষের ভ্রান্তবুদ্ধিতে প্রত্যক্ষ বিচার কখনও অভ্রান্ত হইতে পারে না।"

বাস্তব সত্যের প্রকাশক বেদ-বেদান্তের মধ্যে কল্পনার কোন আশ্রয় নাই। তাই যে ভারতবর্ষে বেদ-বেদান্ত আবির্ভূত হইয়াছেন, তাহাকে দর্শন তথা সম্মান করিবার জন্য পূর্ব্বে দেশ-দেশান্তর হইতে মানুষ এই ভারতে আসিতেন, বর্ত্তমানেও আসিতেছেন এবং ভবিষ্যতেও আসিবেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্যের দার্শনিক

Victor Cousin লিখিয়াছেন,—"The Upanishads contain truths so profound that we are constrained to bend the knee before the philosophy of the East and to see this, the native land of the highest philosophy. অর্থাৎ উপনিষদই বাস্তব সত্যকে তুলিয়া ধরিয়াছে ও প্রাচ্যের এই দর্শনের নিকট নতজানু হইয়া আমরা সর্ব্বদা প্রণাম করি। যেখানে এই দর্শনের সৃষ্টি হইয়াছে, সেই ভারতবর্ষকে দেখিবার জন্য আমরা সর্ব্বদাই আগ্রহান্বিত।"

অতীতের ঋষিগণের অবদানই সমগ্র বিশ্বের দরবারে ভারতবর্ষের মস্তককে উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছে। ব্যবহারিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও প্রাচীনকালে মুনি-ঋষিগণের কতদূর কৃতিত্ব ছিল, তাহা আশ্চর্য্য ও অনুধাবন করিবার বিষয়। ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের 'Extact Science of Hindu' এবং Sir প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের 'History of Hindu Chemistry' গ্রন্থদ্বয় হইতে আমরা জ্ঞাত হইতে পারি,—"জ্যোতিষ (Astronomy), পদার্থবিদ্যা (Physics), রসায়ন (Chemistry), দেহবিজ্ঞান (Physiology and Anatomy), আয়ুর্বিজ্ঞান (Medicine), তন্ত্রসিদ্ধ জারণ-মারণ, শোধন-ক্ষারণ কোন বিষয়ই ঋষিগণের অজ্ঞাত ছিল না। মাধ্যাকর্ষণ (Gravitation), রক্ত সঞ্চালন (Circulation of blood), ফুসফুসের আকুঞ্চন-প্রসারণ, আজ্ঞা নাড়ী ও সংজ্ঞা নাড়ীর (Motor and Sensory Nerves) এর প্রভেদ, পৃথিবীর আবর্ত্তন, আহ্নিক ও বার্ষিক গতি, গ্রহণে চন্দ্র-সূর্য্য-কর্ত্তৃক ছায়াগ্রহণ, সৌরমণ্ডলস্থ গ্রহ-উপগ্রহের গতিবিধি, এমন কি বহু ব্রহ্মাণ্ডের ও অয়ন চয়ন (Precision of the Equnoxes) পর্য্যন্ত তাঁহাদের জ্ঞানের গোচরীভূত ছিল। সেই যুগে পরমাণুবাদ, পরমাণুর অনিত্যতা, প্রকৃতির বিশ্বরচনায় আত্ম-উপাদানতা, সৃষ্টি অব্যক্তের ব্যক্তীভাব, বিলীনের পুনঃপ্রকাশ, Emergence—creation নহে, শক্তির সমাবর্ত্তন (Theory of Evolution), অবিশেষ হইতে বিশেষারম্ভ (from the homogeneous to the hetrogeneous) প্রভৃতি সুগভীর দুরবগাহ বৈজ্ঞানিক সত্যের সহিত তাঁহারা কেবল পরিচিত নহেন, বেশ নিবিড়ভাবে নিষ্ণাত ছিলেন।" এই প্রসঙ্গে চৈনিক কনফুচিও লিখিয়াছেন,—"I only hand on, I cannot create new things. I believe in the ancients and love them." বিজ্ঞানী Oliver Lodge লিখিয়াছেন,—Modern science appears to be rediscovering some of the discoveries of ancient science which were lost sight of or forgotten."

টি. কে. রায়ের প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর :—

(১) বিজ্ঞান কোন্ পরীক্ষিত সত্যের উপর ভিত্তি করিয়া সূর্য্যলোকে প্রাণের স্পন্দন নাই নির্দ্ধারণ করিয়াছেন? বিজ্ঞানীরা কি সূর্য্যলোকে গমন করিয়া এই তথ্যের সন্ধান পাইয়াছেন? কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বিজ্ঞানীরা মঙ্গলগ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না, পরে পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা তাঁহাদের ভ্রান্ত ধারণার আমূল পরিবর্ত্তন হয়। পৃথিবীর থেকে অনেক উন্নত সূর্য্যলোকে যে অনন্ত উন্নত পর্য্যায়ের জীব থাকিবে ইহাতে আশ্চর্য্যের কি আছে? সূর্য্যলোক ও সূর্য্যলোকের অধিপতি সূর্য্যদেব এক নহে। পুকুর বা জমির মালিককে যেরূপ পুকুর বা জমি বলা হয় না, তদ্রূপ সূর্য্যদেবকে সূর্য্যলোক বলা হইবে না। সূর্য্যলোকের সন্তানাদি না থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার অধিপতি সূর্য্যদেবের (যম, কর্ণ) সন্তানাদি আছে, তাহাতে অস্বাভাবিকতার কি আছে? সূর্য্যদেব রথে পরিভ্রমণ করেন, ইহাতে কল্পনার স্পর্শ কোথায়?

(২) Nobel Prize প্রাপ্ত বিজ্ঞানী Einstein লিখিয়াছেন,—"There is a perfect brain behind all the natural physical laws. অর্থাৎ সমস্ত প্রাকৃতিক কারণের পিছনে এক পূর্ণ জ্ঞানবান পুরুষের ক্ষমতা বর্ত্তমান।" বিজ্ঞানী Jeans তাঁহার Jean's Mysterious Universe' গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"We are beginning to suspect, the mind is the creator of the matter. Universe, a world of pure thought. অর্থাৎ জড় মনের দ্বারা উদ্ভূত সকল তথ্যের প্রতি আমরা সন্দেহ প্রকাশ করিতেছি, কিন্তু অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের এক একটী জগৎ সুসংবদ্ধ চিন্তার দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে।" তাই অনন্তনাগের মস্তকের উপর সর্ষের দানার মত পৃথিবীর অবস্থান সাধারণের দৃষ্টিতে অলৌকিক মনে হইলেও বিজ্ঞজনের নিকট তাহা স্বাভাবিক বলিয়া প্রতিভাত হয়।

(৩) সনাতন বৈদিক শাস্ত্রে আত্মার যে স্বরূপ বর্ণিত রহিয়াছে তাহাই সকলকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বিতর্কের দ্বারা আত্মার স্বরূপ কখনও নির্দ্ধারণ করা সম্ভবপর নহে। আত্মার যদি photo তোলা যাইত অথবা আত্মা দেখিতে যদি একটা ভুট্টা দানার মত হইত তবে বিজ্ঞানীরা অতি অনায়াসে তাহার সন্ধান পাইতেন। অনুবীক্ষণ যন্ত্রে তাহার স্বরূপ অবশ্যই ধরা পড়িত, কিন্তু আত্মার স্বরূপ ত' তাহা নহে। বৈজ্ঞানিকের যন্ত্রপাতি যতই সূক্ষ্ম, সুতীক্ষ্ণ ও সুকুমার হউক না কেন, আত্মার স্বরূপ তাহাতে কিছুতেই ধরা পড়িবে না। এইখানেই বিজ্ঞানের অক্ষমতা ও বৈফল্য। ভারতীয় যুক্তিবাদী বিজ্ঞান সমিতির President প্রবীর ঘোষ (অলৌকিক নয় লৌকিক ১ম খণ্ড) আত্মার বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার করেন

নাই। প্রবীর ঘোষের 'অলৌকিক নয় লৌকিক' ১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড আমার নিকট রহিয়াছে। প্রত্যেক খণ্ডেই তিনি আত্মার অস্তিত্বকে অস্বীকার করিয়াছেন। জীববিজ্ঞানকে প্রাধান্য দিতে গিয়া মানুষের মনকে তিনি সূক্ষ্মদেহ স্বীকার না করিয়া মনকে মস্তিষ্ক কোষেরই অ্যাকশন বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন। জীবনবিজ্ঞান সম্বন্ধে জীবনবিজ্ঞানী Haldane তাঁহার Haldane's Possible World গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"I have no doubt that biological theory is riddled with falsehood অর্থাৎ জীবনবিজ্ঞান যে মিথ্যা তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।" অথচ সেই জীবনবিজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া আত্মার অনুসন্ধান করা নিরর্থক নহে কি? প্রবীর ঘোষ আত্মার অস্তিত্বকে অস্বীকার করিয়াছেন বলিয়া আত্মার অস্তিত্ব থাকিবে না, তাহা হইতে পারে কি? কোন অজ্ঞ বালক যদি কলিকাতাকে পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী বলিয়া অস্বীকার করে, তাহাতে পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলিকাতা থাকিবে না কি? যেমন বিশেষ Process এবং Procedure এর মাধ্যমে কোন নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হয়, তদ্রূপ বৈদিক পন্থানুসারে আত্মার অনুসন্ধান করিলে অবশ্যই আত্মার স্বরূপ দর্শন হইবে।

(৪) নিউটন হইতে আইনস্টাইন পর্য্যন্ত প্রায় দুইশত বৎসরের গবেষণায় বিজ্ঞানের জ্ঞানের পরিধি একদিকে যেমন বিস্তার লাভ করিয়াছে, অন্যদিকে অজ্ঞাতের পরিধিও দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে। বিজ্ঞানের সামনে একদিকে সৌর-মণ্ডলেরও সীমার বাইরে কোটি কোটি ক্রোশ ব্যাপী ক্রমবর্দ্ধমান বিশ্বজগতের অজ্ঞাত রহস্য উপস্থিত হইতেছে, অন্যদিকে আবার প্রত্যেক পরমাণু ও জীবকোষের মধ্যে নিহিত সূক্ষ্ম জগতের বহু অজ্ঞাত রহস্যও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। এইরূপে পৃথিবীর বাইরে স্বর্গ ও নরকের অস্তিত্বের কথা যাহা আমরা বিভিন্ন ধর্ম্মগ্রন্থে পাই, তাহা কখনও কাল্পনিক হইতে পারে না। স্বর্গ ও নরকের বাস্তব অস্তিত্ব না থাকিলে ধর্ম্মশাস্ত্রে তাহা কখনই উল্লেখ থাকিত না। কুয়োর ব্যাঙ কুয়োটাকেই জগৎ বলিয়া জানে। তাই কুয়োর ব্যাঙকে কুয়োর বাইরের বিশাল জগৎকে জানিতে হইলে অবশ্যই তাকে কুয়ো ছাড়িয়া বাহিরে আসিতে হইবে।

(৫) বিজ্ঞানী Dirac বলিয়াছেন,—"Same experiment yields different results অর্থাৎ বিজ্ঞানীদের একই পরীক্ষায় বিভিন্ন ফল দেখা যায়।" বিজ্ঞানীদের অনেকে etherকে পদার্থের সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিয়া ভারবান্ বলেন, আবার অনেকে ether-এর ভার স্বীকার করেন না। নামকরা বিজ্ঞানীদ্বয় Heisenberg ও Dirac ইথারের তরঙ্গই স্বীকার করেন না। বিজ্ঞানীদের অনেকে Force ও Gravitation স্বীকার করেন না। উহাদের অস্বীকারে

স্থিতিবিজ্ঞান (Statics), গতিবিজ্ঞান (Dynamics), জলবিজ্ঞান (Hydrostatics) প্রভৃতি মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হয়। ৫০০ কোটি বৎসর পূর্ব্বে সূর্য্য থেকে একটী অংশ ছিটকে আসিয়া পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছিল, এই তথ্য কিছু কিছু বিজ্ঞানীর অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়া প্রতিষ্ঠিত নহে কি? অনুমানকে প্রমাণ বলিয়া কিছুতেই মানিয়া লওয়া যায় না। Darwin-এর 'Theory of Evolution' এর মতে জলের ভিতর প্রথম প্রাণের স্পন্দন দেখা দিল cell বা এককোষী প্রাণী। ক্রমঃবিকাশের ফলে এককোষী প্রাণীই সর্ব্বশেষে মানুষে রূপান্তরিত হইয়াছে। কিন্তু এককোষী প্রাণী যদি মানুষে রূপান্তরিত হইয়া থাকে, তবে ত' এককোষী প্রাণী, কুকুর, বিড়াল, ছাগল প্রভৃতি প্রজাতি বর্ত্তমানে জগতে থাকিবার কথা নহে; অথচ ঐসকল প্রজাতি দেখা যাইতেছে কেন? Darwin Thory যে বাস্তব সত্য নহে, তাহা ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয়। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই সকলপ্রকার প্রজাতির অস্তিত্ব ছিল এবং বর্ত্তমানেও রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া জগতে এইরূপ বৈচিত্র্য বিদ্যমান।

(৬) কর্ম্মানুযায়ী মানুষের পরবর্ত্তী জন্ম নির্দ্ধারিত হয়। কর্ম্মফলেই মানুষ কুকুর, বিড়ালাদি ৮৪ লক্ষ যোনি পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ ব্যতীত অন্যান্য জীব পাপ-পুণ্যের বিচার করিতে অক্ষম। মানুষই কর্ম্মবশে দেবত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে, আবার কর্ম্মবশেই নিম্নযোনি লাভ করিতে পারে। সৃষ্টির প্রথমে জীবসকল পশু, পক্ষী, মানব প্রভৃতি বিভিন্ন জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছিল। কর্ম্মানুসারে মানবসমূহই দেবত্ব ও নিম্নযোনি প্রাপ্ত হইবার যোগ্যতা লাভ করে। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্যই বর্ত্তমান জন্ম হইয়া থাকে, ইহাই বাস্তব সত্যকথা। ইহার মধ্যে গাঁজাখুরি কোন কথাই থাকিতে পারে না।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা

ও

শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)
ফোন : নব-২৪৭

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ ;
জেলা—নদীয়া (পশ্চিমবঙ্গ)।

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ **শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির** নিখিল ভুবন-মঙ্গলময়ী **আবির্ভাব-তিথিপূজা** (ফাল্গুনী-পূর্ণিমা) উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** শুভাশীর্ব্বাদে এবং সমিতির সভাপতি-আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের** আনুগত্যে উপরিউক্ত ঠিকানায় আগামী ৮ই চৈত্র, (ইং ২২।৩।৯৪) মঙ্গলবার হইতে ১৫ই চৈত্র, ১৪০০ (ইং ২৮।৩।৯৪), সোমবার পর্য্যন্ত এক সপ্তাহব্যাপী বিরাট **মহোৎসবের** অনুষ্ঠান হইবে। এই মহদনুষ্ঠানে প্রত্যহ পাঠ, বক্তৃতা, কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহ-সেবা, **মহাপ্রসাদ বিতরণাদি** বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-সমূহ যাজিত হইয়া থাকে।

বিশেষতঃ এতদুপলক্ষে **শ্রীনবদ্বীপধামের** অন্তর্গত নয়টী (৯টী) দ্বীপ দর্শন, তত্তৎস্থান মাহাত্ম্যকীর্ত্তন ও নগর-সঙ্কীর্ত্তনমুখে **ষোলক্রোশ শ্রীধামপরিক্রমা** হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধবে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে ভক্ত্যানুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মোৎসব এবং **শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমাপঞ্জী পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল**। ইতি—৩০শে মাঘ, ১৪০০

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য : কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে সমিতির 'সভাপতি' অথবা 'সম্পাদক'-এঁর নিকট উল্লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য ও প্রেরিতব্য।

শ্রীগৌরধাম-পরিক্রমা ও জন্মোৎসব-পঞ্জী

১। ৮ই চৈত্র (ইং ২২।৩।৯৪), মঙ্গলবার ;—(১) **শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ** (কীর্ত্তনাখ্য)—গঙ্গাস্পর্শনান্তে শ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম-মায়াপুর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ-প্রণত হইয়া স্বরূপগঞ্জ, গাদিগাছা, সুরভিকুঞ্জ, স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ, সুবর্ণ-বিহার, হরিহরক্ষেত্র, **নৃসিংহপল্লী** ; এবং (২) **শ্রীমধ্যদ্বীপ** (স্মরণাখ্য)—মাজিদা, হাটডাঙ্গা আনন্দবাস, বামনপুরা, হংসবাহন।

২। ৯ই চৈত্র (ইং ২৩।৩।৯৪), বুধবার :— (৩) **শ্রীকোলদ্বীপ** (পাদসেবনাখ্য)—গদখালির কোল, তেঘরির কোল, কোলের আমাদ, কোলের গঞ্জ, কোলের দহ, সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটি ; এবং (৪) **শ্রীঋতুদ্বীপ** (অর্চ্চনাখ্য)—রাতুপুর।

৩। ১০ই চৈত্র (ইং ২৪।৩।৯৪), বৃহস্পতিবার ;—(৫) **শ্রীজহ্নুদ্বীপ** (বন্দনাখ্য)—জান্নগর (জহ্নুমুনিস্থান), বিদ্যানগর (সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পাট) ; এবং (৬) **শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ** (দাস্যাখ্য)—**মামগাছি** (শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের পাট), অর্কটীলা বা একডালা, মাতাপুর (পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস)।

৪। ১১ই চৈত্র (ইং ২৫।৩।৯৪), শুক্রবার ;—(৭) **শ্রীরুদ্রদ্বীপ** (সখ্যাখ্য) —রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর ও গঞ্জের ডাঙ্গা ; এবং (৮) **শ্রীসীমন্তদ্বীপ** (শ্রবণাখ্য)—শিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘার চড়, বেলপুকুর ; অতঃপর শহর নবদ্বীপস্থ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি, পোড়ামাতলা (প্রৌঢ়া-মায়াস্থান)।

৫। ১২ই চৈত্র (ইং ২৬।৩।৯৪), শনিবার ;—(৯) **অন্তর্দ্বীপ** (আত্ম-নিবেদনাখ্য)—শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীগৌর-জন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীচৈতন্যমঠ (শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য-ভবন), জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-মন্দির, শ্রীধর-অঙ্গন ও শ্রীমুরারী গুপ্তের পাট, চাঁদকাজির সমাধি প্রভৃতি দর্শনান্তে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

৬। ১৩ই চৈত্র (ইং ২৭।৩।৯৪), রবিবার ; —**শ্রীগৌর-জন্মোৎসব।**

৭। ১৪ই চৈত্র (ইং ২৮।৩।৯৪), সোমবার ; —**সাধারণ-মহোৎসব (মহাপ্রসাদ বিতরণ)।**

জ্ঞাতব্য :—পরিক্রমায় যোগদানেচ্ছু যাত্রিগণ হাল্কা থালা, ঘটি এবং মশারীসহ বিছানা অবশ্যই সঙ্গে আনিবেন ও ৭ই চৈত্র (ইং ২১।৩।৯৪) সোমবার সন্ধ্যায় শ্রীমঠে উপস্থিত হইবেন। এতদ্ব্যতীত উক্ত দিবসের পূর্ব্বেই কেহ মঠে আসিলে থাকার ও প্রসাদাদির ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে না।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার নিয়মাবলী

১। **"শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা"** প্রতিবৎসর দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়। প্রতি মাসের অন্তিম দিবসের মধ্যেই শ্রীপত্রিকা প্রকাশিত হন।

২। সাধারণ ডাকযোগে "শ্রীপত্রিকা" গ্রহণ করিতে আগ্রহী হইলে বার্ষিক ভিক্ষা ৩০·০০ টাকা ও যাণ্মাসিক ১৭·০০ টাকা এবং আজীবন সদস্যপক্ষে ১০০১·০০ টাকা অগ্রিম প্রেরিতব্য। ভারত ও বিদেশবাসী সকলের পক্ষেই ভারতীয় মুদ্রা দেয়। ভি. পি. তে লইতে হইলে অতিরিক্ত খরচ গ্রাহকগণের স্বীকার্য্য।

৩। যে-কোনও সময়ে শ্রীপত্রিকার গ্রাহক হইতে পারিবেন। অতীত সংখ্যা লইতে হইলে প্রকাশকের সহিত পৃথক্ বন্দোবস্ত করিতে হয়।

৪। গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে সত্বর প্রকাশকের নিকট জানাইবেন। **সর্ব্বদা গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিবেন। পত্রের উত্তর পাইতে ইচ্ছা করিলে জোড়া** পোষ্টকার্ড বাঞ্ছনীয়।

৫। **শ্রীপত্রিকার কোন সংখ্যা না পাইলে পরবর্ত্তী মাসের মধ্যেই জানাইবেন।**

৬। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শিক্ষা-সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠান হয় না। ঈর্ষামূলে আক্রমণ-সূচক প্রবন্ধাদি শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হইবে না। সৎ-আলোচনা সর্ব্বদা আদরণীয়া।

৭। কোনও কিছু জানিতে বা টাকাকড়ি পাঠাইতে হইলে **'কার্য্যাধ্যক্ষ'** অথবা **'প্রকাশক' শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যালয়,** শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ ; ২৮, হালদার বাগান লেন ; কলিকাতা-৭০০০০৪ ঠিকানায় জানিতে বা পাঠাইতে হইবে।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রকাশিত শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ২। সিদ্ধান্তরত্নম্ (ভাষ্য-পীঠকম্), ৩। শ্রীচৈতন্যশিক্ষাষ্টক, ৪। শ্রীগৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছ, ৫। মায়াবাদের জীবনী, ৬। শরণাগতি, ৭। শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী-চরিত, ৮। শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ও পরিক্রমা-গ্রন্থাবলী, ৯। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা, ১০। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য, ১১। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা, ১২। জৈবধর্ম্ম (বাংলা ও হিন্দী), ১৩। বিজনগ্রাম ও সন্ন্যাসী, ১৪। শ্রীদামোদরাষ্টকম্, ১৫। অর্চ্চন-দীপিকা, ১৬। শ্রীগৌরাঙ্গ, ১৭। শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা, ১৮। শ্রীএকাদশী-ব্রতকথা, ১৯। শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি, ২০। উদ্ধারের পথ, ২১। শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ, ২২। শ্রীমনঃশিক্ষা, ২৩। শ্রীউপদেশামৃতম্, ২৪। তত্ত্বমুক্তাবলী (যুক্তিমল্লিকাসহ), ২৫। শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী, ২৬। শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য, ২৭। Shri Chaitanya Mahaprabhu, ২৮। The Bhagavat, ২৯। Nam-Bhajan, ৩০। The Vedanta, ৩১। Vaishnavism, ৩২। Rai Ramananda.

Central Regd. No. R. N. 5111/57
Postal Regd No. W. B./NDA-13

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিচালিত
শুদ্ধভক্তি প্রচারকেন্দ্রসমূহ

১। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ—তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ (নদীয়া)।
২। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ—চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ (হুগলী)।
৩। শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ—কংসটীলা, মথুরা পোঃ, (মথুরা), ইউ. পি.।
৪। শ্রীরূপ-সনাতন গৌড়ীয় মঠ—দানগলি, বৃন্দাবন পোঃ, (মথুরা) ইউ. পি.।
৫। শ্রীগোপীনাথজী গৌড়ীয় মঠ—রাণাপতঘাট, বৃন্দাবন পোঃ, (মথুরা) ইউ. পি.।
৬। শ্রীভক্তিবেদান্ত গৌড়ীয় মঠ—সন্ন্যাস রোড্, কঙ্খল পোঃ, (হরিদ্বার) ইউ. পি.।
৭। শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ—গৌরবাটসাহি, পুরী পোঃ, (পুরী), উড়িষ্যা।
৮। শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ—২৮, হালদার বাগান লেন, কলিকাতা-৪।
৯। শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ—গোলকগঞ্জ পোঃ (ধুবড়ী), আসাম।
১০। শ্রীনরোত্তম গৌড়ীয় মঠ—অরবিন্দ লেন, পোঃ ও জেলা কোচবিহার।
১১। শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচারকেন্দ্র—রান্দিয়াহাট পোঃ, (বালেশ্বর) উড়িষ্যা।
১২। শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ—শক্তিগড়, শিলিগুড়ি পোঃ, (জলপাইগুড়ি)।
১৩। শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠ ও পাদপীঠ—আশুতিয়াবাড় পোঃ, (মেদিনীপুর)।
১৪। শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠ—সিধাবাড়ী, রূপনারায়ণপুর পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
১৫। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ—বাসুগাঁও পোঃ, (কোকড়াঝাড়) আসাম।
১৬। শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ—তুরা পোঃ, (ওয়েষ্ট গারো হিলস্) মেঘালয়।
১৭। শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ—মিলনপল্লী, শিলিগুড়ি পোঃ, (দার্জ্জিলিং)।
১৮। শ্রীমদনমোহন গৌড়ীয় মঠ—মাথাভাঙ্গা পোঃ (কোচবিহার)।
১৯। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী—মণিপুর, নবদ্বীপ পোঃ, (নদীয়া)।
২০। শ্রীত্রিগুণাতীত সমাধি আশ্রম—গদখালি, নবদ্বীপ পোঃ, (নদীয়া)।
২১। শ্রীগৌড়ীয় দাতব্য চিকিৎসালয়—দেয়ারাপাড়া রোড্, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

BOOK-POST SL. NO.

To

From—

SHRI GOUDIYA-PATRIKA OFFICE
SHRI BINODE BEHARI GOUDIYA MATH
28, Halder Bagan Lane
Calcutta-700004
Ph : 33-8973